তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮
চতুর্থ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৭৩

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রী প্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও দি শ্রীধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬
হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র পান কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

উপন্যাস

নীলকণ্ঠ ... ১

গণদেবতা ... ১০৩

রাইকমল ... ৩৭১

বিবিধ

জলসাঘর (গল্প) ... ৪৪৩

যে বই লিখতে চাই (প্রবন্ধ) ... ৪৬১

নীলকণ্ঠ

এক

বেলা যায়-যায়। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মিধারা আকাশের বুকে ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ গ্রহণ করিতেছে। পৃথিবীর কোল হইতে অন্ধকার যেন ক্রমশ মাথা তুলিয়া উপরে উঠিতেছে। পল্লীপথ ধরিয়া একদল ছেলে কলরব করিতে করিতে বাড়ি ফিরিতেছিল। সকলেই সমান ভাবে চিৎকার করিয়া ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ প্রশ্ন বর্ষণ করিতেছিল—একটি ছেলের উপর।

অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়াছিল সপ্তরথী—কিন্তু শ্রীমন্তের চতুষ্পার্শ্বে বহুরথীর সমবেত আক্রমণ। শ্রীমন্ত আর যাই হৌক কাপুরুষ নয়—সে সকল প্রশ্নের যথাসাধ্য জবাব দিতেছিল। পেয়ারা চুরি করিতে গিয়া শ্রীমন্ত ধরা পড়িয়াছে; বাবুদের বাগান যে-খোট্টাটা এবার জমা করিয়া লইয়াছে তাহার হাতে বেশ ঘা-কতক খাইয়াছে।

শ্রীমন্তের একটিমাত্র জবাব সম্বল—ধ'রে ফেললে ত কি করব?

রামকেষ্ট কহিল—তুই ত গাছে গাছে চলে গিয়ে সব্বারই আগে বাগান পার হয়ে গেলি। তবে তোকে ধরেফেললে কি ক'রে?

—কে যে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল। আমি ভাবলাম নন্তু পড়ে গিয়েছে! তাই ফের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে গেলাম—তা দেখি কেউ কোথাও নাই! পিছু থেকে—

বাকিটা ধরা পড়ার লজ্জাকর ইতিহাস। সেটুকু বেচারার মুখে ফুটিল না। কিন্তু ব্যঙ্গবিষে ঝাঁজালো করিয়া সেটুকু বলিয়া দিল ওই নন্তুই।

—পিছু থেকে আগলদার এসে ক্যাঁক্ ক'রে ধরে ফেললে। শেয়ালে যেমন ভেড়া ধরে—ঠিক তেমনি ক'রে নয় রে?

বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ হাস্য-রোল আরও উদ্বেল উচ্ছল হইয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের মুখপানে চাহিয়া থাকে। এতগুলা মুখ চাপা দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পায় না।

হাসির বেগ ক্ষীণ হইয়া আসিলে বিপিন কহিল—তুই একটা ভ্যাবাকান্ত রে! সে ত মিথ্যে ক'রে চেঁচালাম আমি। নন্তু তখনও গাছ থেকে নামতে পারে নি—তাই বাগানের কোণে গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মিথ্যে ক'রে চিৎকার ক'রে উঠলাম। বেটা খোট্টা যেমনি এদিকে ছুটে এসেছে, অমনি নন্তুও গাছ থেকে নেমে পঁয়ষট্টি। আর মাঝখান থেকে ভ্যাবা-গঙ্গারাম এসে নাড়ুগোপালের মত ধরা পড়লেন। আহা-হা!

আবার হাসির রোল আবর্তের মত ফেনাইয়া উঠিল, পরম কৌতুকে সবাই উপভোগ করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

চণ্ডীচরণ কহিল—আচ্ছা তুই বল্লি না কেন যে, বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম কে চিৎকার ক'রে উঠল। কেউ পড়ে গিয়েছে মনে ক'রে আমি দেখতে এসেছি—আমায় ধরবে কেন?

একটুখানি আমতা-আমতা করিয়া সে কৈফিয়ৎ দিল—বাঃ, দাঁতে যে পেয়ারার কুচি লেগেছিল—

—দন্ত-বিকাশ রে আমার! ধরা পড়বামাত্রই বুঝি দাঁত মেলে বসেছিলেন? ছিমন্ত কিনা?

—নামেও ছিমন্ত কাজেও ছিমন্ত রে তুই!

—ছিমন্ত নয় রে—শ্রীমন্ত—কানার নাম পদ্মলোচন!

শ্রীমন্ত এবার মরিয়ার মত একটা কৈফিয়ৎ দিল—ছিমন্ত হই আর যাই হই—তোদের নাম ত করি নি আমি।

—নিজে ত মার খেলি।

এবার শ্রীমন্ত যেন একটা মনের মত জবাব পাইল; খুব একচোট তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া সে কহিল—লাগেই নাই আমাকে। সেই বেটা ছাত্তুরই হাত ফুলে উঠবে দেখতে পাবি!—থাঁটি রক্ত জমে যাবে। বাবা, এ পিঠে যিনি চাপড় মারবেন তিনিই ঠ্যালা বুঝবেন—হেঁঃ হেঁঃ—।

—না—মেলে আবার লাগে না!

মাইরী বলছি—লাগে না। দেখছিস ত, পণ্ডিত মেরে মেরে আর আমার পিঠে হাত ঠেকায় না। আর বিশ্বাস না হয় ত দেখ তোরা—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে একজন সটান আসিয়া ঘা চার বসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন—আর একজন—আর একজন; মোট কথা বাকী কেহ রহিল না। যাহাকে বলে চাঁদা করিয়া মার, সেই মার শ্রীমন্তের পিঠে পড়িয়া গেল।

শ্রীমন্ত দাঁতে দাঁত টিপিয়া থাকে—কোনক্রমে বেদনা উপলব্ধির বিন্দুমাত্র আভাসও প্রকাশ হইতে দেয় না। সকলের পরীক্ষা শেষ হইলে গোটা দুই দম লইয়া সে হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—ওস্তাদের মন্তর আছে রে। আর জানিস দম বন্ধ ক'রে থাকলে কিচ্ছু লাগে না।

পাথর কাঁদে না বলিয়া মানুষ পাথরে চাপড় মারে না। চাপড় মারিয়া অভিজ্ঞ মানুষ প্রবচন রচনা করিয়া গেছে—পাথরে তুল' না হাত—পরাজয় নির্ঘাত।

শ্রীমন্ত না কাঁদিয়া আজ জিতিয়া গেল; ছেলের দল এ উহার মুখের পানে চাহিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।

বেশ সদম্ভে কয় পা অগ্রসর হইয়া শ্রীমন্ত বিজ্ঞের মত কহিল—বাবা—গুরুমশায়ের কঞ্চি, বাবার পাঁচন, মায়ের হাতা, আর ওস্তাদের লাঠি প'ড়ে প'ড়ে পিঠ হয়েছে পাথর। ন'সে—দেখি তোর হাতটা। শুধুই কচলাচ্ছিস কেন, রক্ত জমেছে বুঝি? দেখি!

মার খাইয়া শ্রীমন্ত বিজয়ীর মত চলিল।

রামকেষ্টর তাহা বোধ করি সহ্য হইল না, সে কহিল—মার খেয়ে তোমার না লাগুক, তোমাকে কিন্তু এই ধরা পড়ার জন্যে জরিমানা দিতে হবে। চুরি করতে গিয়ে যে ধরা পড়বে তাকেই কিন্তু জরিমানা দিতে হবে; আমাদের দলে এই নিয়ম হ'ল আজ থেকে।

শ্রীমন্তের ইহাতে প্রবল আপত্তি, সে কহিল—বাঃ, মারও খাব আবার জরিমানাও দেব। বাঃ! না ভাই—

রামকেষ্ট কহিল—বাঃ কি রকম—জেলেদের দেখনি? মাছ চুরি ক'রে ধরা পড়লে সমাজে ওদের জরিমানা দিতে হয়।

—আমরা ত জেলে নই।

—জেলে না হই না কেন, আমাদের ওই নিয়ম হবে। আচ্ছা ভোট হোক। কে কে আমাদের দলে হাত তোল।

উপস্থিত-প্রাপ্তির আশায় সবাই রামকেষ্টর দলে ঝুঁকিয়া পড়িল, সকলেই হাত তুলিয়া বসিল। ভোটযুদ্ধে পরাজিত শ্রীমন্তকে সমষ্টির রায় মানিয়া লইতে হইল।

শ্রীমন্ত বিষণ্ণভাবে কহিল—আচ্ছা কি জরিমানা লাগবে বল।

রামকেষ্ট দলের সদস্য গণনা শুরু করিয়া দিল। গণনা শেষ হইলে সে কহিল—চৌদ্দ জনের চৌদ্দ আনা।

শ্রীমন্তের মুখ শুকাইয়া গেল, এই পয়সার জন্য তাহার যত বিপদ। পাঠশালায় পণ্ডিত ঠ্যাঙান্ পয়সার জন্য—ছিদাম মুদীর দোকানের সম্মুখ দিয়া হাঁটিবার যো নাই এই পয়সার জন্য, পয়সা চাহিলে বাপ পাঁচন তুলিয়া মারিতে আসে, মা হাতার আঘাত বসাইয়া দেয়। আবার সঙ্গীরা চাহে পয়সা?

সে কহিল—না ভাই, পয়সা-টয়সা আমার নাই, আমি বরং দুটো হাঁস দেব তোমাদের।

রামকেষ্ট হিসেবী ছেলে, সে কহিল—মশলার দাম কে দেবে শুনি? তুমি ত মুখুজ্জেদের হাঁস গেঁড়া মারবে।

বিপিন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, তার উপর একটু লোভী, সে কহিল—আমি দেব—আমি দেব; ছিমন্ত, আনিস তুই হাঁস।

রামকেষ্ট কহিল—এই বিপ্‌নে চুপ।

পল্লীর বসতির মধ্যে তখন তাহারা আসিয়া পরিয়াছে। সম্মুখেই হালদারের মজলিস। তিন বুড়া সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া থাকে আর দাবা খেলে।

ছেলেরা সুট্‌সাট্ করিয়া এদিক ওদিক খসিয়া পড়ে, যে যাহার আপন আপন পথ ধরে শ্রীমন্ত আপন বাড়ির পথ ধরিল।

মাথার উপরে আকাশ এখনও স্বচ্ছ, পশ্চিম আকাশে শুধু একটি উজ্জ্বল তারা দেখা দিয়াছে। মাটির বুকের উপর অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। জনবিরল পল্লীপথে চলিতে চলিতে শ্রীমন্ত এতক্ষণে আপনার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইল। হাতের লবণাক্ত স্পর্শে পিঠটা জ্বালা করিয়া উঠিল, বেদনাও বেশ হইয়াছে—খানিকটা তেল হইলে বেশ হইত।

কিন্তু তেল পাইতে হইলে যে মাকে পিঠটা দেখাইতে হয়—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল মায়ের লোহার হাতাখানার কথা।

অবশেষে কয়টা আগাছার ডাল ভাঙিয়া শ্রীমন্ত পিঠে বুলাইয়া লইল। এগুলি নাকি বিশল্যকরণীর ডাল। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের আঘাত ইহাতে আরোগ্য হইয়াছিল—এ ত কয়টা চড়চাপড়।

বাড়ির দুয়ার হইতেই সে শুনিল তাহার ভাগ্নী গৌরী সন্ধ্যাকাশে তারা গুনিতেছে—এক তারা নাড়াচাড়া, দুই তারা কাপাশের খাড়া—

শ্রীমন্ত বেদনার কথা ভুলিয়া গেল—সেও বহির্দ্বার হইতে আরম্ভ করিল—তিন তারা পাটে বসি—চার তারা ঘোর মোর।

দুই

নামের মধ্যে মানে খুঁজিলে শ্রীমন্তের কোন অর্থ-ই হয় না;—দুনিয়ার অভিধান হইতে বাদ পড়িতে হয়। ঐ ছেলেটা বলিয়াছে ঠিক—শ্রীমন্তের নাম শ্রীমন্ত আর অন্ধের নাম পদ্মলোচন প্রায় সমান শোভন। শ্রীমন্তের কোন শ্রীই ছিল না। দেহের শ্রী—রূপ, অন্তরের শ্রী—গুণ, ঘরের শ্রী—লক্ষ্মী, এ তিনের একটিও শ্রীমন্তের ভাগ্যলিপিতে বিধাতা বোধ হয় লেখেন নাই।

কর্কশ পাক-দেওয়া কঠোর-গিঁঠ-গিঁঠ দেহ, দীপ্তিমান চোখ, তামাটে চুল, মুখে অজস্র তিল—সর্বোপরি কর্কশ তাম্রাভ দেহবর্ণ তাহাকে বেশী শ্রীহীন করিয়াছিল। সে যেন কালো হইলে এর চেয়ে অনেক শ্রীমন্ত হইত।

সত্যই হয়ত সে এর চেয়ে অনেকটা শ্রীমন্ত হইলেও হইতে পারিত। মাটির বুকে শিশু প্রথম যখন আসে তখন সঙ্গে আনে সে আকার, লাবণ্য আনে না। সে দেহে লাবণ্য রূপ সঞ্চারিত করে ধরণীর প্রসাদ।

শৈশবের শিশু শ্রীমন্তেরও আর পাঁচটা ছেলের মতই ফুলো ফুলো গাল, নরম নরম হাত-পা, মোট কথা—একটি মানবশিশুর যাহা যতটুকু প্রয়োজন সবই ছিল। ছিল না—দারিদ্র্যশীর্ণা জননীর বুকে দুধ—ছিল না বাপের গোয়ালে গাই বা বাপের বাক্সে দুধ কিনিবার কড়ি।

শুকাইয়া শুকাইয়া শৈশব কাটিল, আসিল কৈশোর। কিন্তু সে যেন এক অনাবৃষ্টির বর্ষা—দেহে পুষ্টি, অবয়বে লাবণ্য, ফসলের ফুলের মত অভাবের শোষণে কুঁড়িতে উঁকি মারিয়া শুকাইয়া গেল। 'সুখের ঘরে রূপের বাসা' কথাটা সংসারে অতি সকরুণ সত্য। তাই বাপ-মায়ের শ্রীমন্ত দুনিয়ার কাছে ছিমন্ত হইয়া গেল। পাড়া-প্রতিবেশীর দল অপরিমেয় সহানুভূতিতে শ্রীমন্তের বাপ-মায়ের চরম অবিবেচনার অপরাধ সংশোধন করিয়া লইল। আবার ছিমন্তের—ছি-তে একটা লম্বা টান মারিয়া সুর দিয়া সুসঙ্গত করিয়া তুলিল।

শ্রীমন্তের তাহাতে রাগ রোষ নাই। সে বেশ হাসি মুখে এ-নামেই সাড়া দেয়। মা রাগ করে, বলে—খেতে পরতে দেয় কেউ? আর নিজেরা ত সব মদনমোহন।

শ্রীমন্ত আশ্চর্য হইয়া যায়; মায়ের রোষের হেতু সে খুঁজিয়া পায় না। সে বলে—বললেই বা!

—বললেই বা?—তোর দেহে কি পিত্তি নাই রে?

বাপ ঘরের ভিতর হইতে কহে—পিত্তি বেশ আছে, কাজের জন্যে দু'টো কড়া কথা ব'লে দেখ না, ছেলের লাল চোখ। মনে হয় দিলে বা খুন ক'রে। আবার বেহারী বাগ্দী ওস্তাদের

কাছে লাঠি খেলা শেখা হচ্ছে। ঘটে নাই বুদ্ধি—ছিমন্ত বললে কি বলা হয় তা কি মাথায় ঢোকে ?

শ্রীমন্ত আড়ালে গিয়া দেওয়ালকে দাঁত দেখাইয়া বাপকে ভেঙচি কাটে, কহে,—নাঃ মাথায় ঢোকে না, ওর মত সবাই কিনা ? ছিমন্ত বললে আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে না কি ?

যাক্ ওসব গত ইতিহাস।

পেয়ারা চুরির পরের দিনের কথা। সেদিন শ্রীমন্ত পাঠশালায় যায় নাই। বইদপ্তর বগলে মুখুজ্জেবাড়ির খিড়কী পুকুরের চারিপাশে সে ঘুরিতেছিল। পুকুরের মধ্যস্থলে একপাল হাঁস কলরব করিয়া ফিরিতেছে।

মুখুজ্জেবুড়ীর ঘটি মাজা শেষ হয় না! শ্রীমন্ত বুড়ীকে মনে মনে অভিসম্পাত দিল।

একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে আঁচল হইতে একমুঠা ধান জলের ধারে ধারে ছিটাইয়া দিতে শুরু করিল। তবু হাঁসগুলা এদিকে আসে না। শ্রীমন্ত একটা ঢেলা লইয়া হাঁস-গুলাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। কোনটার গায়ে ঢেলা লাগিল না বটে কিন্তু হাঁসের দল কলরব করিয়া উঠিল। মুখুজ্জেবুড়ীর নজর গিয়াছে কিন্তু কান বড় সজাগ। বুড়ী কাঁপাগলায় চিলের চিৎকার করিয়া উঠিল—কে রে মুখপোড়া দস্যি, বলি কার পেটে আগুন লাগল ?—কে ঢেলা মারছিস ? এ্যাঁ—ওই যে, দাঁড়া দাঁড়া, চিনেছি আমি তোকে। যাই আমি পাঠ-শালায় পণ্ডিতের কাছে।

শ্রীমন্ত কিন্তু ভয় খাইল না। সে বুড়ীর এ পুরানো ধাপ্পাবাজি বেশ জানিত ;—শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়াছিল দক্ষিণ পাড়ে আর বুড়ী লোক চিনিতেছিল পূর্ব পাড়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া। সে বুড়ীকে মুখ ভেঙাইয়া আপন মনেই হাসিতেছিল।

—কে-রে, কে-রে—

মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। শ্রীমন্ত ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল খোট্টা ফলওয়ালাটা তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়াছে!—খোট্টাটার পিছনে রামকেষ্ট দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

রামকেষ্ট কহিল—চল, পণ্ডিত তোকে ডাক্‌ছে!

জোয়াল ঘাড়ে নূতন গরুর মত ঘাড় ঝাঁকি দিয়া শ্রীমন্ত আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যা—ও, আমি যাব না। যা—ও।

খোট্টাটা এবার তাহাকে শিশুর মত কোলে তুলিয়া লইয়া পাঠশালামুখে চলিল। খোট্টাটার কোলে যাইতে যাইতে শ্রীমন্ত পণ্ডিতের কঞ্চিটার কথা ভাবিতেছিল। সরু লিকলিকে পাকা বাঁশের কঞ্চি—যেখানে পড়িবে সেইখানেই কাটিয়া বসিবে। পাঠশালাও আসিয়া পড়িয়াছে।

গণেশ পালের দাওয়ার পর মথুর ঘোষের খামারবাড়ি, তারপর গড়াঞীদের ঘানিঘর, তার পরই পাঠশালা।

গণেশ পালের দাওয়া পার হইল, মথুর ঘোষের খামারবাড়ির অর্ধেকটা চলিয়া গেল। শ্রীমন্ত আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। কিন্তু এ বন্দী অবস্থায় কোন উপায়ই আর নাই।

গড়াঞীদের ঘানিঘরও পার হইল। পাঠশালার দরজার মুখে ছেলের দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সহসা খোট্টাটা তীব্র বেদনায় আর্তনাদ করিয়া শ্রীমন্তকে ছাড়িয়া দিল; শ্রীমন্ত মাটিতে পড়িয়া গেল না, সে খোট্টাটার বিপুল গোঁফ জোড়াটার একপ্রান্ত ধরিয়া ঝুলিতেছিল।

মাটিতে পদস্পর্শ হইবা মাত্র শ্রীমন্ত খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া লম্বা টানা এক দৌড় দিল। অনেকটা গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—ছেলের দল কলরোল করিয়া হাসিতেছে; খোট্টা গোঁফের গোড়ায় হাত বুলাইতে বুলাইতে করুণ বিলাপের সুরে পণ্ডিতকে কি নিবেদন করিতেছে। আপনার হাতের দিকে তাকাইয়া শ্রীমন্ত দেখিল, এখনও কয় গাছা বড় বড় গোঁফ আঙুলে তাহার জড়াইয়া আছে। সে নিজেও খুব খানিকটা হাসিল।

—আমার পাঠশালায় খবরদার আসবে না তুমি।

মুখ তুলিয়া শ্রীমন্ত দেখিল পণ্ডিত পাঠশালার দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাকেই সম্বোধন করিতেছে—আজ থেকে তোমার নাম কেটে দিলাম আমি।

শ্রীমন্ত জিভ বাহির করিয়া পণ্ডিতকে দেখাইয়া দিল।

তারপর বগলের বই-শ্লেট বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া বেশ উঁচু মাথা করিয়া বাড়ি ফিরিল। বাহির দুয়ার হইতেই সে হাঁকিল—গৌরী—এই নে।

এই মাতৃহীনা ক্ষয়া-ক্ষয়া ফুটফুটে মেয়েটি শ্রীমন্তের বড় প্রিয়। বছর চারেকের মেয়েটি অপটু পদে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীমন্তকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—কি মামা?—পেয়ারা? দা—ও।

শ্লেট আর ছেঁড়া বইখানি আগাইয়া দিয়া শ্রীমন্ত কহিল—না বইদপ্তর।

এই বস্তু কয়টির উপর গৌরীর লোভের পরিসীমা ছিল না। নতুন বোধোদয়খানার মলাট গৌরী প্রথম দিনই ছিঁড়িয়াছিল; শ্লেটখানায় পাথর দিয়া দাগ কাটিয়া স্থায়ী হিজিবিজি সে-ই রচনা করিয়া রাখিয়াছে।

পরম আগ্রহে হাত বাড়াইয়া গৌরী কহিল—দাও মামা, দা—ও।

রান্নাঘরের দাওয়া হইতে শ্রীমন্তের মা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—ছিঁড়ে দেবে, ছিঁড়ে দেবে।

পরম ঔদাস্যভরে শ্রীমন্ত কহিল—যা করবে করুক—আমার আর চাই না ওসব।

—কেন?

—পণ্ডিত আজ তাড়িয়ে দিয়েছে, আর আমাকে নেবে না পাঠশালায়। খাতা থেকে নামও কেটে দিয়েছে।

—কেন?

—মাইনে দেবে না—কিচ্ছু না। তাছাড়া কিস্যু হবে না আমার পণ্ডিত রোজ বলে—

কথাগুলির মধ্যে এতটুকু দুঃখবোধের পরিচয় ছিল না। মা তাহার অবাক হইয়া গেল! কিন্তু বলিবারও কিছু নাই। বেতন না দিলে গুরুমশাই যদি বেত মারেন তবে শ্রীমন্তের অপরাধ কি?

যাক্, তবু অপচয় নারীর সহ্য হয় না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা কহিল—তবু তুলে রেখে দে। মেয়েমানুষ বই নিয়ে কি করবে—যত্ন করে তুলে রেখে দে—তোর ছেলে হয়ে পড়বে।

শ্রীমন্ত বেশ একটু সলজ্জ পুলক অনুভব করিল, কিন্তু প্রথানুযায়ী আপত্তি জানাইতেই হয়, সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—ধ্যেৎ।

কার্যান্তরে যাইতে যাইতে মা বিরক্তিভরে কহিল—তবে যা মন চায় তাই কর। ওই ত মেয়েকে মানুষ করছি, ঘরের দোরে বাপ থাকতে একটা খোঁজখবর নাই! তার ওপর দে, মেয়েকে আকাশের চাঁদ ধরে দে।

মা অন্তরালে যাইতেই কিন্তু শ্রীমন্ত গৌরীর হাত হইতে বই শ্লেট লইয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিল।

গৌরী কাঁদিতে আরম্ভ করিল—বই নেব—ছেলেট—

মা ঘরের ভিতর হইতে শ্রীমন্তকে তিরস্কার করিল—ওরে ও মুখপোড়া আকাট মুখ্যু, আবার ওকে কাঁদাতে শুরু করলি? দেখবি দেব গিয়ে হাতার বাড়ি!

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি গৌরীকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল—পেয়ারা খাবি গৌরী, পেয়ারা?—ইয়া বড় তুলতুলে পাকা!

গৌরীর সেই এক বায়না—বই—ছেলেট!

বাড়ির বাহিরে গিয়া শ্রীমন্ত চুমু খাইয়া কহিল—ছি মা, বই ছেলেট নিতে নাই; তোমার ভাইটি হয়ে পড়বে। তোমাকে দিদি বলবে।

ভাই-এর নামে গৌরী প্রবোধ মানিল, সে উৎফুল্ল হইয়া কহিল—ভাইটি মামা, আঙা টুকটুকে!

—চুপ—চুপ চেঁচায় না। ছি!

মামার কর্কশ তাম্রাভ মুখখানা ঈষৎ কোমল রক্তাভ হইয়া উঠিল।

তিন

পুত্রের এই মা-সরস্বতী বিসর্জনের সংবাদ শুনিয়া শ্রীমন্তের বাপ অকারণে অতিমাত্রায় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ফেলিল; কহিল—বেশ করেছিস, আচ্ছা করেছিস—ও বেটা জানে কি যে ওর কাছে শিখবি? আবার বেটার মাইনের তাগিদ কত!

শ্রীমন্তের মা কহিল—তা হলে না হয় আমোদপুরের মাইনর ইস্কুলে—।

শ্রীমন্তের বাপ দাঁত খিঁচাইয়া কহিল—মাইনে দেবে কে শুনি—আমোদপুরের মাইনর ইস্কুলে—। ইদিকে লম্বাচওড়া বাত খুব আছে। হুঃ!

শ্রীমন্তের মা আর কথা কহিল না। মনে মনে আপন অন্যায়টুকু সে স্বীকার করিয়া লইল। মাত্র ওই ক'টি কথা বলিয়া শ্রীমন্তের বাপের যেন তৃপ্তি হয় নাই, সে তামাক খাইতে খাইতে আপন মনেই কহিল—আর চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে হবেই বা কি শুনি? সেই ত বাবা শেষকালে হালগরু হোৎ—ত্যা—ত্যা।

শ্রীমন্তের মা তবু কোন উত্তর করিল না। বাপ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—সেই ভাল, তুই কাল থেকে আপনার কুলকর্ম শেখ। কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে কি হয় শুনি? তার চেয়ে মাটির বুকে ফালের আঁচড় দে—ফুল ফুটবে, ফসল হবে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঘরে এসে ঢুকবে।

শ্রীমন্তের বাপ চলিয়া গেল।

শ্রীমন্ত কহিল—সেই ভাল মা, এবার বাপবেটাতে আলুর চাষ করব। দোগাছির সরজান শেখ আলুর চাষে এমন ফেঁপে উঠেছে মা—কি আর বলব তোমাকে। ওর নাতি ইস্কুলে আসে সাটিনের জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় জরির তাজ।

মা হাসিয়া কহিল—তাই কর।

শ্রীমন্ত রুক্ষভাবে কহিল—তোমার ত কিছুই মনে ধরে না দেখি। চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে কি হবে শুনি?

—কিছু হয় না শ্রীমন্ত। কিন্তু তোদের সংসারে আমার কি একদণ্ড দুঃখ করবারও অধিকার নেই রে? সুখ দুঃখ নিয়েই ত মানুষের দেহ।

মায়ের উত্তর শ্রীমন্তের মনঃপূত হইল না; কিন্তু এ কথার উত্তরে সে কিছু বলিতেও পারিল না। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হালের গরু জোড়াটার পাশে দাঁড়াইয়া সে তাহাদের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। গরু দুইটার পায়ের কাছে গোবরে চোনায় কাদা হইয়া উঠিয়াছে, ডাবায় এককুটি খড়ও নাই।

শ্রীমন্ত আপন মনেই কহিল—হুঁঃ। গরু দুটো অনসেবায় হয়েছে দেখ দেখি? এই গরুর সেবায় অবহেলা ক'রে ক'রেই এই লক্ষ্মীছাড়ার দশা।

কোমরে কাপড় সাঁটিয়া সে গোবর সাফ করিতে লাগিয়া গেল।

—আরে বাপ রে বাপ্, তিন দিনকা যোগী, ইসকে অন্দর পাঁও বরাবর জটা নিকাল গিয়া!

কণ্ঠস্বর শ্রীমন্তের ভগ্নীপতি হরিলাল—গৌরীর বাপের।

হরিলালের কথাই এমনি। হিন্দী বাত বলিতে সে কেমন ভালবাসে। সে গেরুয়া কাপড় পরে, গোঁফদাড়ি রাখে, তেল মাখে না। বাম বাহুতে একটা লোহার তাগা পরিধান করিয়া রাখে। গাঁজা খায়, তানপুরা লইয়া গলা সাধে।

শ্রীমন্ত হরিলালের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। হরিলাল হা হা করিয়া হাসিয়া শ্রীমন্তের পিঠে চাপড় দিয়া কহিল—কেয়া বাবুজী—সমঝা নেহি? বলি পাঠশালা ছাড়তে না ছাড়তেই ঘোর সংসারী? একদম গোবরে হাত? তিনদিনের যোগী হ'তে না হ'তেই পা পর্যন্ত জটা গজিয়ে গেল বন্ধু? বহুৎ আচ্ছা, জীতা রহো!

শ্রীমন্ত একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল; সে মৃদুস্বরে কহিল—গরু দুটোর চেহারা হয়েছে দেখ না? এতে কি চাষ চলে?

তাহার মাথায় এক চাঁটি বসাইয়া দিয়া হরিলাল তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া কহিল—ভাগ্। আয়, আমার সঙ্গে আয়। চাষ ক'রে কে কবে বড়লোক হয়েছে? আমি তিনদিনে তোকে মানুষ ক'রে দোব।

শ্রীমন্ত চলিল।

হরিলালের চেলা হইতে শ্রীমন্তের অনেক দিন হইতে সাধ। হরিলালের ভাঙা বাড়িতে হরিলালের আড্ডা। দক্ষিণদুয়ারী কোঠাঘরখানা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, পূবদুয়ারী গোয়ালঘরখানা কোনরূপে বজায় রাখিয়া হরিলাল সেইখানে বাস করে। চালে খড় নাই, বাহির দরজায় দুয়ার নাই, কিন্তু উঠান ভরা ফুলের বাগান। ঘরের মধ্যে একটা তানপুরা, একজোড়া বাঁয়া তবলা—একটা পাখোয়াজ, দেওয়ালের গায়ে একটা পেরেকে ঝুলানো একজোড়া মন্দিরা।

শ্রীমন্তের সেই দিনই দীক্ষা হইয়া গেল। গাঁজা খাইয়া সে অনুভব করিল সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার একটা বোধ জন্মাইয়া গেছে। হরিলালের আসোয়ারী আলাপটা তাহার বড়ই মধুর বোধ হইল। সে আপন মনেই সুরটা ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাড়ি ফিরিল—তানে নানে নানে নানা না—তানে নানে—নানে—

মা সেদিন তাহার আহারের পরিমাণ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। ইহার পর হইতে শ্রীমন্ত চাষও করে, হরিলালের হাতে মানুষও হয়, আবার বেহারী ওস্তাদের আখড়ায় লাঠিও খেলে। লোকে দু'নৌকা ধরে, শ্রীমন্ত তিন নৌকা!

শ্রীমন্তের আহার অকস্মাৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় মা ভাবিল, চাষের পরিশ্রম আর ছেলের বাড়ার বয়স, তাই বোধ হয় আহার এমন বাড়িয়াছে। সময়ে অসময়ে চোখের লালিমা দেখিয়া ভাবিত রৌদ্রে ঘোরাঘুরির জন্য এমন হইয়াছে। কিন্তু সন্দেহ জন্মাইয়া দিল শ্রীমন্তের ঐ আসোয়ারী আলাপ। সহসা ছেলের এরূপ সঙ্গীতানুরাগের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সমস্তই মা জানিয়া ফেলিল। হরিলালের আড্ডা হইতে সেদিন বোধ হয় ভৈরবী সাধিতে সাধিতে শ্রীমন্ত বাড়ি ঢুকিয়া ডাকিল—মা!

পিছন হইতে মা বাড়ি ঢুকিয়া কহিল—আমার কপালে কি এমনি ক'রেই আগুন ধরিয়ে দেয় শ্রীমন্ত?

প্রশ্নটার অর্থ শ্রীমন্ত একবিন্দু বুঝিল না, কিন্তু গুরুত্ব বেশ অনুভব করিল। ভৈরবীর আলাপ স্থগিত রাখিয়া মায়ের মুখপানে সে চাহিয়া রহিল।

মা কহিল—শেষে তুই হরিলালের সঙ্গে—

শ্রীমন্ত বুঝিল সে ধরা পড়িয়া গেছে; তাহার বোধ হইল তাহাকে কে যেন গলায় ধরিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিতেছে।

মা আমার কহিল—ছি—ছি—ছি রে আমার কপাল!

শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। হরিলালের সহিত মেলা-মেশায় মা যে এমনভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার মূলে একটা কারণ ছিল। জামাইটিকে শ্রীমন্তের মা বেশ সুনজরে দেখিত না। তাহার ধারণা ছিল গৌরীর মায়ের যে হঠাৎ বাক্‌রোধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল তাহার হেতু কোন রোগ নয়; তাহার হেতু ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন নেশাখোর জামাতার অত্যাচার—সে লাথি হোক, কিল হোক; চড় হোক, বা যাই হোক। আপনার মেয়ের মেয়ে, তাই দায়ে পড়িয়া গৌরীকে বুকে করিতে হইয়াছে নতুবা ও বংশের

ছায়াতেও তাহার বিষদৃষ্টি ছিল! আরও, তাহাদের পর্যায়ের সাধারণের চেয়ে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন একটু উঁচু ছিল। মা সেদিন আর ছেলেকে খাইতে পর্যন্ত ডাকিল না।

রাত্রে স্বামীকে সে কহিল—ছেলেকে হরিলালের সঙ্গ ছাড়াও। মাঠে কখন যায় কি করে জানি না কিন্তু ঘরবাস ত ছেড়েছে।

বাপ একটু অধিক পরিমাণে বাস্তব-রাজ্যের লোক, সে কহিল—তা হরিলালের সঙ্গে মিশলে দোষ কি? জান ওর অনেক কিছু মাথায় খেলে? রোজগারে ওর মত মাথাই হয় না! শিখতে পারলে আখেরে ভাল হবে।

শ্রীমন্তের মা ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে সে কহিল—তা হলে ত রাধারাণীর মরণে তোমার কোন কষ্ট হয় নি?

স্বামী চমকিয়া উঠিল, কহিল—কেন?

—নইলে তুমি ওই জামাই-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হও, না ছেলেকে তারই কাছে তার আচার-ব্যবহার শিখতে মত দাও।

শ্রীমন্তের বাপ এমন ভাবে নাই। এ কথার মানে যে এমন হইতে পারে এ তাহার ধারণারও অতীত ছিল। কিন্তু মনে মনে সে ভাবিয়া দেখিল, শ্রীমন্তের মা ধরিয়াছে অনেকটা ঠিক। কন্যাহন্তা জামাতাকে সে মার্জনা করিয়াছে এটা সত্য। ফন্দিবাজ হরিলাল নানা ফন্দিতে উপায় করে—অভাবী সে, তাহার জন্য তাহাকে প্রশংসা করে এও ঠিক। মাঝে মাঝে হাত পাতিলে সে কিছু কিছু পাইয়াও থাকে। নীরবে খতাইয়া দেখিল তাহার স্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ সত্য। বুকের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। অভাবের নির্মম পেষণে তাহার অন্তরাত্মার বিকৃত স্বরূপ দেখিয়া সে আজ শিহরিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে উঠিয়া যাইতে যাইতে কহিল—রাঁধুর মা! তুমি কথাটা বলেছ ঠিক। কিন্তু কি করব বল, অ-ভর পেট সন্তান খেয়েও ভরে নি, তাই ক্ষিদের জ্বালায় কার কাছে হাত পাততে হয় না হয় তাও ভুলেছি—উপায় নাই।

স্ত্রীও এমন উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সেও এই উত্তরে অভিভূতের মতই স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, কোন সান্ত্বনা-বাক্যও যোগাইল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে স্বামী আহারে বসিলে শ্রীমন্তের মা কহিল—ছেলের বিয়ে দাও।

স্বামী তাহার মুখপানে তাকাইয়া থাকিল।

শ্রীমন্তের মা আবার কহিল—বিয়ে দিলে ছেলের ঘরে মন বসবে, তখন একটু বাগিয়ে ধরলেই ছেলে বশ মানবে।

শ্রীমন্তের বাপের মন এই শোকস্মৃতিটা ভুলিবার জন্য এমনি বিষয়ান্তর অনুসন্ধান করিতেছিল। সে সোৎসাহে কহিল—বেশ বলেছ তুমি; হাতির গলায় ঘণ্টা না হলে হাতি ভাল চলে না; তালে তালে পা ফেলতে তার মন ওঠে না।

ঘরের মধ্যে লুকাইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে শ্রীমন্ত কথা কয়টা শুনিল। একটা অপূর্ব পুলকে তাহার চিত্ত কেমন সরস হইয়া উঠিল। উৎসাহে সেদিন সে গোটা মাথাটা

ব্যাপিয়াই সিঁথি চিরিয়া টেরি কাটিয়া ফেলিল। তারপর গাড়ি জুতিয়া ধান আনিতে চলিল। মনোরথ তাহার উড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু বুড়া বলদ দুইটার গতি বড় মন্থর! সে তাহার সহ্য হয় না। বুড়ো বলদ দুইটার পিঠে আঙ্গুল টিপিয়া, পেটে পায়ের গুঁতো দিয়া শেষ পর্যন্ত শ্রীমন্ত গরু দুইটাকে ছুটাইল। গাড়ি ছুটিয়া চলে, শ্রীমন্ত হাতের পাঁচনগাছটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া হাঁকে—হৈও চলে মটরগাড়ি ভরর ভরর ভোঁ ভোঁ।

চার

ঠিক ওই দিন হইতে শ্রীমন্ত যেন আর একটি মানুষ হইয়া উঠিল। ঘণ্টার নামেই হাতি তালে তালে পা ফেলিতে শুরু করিয়াছে। হরিলালের আড্ডায় যাওয়া-আসা যথাসম্ভব কম করিল। অতি সন্তর্পণে আঁকা-বাঁকা জনহীন পথ দিয়া মৌতাতের সে সময় আড্ডায় গিয়া উঠে। রাগিণী আলাপ সে একরকম ছাড়িয়াই দিল। ঘর-দুয়ারের কাজকর্মে এখন সে অসম্ভব রকমের মনোযোগী হইয়া উঠিল। খামারখানি নিকাইয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিয়াছে; ক্ষেতের মাটি কোদালের কোপে মাখনের মত নরম হইয়া উঠিল। ফসলের পল্লবগুলি সতেজ শ্যামলতায় মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছে।

লোকে কহিল—এইবার বলাই পালের ঘরে লক্ষ্মী হবে। ছিমন্ত লক্ষ্মীমন্ত ছেলে।

শ্রীমন্ত মনে মনে হাসিয়া ভাবিত—তবু ত লক্ষ্মী এখনও ঘরে আসে নাই।

মা ইঙ্গিতে স্বামীকে কথাটা বুঝাইয়া মৃদু হাসি হাসিত। বলাই পালও ঘাড় নাড়িয়া সেটুকু উপভোগ করিত।

সেবার উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলায় গিয়া শ্রীমন্ত খান-কয় পট কিনিয়া আপন ঘরটির চারিদিকের দেওয়ালে টাঙাইয়া দিল।

গৌরী পাশে দাঁড়াইয়া মামার এই রূপ-রচনা দেখিতেছিল। শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—কেমন হ'ল গৌরী?

গৌরী উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—খু—ব ভাল, ভা—রী সুন্দর।

শ্রীমন্ত চুমা খাইয়া সাদরে কহিল—ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।

গৌরী চুপি চুপি কহিল—মামীমা আসবে, নয় মামা?

গৌরীর বুদ্ধিমত্তায় শ্রীমন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল। গৌরী আবার কহিল—ভা—রী সুন্দর হয়েছে মামা! আমাকেও পট কিনে দিয়ো, আমারও বিয়ে হবে।

শ্রীমন্ত গৌরীর বিবাহের কথাটা আমলেই আনিল না, চিত্রশোভিত দেওয়ালের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সে কহিল—দেখ্‌বি, দোরের পাশে-পাশে কেমন পদ্ম আঁকব। মুখুজ্জেদের রামের কাছে কম্পাস নিয়ে আসব।

মোট কথা, ভাবী গৃহলক্ষ্মীর আগমন-প্রত্যাশায় শ্রীমন্ত রুক্ষ-দারিদ্র্যের মধ্যেও শ্রী-শতদল রচনা শুরু করিয়া দিল।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলা হইতেই সে চার পয়সার দু'খানা গোলাপী রঙের সাবান কিনিয়াছিল। মুখের দাগগুলা লুপ্ত করিতে স্নানের সময় প্রবল বেগে সে সাবান মাখা আরম্ভ করিল।

কয়েকদিন পর গৌরী কহিল—মামা কি সুন্দর হয়েছে দিদ্‌মা—দেখ—কেমন রাঙা টক্‌টকে!

শ্রীমন্তের মা কহিল—তোর মুখখানা কি হয়েছে রে শ্রীমন্ত? বাঁদরের মুখের মত লাল। মুখে একটুখানি তেল বুলিয়ে নিস রাত্রে।

শ্রীমন্ত আরশি লইয়া দেখিল—সত্যই ঝামা ইঁট দিয়া মুখখানা কে যেন ঘষিয়া দিয়াছে, তাহার উপর শীতের হাওয়ায় ফাট ধরিয়াছে।

যাই হোক, মুখের কাটে তাহার বিবাহ আটক রহিল না। ঐ রূপেই সে বর সাজিয়া বৌ লইয়া হাসিমুখে ঘরে ফিরিল।

বৌটি নেহাৎ ছোট নয়, বারো-তেরো বছরের মেয়ে;—নাম গিরিবালা।

দেখিতে শুনিতে নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু কুৎসিত নয়। শ্যামলা রং, মাঝারি চোখ, নাকটি একটু চাপা কিন্তু তাহাতেই যেন মেয়েটির মুখখানি ভাল মানাইয়াছে। দেহের গঠন-ভঙ্গীটি কিন্তু অনবদ্য, দীঘল দেহখানি সুসন্নিবিষ্ট—দৃঢ়—সুপুষ্ট। গরীবের মেয়ে আবাল্য পরিশ্রমে সর্বাঙ্গ সুগঠিত দৃঢ় করিয়া নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছে। আরও—সে গঠন-ভঙ্গীর মধ্যে মধুর একটি লাবণ্যময় পারিপাট্য আছে।

ব্যবহারেও গিরি মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ; কয়দিনের মধ্যেই নতুন সংসারে আপনাকে বেশ মিশাইয়া লইল। স্বচ্ছন্দ ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, হাতের কাজ কাড়িয়া করে; গৌরীর মুখ মুছাইয়া দেয়; যেন কতদিনের পুরানো এই সংসারেরই একজন সে। শ্রীমন্তের মা বৌটিকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিল। সে ভালবাসা আরও বাড়িয়া গেল—সেদিন রাত্রে পুত্র-পুত্রবধূর গোপন আলাপ শুনিয়া।

সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীমন্তের ফিরিতে একটু দেরি হইয়াছিল। গিরি বোধ করি তাই লইয়া অভিমান করিয়াছিল।

শ্রীমন্তের অনেক সাধ্য-সাধনার পর সে কহিল—যাও, তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না বলছি।

শ্রীমন্ত কহিল—আর দেরি হবে না গো!

—না, তুমি ওই ঠাকুর-জামায়ের সঙ্গ যদি না ছাড়—

—তার ওপর রাগ কেন? সে কি করলে?

—সে কি করলে? আমি কিছু জানি না বুঝি? ওই ত ঠাকুরঝিকে খুন ক'রে ফেলেছে। লজ্জা করে না তোমার?

শ্রীমন্তের আর কথা যোগাইল না। গিরি আবার কহিল—ওই আড্ডায় যাও—গিয়ে পরিবার খুন করা শিখে এসে আমাকেও তুমি কোনদিন খুন ক'রে ফেলবে।

শ্রীমন্ত নীরব। গিরি আবার কহিল—বল আর ওখানে যাবে না?

শ্রীমন্ত তবু নীরব। গিরি এবার কাঁদিয়া কহিল—আমার মা নাই, বাপ নাই, খুড়ো-খুড়ীর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে এতকাল কাটল। ভেবেছিলাম এইবার সুখের মুখ দেখব, তা—পোড়াকপালে হবে কেন?

শ্রীমন্ত এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আচ্ছা আর যাব না।

গিরি বলিল—আমার গায়ে হাত দিয়ে সত্যি কর। কর—। চুপ ক'রে রইলে যে? দেখ—তুমি গাঁজা খাও ত? সে আমি জানি। আমি গাঁজার জন্যে রোজ একটা ক'রে পয়সা দেব। সত্যি ক'রে বল আর যাবে না তুমি?

শ্রীমন্ত এবার উৎফুল্ল ভাবেই শপথ করিয়া ফেলিল।

শ্রীমন্তের মায়ের বধূপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বহু আশীর্বাদ তিনি বধূর শিরে বর্ষণ করিলেন।

শ্রীমন্ত ইহার পর হইতে আরও তালে তালে চলিতে আরম্ভ করিল। তবু মায়ের সম্পূর্ণ আক্ষেপ মিটিল না, বাপেরও না। মায়ের আক্ষেপ—শ্রীমন্ত হরিলালের সঙ্গ ছাড়িল কিন্তু গাঁজা ছাড়িল না। কিন্তু মা ভরসা এখনও একেবারে পরিত্যাগ করে নাই—কারণ সে বুঝিয়াছে যে দেহের ওজনে বধূ মেয়েটি লঘুভার হইলে কি হয়—মনের ওজনে গিরি গিরির মতই গুরুভার, সে যখন ঘাড়ে চাপিয়াছে তখন শ্রীমন্ত কায়দায় আসিবে।

বাপের আক্ষেপ—ছেলেটা হরিলালের রোজগারী-ফন্দির ষোল আনার এক আনা দূরে থাক্‌, এক অণুও আয়ত্ত করিতে পারিল না।

এদিকে হরিলালের আড্ডায় শ্রীমন্তের এই নিয়মিত গরহাজিরায় একটু চাঞ্চল্য উঠিল। এ দল ত ছাড়িয়া যাওয়া সোজা নয়, একটা কোকিল এই আড্ডায় পোষা হইয়াছিল, সেটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মুক্ত পাখিটাকে আজও দুধ আফিংএর টানে নিত্য বৈকালে হাজিরা দিতে হয়। আর একটা ছোঁড়া কিনা শিকল কাটিল!

হরিলাল গাঁজা টিপিতে টিপিতে ঘাড় নাড়িয়া গান ধরিল—

রমণী-রতন মনের মতন, ও-হায় ভুলিয়াছে মন।

—শালাকো নয়া নিশা মিলা হায়, আচ্ছা রহে দেও, তিন থাপ্পড়মে শালাকো নিশা টুটায়েগা হাম।

শ্রীমন্তের সঙ্গী বিপিন, সেও এ পাঠশালায় নতুন পড়ুয়া; সে কহিল—গাঁজা না খেয়ে বৌয়ের সঙ্গে আলাপ জমায় কি ক'রে?

হরিলাল ওধার দিয়া যায় না, সে কহিল—জমুক আর ফেঁসে যাক্‌, হাম লোককা কেয়া? যিস্‌কা ফাটে, উস্‌কো ফাটে, ধোবিকা কেয়া? অগর্‌ হামলোককা একরোজ খিলানা চাহি।

হরিলাল সেদিন শ্রীমন্তকে ধরিল। শ্রীমন্ত মাঠ হইতে ফিরিতেছিল—পথে হরিলালের সহিত দেখা। হরিলাল কহিল—এ-ও, পাঠাশালমে কেঁও নেহি যাতা?

শ্রীমন্ত চলিতে চলিতেই বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—আর যাবো না।

—কেঁও ? হরিলালের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—কেঁও আবার কি ? তোমার সঙ্গে মানুষ মেশে ? মিশে ত শেষে বউ খুন করতে শিখব।

আর যায় কোথা ! হরিলাল খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে, সে খপ্‌ করিয়া শ্রীমন্তের চুলের মুঠা ধরিয়া টান মারিয়া কহে—কোন্ শালা এ কথা বোল্‌তা হ্যায়, কোন্ হারামজাদ—খুন করেঙ্গে, কাট ডালেঙ্গে—

হরিলালের ওই একটা বিশেষত্ব, রাগিলেই সে তলোয়ার ভাঁজিত, শত্রুর শির সে আর রাখিত না—অন্তত মুখে।

লাঠি-খেলা-কঠোর কর্কশ-হাতে হরিলালের প্যাকাটির মত হাতখানা মুচ্‌ড়াইয়া শ্রীমন্ত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল—এই দেখ, আমার সঙ্গে বেশি চালাকি করো না বলচি, তোমাকে দুমড়ে ভেঙে দেব।

শ্রীমন্তের কথাটা বলা বাহুল্য হইল ; হরিলাল সেটা পূর্বেই বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু লম্ফঝম্প ত্যাগ করে নাই।

—দেখ্‌ লেঙ্গে—হাম দেখ্‌ লেঙ্গে, হামরা সাথমে রহেনেসে তেরা আখের মে ভাল হোতা, আচ্ছা যাও—যাও—তুমকো কুছ বোলা ঝুট, মানুষ হলে বুঝতিস্, বুঝলি—মানুষ হলে বোঝে কচু হ'লে সেজে—তোম দকর কচু হ্যায়…দকর কচু !

হরিলাল তখন এই বলিয়া সরিয়া পড়িল বটে, কিন্তু একেবারে ব্যাপারটা ছাড়িল না। আবার গিয়া আসর পাতিল শ্রীমন্তর বাড়িতে।—হাজার হোক শ্বশুরবাড়ি, শাশুড়ী সুনজরে দেখুক—না দেখুক—অন্তত খেদাইয়া দিতে পারিবে না। আরও ভরসা—শ্বশুর অবাধ্য নয়। সে এবার এক ছুরি হাতে করিয়াই হাজির—মুখে একটু মদের গন্ধ।

—এ প্রাণ আর রাখবই না, ছিমন্তে আমার অপমান করে !

শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে—শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করে—দাও পায়ের ধুলো দাও—এ প্রাণ আর রাখবই না। একটা ছোটলোকের মেয়ের পরামর্শে ছিমন্তে কিনা—নাঃ—এ প্রাণ আর রাখবই না।

শাশুড়ী বিব্রত হইয়া কহে—দোহাই, বাবা আমার, আসুক শ্রীমন্তে—

—কভি নেহি—এ জান নেহি রাখে গা। বলিয়া সে ছুরিটা উঁচু করিয়া তোলে।

শ্বশুর হাত চাপিয়া ধরে, শাশুড়ী চেঁচাইয়া উঠে। গিরি পিছন হইতে শাশুড়ীকে কহে—মা, শ্বশুরকে হাত ছেড়ে দিতে বল।

—সে কি গো—খুন-খারাপী হবে !

বউ বলে—হ্যাঁ, খুন কতজনা হয়েছে, ও হবে ; বলে একটা কাঁটার ঘা মানুষের সয় না, নিজের বুকে ছুরি বসাবে নিজে।

কথাটা শ্বশুরের কানেও গিয়াছিল, বাস্তব রাজ্যের লোক সে, কথাটা একদণ্ডেই কানের ভিতর দিয়া মরমেও গিয়া পশিল। সে সত্যই হরিলালের উদ্যত হাতখানা ছাড়িয়া দিল।

কেহ ধরে না দেখিয়া হরিলালকেও ছুরি নামাইতে হইল। শুধু ছুরি নামাইতে হইল না, ওই একরত্তি মেয়েটার কুবুদ্ধির নিকট মাথা নামাইয়াও সরিয়া পড়িতে হইল। ওড়া পাখি আর ধরা পড়িল না!

পাঁচ

দিন দাঁড়াইয়া থাকে না, দিনের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার বয়স বাড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্ত পুরা জোয়ান হইয়া উঠিল, গিরিও ঘরণী হইয়া উঠিল, শ্রীমন্তের বাপ মা বৃদ্ধ হইয়া একে একে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমন্তের তাহাতে বড় আক্ষেপ নাই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মা বাপের শোক ভুলিয়াছে। কিন্তু গিন্নির আক্ষেপের সীমা নাই—সে শাশুড়ীর আক্ষেপ মিটাইতে পারে নাই—নারী হইয়া একটি পৌত্র শাশুড়ীর কোলে সে তুলিয়া দিতে পারে নাই। শুধু ত আক্ষেপ নয়, এ নিষ্ফলতা তাহার নারীত্বের কলঙ্ক। শাশুড়ী রাজ্যের মাদুলী তাহার গলায় দিয়া তাহাকে কত বার ব্রত করাইয়াও যখন কিছুতে কিছু ফল পায় নাই—তখন সে কথা একদিন মুখ ফুটিয়া বলিয়াও ছিল, নাতির জন্যে পাতা কোল আমার খালিই রইল। আমার যেমন ভাগ্যি—নইলে এমন অফলা হতভাগা মেয়ে আমার ঘরে আসবে কেন?

বিপিনের মা ছিল কাছে বসিয়া, সে বলিয়াছিল—এক কাজ কর শ্রীমন্তের মা—কার্তিক পূজো কর।

শ্রীমন্তের মা অতি ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—কি যে বল বিপিনের মা? কথায় আছে জান—'হবে না রে বাঁজার ছেলে কার্তিক রে তোর বাবা এলে!' ও সব মিছে—ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি!

ওই কথাগুলি গিরি আজও ভুলিতে পারে নাই: যখনই তাহার সন্তান-ক্ষুধাতুর নারীমন আপন শূন্য কোলের পানে তাকাইয়া উদাস হইয়া উঠে, তখনই ওই কথাগুলি মনে জাগিয়া উঠে। এখনও শাশুড়ীর সে আক্ষেপ তীব্রকণ্ঠে তাহাকে ধিক্কার দেয়। নিরুপায়ে গৌরীকেই সে বুকে জড়াইয়া ধরিল, সান্ত্বনাও পাইল। সংসারে পালনের মমতাটাই বোধ করি সব চেয়ে বড়। ভূমিষ্ঠ হইয়া যে সন্তানটি মরিয়া যায়—তাহার শোক মায়ের ভুলিতে বড় বেশি দিন লাগে না। কিন্তু লালনে-পালনে বর্ধিত বয়স্ক সন্তানে মায়ের বুকে যে শক্তিশেল হানিয়া যায়—সে শক্তিশেলের বেদনা কোন বিশল্যকরণীতেই উপশম হয় না। যৌবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর জীবন-পাত্রে যে স্নেহ-রসধারা উচ্ছল হইয়া উঠে, তাহাই মাতৃত্বের উপাদান। নারী সন্তান চায় শুধু ওই স্নেহরস-ধারায় তাকে সিঞ্চিত করিতে। ভ্রূণ সৃষ্টি করে অদৃশ্য হস্ত, সে ভ্রূণকে আপন স্তন্যে স্নেহ-সুন্দর হস্তে, দিন দিন সুন্দরতর, পরিপুষ্ট করিয়া পূর্ণাঙ্গ সক্ষম মানবে সৃষ্টি করে—নারী। সেইখানেই তার প্রত্যক্ষ সৃষ্টির আনন্দ।

গৌরীকে পাইয়া সে আনন্দে গিরি আপন ব্যর্থতার বেদনা অনেকটা ভুলিয়াছিল। হয়ত

সবটাই ভুলিতে পারিত—কিন্তু মাঝে মাঝে হরিলাল আসিয়া কন্যার উপর দাবী জানাইয়া যায়, তখন গৌরী যে আপনার নয়—এই বেদনায় আপনার ব্যর্থতার ব্যথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

ইদানীং হরিলালের সে দাবীটা কিছু প্রবল ও ঘন ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে, থাকতির বাজার, পেটের ভাত জোটে না—গাজা জোটে কেমন করিয়া? কাজেই সে মেয়ের দাবীতে শ্রীমন্তের ঘরে ভাতের ব্যবস্থাটা করিয়া লইতে চাহিল। এখানে ওখানে যায়, ভগবান যেখানে মাপেন সেইখানেই খায়, কিন্তু গ্রামে ফিরিলেই শ্রীমন্তের বাড়িতে ঢুকিয়াই হাঁকে—গৌরী, তোর মামীকে—না—মা বলিস্, তুই বল্ যে আমি খাব।

এক দিন, তুই দিন, চার দিন, শেষে পাঁচ দিনের দিন গিরির আর সহ্য হইল না; সেদিন সে ঘোমটার ভিতর হইতেই গর্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু সে গর্জন হয়ত হরিলালের কানে গেল না, বা গেলেও সে তা আমলে আনিল না—স্ত্রীলোকের কথা আবার ধরে!

গিরির আসল বিরক্তি কিন্তু ভাতের জন্য নয়। হরিলাল যে আসিয়া গৌরীর উপর একটা ভাব-ভঙ্গীতে কথার সুরে পিতৃত্বের দাবী জানায় আপত্তি তাহার তাহাতেই। সেটা বোঝা গেল যখন গৌরী শ্রীমন্তের নিকট হইতে ভিতরে ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া কহিল—মাগো, সেই মাতাল জামাইটা এসেছে, বিদেয় কর, বিদেয় কর, ভাত দিয়ে বিদেয় কর মা, বিদেয় কর—ভাত নইলে ও যাবে না।

তখন গিরির অধরে হাসি দেখা দিল। সে গৌরীকে একটু পরখ করিয়া লইতে কহিল—সে কি লো—ওই কি বলে! ও যে তোর বাবা হয়।

গৌরী মুখ বাঁকাইয়া কহিল—হ্যাঁ হয়। ওকে কক্ষনো আমি বাবা বলবো না।

গিরির আর আক্ষেপ থাকে না, বরং করুণাই হয় একটু হরিলালের উপর। আহা, তুনিয়ায় আপনার বলিতে ত কেহ নাই ঐ লোকটির! সে তুই থালা ভাত বাড়িয়া শিকল বাজাইয়া শ্রীমন্তকে ইঙ্গিত করিল।

তু'খানি থালায় আহার্য সাজানো, কুটুম্বের থালাতেই পরিচর্যা বেশি।

রাত্রে ঘুমন্ত গৌরীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীমন্তকে গিরি কহিল—দেখ, আপন জন তোমার, তোমার একটু খোঁজখবর করা উচিত।

শ্রীমন্ত কথা না বুঝিয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিল।

গিরি কথাটা ভাঙিয়া কহিল—তোমার ভগ্নিপোতের কথা বলছি—মানুষটা কি হয়ে গেল, শুধু যত্নআত্তির অভাবে। যদি ঠাকুরঝি বেঁচে থাকত তবে কি এমনি হ'ত?

শ্রীমন্ত এবারও স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, গিরির সহসা এ পরিবর্তনের কারণ সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

স্বামীর নীরবতায় ঠিক ওই কথাটাই গিরিরও স্মরণ হইল, সে বুঝিল হরিলালের জন্য এতটা ওকালতি তাহার পক্ষে নিতান্ত অশোভন হইয়াছে। তাই কথাটা সে ঘুরাইয়া কহিল—আপনার জন বলেই বলছি, হাজার হ'লেও গৌরীর বাপ, গৌরীই ত ধর আমাদের সব।

* *

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—কাজেই, যার নিজের নাই, তার—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, ক্ষীণ-রশ্মি প্রদীপটির ম্লান আলোকেই গিরির মুখ দেখিয়া সে কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কিন্তু যে কথাটা মনের মধ্যে ফেরে সেটা চাপিয়া রাখিতে পারে মানুষ কতক্ষণ? অল্প একটুক্ষণ উভয়েই নীরব, আবার শ্রীমন্ত কহিল—জান, একটা কথা আজও আমি ভুলতে পারি নি। যেদিন আমি পাঠশাল ছাড়ি, সেইদিন পাঠশাল থেকে এসে বই-দপ্তর দিয়েছিলাম গৌরীকে। গৌরীর লোভ ছিল বই শেলেটের উপর। তা মা বললে, 'রেখে দে, মেয়েতে বই-দপ্তর নিয়ে কি করবে, তোর ছেলে হয়ে পড়বে।' সে বই শেলেট আজও তোলা আছে, ওই বেতের ঝাঁপিতে।

গিরি আর শুনিতে পারিল না। সে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে পাশ ফিরিয়া শুইল।

গিরির এ ব্যথার নীরবতায় শ্রীমন্ত মনে করে গিরি ঘুমাইল বুঝি, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেও পাশ ফিরিয়া শোয়। পরদিন শ্রীমন্ত মাঠ হইতে ফিরিয়া বাহির হইতেই শোনে গৌরীর উচ্চকণ্ঠে বাড়িখানা মুখর হইয়া উঠিয়াছে, অবোধ্য একঘেয়ে অবিশ্রান্ত ভাবে গৌরী কি বলিয়া চলিয়াছে। সে বাড়ি ঢুকিতে ঢুকিতেই কহিল—কি গো, গৌরী মা?

গৌরী ব্যতিব্যস্ত ভাবে বাধা দিয়া কহিল—চুপ কর, পড়ছি আমি, এই দেখ বই, এই দেখ শেলেট।

সেই বই, সেই শেলেট, ছেঁড়া মলাটে তাহারই বাঁকা হাতে নাম লেখা, সেই শেলেটের কোণগুলি সে-আমলের সেই বুড়াকামারের হাতের তার দিয়া বাঁধা। দুটি পয়সা সে লইয়াছিল।

শ্রীমন্ত নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া ওই বই-শেলেটের পানে চাহিয়া থাকিল।

কাহার স্পর্শে ফিরিয়া দেখিল গিরি পিছনে দাঁড়াইয়া। কিন্তু এ গিরি ত সে গিরি নয়; এর দৃষ্টিতে ভিক্ষার ভাষা, ভঙ্গীতে ভিক্ষার ভাব। শ্রীমন্তও ব্যথা পাইল, স্নেহাস্পদের কাতরতা তাহার সহ্য হইল না। সে আদর করিয়া কহিল—কি?

গিরি কহিল—কিছু বলো না!

—বলবার মতো ত কিছু করনি তুমি গিরি।

—বই-শেলেট আমি দিয়েছি।

—বেশ করেছ, তাতে কি হয়েছে?

—দেখ ছেলেকে কিছুতে বঞ্চিত করতে নাই, তুমি দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলে, তাতে ত ওর মনে দুঃখ হয়েছিল, দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছিল, হয়ত তাতেই—

গিরির কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়ে, চোখ সজল হইয়া আসে। শ্রীমন্ত অতি আদরে তাহার হাত ধরিয়া কহিল—কেঁদ না, তোমার কোন্ কাজে আমি না করি বল?

গিরি একটু নীরব থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল—তুমি যা ক'রে চেয়ে দেখছিলে বই-শেলেটের পানে।

শ্রীমন্ত হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল—দেখলাম কি জান, বইএর মলাটে নিজের হাতের লেখা,

সেই পাঠশাল মনে পড়ছিল—

এবার গিরি কৌতুক করিয়া কহিল—আর গুরুমশায়ের মার—

শ্রীমন্ত আবার হাসিয়া উঠে।

গৌরী ওদিকে নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল ক, খ, ল, য, মা—বা বা—গরু, গ, চ, ট, প

ছয়

ইহার পর কিছুদিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। গৌরী বই-শেলেট লইয়া অনর্গল পড়ে, কোন দিন বা প্রতিবেশীদের ছেলেদের সঙ্গে পাঠশালে গিয়াই হাজির হয়।

গিরি রাঁধিতে রাঁধিতে দশবার এদিক ওদিক তাহাকে খুঁজিয়া ফেরে।

শ্রীমন্ত আসিতেই গিরি কহে—দেখ ত, গৌরী বোধ হয় পাঠশালা গিয়ে বসে আছে—কি বাই হ'ল মেয়ের মা, আসুক ত আজ, তার বই-শেলেট শেষ করব আমি।

শ্রীমন্ত হাসিতে হাসিতে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে। গৌরী আসে—একেবারে অভিধানের মত অনর্গল বানান আওড়াইতে আওড়াইতে—'ব-এ আকার ল-এ আকার—বাবা, ম-এ আকার ল-এ আকার—মামা।' শ্রীমন্ত হাসে, গিরিও হাসে—সে স্পষ্ট না বুঝিলেও বোঝে যে গৌরী নব নব অভিধানের সৃষ্টি করিতেছে।

মোট কথা ওই শিশুকে কেন্দ্র করিয়া এই দুইটি নরনারী জীবনে যে একটি মধুচক্র রচনা করিয়া তুলিয়াছিল সেটি দিনে দিনে বেশ রসঘন হইয়া উঠিল। কিন্তু দিন সমান যায় না, সেদিন মাস দেড়েক পরে সহসা ধূমকেতুর মত হরিলাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

পড়ন্ত বেলা, সন্ধ্যা হয়-হয়, গিরি রান্না চাপাইয়া গৌরীকে পড়াইতেছে, গৌরী পড়িতেছে। যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, ভুলচুকের বালাই নাই, শাসন নাই, সংশোধন নাই, আছে শুধু শিষ্যের সপ্রতিভ উত্তর—আর গুরুর সপ্রশংস অজস্র উচ্ছ্বাস, শিষ্যের প্রতিভায় অগাধ বিশ্বাস।

উনানে কাঠটা ঠেলিতে ঠেলিতে গিরি গুরুগিরি করিল, আচ্ছা বানান কর দেখি—'কাঠ'।

সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর উত্তর—ক-এ আকার ল-এ আকার।

—বাঃ বাঃ—আচ্ছা বানান কর ত—'রান্না'।

—র, ব-এ আকার।

—বাঃ বাঃ—সোনামণি রে আমার।

—এইবার কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ কিনে দিতে হবে আমাকে—হুঁ।

—আচ্ছা এই বানান বলতে পারলেই দোব, বানান কর—'ডিম'।

—বাঃ—রে, ও যে দ্বিতীয় ভাগের বানান, আমি বুঝি জানি?

এমন সময় পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া শীর্ণ কুব্জ লোকটি বাড়ি ঢুকিয়া ডাকিল—গৌরী!

অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া হরিলালের পায়ের শিরায় টান ধরিয়াছিল—গোড়ালী আর পড়িত না।

লোকটির আবির্ভাবে এমন অভিনব বিদ্যার আদান-প্রদানটুকু বন্ধ হইয়া গেল।

হরিলাল বিনা ভূমিকায় কহিল—একবার বাইরে আয় দেখি।

গৌরীর মুখ শুকাইয়া গেল—সে গিরির কোল ঘেঁষিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিলালের রুক্ষ মেজাজে এটা সহ্য হইল না, সে কটু কণ্ঠে কহিল—কানমে কেত্না ভরি সোনা উঠা হায় ?

গৌরী কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল—আমি পড়ছি যে।

হরিলালের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, সে অনুরূপ বিকৃত কণ্ঠে কহিল—পড়ছি ? —পড়ছি কি ?

গৌরীর কথা আর ফুটিল না, গিরিও ঘোমটার অন্তরাল হইতে জবাব দিতে পারিল না। কিন্তু জবাব হরিলাল নিজেই খুঁজিয়া লইল, বই-শেলেটগুলা তাহার নজরে ঠেকিতেই 'পড়া'র অর্থ করিয়া লইল—সে অতি কর্কশ কণ্ঠে ব্যঙ্গভরে কহিল—ও—লি-খা প-ঢ়ি। আরে বাপ্ রে বাপ্। চাষার মেয়ে ধানভানা ছোড়্কে—লি-খা প-ঢ়ি। তাজ্জব কি বাত্! নাঃ, এরাই দেখছি আমার মেয়ের মাথাটা খেলে। —নে—নে, এখন আয় দেখি এক ঘটি জল নিয়ে, বাইরে লোক এসেছে।

'আমার মেয়ে!' গিরির অন্তরটা টগবগ করিয়া উঠিল। সে চট্ করিয়া উঠিয়া একঘটি জল গৌরীর হাতে ধরাইয়া দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া বাপের কাছে দাঁড় করাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হরিলাল মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল —আমার সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক আছে, দুজন খাব—উমদা রান্না বানাও, মাছ-টাছ না থাকে—কেনো।

ধূমায়মানা গিরি জ্বলিয়া আগ্নেয়গিরি হইয়া উঠে—সে হরিলালের পশ্চাতে বেশ উচ্চকণ্ঠেই কহে—বলে নিজের ঠাঁই হয়নাক শঙ্করাকে ডাকে, সেই বৃত্তান্ত। পারব না আমি—পারব না বলে দিচ্ছি, আপন ব্যবস্থা সময় থেকে করুক যেয়ে! এঃ—আবার মাছ চাই, ভাল রান্না চাই।

আপন মনেই গিরি গর্জন করিয়া চলে, কড়ার উপর হাতার শব্দটা সঙ্গে সঙ্গে সঘন এবং সুউচ্চ হইয়া উঠে।

এমন সময় গৌরী ফিরিয়া আসিল, গিয়াছিল সে কাঁদিতে কাঁদিতে কিন্তু আসিল বেশ হাসিমুখে। গিরি ভাবিল বাপের কবল হইতে নিস্তার পাইয়া গৌরীর হাসি ফুটিয়াছে। তাহার অন্তরটাও একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বাঁ হাতে উনানের মুখের কাঠখানা ঠেলিয়া দিতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করিল—কে লো—গৌরী ?

ঈষৎ ঝঙ্কার হানিয়া গৌরী কহিল—জানি না।

কিন্তু ঐ ঝঙ্কারটুকুর মধ্যে লজ্জার বেশ একটু আভাস। গিরির হাতের হাতা স্থির হইয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া গৌরীর মুখপানে তাকাইল।

গৌরী আপন ছোট হাতখানির ছোট্ট মুঠাটি চট্ করিয়া খুলিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ

করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে কহিল—দেখেছ, দেব না তোমায়।

চকিতের মত ক্ষণটুকু ক্ষীণ হইলেও গৌরীর হাতের জিনিসটা কি তাহা বোঝা গেল—টাকা!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! তারও উপর গিরির ঈর্ষা। হরিলাল মেয়েকে আদর করিয়া টাকা দিয়াছে, মুখের কথায় নয়, কাজকর্মে পিতৃত্বের অধিকার স্থাপন করিয়াছে ইহা গিরির সহ্য হইল না; সে বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে কহিল—

একশো বছর গিয়েছে চলে,
ভাগ্যি আমার, ভাগ্যি ভাল—
পড়ল মনে এতদিনে দুখিনী বলে।

—ভাল—তাও ভাল। রেখে দে লো বাপের দেওয়া প্রথম টাকা।

গৌরীর শিশুমন এই শ্লেষ বুঝিল না, সে এতগুলা কথার মধ্যে বুঝিল শুধু 'বাপের দেওয়া টাকা'। এ কথাটারই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়া সে কহিল—যাঃ, জামাই দেবে কেন, ও গাঁজাল টাকা দেবে? আর পাবেই বা কোথা? দিলে সেই লোকটা।

—সে লোকটা? কে সে?

আবার সেই সলজ্জ ঝঙ্কার দিয়া গৌরী কহিল—জানি না।

হরিলাল টাকা দেয় নাই শুনিয়া গিরি একটু লঘুভার হইয়াছিল। সে এবার একটু হাসিয়া কহিল—সে লোকটার নামে তোর লজ্জা কেন? সে তোর শ্বশুর নাকি? তোকে দেখ্‌তে এসেছে?

গৌরী এবার টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া চট্ করিয়া কহিল—হুঁ।

—হুঁ! সে কি?

গৌরী কহিল—বলছিল যে জামাই।

গিরি আর শুনিল না—সে উঠিয়া গিয়া বাহিরের ঘরের পিছনে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সর্ব অঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল। অতি কষ্টে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে গৌরীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিল। গৌরী অবাক হইয়া গিরির মুখপানে চাহিতেই দেখিল গিরির চোখে জল; সে ছোট হাতখানি দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল—কাঁদছ মা!

গিরি কথা কহিল না, তাহার অশ্রুধারার বেগ বাড়িয়া গেল।

গৌরী কহিল—মা, ওদের টাকা ফিরে দিয়ে আসব মা?

গিরি তবুও নীরব, চিন্তাকুল স্তিমিত নেত্রে অন্তহীন ভাবনা সে ভাবিয়া যায়। কতবার তাহার চিন্তা ধারণার সীমা পার হইয়া অর্থহীন হইয়া পড়ে, সচকিত হইয়া আবার সজাগ হইয়া সে ভাবিতে বসে।

গৌরী সেই মুখপানে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার পরনির্ভর শিশু-চিত্তখানি সশঙ্ক আগ্রহে ওই চিন্তাকুলার মুখপানে চাহিয়া থাকে, এটুকু বোঝে যে ভাবনার কেন্দ্র সে-ই, তাহাকে লইয়াই একটা কিছু ঘটিতে বসিয়াছে।

সহসা গিরি যেন সহজভাবে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, বোধ হয় সে একটা কুল পাইয়াছে—গৌরীর হাতটা ধরিয়া উজ্জ্বল নেত্রে সে বলিল—খবরদার যাবি না তুই। ওই মাতাল, তোর বাপ যদি নিয়ে যেতে চায় তোকে—খবরদার যাবি না তুই।

গৌরীর কেমন শঙ্কা হয়, ওই মানুষটাকে দেখিলেই তাহার যে ভয় হয়! সে তাহার কথার প্রতিবাদ করিবে কেমন করিয়া? সে শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল—যদি ধ'রে নিয়ে যায় মা জোর ক'রে।

—আমার জোর নাই? আমি যে তোকে এত বড় করলাম, আমার জোর নাই?

—মামা এলে ওকে তাড়িয়ে দিতে ব'ল মা, দিক লাঠির বাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমন্ত কোদাল হাতে আসিয়া খিড়কির দরজায় বাড়ি ঢুকিল। বাহির হইতেই সে গৌরীর কথাটা শুনিয়াছিল, হাসিতে হাসিতে সে কহিল—কাকে মারতে হবে মা-মণি?

শ্রীমন্তকে দেখিয়া গৌরীর বুকখানা সাহসে ফুলিয়া উঠিল। সে ঝঙ্কার দিয়া কহিল—ওই মুখপোড়া মাতালকে, তোমাদেরই ওই লক্ষ্মীছাড়া জামাইকে গো।

মেয়ের পিতৃ-ভক্তির ঘটা দেখিয়া শ্রীমন্ত হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। গিরির কিন্তু তাহা ভাল লাগিল না, তাহার চিন্তা-পীড়িত ক্ষুব্ধ অন্তর অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সে অস্থির কণ্ঠে আত্মহারার মত বলিয়া উঠিল—আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব বলছি।

শ্রীমন্তের প্রাণখোলা হাসি অর্ধ পথেই থামিয়া গেল, সে হতভম্বের মত তাল হারাইয়া গিরির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গিরি উঠিয়া শ্রীমন্তের পায়ে সত্যই মাথা কুটিতে কুটিতে কহিল—বল, বল, তুমি এর বিহিত করবে কিনা বল।

তাড়াতাড়ি শ্রীমন্ত তাহাকে ধরিয়া তুলিতে তুলিতেই সান্ত্বনা দিল—করবো, করবো, করবো, তিন সত্য করছি, থাম গিরি-বৌ, থাম।

গিরি সজল নেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—তা যদি হয় তা হ'লে মরে যাব আমি।

অন্ধকারে দিশাহারার মতই ব্যাকুল ভাবে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—কি, হ'ল কি?

গিরি কি যেন বলিতে গিয়া গৌরীর দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল, কহিল—বলব এর পর।

তারপর গৌরীর হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরে লইয়া যাইতে যাইতে কহিল—মেয়ের চোখে ঘুম নাই মা, রাত দু'পহর পর্যন্ত চোখ চেয়ে বসে আছেন। আয়, খেয়ে ঘুমোবি আয়।

শ্রীমন্ত একটা উদ্বেগ লইয়াই তামাক সাজিতে বসিল। এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল—আরে ছিমন্ত নাকি? বহুৎ আচ্ছা রে ময়না, একদম্‌সে পিঁজরাকে ভিতর যাকে বৈঠা! পড়ো আত্মারাম 'রাধাকিষণ সীতা রাম'! তারপর উচ্চ হাসি!

শ্রীমন্ত কলিকাটা হাতে করিয়া উঠিয়া আপন মনেই কহিল—হরিলাল নাকি? এলে কখন?

গিরি ঘরের মধ্য হইতে আগ্নেয়গিরির মতই অগ্ন্যুদ্গার করিল—দেখ আমি কিছু দানছত্র খুলি নাই।

শ্রীমন্ত আন্দাজেই তাল মারিল—নিশ্চয়ই।

—তাই বল তোমার ভগ্নিপোতকে, নিজে ষোল আনা বাঁধবেন, আমার অন্নধ্বংস করবেন, আবার আমারই সর্বনাশের চেষ্টা—ব'লে দাও বলছি ভাত আমার নাই।

শ্রীমন্ত কিন্তু এটা পারিল না। যতই ঘৃণা সে হরিলালকে করুক কিন্তু একমুঠো ভাত—না—তাহা সে মুখ দিয়া বাহির করিবে কি করিয়া? সে মৃদুস্বরে ক্ষীণভাবে কহিল—তুমিই ব'লে দিয়ো।

—তোমার আক্কেল ত খুব, আমি ওর সঙ্গে কথা কই যে কথা কইব!

শ্রীমন্ত বিব্রত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—সে শুনতে পেয়েছে ঠিক, আর বলতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে বেশ অধিকারভরা কণ্ঠে ডাকও আসিল, হরিলাল হাঁকিল—গৌরী, গৌরী, চলে আয় বল্ছি, চলে আয়।

গৌরী ভয়ে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার সেই নিজের কথাটাই বোধ করি মনে পড়িয়া গেল—যদি জোর করে ধরে নিয়ে যায় মা!

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারী মুখও বন্ধ হইয়া গেল। চিরন্তন চলিত সমাজ-বিধান অনুসারে সন্তানের উপর পিতার অধিকার, তা সে পিতা যেমনই হউক না কেন, সে বিধান অমান্য করিবার মত জোর কই তাহার নাই।

হরিলাল কিন্তু নিরস্ত হইল না, সে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া দাবীভরা কণ্ঠে ডাকিল—গৌরী!

শ্রীমন্ত ঘটনাটার মোড় ফিরাইয়া দিতে হাসিমুখে আপ্যায়ন করিল—আরে ওস্তাদ যে, এলে কখন? তোমার ডাক শুনে তামাক নিয়ে—

হরিলাল ও প্রচ্ছন্ন অনুনয় গায়ে মাখিল না, সে বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই কহিল—ছিমন্তে, গৌরীকে দে দেখি।

আজ হরিলালের সম্মুখেও গিরির চাপা গলা শোনা গেল—সে গৌরীর জন্য দুধে ভাতে মাখিতে মাখিতে কহিল—বল না সে ঘুমিয়েছে।

শ্রীমন্তকে আর কথাটা হরিলালের কানে তুলিয়া দিতে হয় না, সে নিজেই শুনিতে পাইল, উত্তরে সে কহিল—ঘুমোক্, আমার মেয়ে আমায় দাও, ঢের হয়েছে, ঢের ভাত দিয়েছ, আর না।

এমন গম্ভীর ভাবে কথা কওয়া হরিলালের পক্ষে অস্বাভাবিক। ইহাতেই গিরি বেশি দমিয়া গেল। হরিলাল বকিয়াই যায়—ভাত, আরে ভাত দেখলাতা হামকো? ভাত? ভাত তো ঘাসকা বীচ, কেয়া দাম উস্‌কো? আর দেখলাতা কিনা একঠো আওরৎ। আরে তুলসীদাস কেয়া বোলা জানতা—

শিরকা তাজ, মরদকা মান,
জুত্তি আও জরু দুঁহি সমান।
পাঁওকা পঁয়জার তুমি শিরমে উঠায়া ?

কথাটা শ্রীমন্তকে বড় লাগিল, তাহার জিহ্বাগ্রে একটা কটু উত্তর আসিয়া পড়িয়াছিল—হ্যাঁ, পরিবারকে যে খুন করতে পারে তার কাছে পরিবার 'জুত্তি' বই আর কি ?

কিন্তু সন্তানকাঙালী মানুষটিরও যে নারীর মতই দুর্বলতা আছে, কাজেই অন্তরের বিদ্রোহ অন্তরেই চাপিয়া তোষামোদ তাহাকে করিতে হয়। মহাজন আর খাতক—এদের মধ্যে খাতকের যে ওই ছাড়া উপায় নাই।

শ্রীমন্ত কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল—আরে ভাই ওস্তাদ, আওরৎ কি বাত্ ধরতে আছে, এস, এস, তৈরি তামাক, তোমার সে বাত্‌টা কি হে—'তৈয়ার তামকুল, বিছাওনা, খানা, মৎ ছোড়না'—না কি ?

হরিলাল কহিল—গৌরীকে এনে দাও।

গিরি পুনরায় ঘর হইতে কহিল—বল না রাত্রে কাঁদবে।

—কাঁদুক, কাঁদবে বলে ত হতচ্ছেদ্দায় মেয়েটাকে ফেলে রাখতে পারি না।

হতচ্ছেদ্দা! অকৃত্রিম স্নেহের এত বড় অপমান গিরির সহ্য হয় না, সে লজ্জা শরম ভুলিয়া অতি তীব্র কণ্ঠে কহিল—এতকাল ত এই হতচ্ছেদ্দায় কাটল, আজ হঠাৎ বাপের স্নেহ উৎলে উঠল।

বলিয়া মেয়েটার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া হরিলালের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া কহিল—নাও, মেয়ে বিক্রি কর গে যাও। তোমার এ স্নেহ-রস কেন উথ্‌লে উঠল, জানি না মনে করছ? সব জানি।

গিরির মাথায় ঘোমটা নাই, কণ্ঠস্বরে লজ্জার মৃদুতা নাই, সে বোধ করি তখন আত্মহারা।

এবার হরিলাল চুপ হইয়া গেল। সংসারে অতি বড় পাষণ্ডেরও বিবেক বোধ হয় নিঃশেষে মরিয়া যায় না। তাই সে যে-অন্যায়, যে-পাপ পূর্বে করে নাই, সে-পাপ করিবার পূর্বে ধরা পরিলে লজ্জা তাহার হয়-ই হয়। ওই লজ্জাই ত সংসারে অন্যায়-বোধ, সে লজ্জা অনুভব করে মানুষের যে-সংস্কার তাহাই বিবেক।

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া গিরির দিকে চাহিল, সে কথাটা বেশ বুঝিতে পারিল না, গিরি কহিল—তখন গৌরী ছিল বলে বলতে পারি নাই আমি। যে কথা পর, হ্যাঁ পরই ত আমি, পর হয়েও আমি মেয়ের সামনে মুখে আনতে পারি নি সেই কাজ ও বাপ হয়ে করবে ঠিক করেছে, মেয়ে বিক্রি করবে, কোথায় কোন বুড়ো খোঁড়া বর ঠিক করেছে, আজ একজন দেখতেও এসেছে। এই দেখ, একটা টাকাও সে দিয়েছে গৌরীকে।

সে গৌরীর হাত হইতে টাকাটা কাড়িয়া লইয়া হরিলালের দিকেই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

শ্রীমন্তের ভাবে ভঙ্গীতে একটা পরিবর্তন খেলিয়া গেল, সে কঠোর দৃষ্টিতে হরিলালের পানে চাহিতে চাহিতে দৃঢ় ভঙ্গীতে গৌরীকে আপনার কোলের কাছে টানিয়া লইল।

সে দৃষ্টির ধিক্কারে এবং কঠোরতায় হরিলাল এতটুকু হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি একটা কৈফিয়ৎ না দিয়া পারিল না, লজ্জাও হইতেছিল, আর আশঙ্কারও সীমা ছিল না। শ্রীমন্তের ঐ চিমড়ে দেহ রক্ত-মাংসের মত নয়, পাথর-লোহার। সে কহিল—মেয়ের ত বিয়ে দিতে হবে, ভাল ঘর বর ত অমনি হয় না, টাকা চাই।

গিরি গর্জন করিয়া উঠিল—টাকার পুঁটুলি বুকে চাপিয়ে যাবেন, জমি রয়েচে—

হরিলাল ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিল—জমিন্ কেন্, জমিদারী হ্যায়, ওহিঠো বেচেঙ্গে—

অপব্যয়ে, উচ্ছৃঙ্খলতায় সমস্ত খোয়াইয়া পথের ভিখারী হইয়াও যে মানুষ এমন নির্লজ্জ, সপ্রতিভ আস্ফালন করিতে পারে এ ধারণা গিরির ছিল না, কিন্তু শ্রীমন্তের ছিল, সে হরিলালকে চিনিত।

বিস্ময় তাহার হইল না, কিন্তু ঘৃণাভরেই সে কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, টাকা তোমার লাগবে না। যা খরচ হবে আমার—বিয়ে আমি দেখেশুনে দেব।

তবু হরিলাল একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করিল—কুল-টুল দেখতে হবে, আমার কুল ভেঙে দেবে তোমরা।

গিরির অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, সে বোধ করি ওই লোকটির অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছিল, সে কহিল—বুঝতে পারছ না ও চামারের চালাকি, ওই সব আবোল-তাবোল করে বিয়ে দেবার নাম করে মেয়ে বেচবে।

হরিলাল এবারে একটু সহজ ভাবেই প্রতিবাদ করিল, কিন্তু গিরির কথার উত্তরে সে কথাটা একান্ত অবান্তর বোধ হয়। সে মনে মনে যুক্তি-সবল প্রতিবাদই খুঁজিতেছিল, কহিল—আরে, আমার মেয়ের বিয়ে তোমাদের টাকাতেই বা দিতে দেব কেন? আমার মান নাই?

গিরি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, অতি শ্লেষতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের জ্বালায় ভরা—ওরে আমার মানী লোক, বলে—

সেই মানভূমের মানকুণ্ডুর মানসিংহী মহারাজ,
মানের গোড়ায় ছাইয়ের গাদায় বসে বসে সদাই লাজ।

সেই বিত্তান্ত।

শ্রীমন্ত বেশ গম্ভীর ভাবেই কহিল—দেখ হরিলাল, ওসব মতলব ছাড়, গৌরীকে জলে ফেলে দিতে আমি দেব না।

গাম্ভীর্যের মধ্যে উত্তেজনা থাকে না। হরিলাল শ্রীমন্তের এই উত্তেজনাহীন গাম্ভীর্যকে ভ্রম করিল মৃদুতা বলিয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাহার রোষ হইয়া উঠিল প্রবল, সে বলিয়া উঠিল—আমার মেয়ে আমি যদি জলে ফেলেই দি—বলিয়া সে আগাইয়া আসিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া শ্রীমন্তের সন্নিকট হইতে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

গৌরী শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে শ্রীমন্তের কঠোর দেহখানা হইয়া উঠিল সুকঠোর, প্রত্যেকটি পেশী যেন দৃঢ়ভাবে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, মুখ চোখ ঘৃণায়, ক্রোধে হইয়া উঠিল বীভৎস—ভীষণ! সে একদৃষ্টে হরিলালের পানে চাহিয়া থাকিতে

থাকিতে অনুত্তেজিত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—খুন করে ফেলব।

সংসারে উচ্ছ্বসিত ক্রোধকে মানুষ তত ভয় করে না; কিন্তু এই শান্ত ক্রোধ সত্যিই ভীতির বস্তু। উচ্ছ্বসিত ক্রোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠোর প্রবল তিরস্কারেরই নামান্তর, ইহার প্রকাশ প্রায়ই বাক্যে আবদ্ধ। কিন্তু এই শান্ত ক্রোধ প্রতিহিংসারই রূপান্তর, ইহার প্রকাশ প্রায়ই কর্মে। বাহৃত নিরীহ বন্দুকের গুলির মত, যে কোন মুহূর্তে ফাটিয়া জীবন সংশয় করিতে পারে। মানুষ ইহাকে ভয়ও করে বেশি, সব সময়ে এটা বিশ্লেষণ করিয়া না বুঝিলেও, মানুষের অন্তর এটা অনুভব করে। হরিলালও ভয় পাইল, সে গৌরীকে ছাড়িয়া দশ হাত পিছাইয়া গিয়া শ্রীমন্তের পানে চাহিয়া কহিল—আচ্ছা থাক্‌, কাল—

সহসা তাহার নজরে গিরির ফেলিয়া-দেওয়া টাকাটা ঠেকিল, সে চট্‌ করিয়া টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া কথাটা শেষ করিল—পুলিস এনে মেয়ে দখল করব।

বাক্য শেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পা দরজার ওপরে পড়িল এবং এক মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। বোধ হয় আড়ালে সে ছুটিতেই শুরু করিয়াছিল।

গৌরী বাপের এই পলায়ন-ভঙ্গীতে খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, গিরিও হাসিল। কিন্তু শ্রীমন্ত নীরব হইয়াই রহিল।

গিরি গৌরীকে টানিয়া লইয়া রান্নাঘরের মুখে পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া কহিল—আমাদেরও আর দেরি করা নয়, শিগ্রি পাত্র দেখ!

শ্রীমন্ত ঘরের দাওয়ার উপরে বসিতে বসিতে শুধু কহিল—হুঁ।

গিরি কহিল—কি ভাবছো বল দেখি?

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—ভাবছি সেই কথাটা, বলে যে সেই—

পরের সোনা প'রো না কানে
ছিঁড়ে দেবে হেঁচ্‌কা টানে।

নিজের একটা হ'ল না—

আর তাহার বলা হইল না, গিরি দ্রুত পদক্ষেপে রান্নাঘরের ভিতর চলিয়া যাওয়াতেই কথাটা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। শ্রোতার অভাবে, না—ঐ নারীটির দ্রুত পদক্ষেপের ইঙ্গিতে তাহার মনের তুফানের পরিচয় পাইয়া, কে জানে!

সাত

রাত্রে গৌরীকে শোয়াইয়া দপ্‌ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া গিরি শুইয়া পড়িল। গৌরী নিদ্রিতা। কিন্তু জাগ্রত দুটি প্রাণীও নীরব। অনেকক্ষণ পরে শ্রীমন্তই কথা কহিল—ঠিক বলেছ তুমি, আর দেরি করা নয়, যত শিগ্রি হয় বিয়ে দিতে হবে।

গিরি কোন উত্তর দিল না, শ্রীমন্ত পাশ ফিরিয়া গিরির পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল—রাগ করেছ গিরি-বৌ?

পিঠে হাত রাখিয়া শ্রীমন্ত অনুভব করিল গিরির দেহখানি ঘন ঘন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, সে কহিল—সত্যিই আমার দোষ হয়েছে, কেঁদো না গিরি।

গিরি তবুও মুখ তুলিল না, শ্রীমন্ত এবার আরও একটু সরিয়া গিয়া গিরির মুখখানি তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল, কহিল—আমায় মাপ কর গিরি—করবে না ?

গিরি এবার আর থাকিতে পারিল না, সে উঠিয়া স্বামীর পা দুইটার উপর উপুড় হইয়া পড়িল, কহিল—ওগো, আর আমার লজ্জার বোঝা বাড়িয়ো না গো, আমি যে এতেই তোমায় মুখ দেখাতে পারছি নে।

শ্রীমন্ত বুঝিল কিসের এ বেদনা। তাহারও বঞ্চনার বেদনা ছিল, কিন্তু এই নারীটি যে সে বঞ্চনার জন্য নিজেকেই দায়ী করিয়া অহরহ বুকের মধ্যে এত ক্ষোভ এত শোচনা পোষণ করে তাহা সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহার আভাস পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরম দুঃখের মুহূর্তে আত্মহারা হইয়া যে আঘাত আজ সে আপন অজ্ঞাতে দিয়া ফেলিয়াছে, তাহার জন্য গ্লানির আর পরিসীমা রহিল না। তাহার মুখে সান্ত্বনার কোন বাণী ফুটিতে পারিল না, বোধ করি মনেও যোগায় নাই। সে পরম স্নেহভরে প্রিয়তমার এলাইয়া-পড়া কেশের উপর হস্তের পরশ বুলাইয়া নীরবে সান্ত্বনা দিতে চাহিল।

গিরি আবার কহিল—আমি ত জানি, এর জন্যে কত বড় দুঃখ তোমার মনে—সেই লজ্জাতেই যে আমি মরে যাই। আমার মনে হয় কি জান, মনে হয় ছুরি দিয়ে আমার এ দেহখানাকে ফেড়ে ফেড়ে দেখি।

শ্রীমন্ত আর এ উচ্ছ্বসিত দুঃখের আঘাত সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে কৃত্রিম আনন্দের ভান করিয়া, লঘু হাস্যপরিহাসের বঞ্চনায় বেদনার সত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া গিরিকে ভুলাইতে গেল, সে কহিল—দূর, দূর, মিছেমিছি মাথা খারাপ করা দেখ, যত সব বাজে ভাবনা! হ্যাঃ, ছেলের জন্যে ত দুঃখে মরে গেলাম! ছেলে অভাবে ত রাজ্য-পাট ভেসে যাচ্ছে—তাই ছেলে! ছেলে না হয়েছে ভালই, হাঙ্গামা কত, খাবে কি ?

কিন্তু ফল হইল বিপরীত। গিরি স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—সে কণ্ঠস্বর অতি দীনতায় ভরা, প্রচ্ছন্ন আক্ষেপের তাহাতে সীমা নাই, ভিক্ষুককে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিলে যে দীনতা, যে আত্মধিক্কারের সুর তাহার পদক্ষেপে, চাহনিতে ফোটে, গিরির কণ্ঠেও ঠিক সেই সুর, সেই ধিক্কার! সে কহিল—এত বড় কথাটা তুমি আমাকে বল্লে!

শ্রীমন্ত বুঝিল না এ কথায় গিরি বেদনা পাইল কেমন করিয়া! কিন্তু গিরি বেদনা পাইয়াছিল, সে ত সন্তানের আশা আজও ছাড়িতে পারে নাই, তাহার মনোমন্দিরে তাহার অন্তরের নারীটি অহরহ যে কল্পিত একটি শিশু-দেবতার পরিচর্যায় ব্যস্ত! সত্য সন্তানের মাতাকে যদি পরম অভাবেও স্বামী এমন কথা বলে, তাহাতে যে বেদনা সে পায়, সেই বেদনা সে পাইয়াছিল।

তারপর সব নীরব। শ্রীমন্ত শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, এমন কথা সে কি বলিল যাহাতে গিরি বেদনা পাইল।

আর ঐ নারীটি কি যে ভাবিতেছিল সেই জানে।

বহুক্ষণ পরে গিরিই শ্রীমন্তের কাছে সরিয়া আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিল—ঘুমোলে ?

শ্রীমন্ত বেশি কথা বলিতে সাহস করিল না, সে সংক্ষেপে সাড়া দিল—উঁ।

গিরি বাহুপাশে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল—আমার একটি কথা রাখবে তুমি, বল ?

শ্রীমন্তর ভয় হইতেছিল, কি কথায় হয়ত কি হইয়া যাইবে, সে শঙ্কাভরেই কহিল—কি কথা বল।

—আগে বল, রাখবে ?

এবার শ্রীমন্ত গিরির দেহ বেষ্টন করিয়া সাদরে কহিল—তোমার কোন্ কথা রাখি নে বল ?

—তা নয়, তিন সত্যি করতে হবে।

শ্রীমন্তের মনে কি হইল কে জানে, সে কহিল—না, আগে বল কথাটা কি, শুনি, তারপর।

—তুমি আবার বিয়ে কর।

শ্রীমন্ত কথাটা শুনিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না, বহুক্ষণ পরে মাত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

স্বামীর এ নীরবতার অর্থ গিরি বুঝিয়াছিল, কিন্তু বিচিত্র নারীর মন, আর বিচিত্র সম্বন্ধ নর ও নারীর মধ্যে। এ অনুরোধ হেলা করায়, বিশেষ, স্বামী এই প্রস্তাবে বেদনা পাওয়ায় গিরির একটু আনন্দই হইল। সে স্বামীকে আপনার দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া কহিল—রাগ হ'ল বুঝি ? শোন শোন !

শ্রীমন্ত ফিরিয়া কহিল—এ সংসারে আজ ছ'সাত বছর একসঙ্গে ঘর করছি, তুমি আমার সব চেয়ে বড়, এ কি তুমি জান না ?

নারীটির অন্তর পুরুষের সোহাগে পুলকে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, গিরি চটুল ভাবে কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর টানিয়া কহিল—তাই নাকি ? কত বড় গো, তোমার ওই তেল-পাকা কালো হুঁকোটার চেয়েও বড় ?

শ্রীমন্ত এবার স্ত্রীর গালে সোহাগের চড় মারিয়া কহিল—ভাগ্ !

উত্তরে গিরি পরম সোহাগে স্বামীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—তা জানি ব'লেই ত এত দুঃখ, এত লজ্জা আমার যে তোমার মনের খেদ মেটাতে পারলাম না !

শ্রীমন্ত তিরস্কার করিয়া কহিল—ফের ঐ কথা ? তা হলে কিন্তু আমি উঠে যাব।

—আচ্ছা থাক্ থাক্, এই মুখ বন্ধ করছি। বলিয়া সে স্বামীর অধরে আপন অধর আবদ্ধ করিয়া দিল। অতি পুলকে গিরি স্বামীর নিকট হইতে আগে প্রেম নিবেদন পাইবার স্ত্রীর যে একটা মর্যাদা ও সলজ্জ রীতি আছে, তাহা আজ লঙ্ঘন করিয়া ফেলিল।

সহসা গৌরী ঘুমের ঘোরে শব্দ করিয়া নড়িয়া-চড়িয়া ওঠায় গিরি গৌরীর দিকে ফিরিয়া তাহার পিঠে ঘুমপাড়ানি চাপড় মারিতে মারিতে কহিল—সত্যি আর দেরি ক'রো না, ওই ত বাপের ইচ্ছে, আর এদিকেও গৌরী ষেটের কোলে ন' দশ বছরের হ'ল।

শ্রীমন্ত কহিল—পাত্র যে মনের মত মিলছে না, আমি কি বসে আছি ভাবছ ? দু-তিন জন

ঘটককে বলেছি, কত বন্ধুজনকে বলেছি। যার-তার হাতে ত গৌরীকে দিতে পারব না।

—রাঙা টক্‌টকে ছেলেটি চাই বাপু, হর-গৌরীর মত মানান চাই।

—তুকলম লেখাপড়া জানা চাই, যে চাষাকে সেই চাষা—আমাদের মত হলে চলবে না, অন্তত ছাত্তবিত্তি মাইনর।

—শ্বশুর-শাশুড়ী ভাল চাই, সে যে কষ্ট দেবে তা হবে না। বরং শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকে সে ভাল। গৌরীর ত ধর বাপের যা আছে তা পাবে।

—বাপে আছে ছাই, তবে হ্যাঁ, আমার ক্ষুদকুঁড়ো যা আছে সেটুকু ত পাবেই।

গিরি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে, ক্ষণ-পরে কহে—তার চেয়ে দেখেশুনে দেওয়াই ভাল, সম্পত্তি কিছু দিয়ো, সব দিয়ো না, সময় গিয়েও ত মানুষের ছেলেপিলে হয়।

শ্রীমন্ত কহিল—চল গিরি, এবার বদ্যিনাথ যাই, ধন্না দিলে বাবার কি দয়া হবে না!

গিরি কহিল—তাই চল, গৌরীর বিয়েটা হয়ে যাক।

আট

শ্রাবণের মাঝামাঝি, কয়দিন হইতে তাহার উপর বাদলা করিয়াছে। আকাশ ভরিয়া জলভরা মেঘের দাপাদাপি। দুরন্ত বর্ষণে মানুষ ঘরের বাহির হইতে পারে না।

শ্রীমন্ত সেই বর্ষা মাথায় করিয়া গিয়াছিল মহাজনের বাড়ি।

গৌরীর পাত্র মিলিয়াছে, যেমন ঘর, তেমনি বর। যেমনটি শ্রীমন্ত ও গিরি চাহিয়াছিল তেমনটি। মেলে নাই শুধু শ্বশুর-শাশুড়ীর কথাটা—দুইই মজুত, তবে তাহাতে কিছু আসে যায় না—তাহারা লোক খুব ভাল। এদিকে সুবিধাও খুব, তাহারা চায় মাত্র দু'শো টাকা। তা এমন পাত্রের তুলনায় সে আর এমন বেশি কি!

কিন্তু পাত্রটির মূল্য হিসাবে দু'শো টাকা হয় ত কিছু নয়, কারণ সমাজের হাটে তাহার কদর আছে, চাহিদা আছে। কিন্তু ক্রেতার সংস্থানের ঘরটি যে শূন্য, তাহার কাছে দু'শো টাকা যে অনেক, নিঃশেষে রক্তহীন জনের কাছে দু'টি বিন্দু রক্ত!

কিন্তু কাঙ্গালের কি সাধ হয় না! আর সে সাধের জন্য যদি সে জীবন পণ করিয়া বসে!

শ্রীমন্ত গিরিকে কহিল—দেখ এক কাজ করা যাক্, গৌরীকে ত কিছু জমি দোবই ঠিক করছি, তা ওই জমিটুকু বেচে-কিনে গৌরীর বিয়েটা দিয়ে দি—কি বল?

গিরিও ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল—সে ভাল, তবে জমিটা যদি ওরাই নিয়ে মেয়েটি নিত তবে ভাল হ'ত। গৌরীর ছেলে-মেয়েরা নাম করত, মায়ের মামা-মামীর দেওয়া আমাদের। নইলে যতই কর ততই কর—গৌরীর ছেলেরা আমাদের চিনবে না, শুভকর্ম হবে—আভ্যুতি দেবে সেই মাতামহ পাবে।

শ্রীমন্ত উৎসাহভরে কহে—তা না হয় 'দো'য়ের যে ছোট চারটুক্‌রো কেটে একবিঘে বাকুড়ি করেছি, সে বিঘে খানেক গৌরীকে দান করব। লিখে দোব 'কেনারামের জমির পশ্চিম,

পুন্নচন্দ্রের দো'এর উত্তর ও পূব্ব, কালিকেষ্টর বাকুড়ির দক্ষিণ ইতিমধ্যে দোয়েম জমি—নাম গিরি বাকুড়ি, বুঝলে, নাম দোব্ গিরি বাকুড়ি। ব্যাস—আখ হবে, কলাই হবে, গম হবে, গৌরীর ছেলেমেয়েরা খাবে আর বলবে 'গিরি বাকুড়ির ফসল। গিরি কে—না মায়ের মামী।'

গিরি ঈষৎ লজ্জাভরে কহে—তোমার নামটাও জুড়ে দাও আগে, দুজনেরই নাম থাকবে।

একটু চিন্তা করিয়া শ্রীমন্ত প্রবল উৎসাহে ঘাড় দোলাইয়া কহিল—তাই হবে, নাম দিয়ে দেব, 'শ্রীগিরি বাকুড়ি', কেমন ?

সমস্তটাই গিরির মনে ধরিল।

শ্রীমন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সেদিন শ্রীমন্ত গিয়াছিল সেই দু'শো টাকার যোগাড়ে। মহাজন জমি কিনিল না, শ্রীমন্তের সমস্ত ভূ-লক্ষ্মীটুকু বাঁধা লইয়া আড়াই শত টাকা শ্রীমন্তকে দিল। গৌরীকে দিবার জন্য হাতে পায়ে ধরিয়া ওই 'শ্রীগিরি বাকুড়ি'টুকু শ্রীমন্ত দলিলের বাহিরে রাখিল।

শ্রীমন্ত খুশি হইল ; তাহার ভরসা হইল তাহার সমর্থ দেহে খাটিয়া সে একদিন ঋণ শোধ করিয়া তাহার ভূমি-লক্ষ্মী মাকে পূর্ণাঙ্গ রাখিয়াই পূজা করিতে পাইবে।

মহাজনের আশা—সুদের তন্তু বয়ন করিয়া একদিন সে শ্রীমন্তের সমগ্র জমিটুকু টানিয়া লইতে পারিবে।

যাক, শ্রীমন্ত যখন টাকা লইয়া বাড়ি ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়ায় গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, যেন কোন বিরাটপক্ষ নিকষ-কালো পাখি ধরণীর কেন্দ্রদণ্ডের শীর্ষে বসিয়া অণ্ডের মত ধরণীকে বুকে ধরিয়া আছে। তাহার পক্ষতলে উত্তাপ নাই—আছে শুধু হিমানী স্পর্শ। তাহার সে পক্ষে ঝরে জল, আর সে পক্ষের আন্দোলনে জাগিয়া উঠে হিমতীক্ষ্ণ বায়ুপ্রবাহ। সে বর্ষণে আর বায়ু-প্রবাহে ধরণী শীতার্তা। সিক্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীমন্ত বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। ঘরে আলো নাই, বাড়িতে মানুষের সাড়া নাই, শ্রীমন্ত পরম বিরক্তিভরে কহিল—বলি সব মরেছে, না কি ?

অন্ধকারের মাঝে শ্বেতবস্ত্রাবৃত একটি মূর্তি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমন্ত বুঝিল গিরি।

শ্রীমন্ত কহিল—দিন ঠিক করে ফেল, কালই খোলায় খই দাও। খুব ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল —বুঝলে !

গিরি তবু কোন কথা কয় না।

গিরি কথা কহিল আর না কহিল তাহাতে শ্রীমন্তের কিছু আসে যায় না। সে দাওয়ার উপর বসিয়া কলিকা খুঁজিতে খুঁজিতে গোটা বিবাহের ফর্দটা মুখে মুখে বলিয়া গেল।

—ভদ্দরলোকের সঙ্গে করণকর্ম, ভদ্দরলোকই আসবে সব, রাত্তিরে লুচি করতেই হবে। তা ঘরের গম-ময়দা পিষে নাও, আর ছোলার ডাল তাও ঘরে আছে। আর গুড়—তা হোক, এবার আমার যা গুড় হয়েছে চিনি ফেলে তা খেতে হবে। না হয় চিনি কিছু আনা যাবে। কথা বিশ্বাস না হয় বিয়ের রাত্তিরেই পরখ করিয়ে দেব তোমাকে, তারা গুড়ই যদি না চায়—

এতক্ষণে গিরি অতি মৃদুভাবে দুটি কথা কয়—কার বিয়ে ?

—কার বিয়ে? বলে যে সেই সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের কে? যাঃ গেল, ঘরে আলো কি হ'ল, কয়লা ধরাব যে, দেশলাইটা দাও ত। বলে কার বিয়ে? আমার নানার বিয়ে —কেন গৌরীর বিয়ে!

গিরি কাঁদিয়া উঠে, কহে—তাই ত বলছি গো, কার বিয়ে দেবে? গৌরীকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

—কেড়ে নিয়ে গিয়েছে? কে? কেন?

—যার মেয়ে, সেই মাতাল বদমাস; আজ তার বিয়ে দেবে। পাত্রটির দু চোখ কান, বিয়ে দিয়ে টাকা পাবে। তাছাড়া তিনকুলে সে পাত্তরের এক বোন আর বোনাই ছাড়া কেউ নাই, বিষয়সম্পত্তি আছে ভাল।

শ্রীমন্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

গিরি কাঁদিতেছিল, রোদন-ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই সে কহিল—তুমি গেলে, তার দণ্ড-দুই পরেই সে এসে হাজির, সঙ্গে পাঁচজন লোক। বললে, 'ভালোয় ভালোয় মেয়ে দেবে ত দাও, নইলে খুঁটিতে তোমাকে বেঁধে জুতো মেরে মেয়ে নিয়ে যাব। গাঁয়ের দু-চারজন এল, তাদের কি সব বললে, তারা বললে, তা ওর নিজের মেয়ে ও নিয়ে যাবে তাতে কে কি বলবে বাপু, এতদিন তোমাদের কাছে রেখেছে এই—

সহসা শ্রীমন্ত উঠিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কোথায় বিয়ে?

—মহাদেবপুর।

মহাদেবপুর এখান হইতে ক্রোশ-তিনেক পথ।

শ্রীমন্ত রান্নাঘরের মাচায় তোলা একগাছা লাঠি টানিয়া লইয়া কহিল—চল্লাম।

গিরি চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহে—সে কি, কোথা যাবে?

—দিয়ে আসি সেই শালা হ'রের মাথাটা চেলিয়ে।

—সে কি, তার মেয়ে!

—তার বাবার মেয়ে,—বলিয়া গিরির হাত সজোরে ছাড়াইয়া সেই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে শ্রীমন্ত বাহির হইয়া গেল।

গিরি বাহিরের দুয়ার পর্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া ব্যাকুলভাবে ডাকিল—ওগো, ওগো।

কোথায় কে!

দুয়ারের দুই পাশের বাজু দুইটা আশ্রয় করিয়া গিরি বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

আঁকা-বাঁকা পল্লী-পথখানি হাত দশ-বারো দূরে গভীর অন্ধকারের মাঝে লীন হইয়া গেছে। সে অন্ধকারে তাহার অশ্রুসজল দৃষ্টি বার বার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

বর্ষণ ও বায়ুতে গাছে, ঘরের চালে চালে একটা শব্দ-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে।

পাশের বড় গাছটায় কয়টা পক্ষীশাবক আর্তভাবে চিঁ-চিঁ করিয়া ডাকিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পিতামাতায় পক্ষপ্রসারণ ও সঙ্কোচনের শব্দ পাওয়া যায়, তাহারা বুঝি শাবক কয়টিকে বুকে টানিয়া লইল।

বিপুল অন্ধকার। দিকে, দিগন্তে, ঊর্ধ্বে—কোন দিকে কোথাও আলোক-রশ্মির একটুকু রেখার এতটুকু আভাস নাই। মাঝে মাঝে কালো আকাশের বুক চিরিয়া আঁকা-বাঁকা বিদ্যুতের রেখা ঝলক্ দিয়া যায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গিরি ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া একটি কোণে চুপ করিয়া বসিল।

তাহার মনের যত রোষ গিয়া পড়িল আজ ওই ভাগ্যহতা মেয়েটা, ওই গৌরীর উপর। কি একটা কুগ্রহের মত তাহার অদৃষ্টাকাশে সে আসিয়া জুটিয়াছিল। সমস্ত সংসারটা তাহার এক-দিনে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। আর রোষ পড়ে তাহার নিজের উপর, তাহার নিজের একটা হইলে ত আজ—

একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক চিরিয়া ঝরিয়া পড়িল। সহসা সে, কে জানে কেন, আপন যৌবন-পরিপুষ্ট দেহখানা কঠিন ভাবে নিপীড়িন করিল—বুঝি সে বুঝিতে চাহিতেছিল কোথায় সে অঙ্গহীনা।

নয়

অন্ধকার!

হাত দিয়া সে অন্ধকার স্পর্শ করা যায় বোধ হয়।

তাহার উপর অজস্র বর্ষণ, এলোমেলো বাতাস বর্ষণের শৈত্যকে অসহ, তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সে শৈত্যে ধরণী পর্যন্ত আর্ত হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া নিথর অবস্থায় পড়িয়া আছে; তাহার বুকের আবরণ-মাটি শিথিল, গলিত হইয়া গিয়াছে।

সেই বর্ষণ, বাতাস আর সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়াছে শ্রীমন্ত। উন্মত্ত যে, সেও যদি এই বর্ষণ-মুখর অন্ধকারের মধ্যে চলে, তবে দেহের যাতনায় অস্থির হইয়া উঠে।

কিন্তু শ্রীমন্ত চলিয়াছে দৃঢ়ভাবে একটা দিক লক্ষ্য করিয়া। মুখ দিয়া ঘন ঘন পড়িতেছে দ্রুত-গমন-হেতু গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস; হাতে লাঠি, মাথায় জড়ানো একখানা চাদর। কিছু দূর যায় আর একবার দাঁড়াইয়া দিক ঠিক করিয়া আবার চলে।

জলকাদায় পথে বিপথে ঘুরিয়া সে শেষে মহাদেবপুরে মধ্যরাত্রির পূর্বেই আসিয়া পৌছিল। খোঁজ করিয়া সে রামদাস ঘোষ, পাত্রের ভগ্নীপতির বাড়িতে গিয়া উঠিল।

যাক্, তখনও বিবাহ হয় নাই, শেষরাত্রে লগ্ন।

বাহিরে একটা লণ্ঠনের আলো জ্বলিতেছিল। সেই আলোয় একটা কম্বলের উপর আসর জমাইয়া বসিয়া আছে হরিলাল স্বয়ং।

শ্রীমন্ত আসিয়া হরিলালের মাথা ফাটাইয়া দিল না, সে একেবারে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। কহিল—ওস্তাদ, গৌরীর পানে তাকাও, না হয় তার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল।

হরিলালও আকস্মিক আর্তভিক্ষায় কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখে আজ হিন্দী-বাত ফুটিল না, সে কহিল—তাই ত, টাকা নিয়েছি যে—

—কত টাকা নিয়েছ? ফেরত দাও টাকা।

—সে টাকা কি আর আছে? দেনা ছিল, বডি-ওয়ারেন্ট ধরিয়েছিল, তাই—

শ্রীমন্তের মনে পড়িল, মহাজনের বাড়ি যে-চাদর সে ঘাড়ে করিয়া গিয়াছিল সে-চাদর তাহার মাথায় বাঁধা, আর তাহাতে আড়াই শত টাকা বাঁধা আছে।

সে হরিলালের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল—কত টাকা? আমি এখুনি দিচ্ছি, কত টাকা?

হরিলাল তখন ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে তখন নিজের জন্য সম্ভবমত লাভ যোগ দিয়া অঙ্ক স্থির করিতেছিল; হিসাব করিয়া নিজের জন্য গোটা ত্রিশ টাকা রাখিয়া সে কহিল—দেড় শো টাকা।

শ্রীমন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলিল—আমি দিচ্ছি, দাও ভাই, গৌরীকে আমাকে দাও, আমি দেখেশুনে ওর বিয়ে দোব, ভিক্ষে চাইছি আমি—

বলিয়া সে মাথার চাদর খুলিয়া টাকা-বাঁধা খুঁটটা বাহির করিল। টাকার ভারী খুঁটটা সশব্দে মাটির উপর পড়িল।

হরিলালের চোখ দুইটা লোলুপতায় জল্-জল্ করিয়া উঠিল, আফসোস হইল কেন সে বেশি করিয়া বলিল না। মুহূর্তে এক মতলব ভাঁজিয়া তাড়াতাড়ি সে কহিল—কিন্তু এরা? এরা আবার কি বলে দেখি?

বলিয়া সে পাত্রের অভিভাবক ভগ্নীপতি রামদাসের উদ্দেশে উঠিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই রামদাস নিজে আসিয়া শ্রীমন্তকে অভ্যর্থনা করিল।—তা বেশ, তাতে আর আমাদের আপত্তি কি? উনি নেহাৎ ধরেছিলেন তাই, নইলে ধরুন গিয়ে কন্যে আমাদের গেরামেই ঠিক রয়েছে। আজই রাত্রে আমরা বিবাহ দিতে পারব্। তা আমাদের টাকাটা আর খরচা, ধরুন গোটা পঞ্চাশেক—টাকাটা পেলেই—হেঃ—হেঃ—

বলিয়া বিনীত বিকশিত হাসি দিয়া সে শ্রীমন্তকে মুগ্ধ করিয়া দিল। নাঃ—এরা সত্যই ভদ্র-লোক! কিন্তু উপায় নাই, পাত্রটি যে কানা—অন্ধ!

শ্রীমন্ত কহিল—তাই দেব আমি, গৌরীকে নিয়ে এস, টাকা গুনে নাও।

রামদাস উঠিয়া গেল, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হরিলালের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল, হরিলালের কোলে ঘুমন্ত গৌরী। চেলী-পরা ঘুমন্ত গৌরীর মাথাটি এলাইয়া পড়িয়াছে, হরিলাল শ্রীমন্তের কোলে তাহাকে তুলিয়া দিল। শ্রীমন্ত ডাকিল—মামণি!

—উঁ।

শিশুটির ঘুমন্ত কানেও এ ডাক ব্যর্থ হইয়া ফিরিল না। গৌরী ঘুমঘোরেও মামার ডাকে সাড়া দিল, উঁ।

এমনি ঘুমঘোরে সাড়া দেওয়া তাহার অভ্যাস ছিল; প্রায়ই রাত্রে খাবার সময় গৌরী ঘুমাইয়া পড়িলে গিরি যখন ঝঙ্কার দিত, শ্রীমন্ত তখন এমনি করিয়াই তাহাকে ডাকিত—মামণি!

* *

গৌরী সাড়া দিত—উঁ।

শ্রীমন্ত তখন শুরু করিত—শোন তারপর, সেই যে সেই রাজপুত্তুর—।

হরিলাল কহিল—টাকাটা দে ছিমন্ত। এদের আবার বিয়ের যোগাড় আছে।

হাঁটু দিয়া ঘুমন্ত গৌরীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শ্রীমন্ত গনিয়া দুশো টাকা দিয়া, বাকি টাকাটা খুঁটে বাঁধিল, তারপর গৌরীকে ডাকিল—মামণি—একবার ওঠ ত মণি।

হরিলাল কহিল—হাম্‌কো ত কুচ মিলানা চাহি ভাই, গাঁজা ভাঙ পিয়েগা, দেখো, হামারা সন্তান—

শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—ভাগ্‌, চল, তুমি আমার সাথে চল, আমার বাড়িতে তোমার কায়েমী বন্দোবস্ত, যা চাই তোমার

হরিলাল কহিল—নেহি ভাই, নগদ মূল যেৎনা মিলে ওহি ভাল। আর যে রায়বাঘিনী তোর ঘরে বাবা!

মোট কথা হরিলাল ছাড়িল না, আর পাঁচটা টাকা সে আদায় করিয়া লইল।

শ্রীমন্ত টাকা দিয়া গৌরীকে বুকে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—তবে আমি চল্লাম।

রামদাস প্রবল আপত্তি তুলিয়া কহিল—সে কি হয়? না, সে হতে পারে না। এই দুর্যোগে ওই দুধের মেয়ে মরে যাবে যে। তা ছাড়া যখন আমার বাড়িতে একটা কাজ আজ; আমাদের অপর কনে ত ঠিকই আছে।

হরিলাল কহিল—জরুর মর যায়েগা; শালা—বন বন হাওয়া কন্ কন্ হাড়—ইসমে লেড়কী মর যায়েগা।

শ্রীমন্ত বিপন্ন ভাবে কহিল—তবে?

রামদাস কথাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল—অবিশ্বাস হচ্ছে কি আমাদের ওপর?

ইহার উত্তরে 'হ্যাঁ, অবিশ্বাস হইতেছে' এ কথা ত বলা যায় না। শ্রীমন্তকে কাজেই লজ্জিত ভাবে অস্বীকার করিতে হইল—না—না—তা নয়।

রামদাস কহিল—ধরুন, আমরা যদি মেয়ে না ছাড়তাম, তবে কি করতেন আপনি? আইনেও কিছু করতে পারতেন না; জোরেও কিছু করতে পারতেন না—গাঁ ত আমাদের।

—তা ত বটেই, তবে কিনা গৌরীর মামী—

হরিলাল কহিল—কাঁদবে। তা কাঁদুক, এক রজনী তোমার ছিমতী বিরহে কাঁদুক, ছিমন্ত, কাঁদুক্।

শ্রীমন্ত হাসিয়া ধমক দিয়া কহিল—ভাগ্‌, ফক্কড় কোথাকার।

রামদাস কহিল—তা উনি সে কথা বলতে পারেন বৈকি; ধরুন উনি হলেন আপনার তেনার নন্দাই। রাইএর যত রস-কথা সব হ'ল ননদের সঙ্গে; গানই আছে—ননদিনী ব-লো নাগরে। হেঁ—হেঁ—বলতে উনি পারেন বৈকি।

অগত্যা গৌরীকে পাশে শোয়াইয়া শ্রীমন্ত তাহার পাশে বসিল।

রামদাস এবার জোড় হাত করিয়া কহিল—তা হলে অনুমতি করুন একটুকুন জল-সেবা হোক। আর কাপড় একখানা ছাড়ুন।

সত্য, এ দুইটার প্রয়োজন একান্ত ভাবে শ্রীমন্ত অনুভব করিতেছিল। সারাটা দিনের ও এই অর্ধ-রাত্রির সমস্ত দুর্যোগ মাথার উপর দিয়া গিয়াছে ; তাহার উপর পরিশ্রমে—পরিশ্রম ইহাকে বলা চলে না, ইহাকে বলে শরীরের উপর অত্যাচার, দারুণ অত্যাচার—সমস্ত দেহখানা যেন লতার মত এলাইয়া এলাইয়া পড়িতেছিল। সর্বোপরি ক্ষুধার জ্বালা আর এই হিমানী-মাখানো সিক্ত বস্ত্রখানা তাহার সর্বদেহে যেন মৃত্যুর স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছিল।

শ্রীমন্ত কৃতার্থ হইয়া গেল—সে ভদ্রতা রক্ষা করিতে পযন্ত একবার 'না' করিল না, সঙ্গে সঙ্গে কহিল—আজ্ঞে বড় ভাল হয় কিন্তু।

—দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, বিলম্ব আমারই অন্যায়। বলিতে বলিতে রামদাস উঠিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হরিলালও গেল।

নীরবতা ঘনাইয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে দেহখানা ভাঙিয়া পড়ে—চোখ দুইটাও টানিয়া কে যেন জুড়িয়া দিতে চায়।

—গা তুলুন।

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখিল রামদাস, হাতে খাবারের পাত্র ; এ-কাঁধে কাপড়, ও-কাঁধে একখানা আসন।

শ্রীমন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল।

ভিজা কাপড়খানা ছাড়িতেই শুষ্ক বস্ত্রের সুখস্পর্শে সমস্ত দেহখানা যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, শুষ্কতার মধ্যে যে উষ্ণতা সঞ্চিত থাকে সেই উষ্ণতার স্পর্শে যেন দেহের রক্তধারায় প্রবাহ ধরিল ; গায়ের চামড়ার অসাড়তা ঘুচিতে লাগিল। তারপর আহার—মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়ে, দই, সন্দেশ, কয় কোষ সুমিষ্ট কাঁঠাল, তাহার উপরে সদ্যতপ্ত কয়খানা লুচি! বিলাসের আহার, সে শুধু পঞ্চরস পরীক্ষাহেতু, কিন্তু দেহ-যন্ত্রের প্রয়োজনে অন্তরাত্মা যখন চিৎকার করে, তখন সে ক্ষুধা, সে ক্ষুধার আহার সত্যকার আহার, সে আহার দেখিবার বস্তু, সে রস বাছে না, সে চায় বস্তু। সে আহারের তৃপ্তিতেই ধরণীর শস্যসৃষ্টি সার্থক, গৃহস্থের আতিথেয়তা পুণ্যযুক্ত হইয়া উঠে। বোধ করি শ্রীমন্তের সেই অন্তরাত্মার ক্ষুধা পাইয়াছিল। সে পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া যখন উঠিল তখন দেখিল কিছু গুরুভোজন হইয়া গেছে, ক্ষুধার তাড়নায় মাত্রা বজায় থাকে নাই।

রামদাস কহিল—এই ঘরে আপনি মেয়ে নিয়ে গা গড়ান, আমি একটু আগুন আনি।

শ্রীমন্ত গৌরীকে তুলিয়া কম্বলটা ঘরে পাতিয়াই তাহার উপর গড়াইয়া পড়িল। পরিশ্রমের পর পরিচর্যায় মানুষের অবসাদ আসন্ন ঘর হইয়া উঠে।

রামদাস আসিয়া হুঁকাটি আগাইয়া দিয়া কহিল—টানুন।

তারপর সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অপর হাতখানি বাহির করিয়া কহিল—দেখুন, সেবা করবেন? শরীরটা একটু গরম হবে।

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখিল গাঁজা। সে এবার বেশ সজাগ হইয়া উঠিল, রামদাস গাঁজার কলিকাটি মাটিতে বসাইয়া আধ-তৈয়ারী গাঁজাটা শ্রীমন্তের হাতে দিয়া টিকা ধরাইতে বসিল।

শ্রীমন্ত এবার ভক্তিমন্ত হইয়া উঠিল; এই জিনিসটুকুর সত্যই তাহার পরম প্রয়োজন ছিল।

কলিকায় গাঁজা চড়াইয়া শ্রীমন্ত রামদাসের দিকে আগাইয়া দিতেই সে জোড়হাত করিয়া কহিল—মার্জনা করবেন, আমি ও পান করি না। আপনি সেবা করুন।

শ্রীমন্তের চোখ দুইটা বিস্ময়ে বড় হইয়া উঠিল, সে কহিল—তবে!

রামদাস হাত কচলাইতে কচলাইতে পরম বৈষ্ণব বিনয় সহকারে কহিল—আজ্ঞে ওস্তাদের মুখে শুনলাম কিনা যে নিয়মিত পান আপনার অভ্যাস—তাই।

শ্রীমন্ত কলিকাটায় টান মারিতে মারিতে ভাবিতেছিল, সত্যই রীতিমত ভক্তির পাত্র রামদাস, প্রায় দাতাকর্ণের সমতুল্য!

রামদাস কহিল—ওস্তাদ আপনার একবার আমাদের হয়েই ওপাড়া গেলেন সেই কন্যাটির বাড়ি। বেশ বক্তা লোক। ধরুন এই রাতেই ত বিয়ে ঠিক করতে হবে।

শ্রীমন্ত একটা পুরা দম লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত ঢুলিতে ঢুলিতে রহিয়া রহিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

রামদাস হাসিয়া কহিল—ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস—তাই হয়েছে আমার; নইলে দেব-দুর্লভ দ্রব্য।

শ্রীমন্তের আনন্দটা বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সে পরম আনন্দে গান ধরিয়া দিল—হুঁ—হুঁ দেবদুর্লভ—সত্যিই দেবদুর্লভ, শিব-বন্দনার গানে আছে—

ও গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস,
গাঁজা খেয়ে পাগ্‌লা ভোলা কালিমায়ের বশ।

পুনরায় সে একটা প্রাণ ভরিয়া দম দিল। অতঃপর রামদাস কি বলিয়া যায়, সে কথাগুলা আর তাহার কানে ভাল যায় না। দেহের অবসাদও যেন বড় আসন্ন হইয়া উঠে? সে চোখ মুদিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একহাতে বিছানা হাতড়াইতে লাগিল আর আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া কহিল—গৌরী, গৌরী, বালিশটা দে ত মা, বা-বালিশ।

রামদাস হাঁ হাঁ করিয়া ঠোঁটে তালুতে আক্ষেপের চুক্ চুক্ করিয়া শ্রীমন্তকে সজাগ করিয়া কহে—আহা—জিনিসটা মাটি হ'ল, আছে আছে আরও একটান দিব্যি হবে।

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া কলিকাটা বাড়াইয়া ধরিয়া টান দিতে দিতে কহিল—এসা বিয়ে এবার দোব গৌরী-মার—সেই গৌরী বেটি কনে, শিবে বেটা বর, ঝুম কড়া কুড়—বাক্যটা মুখেই রহিয়া গেল, শ্রীমন্ত কলিকা হাতেই ঘরের মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

রামদাস কয়েক মুহূর্ত পরে ঈষৎ হাসিয়া গাঁজার কলিকার আগুন সাবধান করিয়া, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। হরিলাল পাশ হইতে বাঁকা বকের মত গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ফেলাট হো গিয়া?

রামদাস কহিল—হবে না? দুটি ইয়া বড় সুপক ধুতুরার বীজ মিশ্রিত করে দিয়েছি।

কাল সূর্যাস্তর পূর্বে বোধ হয় আর চৈতন্য –বলিয়া বেশ মৃদু গম্ভীর ভাবে 'না'র ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া কথা শেষ করিল।

হরিলাল কহিল—এইবার তা হ'লে মেয়েটাকে—

রামদাস বলিল—হঁ্যা।

* * *

শেষ রাত্রে একটা প্রবল গর্জনে শ্রীমন্ত চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিমঝিম করিতেছিল। বাহিরের বর্ষণ-শব্দ, বাতাসের হু হু রব কানের মধ্যে আসিতেছে, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে সে শব্দের অনুভূতি যেন তন্দ্রা-ঘোরে ;—তন্দ্রাটা আবার ধীরে ধীরে গভীর হইয়া আসে, সে পাশ ফিরিয়া আরাম করিয়া শুইল।

সহসা বর্ষণ-বাতাসের শব্দ চিরিয়া একটা উচ্চ সুডৌল তীক্ষ্ন শব্দ ভাসিয়া উঠিল। শঙ্খধ্বনি! আবার!

সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের হুলুধ্বনি। সমবেত শব্দে আচ্ছন্ন শ্রীমন্তের মস্তিষ্ক সজাগ হইয়া উঠিল। তাহার এবার সব মনে পড়িয়া গেল ; ওঃ, এদের বিবাহ তাহা হইলে হইতেছে। সে তাড়াতাড়ি গৌরীকে কোলের কাছে টানিয়া লইতে হাত বাড়াইল, হাত পড়িল মাটিতে ; এ-পাশ, ও- পাশ, সকল পাশই খালি, গৌরী নাই!

মুহূর্তে একটা সন্দেহ তাহার অবসাদ-আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের মত চিড় খাইয়া জাগিয়া উঠে, সে-বিদ্যুতের আগুনে, তাহার মস্তিষ্কের উপর আচ্ছন্নতার যে একখানি আবরণ ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। সে লাফ দিয়া উঠিয়া গিয়া দরজাটা সবলে টানিল ; বাহির হইতে দরজা বন্ধ!

নির্মম নিষ্ঠুর বঞ্চনার ক্ষোভে মানুষের বুকে জাগে উন্মত্ত প্রতিহিংসা, সে-প্রতিহিংসায় মানুষের ভিতরের সকল শিক্ষা-সভ্যতার আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া পশুত্ব যে দুর্নিবার ক্রোধে ও উন্মত্ত আত্ম-হারা-শক্তিতে জাগিয়া উঠে, সে ক্রোধের মুখে সমস্ত দুনিয়া, এমন কি নিজের জীবনের উপরে পর্যন্ত মানুষের মমতা থাকে না। তখনকার শক্তি মানুষের বিস্ময়ের বস্তু।

সেই ক্রোধ, সেই শক্তি তখন শ্রীমন্তের পাথরের মত দেহে ক্রিয়া করিতেছিল। তাহার কাছে ঐ পল্‌কা দরজা জোড়াটা কতক্ষণ! বিপুল শক্তিতে চাড় খাইয়া দরজাটা শিকলের গোড়ায় ফাটিয়া গেল, আর এক আকর্ষণে দরজাখানা দুভাগ হইয়া গেল ; শিকলটাও খসিয়া গেল।

লাঠি-গাছটা কুড়াইয়া শ্রীমন্ত চলিল ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া—দ্রুত দৃঢ়, অথচ নিঃশব্দ পদক্ষেপে।

এক পাশে একটা আলোকের ধারা দেখা যাইতেছিল, শব্দগুলাও ঠিক ঐ দিকে ; শ্রীমন্ত দেখিল সেইটাই বাড়ির ভিতরের বাহির দরজা। সেখান হইতে সমস্তই দেখা যাইতেছে।

সম্মুখের উঠানের উপর ঘরের বারান্দায় বিবাহের মণ্ডপ ; ওপাশে বসিয়া বর, সম্মুখের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, কালো কদাকার চেহারা—কি বীভৎস! চক্ষুদুটির চিহ্ন পর্যন্ত নাই, আছে শুধু জলসিক্ত দুটি পঙ্কিল গহ্বর, তাহাতে অনর্গল মৃদু জলধারা

গড়াইতেছে। ঐ যে তাহারই পাশে বসিয়া লাল-চেলীতে মোড়া ঘুমন্ত গৌরী, তাহার ছোট হাতখানি ওই অন্ধের হাতের উপর ধরিয়া আছে হরিলাল। শীর্ণ ক্রূর মুখে তাহার হাসির রেখা, বোধ হয় ওপাশের কুটুম্বগণের সঙ্গে পরিহাস চলিতেছে।

শ্রীমন্তের স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল একটা অদ্ভুত শব্দ, রোষ ও রোদনে জড়িত একটা অভিব্যক্তি, ঠিক যেন আঘাতে মরণোন্মুখ দুর্দান্ত পশুর ক্রোধ ও যাতনার গর্জন!

ঐ শব্দে হরিলাল চমকিয়া কন্যার হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; অভিপ্রায় ছিল পলাইবার।

কিন্তু সম্মুখেই তখন শ্রীমন্ত ; সে তখন হাতের লাঠি দারুণ ক্রোধে হরিলালের মাথায় বসাইয়া দিল।

চারিদিক হইতে একটা কলরোল উঠিল···

শ্রীমন্ত তখন আবার লাঠি উঠাইয়াছে ওই কদাকার চক্ষুহীন নিরীহ জীবনটির উপর ; গৌরী সে কলরোলে জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল—মামা গো!

আর ঐ কদাকার চক্ষুহীন ছেলেটি চঞ্চল অবস্থায় অসহায়ের মত দৃষ্টিহীন চক্ষু লইয়া চারিদিকে চাহিল।

শ্রীমন্তের হাতের লাঠি অবশ হইয়া গেল, তাহার বড় করুণা হইল, হায় ঐ অসহায় জীবনটিরই কি দোষ!

* * *

গিরি সেই দাওয়াতেই বসিয়া ছিল।

সকল ভাবনা তাহার ডুবিয়া গিয়াছে! সে ভাবিতেছিল শুধু, তাহার যাহা আছে তাহাও কি যাইবে? ওই দুর্দান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটিকে তাহার চেয়ে ত কেউ বেশি চেনে না ; সে ত জানে ঐ লোকটির কি শক্তি! তাহারই প্রাণের আবরণে না হয় সে দুর্দান্ত শান্ত হইয়া আছে; কিন্তু আজ যখন তাহার হাত ছাড়াইয়া, তাহার মমতার সকল আবরণ ছিন্ন করিয়া উন্মত্তের মত সে ছুটিয়াছে, তখন যে সে কি করিয়া ঘরে ফিরিবে, সে ত গিরির চোখের উপরেই ভাসিতেছে। তাহার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল—হয় খুন করিয়া ফিরিবে,—নয় খুন হইয়া থাকিবে, রক্তাক্ত শ্রীমন্ত তাহার চোখের উপর বিভীষিকার মত নাচিতেছিল।

ভোরের আলো তখন ফুটি-ফুটি করিতেছে।

গিরির সারা রজনীর জাগ্রত স্বপ্ন বাস্তব হইয়া ঘরে ফিরিল। রক্তাক্ত দেহে শ্রীমন্ত লাঠি-গাছটা ফেলিয়া দিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া কহিল—খুন করেছি চণ্ডালকে।

গিরির মুখে বাক্য সরিল না, কপালে করাঘাত করিতে তাহার হাত উঠিল না, তাহার কণ্ঠ হইয়া গেছে মূক, অঙ্গ হইয়া গেছে অসাড়, মাটির মূর্তির মত বসিয়া সে ভাবিতেছিল একটি কথা —তারপর!

শ্রীমন্ত কথা কহিয়া যাইতেছিল, এবার তাহার কণ্ঠ ভাঙিয়া গেল, চোখে জল, সোনার প্রতিমাকে আমার মরণের হাতে তুলে দিলে গিরি, দেখনি তুমি, সে পাত্র ত নয় যেন জ্যান্ত

মরণ। সব অন্ধকার তার।

আবার ক্ষণেক পরে আক্রোশ-ভরা কণ্ঠে কহিল—মেয়ে বেচে টাকা নেওয়ার সাধ তার মিটিয়ে দিয়ে এসেছি।

এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সকরুণ তিরস্কারের সুরে গিরি কহিল—তারপর?

এখনও তারপরের ভাবনা শ্রীমন্তের মনে জাগে নাই, সে কহিল—তারপর আবার কি? যেমন কর্ম তেমনি ফল—

গিরি কহিল—সে ফল ত তুমি ভোগ করবে ফাঁসিকাঠে, আর আমি—

সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত গুম হইয়া গেল, এতক্ষণ পরে তারপরের ভাবনাটা বুঝি সে ভাবিতে বসিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গিরি উঠিয়া কাপড়, গামছা, ঘটিতে জল লইয়া কাছে দাঁড়াইয়া কহিল—নাও, হাত মুখ ধোও, কাপড় ছাড়।

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ধুই, ছাড়ি। শিথিল হস্তে গিরির হাত হইতে ঘটিটা লইতে লইতে শ্রীমন্ত কহিল—আচ্ছা ওই কানার হাতেই যদি পড়বে, তখন ভগবান আমার গৌরী-মাকে এমন সুন্দর ক'রে কেন গড়েছিল বল দেখি? বলিয়া সে গিরির মুখের পানে চাহিল।

গিরি রুদ্ধ কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—বলো না, বলো না, তার নাম আমার কাছে করো না, তার বিচার নাই, বিচার নাই। হয়ত বা সে নিজেই নাই।

গিরির ভোরের আশঙ্কা সফল হইল।

বৈকালের দিকে থানাপুলিসে ঘর ভরিয়া গেল। সঙ্গে রামদাস, আর মাথায় ফেটি-বাঁধা হরিলাল।

শ্রীমন্তের হাতে দড়ি পড়িল, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 'হত্যার চেষ্টা', কন্যা রাহাজানির চেষ্টা, চুরি, আরও তিন-চারিটা, ফৌজদারী ধারার আর শেষ হয় না। অভিযোগের ফিরিস্তি শুনিয়া শ্রীমন্ত অবাক হইয়া উপরের পানে চাহিল। অনন্ত শূন্যতায় ভরা আকাশ, কিন্তু ঐখানেই মানুষের প্রাণ-ঢালা অহেতুক বিশ্বাস। দুঃখে ঐখানে চোখ রাখিয়া সে বেদনা জানায়, আশ্বাস চায়, মর্মভেদী শোকে ঐ আকাশপানে উদাস মনে চাহিয়া সান্ত্বনা চায়, সবলের অত্যাচারে দুর্বল ঐ আকাশপানে চাহিয়া প্রতীকার চায়, ভক্তি জানায়, মার্জনা চায়, কিছু পায় কি না কে জানে, কিন্তু মানুষ চিরদিন ঐ শূন্যতার মাঝে পূর্ণ কাহাকেও খোঁজে, আজও খোঁজে, বিশ্বাসীও খোঁজে, অবিশ্বাসীও দুর্বল মুহূর্তে ওই আকাশপানেই চায়।

হরিলাল ফেটা-বাঁধা মাথাটাই দোলাইয়া কহিল—কেয়া চাঁদ, ঘুঘু দেখা হায়, লেকিন ফাঁদ দেখা নেই; আব দেখো ফাঁদ সোনার চাঁদ।

গিরি কিন্তু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, হরিলাল মরে নাই।

দশ

তারপর নবযুগের ন্যায়পর্ব বা মামলা অধ্যায়।

এই পর্বে উচ্ছ্বাস নাই, হাস্য-পরিহাস নাই, আছে শুধু হিমশীতল মস্তিষ্কের কূট কৌশল, চিন্তাকুল দৃষ্টি, আর একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। আর আছে ন্যায়প্রার্থীর একটা উদ্বেগপূর্ণ উত্তেজনা, পরাজয়ে হ্রাস পায় না, জয়ে আশা মেটে না। আর দেখা যায় এখানে অর্থের শক্তি, বোঝা যায় বাক্য ব্রহ্ম—সে সত্যই হৌক, আর মিথ্যাই হৌক, সুসংলগ্ন দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিলেই এ পর্বে জয়। শ্রীমন্ত মোক্তারের বাক্যের শক্তিতে তখনকার মত জামিনে খালাস হইয়া ফিরিল।

তারপর দিনের পর দিন পড়ে, সদরে উকীল মোক্তারের ঘটা বাড়ে, আর বাড়িতে ঘড় ঘটি তৈজসপত্র, গিরির গায়ের রূপা, কাঁসা, পিতল একে একে নিঃশেষ হইয়া যায়।

দিনের পর দিন শ্রীমন্ত বাড়ি ফিরিয়া আসে—একটা উদ্বেগপূর্ণ উত্তেজনা লইয়া। মামলায় জয় অনিবার্য, তবে খরচ করা চাই, আর সাক্ষী তৈয়ারী করা চাই; উকীল বলিয়াছে—এ নাকি ন্যায়ের বিধানে লেখা আছে। হায় রে ন্যায়! শ্রীমন্ত ওই কথা ভাবে, ওই সে স্বপ্ন দেখে, তাহার কথার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ওই বস্তুটুকুই আত্মপ্রকাশ করে।

উদ্বিগ্না গিরি হাত পা ধুইবার জল দিয়া সেদিন জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল আজ?

— দিন পড়ল, ফের পনর দিন পর।

—আবার দিন পড়ল। উদ্বেগে গিরি মরিয়া যাইতেছিল। তার ত ভবিষ্যৎ নাই, বর্তমানও বুঝি অতলে তলাইয়া যায়।

শ্রীমন্ত কহিল -আর এ কি ভাতের গেরাস, যে মুখে তুললেই হয়ে গেল, ব্যস্। একটা একটা কথা ধরে এর জেরা কত, তকরার কত? আজ শালাদের সাক্ষী একটাকে, বুঝেছ, যা নাজেহাল করেছে উকীল—হা, হা, হা, বেটা কিন্তু সত্যি কথা বলেছিল। আমি তাকে শুধিয়েছিলাম রামদাস ঘোষের বাড়িটা কোথা হে, শুধান আমার বটে। আমার উকীল ধরলে টুঁটি চেপে— তুমি নেশা কর? বেটার দুর্মতি, বেটা বলে—না। অঃ- আমার উকীলের চোখ কি খর, বললে—দেখি তোমার হাত, হাঁ হাঁ বাঁ হাত, ব্যস হাত পাততেই যায় কোথা, হাতের তেলো হলদে! অমনি ধরে শুঁকে বললে এঃ, এখনো গাঁজার গন্ধ বেরুচ্ছে, আর তুমি বলছ, না! দেখুন হুজুর, দেখুন! আর বুঝলে কিনা কোর্টসুদ্ধ একেবারে কে কার গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাকিম মুখে রুমাল দিয়ে হাসে।

গিরির বোধ করি ভাল লাগে না, সে বুঝিতে পারে না ঐ ব্যক্তিটির গাঁজা খাওয়ার জন্য স্বামীর অপরাধ লঘু লইল কেমন করিয়া, সে কহে—ভাত দিই খাও।

পা মুছিতে মুছিতে শ্রীমন্ত বলে—দাও।

খাইতে খাইতে শ্রীমন্ত আপন মনেই কহিল—কিচ্ছু হবে না, মামলায় কিছু নাই। আর ওদের সাক্ষীগুলো সব গোবর গুলছে। আর এক বেটাকে, বুঝেছ—সে বেটা আমার সেই চাদরখানা, যেখানা ফেলে এসেছিলাম—সেইখানা দেখে বললে, হ্যাঁ এই চাদর গায়ে দিয়ে

আসামী ঘোষের বাড়ি এসেছিল, আমি দেখেছিলাম, আমার উকীল উঠেই তাকে ধরলে—তুমি কি খোঁড়া ?

—আজ্ঞে না—

—তবে তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন ?

—আজ্ঞে পা কেটেছে।

—কিসে, জুতোতে বুঝি ?

সে আর কথা কয় না, উকীলও ছাড়ে না, জেরা করলে, নতুন জুতায় পা কেটেছে বুঝি ?

সে কথা কয় না, তখন উকীল কসে এক ধমক, তখন বললে—হ্যাঁ, আজই নতুন কিনেছি আমি।

উকীল বললে—হরিলাল দিয়েছে, না রাম ঘোষ ?

লোকটা যা হোক চালাক, বললে —আমার শ্বশুর দিয়েছে।

যাক্, শেষটায় লোকটা সেরে নিয়েছে।

গিরির একটা ঘৃণা ধরিয়া যায়, ইহার কোথায় কৌতুক, আস্ফালনের ইহাতে কি আছে তাহার সরল নারী-মন খুঁজিয়া পায় না। ইহাই ত শুধু নয়, ইহার পর আরও আছে অর্থের ব্যবস্থা। সম্বল ত আর কিছু নাই, শ্রী-গিরি বাকুড়ি বিকাইয়া গেছে, মহাজন সমগ্র জমিতে ক্রোক গাড়িয়া বসিয়া আছে, ঘরের তৈজস গেছে। আছে পরের অনুগ্রহের উপর ধার বা দান। তাও লোক দেয় না; আর আছে বঞ্চনা করিয়া লওয়া বা লইয়া বঞ্চনা করা। সাদা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে যাহা চুরি বা পরস্ব আত্মসাতের প্রবৃত্তি।

ওটা বোধ করি দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের মনে থাকে; নতুবা মানুষের আশা মেটে না কেন ? মানুষ ত বোঝে, অপরের না লইয়া তাহার ভাগ মোটা হইবে না, তবু লালসা তাহার বাড়িয়া চলিয়াছে কেন ? এই লালসাই চুরিই বল আর পরস্ব আত্মসাৎই বল, সমস্ত প্রবৃত্তিগুলার উপাদান! লালসা যাহার আছে, ঐ ইচ্ছাও তাহার আছে। তবে শিক্ষায়, সংযমে, সচ্ছলতায় মানুষ তাহার উপর একটা কঠিন আবরণ রচনা করিয়া ও-গুলাকে সমাধিস্থ করিয়া রাখে। কিন্তু লালসার সঙ্গে ক্ষুধার আগুন যেদিন প্রচণ্ডরূপে জ্বলিতে আরম্ভ করে, সেদিন অধিকাংশ লোকেরই সে অগ্নিশিখার ঐ আবরণ একদিক হইতে ছাই হইতে থাকে আর প্রবৃত্তিও ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে। তাই অভাবে স্বভাব নষ্ট, তাই দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

তাহার উপর পূর্ব-পুরুষের প্রকৃতির ধারা নাকি রক্তের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। শ্রীমন্তের বাপের এ প্রবৃত্তি ছিল, হরিলালের গুরুগিরিতে ছেলেকে দিয়াছিল এ বিদ্যা খানিকটা শিখিতে, এই প্রবৃত্তিরই তাড়নায় তখন শ্রীমন্ত যাহা পারে নাই, পারিল আজ, চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিয়া দুনিয়া তাহাকে এ বিদ্যা বেশ ভাল করিয়াই শিখাইল, চর্চায় চর্চায় কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রীমন্ত বাপ গুরুর উপরে চলিতে শুরু করিল।

কিন্তু প্রথম যেদিন সে প্রতিশ্রুতি দিয়া বঞ্চনা করিয়া আসে, সে দিন সে সত্যকার হাসিমুখে

পারে নাই। তবু ঠোঁটে হাসি মাখিতে হইয়াছিল। কেমন করিয়া যে সে হাসি আসিয়াছিল তাও সে জানে না, আর কেমন যে সে হাসির রূপ তাও সে কল্পনা করিতে পারে না।

বিপিন শ্রীমন্তের প্রতিবেশী, বাল্যসাথী, একসঙ্গে হরিলালের আড্ডায় গাঁজা খাইতে শিখিয়াছিল। মামলার দিন শ্রীমন্ত তাহাকে গিয়া ধরিল—

বিপিনদাদা, আজ ভাই আমাকে রাখতেই হবে, দশটি টাকা আজ দিতেই হবে।

বিপিন কহিল—তাই ত শ্রীমন্ত, আমার কাছে ত নাই।

শ্রীমন্ত বিপিনের পা দুইটা ধরিয়া বলিল—দোহাই দাদা!

ভগবানের কৃপায় বিপিনের সচ্ছলতা ছিল বেশ, লোকটাও ছিল মন্দ নয়, সে বাল্যসাথীর এই পায়ে ধরা উপেক্ষা করিতে পারিল না, দশটা টাকা সে শ্রীমন্তের হাতে দিয়া কহিল - দেখিস ভাই।

শ্রীমন্ত তাহাকে কথা কহিতে দিল না, তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্বেই, তাহার সকৃতজ্ঞ বক্তৃতায় বিপিনের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। আপনি কোথা হইতে কথা আসিয়া জুটিয়া গেল জিহ্বায়—দেখো তুমি দাদা, এই দিন চার-পাঁচ, পাঁচদিনের বেশি হয়ত তুমি আমাকে বলো, আর এক মাঘে শীত পালায় না দাদা। না দিই ত জুতো মেরো তুমি রাস্তায় ধরে, বলো তোর জাতের ঠিক নাই।

প্রতিশ্রুতি পালন করিবার অভিপ্রায়ও তাহার ছিল। কিন্তু গরীবের ইচ্ছায় সংসার চলে না, পাঁচ দিনের দিন বহু চেষ্টাতেও কোথাও কিছু মিলিল না।

সে সন্ধ্যায় বিপিন আর আসিল না, শ্রীমন্ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরদিন ভোরে শ্রীমন্তের মাঠ হইতে বাড়ি ফিরিতে বিপিনের সহিত দেখা হইয়া গেল। লজ্জিত শ্রীমন্ত অতি-লজ্জা পাইবার আশঙ্কায় বিপিন কিছু বলিবার পূর্বেই আবার মিথ্যা কথা কহিয়া বলিল- এই যে দাদা, কাল ফিরতে বড় রাত হয়ে গেল—হেঁঃ - হেঁঃ বলিয়া দাঁত মেলিয়া দিল।

হাসির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘামিতেছিল।

বিপিন ভদ্রতা করিয়া কহিল তা বেশ, তা বেশ।

কয় পা আসিয়া তবে শ্রীমন্তের বুকের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিল। সেদিনও বিপিন আর আসিল না; পরদিন সন্ধ্যায় বিপিন নিজে আসিয়া শ্রীমন্তের দরজায় হাঁক দিল —শ্রীমন্ত —শ্রীমন্ত! শ্রীমন্ত ঘরের মাঝে লুকাইয়া বসিয়া রহিল, সাড়া দিল না।

গিরি কহিল—সাড়া দাও না—

শ্রীমন্তের মাথার বোধ করি ঠিক ছিল না, সে ঝাঁজিয়া উঠিল— টাকা দিবি তুই? সাড়া দাও না, এঁ্যা!

গিরি ব্যথিত বিস্ময়ে স্বামীর পানে তাকাইয়া দেখিল।

অন্ধকারে গৃহকোণে বসিয়া শ্রীমন্ত কি ভাবিতেছিল কে জানে! কিন্তু চোখ দুইটা অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জল্ জল্ করিতেছিল, বোধ হয় তীব্র দৃষ্টি হানিয়া ধরণীর বক্ষ ভেদিয়া সে খুঁজিতেছিল, কোথায় ধন-রত্ন লুকানো আছে! আঃ, কাল যদি সে মাটি খুঁড়িয়া টাকা পায়—

লাখ লাখ টাকা—রাশি, রাশি ধন, আঃ! দরিদ্রের বুভুক্ষা এমনি উদগ্র আর এমনি অক্ষয়ই বটে!

এগারো

ইহার পর হইতে সে বিপিনকে এড়াইয়া চলিতে শুরু করিল, শুধু বিপিনকেই কেন, গ্রামের প্রায় সকলকেই এড়াইয়া চলিতে হইল।

কারণ, প্রবৃত্তির মুখের সংযম বা সঙ্কোচের বাঁধ একবার ভাঙিলে ত আর রক্ষা নাই, মানুষ তখন আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। শ্রীমন্ত একে একে সকলের কাছে এমনি করিয়া হাত পাতিল, কাহারও কাছে দুটো টাকা, একটা টাকা, কাহারও কাছে বা একটা সিকি, পাঁচ সের চাল—এমনি করিয়া ক্ষুদ্রতারও আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

গিরির লাঞ্ছনারও অন্ত নাই। শ্রীমন্ত ত বাড়ি হইতে পলাইয়া বাঁচে, কিন্তু বন্দিনী নারী ঘরে বসিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাগাদার কটু বাণী নীরবে সহিয়া যায়, আবার শূন্য হস্তে পরের দুয়ারে দুই মুঠা চালের জন্য যাইতে হয়। অন্তরের দাহ অন্তরে লুকাইয়া কপট তোষা-মোদের হাসি মুখে মাখিয়া গিরি যখন পরের কাছে হাত পাতে তখন ভাবে, হায়, এত অপমান সে সয় কি করিয়া? সে যেমন হইয়াছে, সত্যই কি মানুষ এমন হইতে পারে?

শুধু তাহার সান্ত্বনা মেলে যখন সে মনোমন্দিরে আপনার একান্ত কামনার শিশু-দেবতাটিকে অর্চনা করে। এখনও সে আশা ছাড়ে নাই, এখনও তাহার আশা, তাহার সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া বুক জুড়িয়া সে আসিবে, সেই তাহার ভবিষ্যতের ভরসা—সেই তাহার দুঃখ ঘুচাইবে—আত্ম-ভোলা নির্জন মুহূর্তে আশা-বিভোরা নারীকণ্ঠ গুন গুন করিয়া গুঞ্জন করিয়া উঠে—

এই যে আমার ভাঙা বাড়ি, এই আ-গাছার বন,
আমার সোনার যাদু এসে হেথা রচবে সিংহাসন।

আত্মস্থ হইয়া যদি কখনও এ গান তাহার নিজের কানেই প্রবেশ করিত, তবে হয়ত নিজেই সে বিদ্রূপের হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারিত না।

এমন করিয়াই দিন যায়!

শ্রীমন্ত খাবার সময় চুপি চুপি আসিয়া ঢুকে, খাইয়া-দাইয়া আবার সরিয়া পড়ে, সে আড্ডা গাড়িয়াছে গিয়া বাগ্দীপাড়ায়।

দারিদ্র্যের লজ্জায় সমাজ-বিচ্যুতের মত সে ওদের দলে গিয়া ভিড়িল। এই মানুষগুলিকে শ্রীমন্তের লাগিয়াছিলও ভাল—ওরা লজ্জা দেয় না লজ্জা পায় না, ধার লওয়াই ওদের স্বভাব, শোধ দেওয়ার অভ্যাস নাই, সেটাও স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তুমি পাইবে পাইবে—তাহার জন্য গালি দাও সে সহ্য করিবার শক্তি ওদের আছে। শুধু সহ্য করা নয়, হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারে, নির্যাতন—তাও সহ্য করিতে পারে। শ্রীমন্তের মনে হইত এরাই সত্য দারিদ্র্যকে ভালবাসে। সে ইহাদের মধ্যে গিয়া ইহাদের পানে চাহিয়া থাকিত, অন্তরে অন্তরে কিন্তু সে

দারিদ্র্যকে ঘৃণাই করিত। সে দারিদ্র্যকে ভালবাসিতে পারে নাই—সে ভাবিত ইহারাও যদি তাহার মত দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিত, তবে সে ইহাদের রাজা হইয়া বসিয়া থাকিত।

সেদিন শ্রীমন্ত খাইবার জন্য সবে চুপে চুপে গিয়া বাড়িতে পা দিয়াছে, এমন সময় এ দুয়ার হইতে বিপিন হাঁকিল—শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্তের অঙ্গ হিম হইয়া গেল, ঘরের দুয়ারে তালা বন্ধ, ঘরে ঢুকিয়া যে খিল দিবে তাহার উপায় নাই, সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার গিরির উপর, সে থাকিলে ত এ অবস্থায় তাহাকে পড়িতে হইত না!

রোজ রোজ তাহার ষষ্ঠীতলা যাওয়া আজ ঘুচাইতে হইবে; ছেলের অভাবে ত রাজ্যপাট ভাসিয়া গেল—তাই রাজকুমারের কামনায় রাণীর ষষ্ঠীতলায় পূজা—গলায় বোঝাখানেক মাদুলি—

কথাটার মধ্যে আবার একটি স্বপ্ন-কল্পনার খেলা ছিল।

পূজার সামর্থ্য গিরির ছিল না, রাস্তায় বাহির হইবার মত প্রকৃতি বা সাহসও ছিল না, সে মনোমন্দিরেই শিশু-দেবতার অর্চনা করিত আর ওই গলায় ধারণ-করা মাদুলিগুলির ধোয়া জল খাইয়াই ব্রত পালন করিত।

কিন্তু নারী-বক্ষে যে উগ্র গোপন ক্ষুধা অহরহঃ জাগে, সারা মস্তিষ্কে সে ক্ষুধাতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিত্য কত আকাশ-কুসুম রচনা করে। সে কখন তন্দ্রাঘোরে বঞ্চিতা নারীটির সহিত পরিহাস করিয়া গিয়াছিল।

সেদিন গিরি স্বপ্ন দেখিয়াছে যে, সে ষষ্ঠীতলায় পূজা করিতে গিয়াছে, কোথা হইতে একটি দামাল শিশু, মুখে অজস্র লালা গড়াইয়াছে, গায়ে ধূলা—হামা দিয়া আসিয়া ওর আঁচল ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল—মা—ম্—মা—ম্। গিরি ব্যাকুল আগ্রহে হাত পাতিয়া তাহাকে ডাকিল।

ছেলেটির সে কি খল্‌খল্ হাসি! খল্‌খল্ হাসিয়া সেও বাহু বাড়াইয়া গিরির বুকে ধরা দিল। তাহাকে বুকে ধরিতেই গিরির বুক যেন জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙিয়া গিরি দেখে শূন্য শয্যায় সে মাথার বালিশটিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

সেই অবধি সে নিত্য ষষ্ঠীতলায় যায়। নিজের হাতে পোঁতা রক্তকরবী গাছটির ফুল, কাজল-দীঘির একটু জল, দুটিখানি আতপ চাল—তার উপর এক ফোঁটা গুড়—এই হইল পূজার সামগ্রী। চাল কয়টি সে বামুনবাড়িতে সংগ্রহ করিয়াছে; পোয়াখানেক আতপচাল, তাহাতেই আজও চলিয়াছে, আর খানিকটা গুড়—তাও ভিক্ষালব্ধ।

গিরি সেই ষষ্ঠীতলায় গিয়াছিল।

কিন্তু উত্তর না পাইয়া বিপিন আজ ফিরিয়া গেল না, সে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্তকে দেখিয়া ফেলিল, কহিল—এই যে, আচ্ছা জুয়াচোর ত রে তুই শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত উত্তর দিতে পারিল না। আর কি-ই বা উত্তর দিবে?

বিপিনের জিহ্বা দিয়া যে কটু বিষ ঝরিল, বিষধরেরও বোধ করি তত বিষ সঞ্চিত থাকে না।

সে কহিল—কথা ক'স না যে ?

শ্রীমন্তের নীরব সহিষ্ণুতাও তাহার সহ্য হইতেছিল না।

শ্রীমন্ত অতি কষ্টে কহিল—কি আর বল্‌ব দাদা—

—টাকা দিবি কিনা ?

—দেব।

—দে, তবে দে, এখুনি দে।

—এখুনি কোথায় পাব ?

বিপিন কহিল—কোথায় পাবি তা আমি কি জানি রে শালা—ঘটি বাটি বেচ্‌, না থাকে পরিবার বাঁধা দে—

এক মুহূর্তে শ্রীমন্তের অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়া গেল। মানুষ একেবারে মরিয়া যায় না। ইজ্জতের উপর ঘা পড়িলে মানুষের তা সয় না—এখানে সে মরীয়া হইয়া উঠে, এটা পশুরও আছে—শ্রীমন্ত ত মানুষ! নত মাথাটা শ্রীমন্তের খাড়া হইয়া উঠিল, দেহের শক্তির দম্ভে যে হাঁক সে দিল তাহাতেই বিপিনের হইয়া গেল! শ্রীমন্তের দেহের শক্তির কথাও তাহার না-জানা নয়। তাহার পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ চোখ কেমন হইয়া গেল। বেচারী এক পা এক পা করিয়া পিছাইয়া কোনক্রমে শ্রীমন্তের দরজাটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়াই আপন ঘরমুখে দৌড় মারিল। আপন বাড়ির দুয়ারে গিয়া তবে সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, শ্রীমন্ত কত দূরে!

সেইখানেই দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কি কতকগুলা বলিয়া তবে সে ঘরে ঢুকিল।

শ্রীমন্তের আজ আর হাসি আসিল না—ক্রোধে সে ফুলিতেছিল। কিন্তু তবুও মনটা কেমন করিতেছিল। সামান্য খানিকটা অস্বস্তি—বিপিন যদি আবার নালিশ করে। বসিয়া থাকিতে থাকিতেই আবার একটা পরিবর্তন দরিদ্রের মনে ঘটিয়া যায়। শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে বিপিনের দুয়ারে গিয়া উঠিল, সেই নত ভঙ্গী, বিনীত ভাব। যে শৃঙ্খলিত একটা পশু আত্মবিস্মৃত হইয়া মুহূর্তের জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শৃঙ্খলের নির্মম নিষ্পেষণে স্নায়ু, তন্ত্রী, অস্থি, চর্ম, মাংস টন্ টন্ করিয়া উঠায় দারুণ যাতনায় কুণ্ডলী পাকাইয়া আবার পদলেহন করিতে জিভ বাহির করিয়া হা হা করিতেছে।

বিপিনের দুয়ারে গিয়া বিনীত কণ্ঠে সে হাঁকিল—বিপিনদাদা, বিপিনদাদা—

বিপিন বন্ধ ঘরের খোলা জানালাটা দিয়া শাসাইল—কাল ফৌজদারীতে নালিশ কবব আমি, চিটিং কেস—

শ্রীমন্ত কাকুতিতে কদর্য তোষামোদের হাসি হাসিয়া কহিল—রাগ করো না দাদা, তুমি রাগ করলে, পায়ে ধরচি দাদা।

বিপিন চুপ করিয়া থাকে, মুহূর্ত-পূর্বের দুর্দান্ত শত্রুর পদলেহন মন্দ ঠেকে না, বেশ মুখরোচকই বোধ হয়।

বিপিনের নীরবতায় শ্রীমন্ত সাহস পাইয়া একটু মুখর হইয়া উঠে, অনর্গল চাটুবাক্য উদ্গার

করিয়া যায়। বিপিনও আর প্রসন্ন না হইয়া পারে না; সে দরজাটা খুলিয়া কহিল—আয়, ভেতরে এসে বোস, অনেকদিন একসঙ্গে খাই নাই, চান করবার আগে—নে একবার তৈরি কর্।

সে গাঁজার সরঞ্জাম পাড়িয়া আনিল। শ্রীমন্ত গাঁজা টিপিতে টিপিতে বলিল—তোমাদের সেই লাল বলদটা মনে পড়ে বিপিনদা, ওঃ অমন বলদ কিন্তু গাঁয়ে কারু ছিল না বাপু।

—তার চেয়েও ভাল বলদ করেছি আমি এখন, একটা সাদা আর একটা কালো।

শ্রীমন্ত কহিল—বটে বটে, সেদিন দেখলাম বটে মাঠে চরছিল, তা ভাবলাম ভিন্‌গাঁয়ের কারও, তা সে গরু তোমার? এ তল্লাটে অমনটি কারও নেই।

বিপিন গাঁজা খাইতে খাইতে কহিল—তুই আসিস না কেন? এ ত খেতেই হয়, আমার কাছে এলেই হয়।

শ্রীমন্ত কেমন করিয়া বিপিনকে আপ্যায়িত করিবে খুঁজিয়াই পায় না, শেষে কহে—আচ্ছা তুমি আমার বাড়ি ঢোক না কেন? বার থেকেই ছিমন্তে বলে চলে এস। বেরিয়ে আসতে আসতে দেখি চ'লে গিয়েছ। ও বৌ বুঝি বেরোয় না? বৌটা ভারি পাজি। দাদা বললেই বুঝি দাদা হয়? বন্ধুলোক তুমি—যেয়ো ত তুমি—কেমন না বেরোয় দেখব আমি। বলে—গাঁ-সুবাদে মুচীমিন্সে মামা; যেয়ো ত, যেয়ো ত দাদা—আমার দিব্যি।

শ্রীমন্ত চলিয়া যাইতেছিল, বিপিন কহিল— ওরে শ্রীমন্ত, দাঁড়া, একটা লাউ নিয়ে যা, মেলা লাউ হয়েছে আমার।

শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়া বিপিনের সুন্দর পরিপাটি ঘর-দুয়ারের পানে চাহিয়া দেখে। চারিদিকে শ্রী যেন ঝলমল করিতেছে। এদিকে কয়টা ধানের গোলা। ওদিকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী কয়টি গাভী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক। শ্রীমন্তের বুক দিয়া একটা হিংসাকাতর দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়ে। বিপিন তাহাকে শুধু একটা লাউ নয়, আরও কতকগুলা তরকারী দিল।

যাইতে যাইতে আবার নিজে ফিরিয়া শ্রীমন্ত কহিল, বলতে লজ্জা হচ্ছে দাদা, আট আনা পয়সা দিতে যদি, আর শলিখানেক চাল—

বিপিন কহিল—বোস্।

শ্রীমন্ত বসিল। একাকী বসিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—বিপিনকে সে খুন করিয়া ফেলে।

* * *

ঘরে ফিরিয়া শ্রীমন্ত পয়সা চাল তরকারি নাড়িতে নাড়িতে বেশ মৃদু মৃদু হাসিল—ক্রূর, নিষ্ঠুর, হিম-শীতল হাসি। বোধ করি অবস্থাপন্ন সচ্ছল বিপিনকে বঞ্চনা করিয়াই এ হাসিটুকু পাইয়াছে; ইহার মধ্যে দরিদ্র শ্রীমন্ত ধনীকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, ধনকে ভালবাসিয়াছে!

এই সময় ও-দরজা দিয়া প্রবেশ করিল গিরি। গিরির উপর তখন আর তাহার ক্রোধ ছিল না; তাহার চকিত দৃষ্টি গিয়া পড়িয়াছিল আপন শ্রীহীন ঘরের উপর। ঘরখানায় মূর্তি-মন্ত দৈন্য যেন বাসা গাড়িয়াছে; সর্ব অঙ্গ তাহার ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। সুখহীন—কদর্য—কুশ্রী—সব!

গিরি ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীকে দেখিয়া কহিল—পুরুষ জাতের মুখে ঝাঁটা, ঘেন্না ধরে গেল, টাকার জন্যে এরা না পারে কি, মা গো মা!

শ্রীমন্ত কোন উত্তর করিল না, শুধু গিরির মুখপানে চাহিয়া আপনার জীবনের বঞ্চনার কথাই ভাবিতেছিল।

গিরি বলিয়াই গেল—শুধু আমাদের হরিলালের দোষ কি, ওপাড়ার হরিশ পাল গো, গিয়েছিলাম ষষ্ঠীতলা, শুনে এলাম মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে একজনা কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে তার সঙ্গে; টাকা পাবে নাকি অনেক।

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া কহিল—কত টাকা পাচ্ছে?

—আড়াইশো টাকা।

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

গিরি কহিল—কলির চারপো পুরো হ'ল। বলিয়া ষষ্ঠীর প্রসাদ একটি আতপকণা তুলিতে ব্যস্ত হইল।

সহসা শ্রীমন্ত কটুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—যেমন কপাল আমার, বিয়ে করলাম তা বাঁজা, একটা মেয়ে থাকলে ত আজ এ আড়াইশো টাকা ঘরে আসত।

গিরির নখের কোণে তোলা আতপকণাটি খসিয়া পড়িয়া গেল। সে বজ্রাহতার মত স্বামীর মুখপানে চাহিল, দেখিল সহজ স্বাভাবিক মুখভঙ্গী স্বামীর, কোথাও এতটুকু একটা রেখার বিকৃতির মাঝে প্রচ্ছন্ন ব্যথার কোন রেশ নাই। অতি সরল ভাবেই সহজ কথাটি যেন সে কহিয়াছে।

খানিকটা সময় গিরির কোন বাক্য সরিল না, দেহখানা নড়িল না, সে ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সে কোন কথা না কহিয়া আপন মনে গলার মাদুলির গোছাটা পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল ও সদ্য পূজা করা ষষ্ঠীর কৌটা-বাটা নির্মাল্যগুলি লইয়া খিড়কির ঘাটে বাহির হইয়া গেল।

বারো

এতখানি বিয়োগান্ত করিয়া দুটি যদি দুঃখী নর-নারীর জীবনের জমা-খরচের পাতার শেষে সেই অদৃশ্য হিসাবী দাঁড়ি টানিয়া হিসাবটা শেষ করিয়া দিতেন, তবে বোধ হয় ছিল ভাল। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না।

গিরিকেও জীবনের জের টানিতে হইল, শ্রীমন্তকেও।

শ্রীমন্ত খাইয়া-দাইয়া সন্ধ্যায় ভাবিতেছিল মামলার কথা। কাল মামলার শেষ দিন। বিপিন আসিয়া ডাকিল—শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—এস, এস—দাদা এস!

বিপিন আসিল, হাতে এক ঠোঙা খাবার।

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে চক্ষুর অগোচরে একটা ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল দ্বিপ্রহরে, গিরি যখন ষষ্ঠীর কৌটা-বাটা লইয়া খিড়কির ঘাটে গেল। খিড়কির পুকুরটি একটি ছোট এঁদো ডোবা; ওখানে বাসন মাজাই হয়, মেয়েরা স্নান কেহ বড় করে না। গিরি ঘাটে গিয়াই হাতের সেই ছেঁড়া মাদুলিগুলি আর ষষ্ঠীর কৌটা-বাটা মুহূর্ত দ্বিধা না করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। শ্রীমন্তের এই কথার পর বোধ করি কোন জননীই এ ছাড়া আর কিছু করিতে পারিত না, গিরিও পারিল না।

কয় ফোঁটা জলও চোখ দিয়া ওই ডোবার জলে ঝরিয়া পড়িল। গিরি হাত-পা ধুইয়া ফিরিতেছিল, কিন্তু মনে হইল যদি দেবতার কোন প্রসাদ তাহার এই অভাগা অঙ্গে কোথাও আজ লাগিয়া থাকে, যদি তাহারই জন্য কোন ভাগ্যহীন শিশু-দেবতাকে তাহার মন্দিরে আসিতে হয়—আর এই কামনা, কামনা করিতে হয় যেমন স্নান করিয়া—ত্যাগও হয়ত করিতে হয় তেমনি স্নান করিয়া। এমনি একটা বিপর্যস্ত বিহ্বল মন লইয়া সে ওই ডোবার জলে নামিয়া পড়িল। গায়ের কাপড়খানা পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া সে স্নান করিয়া ফেলিল। ওই ক্লেদাক্ত জলে দেহটা সিক্ত করিয়া, সন্তান-বিয়োগের অশুচি অঙ্গে মাখিয়াই যেন সে ঘরে ফিরিল!

ডোবাটার চারিপাশে ঘন অতি নিবিড় বাঁশের বন। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সংকীর্ণ ঘাট-গুলি জলে নামিয়াছে। ঘাটের গোড়ায় নামিলে বড় কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্ধকারে বাঁশের ঝাড়ের ফাঁক দিয়া ডোবাটির মধ্যস্থল বেশ দেখা যায়। শ্রীমন্তর ঘাটের পাশেই বিপিনের ঘাট। বিপিন নামিয়াছিল ঘাটে। গভীর জলের জন্য গিরিকে ডোবাটার প্রায় মধ্যস্থল পর্যন্ত নামিতে হইয়াছিল, মধ্যজলে আত্মহারা গিরি অটুট যৌবন-সম্ভার মুক্ত করিয়া তখন সেই মুক্তি-কামনার পঙ্কস্নান করিতেছিল।

বিপিনের চোখে পড়িল সেই রূপ! এলানো দীর্ঘ কেশভার, মাজা রং-এ নিটোল পরিপূর্ণ যৌবন, সুসন্নিবিষ্ট সুদৃঢ় প্রতি অঙ্গ—পুরুষকে চঞ্চল করিবার মত বটে। বিপিন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বাকি বেলাটায় আসিবার জন্য সে দশটার পথে নামিয়াছে, দশবার ফিরিয়াছে। আসিলে শ্রীমন্ত কিছু মনে করিত না; কিন্তু দুর্বল মন বলিয়া বিপিনের কেবলই মনে হইয়াছে, শ্রীমন্ত ধরিয়া ফেলিবে হয়ত। অবশেষে সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্তের নিমন্ত্রণ আশ্রয় করিয়া সে আসিল, আসিতে আসিতে আবার ফিরিয়া এই খাবার কিনিয়া আনিল। সে খাইলেও বিপিনের তৃপ্তি, শ্রীমন্ত যা খাওয়ায় সে ত জানে, হয়ত সব দিন দুই বেলা খাইতেই পায় না।

ঠোঙাটা শ্রীমন্তের হাতে দিয়া কহিল—নে—নিয়ে এলাম।

শ্রীমন্তও বিস্মিত হইয়া গেল, সে কহিল—খাবার?

কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন, বিশেষ ওই উগ্র পশুটার বিবরে বসিয়া।

বিপিন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—মাল খেয়ে খাব—নে রাখ্ না।

শ্রীমন্ত পাশেই ঠোঙাটা রাখিয়া দিল। বিপিন চটিয়া গেল, হতভাগা রাক্ষস লজ্জাই হয়ত

সবই গিলিয়া ফেলিবে! সে কহিল—কিন্তু কি আবাঙ রে তুই, সে-ই ছিমন্ত এখনো আছিস্? খাবার দিয়ে আয়, একটা বসবার কিছু নিয়ে আয়—আলো আন্, জমিয়ে বসা যাক্ একটু, না—কি? এই বুঝি তোর আসতে বলা!

শ্রীমন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল, বিশ্বের উপরে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা দিন দিন সে হারাইয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু আজ বাল্যসাথীর এ ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া সে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া খাবারের ঠোঙাটা লইয়া গিরিকে ডাকিল—রাখ ত। বাল্যকালের বন্ধু হাজার হোক—দেখছ ত—

গিরি উনানে আগুন দিতেছিল, মন ভাল ছিল না। সারাক্ষণ বুকের ভিতর বিসর্জনের বৈরাগী সুর বাজিতেছিল। কিন্তু ঘরে আজ বিপিনের দেওয়া চাল ছিল, তরকারী ছিল; আর তা ছাড়া তাহার মনের অবস্থায় মানুষ কিছুই প্রত্যাখ্যান করে না, কোন কিছু অমান্যও করে না। এ অবস্থায় আপনাকে কষ্ট দিয়াও প্রত্যেক কার্যটি নীরবে করিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। এটা বোধ হয় অভিমান, শীতল অভিমান।

গিরি বিনা বাক্যব্যয়ে ঠোঙাটি হাতে লইয়া কহিল—কি করব?

—দুটো কিছুতে কতক সাজিয়ে দাও—আর দুটো গেলাসে, গেলাস বুঝি মোটে একটা আছে—তা ঘটিতে করে জল আর গেলাসটা ধুয়ে দাও—কতকগুলো রেখে দাও।

শেষ কথাটা সে চাপিয়া বলিল।

ওদিক হইতে বিপিন কহিল—আমাকে ভাই অতি অল্প দিও—গুনে দুটি—অম্বলে মরে যাচ্ছি—খবরদার দুটির বেশী নয়।

শ্রীমন্ত বলিল—তবে এক কাজ কর, অল্প অল্প দুটো জায়গায় দিয়ে বাকি রেখে দাও। আর এক কাজ কর দেখি, একটু জল চড়িয়ে দাও,—চা হোক, বিপিনদা—চা খাবে ত, চা?

বিপিন কহিল—তা মন্দ কি!

শ্রীমন্ত বলিল—তুমি জল চড়িয়ে দাও, আমি চা আনি।

—হ্যাঁ, একটা কিছু দাও দেখি বসতে—ঐ চটটা, তা বেশ হবে। একটা আলো—আলো বুঝি আর নাই—তাই ত—তা ওইটাই দাও।

আলোটা নামাইয়া চটটা পাড়িয়া শ্রীমন্ত কহিল—তুমি দু'মিনিট বস ত ভাই, মালটাল বের করে, আমি চা আর চিনি নিয়ে আসি।

বিপিন আপত্তি করিল না, এমন নির্জন মুহূর্ত তাহার অন্তরও কামনা করিতেছিল—যদি একটা কথা কহিবার সুযোগ পাওয়া যায়!

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল, বিপিন গাঁজা বাহির করিতে পকেটে হাত দিয়াই ভাবিতে লাগিল—একটি কথা, কি একটি কথা যা ঐ সুন্দরীর মনস্তুষ্টি করিয়া শোভন ভাবে কওয়া যায়।

গিরি উনান জ্বালিয়া জল গরম করিতেছিল। আলো ছিল না, ঐ উনানের বহ্নি-শিখাতেই গিরির মুখের একপাশ দেখা যাইতেছিল। ব্যথিত ম্লান দৃষ্টি, চুল তখনো এলানো, কয়টা চুলের গোছা কপালের উপর পড়িয়াছে, সেগুলো ওই আগুনের শিখাতাড়নে তপ্ত বায়ুপ্রবাহে নাচিতেছিল।

* *

বিপিন সহসা কহিল—আলোটা নিয়ে যাও, অসুবিধা হচ্ছে—কোন দরকার নাই আমাদের—নিয়ে যাও।

কিন্তু লইয়া কেহ গেল না। বিপিন আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শ্রীমন্ত ফিরিয়া কহিল—দেরি বেশি হয় নি আমার, আমি দৌড়ে এসেছি। কই মাল বের কর নি এখনও?

—এই যে, বলিয়া বিপিন সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিল।

শ্রীমন্ত চা চিনি দিয়া গিরিকে কহিল—চা কর।

চা করিতে করিতে অন্ধকারে খানিকটা চা নিজের হাতের উপর পড়িতেই গিরি 'উঃ' করিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত ধমক দিয়া কহিল—আচ্ছা অকম্মা তুমি, চা-টা ফেলে—উঃ! বলিয়া শেষটায় ভ্যাঙাইয়া উঠিল।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া কহিল—হাত বোধ হয় পুড়ে গিয়েছে, আহা! তুই একটা জানোয়ার রে। একটু নারকেল তেল চুনের জলে বা আলু বেটে—

শ্রীমন্ত কহিল—কিছু করতে হবে না দাদা, গরম চা মুখে সয় তা আর হাতে সইবে না?

যাই হোক চা খাইয়া, গাঁজা টানিয়া, আড্ডা জমাইয়া বহু চেষ্টা করিয়া বিপিন উঠিল, কহিল—তা হ'লে উঠি, কালকে মামলার দিন? আচ্ছা সন্ধ্যেয় এসে শুনব কি হয়।

বিপিন বাড়ির বাহির হইয়াও চলিয়া গেল না; রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল। একটা কথা শোভনভাবে মনস্তুষ্টি করিয়া বলিতে পারে নাই সে; তখনও সে সেই কথাই ভাবিতেছিল।

গিরি তখন শ্রীমন্তকে কহিতেছিল—কালই কি মামলা শেষ হবে?

শ্রীমন্ত কহিল—হ্যাঁ।

—কি হবে? বিপদের উদ্বেগে অভিমান কোথায় গেছে তাহার।

শ্রীমন্ত কহিল—কি হবে, সে ত ভগবান জানেন, কিন্তু খরচ নাই। কাল যদি আর উকীল না দিতে পারি তবে সব মিছে।

—একবার ওকে বলে দেখলে না কেন?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—তা হতো।

বাহিরে বিপিনের মন নাচিয়া উঠিল, গিরির মনস্তুষ্টি সে করিতে পারে, সে পুনরায় হাঁকিল—শ্রীমন্ত!

—কে, দাদা?

—হ্যাঁ রে, ফিরে এলাম আবার, একটা কথা শুধোব কিছু মনে করিস্ না ভাই, কাল মামলার খরচাপাতি—

শ্রীমন্ত উচ্ছ্বাসভরে কহিল, কোথায় পাব ভাই?

—আচ্ছা কাল সকালে আমার কাছ হয়ে যাস্ বুঝলি, মামলা জিতে কিন্তু সন্দেশ আনতে হবে।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

গিরি কহিল, বড় ভাল লোক বাপু।

বাহিরে বিপিনের বুকটা নাচিয়া উঠিল, সেই আনন্দটুকু সম্বল করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

শ্রীমন্ত খাইয়া উঠিলে গিরি সমস্ত সামলাইয়া ফেলিল। শ্রীমন্ত কহিল—তুমি খাবে না?

—না।

—ও, আজ বুঝি ষষ্ঠী পূজো করেছ, তা এক কাজ কর, ওই ত মেলা খাবার রয়েছে, খাও।

গিরির চোখের জল আর বাঁধ মানিতেছিল না, সে মুখ ফিরাইয়া কোনরূপে কহিল—না।

শ্রীমন্ত গিরির হাত ধরিয়া কহিল—রাগ করেছ?

গিরি একবার হাতটা টানিয়া তারপর স্থির ভাবেই শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র। সে যে কি হাসি তাহা শ্রীমন্ত বুঝিল না, সে গিরির হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার মনে হইল এর চেয়ে গিরি কাঁদিলে ভাল হইত, সান্ত্বনা দিয়া অভিমানটা ভাঙানো যাইত।

তেরো

পরদিন শ্রীমন্ত সদরে গেল, গিরি উদ্বেগ-রুদ্ধ বুকে বসিয়া রহিল। হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতে রহিল, খাওয়া হইল না, কিন্তু ক্ষুধা ছিল। আগের দিনটাও উপবাসে গিয়াছে, ক্ষুধা নির্মমভাবে পাকস্থলীতে পীড়ন করিতেছিল, কিন্তু মুখে তাহার কিছুই রুচিল না। এক ঘটি জল ঢক্ ঢক্ শব্দে মুখে ঢালিয়া পেটের আগুনে যেন সে জল দিতে চাহিল।

কিন্তু জলের বুকের মাঝেও যে আগুন জ্বলে! বুকের মাঝে অসুস্থতার চেয়েও অসুস্থ একটা অস্থিরতায় জীবন যেন তাহার কণ্ঠনালীতে ঠেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। হাত পা অনর্গল ঘামিয়া ঘামিয়া ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে; পেটের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। একটা আশার কথা বলিবার কেহ নাই। পাড়ার লোকে, দিনের পর দিন পড়ায় শ্রীমন্তের মামলার দিনের হিসাব রাখা ছাড়িয়াই দিয়াছিল। তাহারা মামলা-অন্তে শ্রীমন্তের মুখে জয়-বার্তা বা গিরির করুণ আর্তনাদে তাহার বন্ধন-দশার কথা জানিবার প্রত্যাশায় ছিল।

আসিল একজন—সে বিপিন। বেলা দুই প্রহরের সময় সে 'শ্রীমন্ত' বলিয়া একেবারে বাড়ির ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। গিরি খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল, অঙ্গ-বাসখানি বেশ ভালভাবেই জড়ানো ছিল, কিন্তু মুখ অনবগুণ্ঠিত। বিপিনকে দেখিয়া সে নড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অনাহারে, দুর্বলতায়, না মনের পঙ্গুত্বের জন্য কে জানে!

বিপিনেরই লজ্জা হইল, সে আসিয়াছিল শ্রীমন্ত নাই জানিয়াই, আর এমনি অতর্কিত মুহূর্তে হয়ত গিরির একটি অসম্বৃত অবস্থা দেখিতে পাইবে আশা করিয়াই। কিন্তু তাহার কল্পনায় ছিল—গিরি তাহাকে দেখিয়া আপন অসম্বৃত অবস্থা সংযত সম্বৃত করিতে বেশ একটু সলজ্জ চঞ্চল হইয়া উঠিবে, হয়ত বা একটুখানি জিভ কাটিয়া ফেলিবে, আর সেই সুসংবদ্ধ ছোট ছোট

দাঁতগুলির শ্রেণী বহিয়া ঠোঁটের কোণ দুটি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি লজ্জার হাসির রেখাও চকিতের মধ্যে চপলার মত দেখা যাইবে। কিন্তু কিছুই গেল না—গেল শুধু তাহার অসম্বৃত অবস্থাই দেখা, সে অবস্থা অচঞ্চল, তাহার মধ্যে একটা পীড়িত ভাব, সে ভাবে মানুষ কখনও সুখী হইতে পারে না।

বিপিন চলিয়া গেল।

আবার ঘণ্টা দুই পরে আসিল। এবার সে বেশ করিয়া সাড়া দিয়া আসিল, গিরি যাহাতে চকিত হইয়া উঠে। কিন্তু এবারও দেখিল সেই ভাবে গিরি বসিয়া। বিপিন অবাক হইয়া গেল, পরক্ষণেই মনে হইল, সত্যই অসুস্থ নয় ত! কিন্তু অসুস্থ হইলেও নারী লজ্জার সংজ্ঞা হারায় না। চেতনা আছে ত! বিপিন ওদিকের দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া আসিল, বার দুই গলাটা পরিষ্কার করিবার ভানে জোর সাড়া দিল, কিন্তু গিরি সেই বসিয়াই থাকিল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা তন্ময় অবস্থা গিরির আসিয়াছিল, সকল মানুষেরই আসে, উপবাসের দুর্বলতা, মনের দুঃখের গভীরতায় অবসাদগ্রস্ত চিত্ত কোন একটা কিছু আশ্রয় করিতে পারিলেই সেইটা লইয়াই তন্ময় হইতে হইতে অমনি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে। তন্ময়তাও নিদ্রার মত বস্তু; তন্ময়তায় সকল চিন্তা, সকল অস্থিরতা লুপ্ত হইয়া যায়। মন চলিয়া যায় ধ্যানের বস্তুর পানে—বাস্তব জগৎ হইতে দূরে। ঠিক নিদ্রারই মত।

বিপিন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—তবুও সেই অবস্থা।

এবার বিপিনের ভয় হইল। সে চোখের পানে চাহিয়া দেখিল—গিরি চোখ চাহিয়া আছে, কিন্তু কিছু দেখিতেছে না। বিপিনের পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড চলিতেছিল অসম্ভব জোরে।

সে হাঁটুর উপর দুটি হাত দিয়া হেঁট হইয়া একটু দূর হইতে ভাল করিয়া গিরির চোখের দৃষ্টির অবস্থা পরীক্ষা করিতে চাহিল; ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা হনুমান বিপুল শব্দে ঘরখানার মাথায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। ওই বিপুল শব্দটা ধ্যানস্থার সুদূর মনকে যেন ডাকিয়া ফিরাইল। গিরি চমকিয়া উঠিল এবং ঐ অবস্থায় বিপিনকে দেখিয়া, পায়ের গোড়ায় সাপ দেখিলে লোকে যেমন চমকিয়া পিছাইয়া যায়, তেমন ভাবেই পিছাইয়া গিয়া বারান্দার এক কোণে বিস্ফারিত নেত্রে বিপিনের পানে চাহিয়া হাঁপাইতে লাগল।

এমন অবস্থায় যে কেহ আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হয়ত বলিয়া উঠিত—আঃ বাঁচলাম!

কিন্তু বিপিন কিছুতেই তাহা পারিল না, সে ত্রস্তপদে পলাইয়া গিয়া যেন বাঁচিল। তারপর বিপিন বাড়িতে আসিয়া দাওয়াতে বসিয়া আপনাকে ধিক্কার দিল, হায় করিলাম কি, মনের পাপেই মরিলাম। শ্রীমন্ত আসিলেই ত গিরি বলিয়া দিবে। বিপিনের বুকখানা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল—দুর্দান্ত শ্রীমন্ত সেদিন একটা কথাতেই খুন করিতে উঠিয়াছিল—আজ! তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, বেচারী বিনা কাজে অবেলায় মাঠপানে চলিল।

মাঠে মাঠে ঘুরিয়া নদীর ধারে এক স্থানে বসিয়া একবার গাঁজা খাইয়া সে যখন বাড়ি

ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আপন দাওয়াতে পা দিয়াই শুনিল শ্রীমন্তের বাড়িতে কতকগুলি লোকের গলা শুনা যাইতেছে। বিপিনের কিঞ্চিৎ সুস্থ প্রাণ আবার কণ্ঠাগত হইয়া উঠিল; তবে ত শ্রীমন্ত ফিরিয়া গিরির মুখে সব শুনিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছে, আর লোকজন বোধ হয় শান্ত করিতেছে। হ্যাঁ, শান্ত করিতেছে, না, তাহার মাথা খাইতেছে, বোধ হয় তাহারই বিরুদ্ধে চুকলামি করিয়া জানোয়ারটাকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিতেছে।

সে ধীরে ধীরে মৃদু পদক্ষেপে আপন গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য সবে পা উঠাইয়াছে, এমন সময় রাস্তা হইতে কে কহিল—এই যে, বিপিন না?

—কে? বিপিন অকারণে অসম্ভব রকম চমকিয়া উঠিল, লোকটা তাহা গ্রাহ্য করিল না, সে কহিল—শুনেছ?

বিপিনের শঙ্কা বাড়িয়া গেল, সে অসম্ভব রকমের বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল—ও সব শুনাশুনি কি? যত সব মিছে।—

লোকটা কহিল—কি রকম? আমি শ্রীমন্তের বাড়িতে শুনলাম—।

বিপিন খিঁচাইয়া উঠিল—শুনলে তা কি হবে কি? তাই বিশ্বাস করে বসে থাক।

লোকটা বিস্মিত হইয়া কহিল—আরে তোমার হ'ল কি?

—হবে আবার কি? হ্যাঁ, ইয়ে হয়েছে, আমার বড় মাথা ধরেচে।

—তা হলেও তোমার যাওয়া উচিত, সবাই তোমায় খুঁজছিল।

—কি আমায় উচিত দেখাও হে কটাহরি, আর সবারই বা কি ধার ধারি আমি? কে আমার কি—

—আরে তুমি এত চটছ কেন? সে যাবার সময় তোমার কথাই দশবার করে বলে গিয়েছে, বিপিনদাকে বলো, বিপিনদাকে বলো—তা এতে—

বিপিনের সংবাদের সুর ফিরিয়া গেল। সে তাহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া কহিল—কি ব্যাপারটা বল দেখি?

—শ্রীমন্তের পাঁচ বছর জেল হয়েছে—

—এঁ্যা বলো কি? হরি, হরি, হরি—

বিপিন রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া শ্রীমন্তের বাড়ির পথ ধরিল। বক্তা কটাহরি বেশ একটু বিস্মিত হইয়াই আপন পথে চলিয়া গেল। শ্রীমন্তের বাড়িতে তখনও গোলযোগ মেটে নাই। শ্রীমন্তের সঙ্গে গিয়াছিল বেহারী বাগ্দী ওস্তাদের ভাইপো পাঁচু—সে-ই আসিয়া খবর দিয়াছে। সে বর্ণনা করিতেছিল আর পাঁচ-সাতজন শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল।

পাঁচু বলিতেছিল, তা মরদ বলতে হবে ছিমন্তকে, একফোঁটা জল মাটিতে ফেলে নাই সে। যেমন লাঠি ধরে মরদের কাজ করেছে, তেমনি মরদের মতই জেলে গিয়েছে সে। একবার শুধু ওপর পানে হাত দেখিয়ে বললে—'ও বিচার ত এখানে হ'ল না—হবে ওইখানে—মানুষের বিচার মানুষে কি করতে পারে?' তা সে হাকিমের মুখের ছামুতেই।

একজন কহিল—নাঃ—মরদ বটে শ্রীমন্ত, সে গায়ের সামর্থ্যেই কি, আর কলিজেতেই বা কি?

পাঁচুর কথা তখনও ফুরায় না। সে ছোট জাত, তাহাদের ভালবাসাটা বড় তীক্ষ্ণ—বড় গাঢ়। তাহারা শ্রীমন্তকে ভালবাসিয়াছিল তাই তাহার কথার সবগুলি না কহিয়া বোধ করি তাহার আশা মিটিতেছিল না। সে কহিল—আর বললে গোটাকতক কথা নিজের উকীলকে। উকীল বললে—'কী আর করব বাপু, এ জানা কথা—মামলা তোমার বড় দুর্বল ছিল—তা সাত বছর না হয়ে পাঁচ বছর করেছি এই ঢের।' তাতেই ছিমন্ত একটুকুন হাসলে। সে হাসি যদি দেখতে! বুঝলে, সেই হাসিতেই উকীলের মাথা হেঁট হয়ে গেল; হেসে ছিমন্ত বললে—'তাই সাত বছরই আমি খাটতে রাজি আছি উকীলবাবু, ফিসের টাকা কটা ফিরিয়ে দেন দেখি। কেন মিছে আমার সর্বনাশটি কল্লেন বলুন ত?' তারপর আবার হেসে বললে—'মিছাই বলা তা জানি, তবু বললাম আপনাকে। কিছু থাকলে ত আর পরিবারটা না খেয়ে মরত না। তা আনা চার পয়সা দেন কেনে, জেল-ফটকে জমা থাকবে, বেরিয়ে দড়ি কিনে গলায় দোব।' বলে আবার সেই হাসি।

একজন কহিল—আ-হা ঘা-টা বড্ড লেগেছে কিনা? মেয়েটাকে মানুষ কল্লে, তার মেমতা ত সোজা নয়, সেই মেয়ে ধর কেনে পেটের অধিক, তাকে বাঁচাতে গিয়ে—

একজন কহিল—ওই মেয়েটাই অলুক্ষণে হে, দেখেছ—কটা কটা রং, প্যাজের পাতার মত চুলগুলোসুদ্ধ কটা ছিল, উ ভা-রী খারাপ, রাহুগ্‌গস্ত না কি বলে বাপু। আমাদের ঐ যে চণ্ডীদাসপুরের রামের মেয়েটা ঠিক অমনি, হ'ল আর বাপকে খেলে। তারপর জমিজেরাত—পিটিলী গুল্‌তে এক কাঠা রইল না।

বিপিন পাঁচুকে কহিল—বাড়িতে কিছু বলে দেয় নাই?

সে তাহার নিজের কথা শুনিতে চাহিতেছিল।

পাঁচু কহিল—তোমার কথা ত দুশবার বলে দিয়েছে। বললে, 'পাঁচু—কি আর বলে যাব ভাই, দেখিস তোরা, বৌটা রইল, যেন না খেয়ে মরে না।' আবার হেসে বললে,—'তোরাই পাস না খেতে ত পরের ভার কেনে দিই, তোরা বিপদে-আপদে দেখিস। আর বিপিনদাকে বলিস—পারে ত ধানটান ভানিয়ে দু'মুঠো খেতে যাতে পায় বৌটা তাই যেন করে।' আবার একবার বললে—'বিপিনদাকে বলিস—যদি বেঁচে থাকি, আর জেল থেকে বেরিয়ে যদি দিন পাই তবে তার দেনা আমি শোধ করব, তার টাকা আমি মারব না।' আর বললে—'গাঁয়ে সবাই কিছু কিছু পাবে, তা বলিস যেন আমাকে শাপ-শাপান্ত করেই মাপ দেয়, বৌটাকে আর কেউ কিছু না বলে।' আমি বললাম—'বৌকে কিছু বলবে?' বললে—'কি বলব? বলিস তার অদেষ্ট আর আমার অদেষ্ট। আর তাকে কিছু বলব না, থেকেও ত সুখ কখনও দিতে পারি নাই, তবে সে আমাকে দুঃখও কখনও দেয় নাই।'

সহসা নারী-কণ্ঠের মর্মফাটা কান্নার একটুখানি ধ্বনি মুহূর্তের জন্য উঠিয়াই নীরব হইয়া গেল। সকলের দৃষ্টি পড়িল ও-ঘরের দাওয়ার উপর—গিরি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আপাদমস্তক আবৃত, দেহখানা ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। সকলেই বুঝিল হতভাগীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে—এক মুহূর্তের জন্য নারীধৈর্যের সীমা টুটিয়া মুখও ফুটিয়াছিল।

পাঁচু কহিল—না, না আর নয়, চল সব, একটুকুন কাঁদুক ও ডাক ছেড়ে, কি বল মোটা মোড়ল? বলিয়া বিপিনের মুখপানে চাহিল।

বিপিনও তাড়াতাড়ি কহিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, চল সব চল; আ-হা-হা অবলা। পাঁচু, বলে দে দোর-টোরগুলো দিতে।

পাঁচু কহিল—না, মাকে আমার পাঠিয়ে দোব, সে দিয়ে শোবে। একা কি থাকতে পারে বৌ-মানুষ!

বিপিনের কেমন কথাটা মনোমত হইল না—তা আবার পারবে না, কি হয়েছে, নিজেরই ঘর—কতজনা বলে—

পাঁচু কহিল—তা নয়, বলি আজ কি একা থাকতে পারে, না থাকতে দিতে আছে? বলি মনের বিবাগীতে ত কত রকম করতে পারে; ধর, ঘরে দড়িও আছে, পুকুরে জলও আছে।

বিপিন শিহরিয়া কহিল—হ্যাঁ, তা পারে। তাহার চক্ষের উপর স্বামীপরায়ণা বধূটির ধ্যানমগ্না ছবিটি ভাসিতেছিল।

চৌদ্দ

পরদিন প্রাতে পাঁচুর মা যাইবার সময় কহিল—বৌ, তাহ'লে আমি আসি, যদি কিছু কাজ থাকে ত বল করে দিয়ে যাই।

কাজ! গিরির হাসি আসিল, অপরে তাহার কাজ করিয়া দিবে! দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া তাহার কপাল ফিরিয়া গেল যে! কাজ এখন কত লোকের দুয়ারে তাহাকেই করিতে হইবে। সে ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—না।

পাঁচুর মা গিরির ওই ম্লান হাসিতে বোধ করি তাহার মনের কথা বুঝিতেছিল, সে কহিল—সে কাজের কথা বলি নাই মা, বলি দোকানে আনতে নিতে যদি কিছু হয়, এই আর কি।

—কি আনবে?

—এই নুন, তেল, খেতে ত হবে মা, পেট ত অভর, পেট ত মানবে না মা। আর না খাবেই বা কেনে, লোক বিধবা হচ্ছে, বেটা মরছে, তাও ত বেঁচে আছে, আর তোমার ত পাঁচ বছর, দেখতে দেখতে চলে যাবে। ওই ত আট বছর পরে আমাদের পাড়ার 'ইন্দি' ফিরে এল। আট বছর, তাও কালাপানি জাহাজে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, পাথরের জেল, বিচিতির পাতা তুলতে হয়, হাত ফুলে ওঠে, আর এ ত তোমার দেশের জেল, এখানে ত রাজার হাল।

গিরি কহিল—সে আমি ভাবি নাই পাঁচুর মা—

—না, ভাবনা হয় বৈকি, তবে মা কি করবে বল—রাজার ওপরে হাত ত নাই, বলে যে সেই 'রাজাতে কাটিবে শির, কি করিবে কোন্ বীর।'

গিরি আর উত্তর করে না, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে।

পাঁচুর মাও একটু নীরব থাকিয়া বলে—তা তোমার একটু কষ্ট বেশি হবে, পেটের একটা নাই যে দুঃখের সময়—

গিরি চমকিত হইয়া কহে—ও কথা বলো না পাঁচুর মা, ওতে কাজ নাই আমার, ও যে হয় নাই সে দেবতার অনেক দয়া আমার উপর।

—ছিঃ মা, সধবা নারী—ও কথা বলতে নাই; কেন, কিসের জন্য এমন কথা বলছ তুমি?

গিরি কথাটা বলিয়াই বুঝিয়াছিল যে কথাটা বলা ভাল হয় নাই, এ প্রশ্নের উত্তরে যে ইতিহাস তাহাকে বলিতে হয়—সে ত শুধু দুঃখের নয়,—অত বড় মর্মান্তিক ভাগ্যহীনতার অপমান নারীর আর হয় না। সে কথাটা একটু ঘুরাইয়া কহিল—আজ কি হ'ত মা, আজ যে সে আমার পেটের শত্রু হয়ে দাঁড়াত।

পাঁচুর মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব রহিল। সেও বিচার করিয়া দেখিল, বৌ কথাটা সত্যই বলিয়াছে—দরিদ্রের সন্তান শত্রু-ই বটে!

পাঁচুর মা এবার পা বাড়াইয়া কহিল—তা হলে আমি মা আসি, তুমি রান্না কর; কি করব বল মা, ছোট জাত আমরা, নিজের জাত হলে কি তোমাকে রেঁধে খেতে হয়?

গিরি হাসিয়া কহিল—জাতের আর কি আছে বল পাঁচুর মা, সত্যি জাত থাকলে ত? আসলে ওসব মিছে—জাত ত এখন দুটি, বড়লোক আর গরীব লোক—যারা বড়লোক তারাই উঁচু জাত, আর যারা গরীব তারাই ছোট জাত।

পাঁচুর মার যাওয়া হইল না। দরিদ্রের সন্তান ওরা, এ কথায় মন তাহার একান্তভাবে সায় দিল, সে কহিল—এই কথাটি তুমি সত্যি বলেছ মা।

বাহির হইতে একটা ডাক শোনা গেল—পাঁচুর মা, রয়েছে নাকি?

পাঁচুর মা কহিল—কে গো, মোটা মোড়ল নাকি, এস, এস।

বিপিনকে গ্রামে সবাই মোটা মোড়ল বলিত; দেহের স্থূলতা অবশ্য ছিল তাহার, কিন্তু সেজন্য নয়, জমিদারের সেরেস্তায় বিপিনের টাকার অঙ্ক মোটা, তাই জমিদার তরফ হইতে এ নামকরণ হইয়াছে। বিপিন ইহাতে বেশ গৌরব অনুভবই করে, এ তাহার সরকারী খেতাব।

গিরি চকিত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখ ফুটিবার পূর্বেই বিপিন আসিয়া ও-ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইল। কথাটা তাহার বলা হইল না। সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল।

বিপিন কহিল—তাই ত পাঁচুর মা, কি ঘটনাটাই ঘটে গেল, বিধির নির্বন্ধ আর কি! ছোঁড়া লোক বড় ভালই ছিল, আমার সঙ্গে প্রণয়টা বড়ই ছিল, সে নিজের ভায়ের তুল্যই মনে করত আমাকে, আমিও তাই। জিজ্ঞেস কর ওই বউকে, টাকা নিয়েছে সে, কখনও চাই নাই আমি। বলি, আহা সময়টা খারাপ পড়েছে, দেবে, দিন হলেই দেবে—আবার তার ওপর না চাইতে নিজে এসে দিয়ে গিয়েছি আমি। এই ত সে কাল, বলি, আহা খরচ নাই মামলার, তা চায় নাই, নিজেই দিইছি আমি, বুঝলে কি না।

পাঁচুর মা কহিল—সে একশবার। তা ছিমন্তের কথাও বলতে হবে বাপু, সে ত আমাদের পাড়া হামেশাই যেত, তা সে নাম করতো তোমার,—বলতো, হ্যাঁ, মানুষের মত মানুষ আমাদের মোটা মোড়ল, সে নেমখারাম ছিল না, তুমি ভালবাসতে—তোমার নাম করতো। তা ধর কেন যাবার সময় সব পাঁচুকেই ত আমার বলে গিয়েছে, দশবার তোমার নাম করেছে, বলেছে—'পাঁচু, বৌ রইল, মোটা মোড়লকে দেখতে বলিস।'

বিপিন তাহার মুখের কথা লুফিয়া কহিল—বৌ রইল, বিপিনদাকে দেখতে বলিস; তা দেখব বৈ কি! ধর না কেন পাঁচুর মা, চৌপর রাত্তি আমার কাল ঘুম হয় নাই, ভাবনায় ঘুম হয় নাই, বলি একা বৌটি সোমত্থ বয়েস—আমাকে রা কাড়ে না—এ আমি করব কি?

পাঁচুর মা কহিল—তা ত বটেই, ভাবনার কথা বটেই ত—বৌ মানুষ সোমত্থ বয়েস—রা-ই বা কাড়ে কি ক'রে?

বিপিন কহে—তা অবিশ্যি আসতে যেতে হলে—অনেকটা সরল হবে বৈ কি—আর ধরগা যেয়ে সম্পক্ক যা তা ত গাঁ-সম্পক্ক।

পাঁচুর মা কহে—তা বৈকি—গাঁ-সম্পক্কে মুচী মিন্সে মামা হয়, সেও ত ধর ফেল্‌না নয়; তবে হ্যাঁ, এলে গেলেই সরল হবে বৈ কি, বলে ভাসুরকে রা কেড়েই আজকাল হুর-ধুর করচে।

বিপিনের কথাটা বড়ই মনোমত হইল—এই হুর-ধুর করচে, আমিও ত তাই বলচি গাঁ-সম্পক্ক ত—আসা-যাওয়া যখন—

অধিক আসা-যাওয়ার অভ্যাসে কথা কওয়ার পথ আর সরল করিতে হইল না, গিরির কণ্ঠস্বর এখনই শোনা গেল—সে বেশ স্ফুট কণ্ঠেই কহিল—পাঁচুর মা, আসা-যাওয়া করতে ওঁকে হবে না, আমিই দরকার হলে দিদিকে সব জানিয়ে আসব।

বিপিন হতভম্ব হইয়া গেল, তাহার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার মনের আগুনের আঁচ এ মেয়েটি পাইল কি করিয়া?

মানুষ বোঝে না—তাহার যে মন, সে মন সৃষ্টি করিয়াছে সর্বান্তর্যামী যে—সেই। আর সৃষ্টি করিয়াছে সে আপন সর্বান্তর্যামী মনেরই খানিকটা লইয়া, তাহার সেই সকল-জানা শক্তি-ই মানুষের মনের অনুমান-শক্তি, তাহাকেই মানুষ বলে দূরদৃষ্টি, তাই হেলায় খেলায় মানুষ যাহা অনুমান করে—তাহা ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু অন্তর সমর্পণ করিয়া যে অনুমান, সে হয় সত্য, প্রত্যক্ষ!

পাঁচুর মা কহিল—সেই ভাল মোটা মোড়ল, বৌমা আমার বলেছে খুব ভাল। কাজ কি আসা-যাওয়ার, দরকার হলে তোমাদের বাড়িতে বলে আসবে।

বিপিন বলিল—তা বেশ। তবে কি পাঁচুর মা, ধরগা যেয়ে—মেয়েমানুষ দেওয়া-থোওয়া বড় দেখতে পারে না।

গিরি এবার সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেওয়া-থোয়ার ত কোন দরকার নেই পাঁচুর মা। দেহ আছে—খেটে খাব আমি।

শশব্যস্ত হইয়া বিপিন বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ত বটেই—

গিরির কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, অনেক বেলা হয়েছে পাঁচুর মা, তুমি ওঁকে যেতে বল— আমি বেরুতে পারছি না।

বিপিন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতেছিল।

গিরি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মৃদু ভৎর্সনা করিয়া পাঁচুর মাকে কহিল —দেখছ আমি বেরুতে পারছি না, আর তোমার কথার শেষ হয় না।

পাঁচুর মা বলিল, কি করব বল মা, এত বড় লোকটা—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া গিরি আগুন হইয়া বলিয়া উঠিল—বড়লোক ত আমার দরকার নেই পাঁচুর মা। আমি গরীব। বড়লোক আমার দু'চক্ষের বিষ।

তাহার কণ্ঠস্বরে ঘৃণা যেন উপচিয়া পড়িতেছিল। সারা মুখখানি ঘৃণার রেখায়-রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত, চোখ দুইটি স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি তাহার অতি তীব্র, তীক্ষ্ণ, সে দৃষ্টির সম্মুখে পাঁচুর মা কেমন হইয়া গেল, তাহার মত মুখরারও মুখ : না।

পনেরো

ভাবপ্রবণতার দিক দিয়া যতই শোচনীয় হোক, দেখিতে শুনিতে যতই সুন্দর হোক না কেন, বাস্তবতার এই কঠোর দুনিয়ায় এই বেনের কারবারে যেখানে ডান হাতটি তুমি না দিলে অপরের বাম হাতের সাহায্য পাইবে না, সেখানে বিপিনকে এই অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া গিরির সঙ্গত বা বিবেচনাসম্মত হয় নাই—এ বলিতেই হইবে।

বিপিন ধনী। বিপিনিই একমাত্র ব্যক্তি যে গ্রামের মধ্যে গিরির মুখপানে চাহিতেছিল—তা সে যত নীচ স্বার্থেই হোক। এ দুনিয়ায় ধনের একটা মত্ততা আছে—কৃত্রিম বিনয়ে ধনী মুখে যতই বৈষ্ণবী বুলি আওড়াক—তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ও স্বচ্ছলতার একটা অভিমান আছে। এই অহঙ্কারে অভিমানে দুনিয়ার উপর তাহার দাবী, দুনিয়া তাহার সম্মান করিবে, মানুষের মাথার উপর দিয়া তার পায়ের তলার পথ তৈরি না হোক—তার পায়ের গোড়ায় মানুষের মাথা নত হইবে। ধনের জোরে জনকে সে কিনিয়াছে মনে করে। আর সাধারণ দুনিয়ার এই যুগে বেনেতির কারবারে আপনাকে মানুষের বিক্রয়ও করিতে হয়; নতুবা মানুষ তাহার হাতের মুঠা বন্ধ করিয়া অনাহারে দুনিয়াকে মারিবে। মাঝে মাঝে গিরির মত অবিবেচনার কার্যে ক্ষণিকের জন্য নতুন ধারার মানুষের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু সে ঐ ক্ষণিকের জন্য; ক্ষণিকের জন্য আপনাকে ভাসাইয়া তুলিয়া সে আবার তলাইয়া যায়।

যাক্, যাহা বলিবার কথা তাহা এই—গিরির প্রত্যাখ্যানে বিপিনের ধনের অহঙ্কারে ঘা লাগিয়াছে, সে অপমান বোধ করিয়াছিল। সে গিরিকে সাহায্যের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। শুধু যে নির্লিপ্তভাবে ত্যাগ করিল তাহা নয়, তাহাকে জব্দ করার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ও তাহার ছিল। সে আপন ঘরে খায়-দায়, গিরির কথা মনে মনে অহরহ ভাবে, কিন্তু প্রকাশ্যে কোন খোঁজখবরই

লয় না। পথেঘাটে পাঁচুর মায়ের সঙ্গে দেখা হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ও কথা তোলে না।

'খাইতে না দিয়া বাজীকর বাঘ বশ করে', এ কথাটার উপর অগাধ বিশ্বাস বিপিনের।

গিরির মনেও একটা সঙ্কল্প ছিল—সে ধনকে অবহেলা করিবে ঘৃণা করিবে, ধনীর দুয়ারে সে হাত পাতিবে না। বিশেষ করিয়া ওই বিপিনের সংস্রবে সে প্রাণান্তেও আসিবে না। সে পাঁচুর মাকে কহিল—পাঁচুর মা, তোমরা ত খেটে খাও, কি খাটুনি তোমাদের জোটে?

পাঁচুর মা কহিল—আমাদের কথা বাদ দাও মা, পুরুষে খেটে আনে, আমরা মেয়েরা দুটো মাছ ধরে আনি, দুটো শাক-পাতা তুলে আনি, সে কি দিন চলা—না বেঁচে থাকা!

গিরি কহিল—যাদের বাড়িতে পুরুষ নেই?

—পুরুষ যাদের নাই, তাদের মা শতেক-খোয়ার, তারা কেউ খেতে পায় না—আবার কারুর রাজার হাল।

গিরি চমকিত হইয়া কহে—রাজার হাল? সে কি করে হয় পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা কহিল—সে কথা শুনতে তোমাদের নাই মা; তোমরা সৎ জাত—

গিরি উত্তপ্ত হইয়া কহিল—জাতির কথা তুলো না পাচুর মা। বামুন বাগদী বলে জাত আর নাই, আছে বড়লোক আর গরীব লোক। আমি ত বলেছি, আমি গরীব—আমি তোমাদের সঙ্গে একজাত।

পাঁচুর মা বিব্রত হইয়া কহিল—তা হোক, সে শুনে কি করবে মা?

গিরি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—না, তুমি বল।

পাঁচুর মা ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল—ইজ্জৎ বিক্রি করে মা, তারা বলে খেয়ে-পরে ত বাঁচি—তার পর ধম্ম। ধম্ম আমায় স্বগ্‌গে দেবে—তা স্বগ্‌গে আমার কাজ নাই। সে—তুমি—

গিরি বাধা দিয়া কহিল—থাম পাঁচুর মা, ও কথা ত বলতে আমি বলি নাই তোমাকে।

পাঁচুর মা অবাক হইয়া গেল, সে কি বৌমা, তুমিই ত জোর করে—

উত্তেজিতা গিরি অতি দৃঢ়তার সহিত কহিল—কক্ষনো না, কক্ষনো আমি ও কথা বলতে বলি নাই তোমাকে।

পাঁচুর মা এই মেয়েটির অন্ত পাইল না, সে ভাবিতে লাগিল, এ কি ধারার মানুষ?

অনেকক্ষণ পরে কহিল—এক কাজ কর বৌমা, তুমি ধান ভানার কাজ কর, তুমি নিজে ভাপা করবে, আমি তোমার ভেনে কুটে দেব; তাতেই তোমার একটা পেট—

গিরি বর্তাইয়া গেল; সে পরম কৃতজ্ঞতাভরে কহিল—সে ত খুব ভাল হয় পাঁচুর মা, কিন্তু দেবে কে?

পাঁচুর মা হাসিয়া পরম তাচ্ছিল্যভরে কহিল—তার ভাবনা কি? আজই আমি মোটা মোড়লকে বলছি—

—পাচুর মা!

গিরির কণ্ঠস্বরে পাঁচুর মা হতভম্ব হইয়া গেল, বুঝিতে পারিল না ইহার মধ্যে তাহার কি অপরাধ হইয়া গেল। বিস্ময়ের ঘোরটা তাহার কাটিতেই সে ঈষৎ উষ্মাভরে কহিল—কি ধারার

মানুষ মা তুমি, রাগের কথা ত কিছু বলি নাই আমি!

এ উত্তরে গিরি শুধু অপ্রতিভই হইল না—আহতও হইল। সত্যই ত, এরূপ রুক্ষতার হেতু কিছু হয় নাই। আর যদি হইয়াই থাকে, অজ্ঞাতে যদি কোন আঘাতই পাঁচুর মা দিয়া থাকে, তাহার জন্য ওকে দোষ দেওয়া চলে না, তাহার জন্য কটু কথা বলিবার তাহার অধিকারই বা কি? ওই যে নারীটি, দাসীবৃত্তি যার ব্যবসায়, যাহার উপর বহুযুগের সামাজিক অধিকারের প্রভুত্বের অভ্যাসে এই কটু কথা সে বলিয়াছে, তাহার উপর সত্যকার প্রভুত্বের দাবী ত কিছু নেই তাহার। তবে থাকিত—থাকিতে পারিত, যদি তাহার অর্থ থাকিত।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখটি নীচু করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা সে কহিল—আর কারও ঘরে ধান পাওয়া যায় না পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা কহিল—আর কার অবস্থা আছে মা? যে ধানটা তারা মজুরী দেবে সে ধানটা থাকলে তাদের পেটের ভাত হবে। এ গাঁয়ে ধান পরকে দিয়ে চাল করিয়ে নিতে এক ওই মোটা মোড়ল।

গিরি কহিল—দাসীবিত্তিও একটা মেলে না পাঁচুর মা?

—মেলে বৈকি মা, তবে এ গাঁয়ে দাসী রাখতেও ওই মোটা মোড়ল। তবে শহরের বাইরে বেরুলে মেলে। তা তোমার এই সোমথ বয়স, এ বয়সে ত মা বাইরে বেরুনো হয় না, তার বিপদ অনেক।

গিরি ক্ষিপ্তার মত জিজ্ঞাসা করিল—ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার কি কোন উপায় নাই পাঁচুর মা?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে পাঁচুর মা হতবাক্ হইয়া গেল, কতক্ষণ পরে সে কহিল—আমি ত উপায় বললাম বৌমা, মোটা মোড়লের কাছে ধান নাও, ভান।

গিরি কহিল—না না, তুমি এখন যাও পাঁচুর মা, আমি একটু শুই। উত্তেজনায় তখন সর্বশরীর তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যে রুদ্ধ কান্না তাহার বুকের মাঝে কয়দিন হইতে স্তরে স্তরে জমা হইয়া আছে, সব যেন আজ নিঃশেষে বাহির হইয়া আসিতে চায়। কান্না আজ তাহার সেই বিসর্জিত শিশু-দেবতাটির বিগ্রহের তরে, কান্না তাহার হতভাগ্য স্বামীর তরে, কান্না আজ তাহার নিজের তরে, জীবনের তরে। হায়, বাঁচিবার আর ত তাহার কোন উপায়ই নাই!

পাঁচুর মা যায় নাই, সে পরম স্নেহভরে তাহার সর্ব অঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল—কেঁদো না মা, কেঁদো না, ছিঃ—

গিরি ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিল—তুমি যাও, তুমি যাও পাঁচুর মা আমায় একটু কাঁদতে দাও।

ষোল

গিরি সঙ্কল্প করিল সে মরিবে। এমন করিয়া আপনাকে বিক্রয় করিয়া বাঁচার অপেক্ষা মরাই সহস্র গুণে কাম্য। আর মরিবে সে এই অনাহারে শুকাইয়া শুকাইয়া, তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াই সে মরিবে, যেন তাহার যাতনার প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসটি সে রাখিয়া যাইতে পারে। সে দীর্ঘশ্বাস যেন অভিশাপ হইয়া এই বিকিকিনির সংসারে বেনিয়ার অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীর সোনার বর্ণটাকে মসীময় করিয়া দেয়। হায় রে, হতভাগিনী নারী জানে না ঐ রাক্ষসীর অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিতে, ঐ রাক্ষসীর চরণযুগলের অলক্তক রাগ যোগাইতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কত লক্ষ বলি হইয়া যাইতেছে, তবু তাহার পায়ের রং মনোমত হইতেছে না, অধরোষ্ঠে হাসির রেখা ফুটিতেছে না!

এই সঙ্কল্প লইয়া পাঁচদিন সে কিছু খায় নাই। শুধু জলের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে। পাঁচুর মা কত সাধ্যসাধনা করিয়াছে, তবুও না। তাহাকে সে বলিয়াছে শরীর বড় খারাপ পাঁচুর মা, আমার অসুখ করেছে।

পাঁচুর মা নিজে হইতে সেদিন সেরখানেক চাল, কয়টি বেগুন, মূলা আনিয়া দিয়া কহিল—বৌমা, ওঠ, উঠে রেঁধে দুটো খাও, না খেয়ে খেয়ে তোমার শরীরের এমন হাল হয়েছে, খেলে-দেলেই শরীরে বল পাবে, ফুর্তি পাবে।

গিরির মাথায় যেন আগুন জ্বলিতেছিল, সে অবজ্ঞাভরে সেই শ্রদ্ধার দানগুলোকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—আমার কি এতই দৈন্যদশা হয়েছে পাঁচুর মা যে তোমার কাছেও ভিক্ষে আমার নিতে হবে?

পাঁচুর মায়ের মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল, সে চাল তরকারিগুলি আপনার আঁচলে তুলিয়া নীরবে চলিয়া গেল। একটি কথাও বলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না।

গিরি আপন মনেই আপনাকে কহিল—ওর ভিক্ষেই বা কেন নেব আমি; তার চেয়ে যে আপনাকে বিক্রি করাও ভাল আমার।

এর পর হইতে পাঁচুর মা আর আসে নাই, গিরিও তাহাকে ডাকে নাই। সে আজ দু'দিনের কথা।

কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা! পেটের মধ্যে সমস্ত অন্ত্র যেন গুটাইয়া পাকাইয়া যাইতেছে। একটা দুঃসহ দাহে যেন ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছে। গিরি মাঝে মাঝে এক এক ঘটি জল ঢক্ ঢক্ করিয়া গেলে, পরমুহূর্তে তাহাও বমি হইয়া সব উঠিয়া যায়। চারদিনের সন্ধ্যা হইতেই এ যাতনাটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রাতঃকাল হইতে মাঝে মাঝে যেন চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, দৃষ্টিতে কিছু পড়ে না, কানে কিছু আসে না, অথচ মন সবটুকু অনুভব করে। মরণের ছায়া-ছবি যেন চক্ষের সম্মুখে নাচিতেছে!

কী বীভৎস! গিরির মনে হইল চক্ষের সম্মুখে ওই অন্ধকার, ওই অন্ধকার দিয়া একখানা শিথিল কঙ্কালময় হস্ত ধরণীর সমস্ত ছবি তাহার চক্ষের সম্মুখে মুছিয়া দিয়া চোখ টিপিয়া ধরিয়াছে। তাহার অবরুদ্ধ কানের মধ্যে সেই কঙ্কালের কৌতুকের খিল্ খিল্ হাসি যেন বাজিয়া উঠিতেছে। সে যেন কৌতুক করিয়া বলিতেছে—বল ত আমি কে?

সমস্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া গিরি প্রাণপণে জাগিয়া উঠিতে চাহিল। আবার অতি অল্পক্ষণ পরেই সেই অনুভূতি তাহাকে এই ধরণীর বুক হইতে সেই হাতখানা সবল আকর্ষণে যেন ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। পিছনে তাহার অবহেলার ঘর-দ্বার নির্মম সংসার মমতাময়ী হইয়া তাহারই জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে।

সভয়ে আবার গিরি আপনাকে ঝাঁকি দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। শীতের প্রভাতে সেদিন সমস্ত ধরণী নিবিড় কুয়াশায় আচ্ছন্ন, বাষ্পকুণ্ডলীর মাঝে সব যেন লুপ্ত হইয়া যাইবে— গাছের পাতা হইতে শিশিরবিন্দু বারিধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। সুতীক্ষ্ণ হিমকণায় ধরণীর জীবন জর্জর হইয়া উঠিয়াছিল।

চেতনা প্রবুদ্ধ করিয়াও গিরি দেখিল সমস্ত ধরণী ধূমাচ্ছন্ন, সে সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল—পথ নাই, পথ নাই, মাটির বুকে ফিরিয়া যাইতে কি পথ নাই? অল্পক্ষণ পরে সে বুঝিল, এ কুয়াশা, আশ্বস্ত হইয়া সে এদিক-ওদিক চাহিল।

আহার! আহার! একটা কিছু, যা আহার করিয়া সে এই বিভীষিকার হাত হইতে নিস্তার পায়! সে খানিকটা জল ঢক ঢক করিয়া খাইল, পরক্ষণেই একটা উদগ্র উদগীরণের অনুভূতিতে সর্বাঙ্গ মোচড় দিয়া উঠিল। সে আপ্রাণ চেষ্টায় উঠিয়া পায়ের কাছের লেবু গাছটার কয়টা পাতা কচলাইয়া শুঁকিতে আরম্ভ করিল; একটা লেবুও নজরে পড়িল। গাছটা খুব বড় নয়, গিরি ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া লেবুটিকে পাড়িয়া লইয়া, দাঁত দিয়া কাটিয়াই লেবুটি লেহন করিতে লাগিল।

লেবুটি চুষিয়া তাহার বমির ভাবটা কাটিতেই সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল।

এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে এতক্ষণে তাহার নজরে পড়িল—দাওয়ার এক কোণে পড়িয়া একটা মূলা আর অতি অল্প কতকগুলা চাল, পাঁচুর মায়ের তুলিয়া লইয়া যাওয়া চাল-তরকারির অবশেষ।

আতঙ্কে, বুভুক্ষায় গিরি মূলাটা লইয়া কচ্‌কচ্‌ করিয়া চিবাইয়া খাইল। তারপর চাল কটি ঘটির জলে ভিজাইয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। নিমীলিত চোখ হইতে দু'ফোঁটা জল টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল —মরিতে পারিল না সেই দুঃখে, না মরণের হাত হইতে পরিত্রাণের আশ্বাসে কে জানে!

কতক্ষণ পরে চাল কটি সে অল্পে অল্পে চিবাইয়া খাইয়া ক্ষুধার দুর্দান্ত জ্বালা কতকটা জুড়াইল; দেহেও যেন কতকটা বল পাইল।

রাজ্যের ভাবনা তাহার মাথায়, তাহাকে বাঁচিতে হইবে। মরিতে সে পারিবে না, মরণ অতি ভয়ঙ্কর, অতি বীভৎস! জ্ঞান সত্ত্বে, সাধ্য সত্ত্বে, সে ওই কঙ্কালের হিমানী-স্পর্শময় আলিঙ্গনের ছোঁয়াচ সহ্য করিতে পারিবে না।

কিন্তু বাঁচিবেই বা কি করিয়া? এ দেনা-পাওনার সংসারে সম্বল না থাকিলে ত বাঁচা যায় না! স্বামী হোক্‌, স্ত্রী হোক্‌, মাতা হোক্‌, পুত্র হোক্‌—নিঃসম্বলের ত উপায় নাই! স্ত্রীব

অক্ষমতা স্বামী ক্ষমা করে না, স্বামীর অক্ষমতা স্ত্রী ক্ষমা করে না। তাহার মনে পড়িল, এই ত সেদিন শ্রীমন্ত তাহার কাছেই তাহার গোপন সম্বল হইতে কয়টা টাকা লইয়াছিল, তাহার জন্য সে-ই ত নিজে কত গঞ্জনা দিয়াছে। শ্রীমন্তের মুখের উপরেই সে বলিয়াছিল—এমন চামার স্বামীর হাতে পড়ার চেয়ে মরণও ভাল।

সে-সময়টা প্রাতঃকাল, সূর্যও তখন ভাল করিয়া উঠে নাই, যখন সারা রজনীর বিশ্রাম অন্তে মানুষ বিগত দুঃখ গ্লানি ভুলিয়া মুহূর্তের জন্য বিমলানন্দ ভোগ করে, তখনই। শ্রীমন্তের মুখে কথা ফুটে নাই—সে শুধু বলিয়াছিল—সকাল বেলায় আমায় গাল দিয়ো না বলছি।

সে বলিয়াছিল—আমার নিলেই আমি বলিব। গাল দেব।

তখন চোখ থাকিতেও লক্ষ্য করে নাই, ওই নিঃসম্বলের মুখখানা কেমন হইয়া গিয়াছিল। তখন মনেও একবার হয় নাই ওই মানুষটির বুকে এ আঘাত কতখানি লাগিতে পারে। আজ কথাটা মনে পড়িয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক চিরিয়া ঝরিয়া পড়িল, মনে হইল হয়ত বা অক্ষয় হইয়া এ কাঁটা তাহার বুকে বসিয়া আছে। আবার মনে হইল, সেদিনের তাহার সে উষ্মা সে ত সত্যই স্থায়ী নয়, সে অভাবের তাড়নায় মুহূর্তের ভুল, সে বিকৃত ক্রোধ। পরক্ষণেই মনে হইল তাই বা কেন, এ অসন্তোষ ত অহরহ তাহার বুকেই ছিল, সে সত্য। বরং সে সত্যকে গোপন করিয়া মুখে হাসি মাখিয়া নিরীহ শ্রীমন্তকে সে এতদিন বঞ্চনা করিয়াই আসিয়াছে; ভালবাসার নামে প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে।

আত্মগ্লানির চরম উত্তেজনায় এক মুহূর্তে তাহার নিজের সমস্ত জীবনটা যেন মেকী হইয়া দাঁড়াইল। কি দাম তাহার ভালোবাসার! দুইটা টাকা! তবে একশো, এক হাজার, পাঁচ হাজারের জন্য সে না পারে কি? ওই ত দেনা-পাওনার কষ্টিপাথরে তাহার ভালবাসার রেখার মধ্যে খাদের অংশটাই জ্বল জ্বল করিতেছে। গিরির অধরে একটা হাসির রেখা খেলিয়া গেল। অদ্ভুত সে হাসি—হাসির রূপই স্বতন্ত্র। আনন্দই সংসারে হাসির উপাদান, কিন্তু গিরির হাসির রেখায় রেখায় জ্বালার তীব্র শিখা!

মিথ্যা, মিথ্যা, সে কাহাকেও ভালবাসে নাই, শ্রীমন্তকে না, গৌরীকে না! সে ভালবাসে শুধু নিজেকে, সমস্ত সংসারটার রূপ যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে নিমেষে পাল্টাইয়া গেল—ধরণীর সুশ্যাম অঙ্গাবরণখানি কে যেন উন্মোচন করিয়া লইয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল ইহার বীভৎস কদর্য ক্ষত-ভরা কুৎসিত স্বরূপ—ধরণীর সে যেন রাক্ষসী, ব্যভিচারিণী রূপ ওই শ্যামাঞ্চলের আবরণ দিয়া রাক্ষসী উদরের জন্য সন্তানের মাংস খায়, আপনাকে বিক্রয় করে, ব্যভিচারের ফলে কুৎসিত ক্ষতে তাই তাহার সর্বাঙ্গ ভরা। ধরণীর বুক চিরিলে পাওয়া যায় শুধু সন্তানের কঙ্কাল—মেদ মজ্জা, তাহাতেই ধরণী দিন দিন পুষ্ট হইতেছে।

গিরি উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল আপন অনশন-শীর্ণ দেহখানার পানে চাহিয়া, তাহার ধূলি-মলিন জীর্ণতার জন্য সারা অন্তর তাহার ঘৃণায় ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল, আরও ঘৃণা জাগিল তাহার আপন অঙ্গের জীর্ণ-মলিন বস্ত্রখানার জন্য।

সে আপনার ভাণ্ডার খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

ভাণ্ডার খুঁজিয়া বাহির হইল—ষষ্ঠীর পূজার জন্য চাহিয়া-আনা সেই আধ পোয়াটেক আতপ চাল, ঘরের কোণে ইঁদুরে খাওয়া কয়টা আলু। ইহাতেই তাহার এক বেলা চলিয়া যাইবে।

কাঠ-কুটা চাই, গিরি দ্বিধা না করিয়া সম্মুখে ঢেঁকি-ঘরের চালাটায় খড়, বাতা টান মারিয়া ছাড়াইয়া লইল। দারুণ উত্তেজনায় অনশনের দুর্বলতা তখন তাহার কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

চালাখানা হইয়া উঠিল কদর্য; সেদিকে গিরি একবার তাকাইলও না। উনানের মুখে সমস্তগুলা জড় করিয়া ছেঁড়া গামছাখানা টানিয়া লইয়া খিড়কির পথে সে বাহির হইয়া গেল।

দেহখানার ধূলিমালিন্য উত্তমরূপে মার্জনা করিয়া কাপড় কাচিয়া ঘাটে উঠিল। হেঁট হইয়া সে কাপড় নিঙড়াইতেছে, বক্ষবাস সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়া সম্মুখের পানে, নিবিড় কুয়াশার মধ্য দিয়াও একটা মানুষের একাংশ দেখা যায়, আর দেখা যায় একটা চোখ। অতি নিকটেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টির লোলুপতা দিয়া সে তাহার অঙ্গ যেন লেহন করিতেছে। শ্মশানচারী শকুন যেন সদ্য-পরিত্যক্ত শবের পানে বৃক্ষশীর্ষ হইতে চাহিয়া আছে। দারুণ উত্তেজনায় গিরি যেন কেমন হইয়া গেল। সে সেই অনাবৃত অঙ্গেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাতছানিতে ওই লোকটিকে ডাকিয়া ত্বরিত পদে আপন ঘরে আসিয়া উঠিল।

গিরি বুঝিয়াছিল সে কে।

বিপিন যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন গিরি কাপড় ছাড়িয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে।

অস্বাভাবিক রূপে প্রদীপ্ত মুখ, চক্ষে জ্বালা, সারা অঙ্গে শুষ্ক দৃঢ় সংকল্পে উপবাসহেতু একটি মহিমান্বিত শীর্ণতা, ললাট পাণ্ডুর, ভাস্বর—একটি প্রদীপ্ত ব্রতচারিণী রূপ! সে মূর্তির সম্মুখে বিপিন যেন কেমন হইয়া গেল। সে তবু সাহস করিয়া কহিল—পাঁচুর মা বলছিল তুমি ক'দিন খাও নি।

গিরি একদৃষ্টে ওই লোকটির দিকে চাহিয়া ছিল, সে দৃষ্টিতে নারীর লজ্জা ছিল না, মাধুর্য ছিল না—ছিল শুধু ঘৃণা, জ্বালা। কি বীভৎস ওই লোকটি!

ভোগের পুষ্টিতে সর্ব অঙ্গে মেদবহুল কদর্য স্থূলতা, মুখের রেখায় রেখায় কাপুরুষ ধূর্ততার ছাপ, ছোট ছোট দুটি চোখে শঙ্কিত কিন্তু লালসা-ভরা নির্নিমেষ দৃষ্টি। গিরির ইচ্ছা করিতেছিল—বর্বরটাকে সে হত্যা করে।

বিপিন গিরির এই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিতেছিল। বুকের মধ্যে একটা কম্পন মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠিতেছিল। একবার ভাবিল সে পলাইয়া যায়। পলাইবার জন্য সে ফিরিলও, কিন্তু লোভী মনের তাড়নায় সে আবার ঘুরিল।

আবার সে কহিল—পাঁচুর মা বলছিল তুমি ক'দিন খাও নি—

ওই একটি ব্যতীত অপর কোন সম্ভাবণ তার কম্পিত অন্তরে জাগিল না।

গিরি ক্ষিপ্তার মত সহসা কহিল—তাতে তোমার কি? তোমার কি? কেন তুমি এমন নির্লজ্জের মত আমার পানে তাকিয়ে থাক, কেন—কেন—

গিরি হাঁপাইতেছিল, অস্বাভাবিক জ্বালায় চোখ দুইটির প্রতি শিরাটি রক্তরাঙা, সমস্ত দেহ তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

বিপিন প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—বৌ, আমি তোমায় ভালবাসি—

পরম ঘৃণাভরে গিরি কহিল—না—না—আমি চাই টাকা—ভাল খাবার, গহনা, কাপড়—

বাক্য আর শেষ হইল না—দুর্বল দেহে বিপুল উত্তেজনায় গিরি জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল। দাওয়ার কানায় গাঁথা ইঁটের উপর কপালটায় আঘাত পাইয়া গভীর একটা ক্ষত হইয়া গেল, ক্ষতের রক্তে সমস্ত মুখখানা তাহার রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

কপালের রক্তধারা নাকের কোল বহিয়া ক্ষিপ্তা নারীটির ওষ্ঠ বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—যেন নিজের রক্ত সে নিজেই পান করিতেছে।

ও যেন ছিন্নলতা।

বিপিন পলাইয়া গেল।

* * *

চোখ মেলিয়া গিরি দেখিল—জলে সর্বাঙ্গ তাহার ভাসিয়া গেছে—আর তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া পাঁচুর মা। পরম আশ্বাসে সে আবার চোখ মুদিল। আপনার কপালে হাত বুলাইয়া ক্ষতটা অনুভব করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বুকের জমা-করা সমস্ত গ্লানি যেন সে নিঃশ্বাসে বাহির হইয়া গেল।

পাঁচুর মা কহিল—উঠতে পারবে মা! ওঠ দেখি আস্তে আস্তে—ভাত কটা যে পুড়ে গেল। জল শুকাইয়া ভাত তখন ধরিয়া গিয়াছে, একটা দুর্গন্ধে সমস্ত বাড়িটা ভরিয়া উঠিয়াছে।

গিরির উদরের মধ্যে তখনও আগুন জ্বলিতেছে—আহার্যের নামে ক্ষুধাতুরার চক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল, সে উঠিয়া বসিল। সমস্ত কথা ভাবিয়া স্মরণ করিবার অবসর এমন কি প্রবৃত্তিও বোধ হয় হইল না; সে টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া উনানের মুখে বসিয়া ঐ কদর্য দগ্ধ ভাতের হাঁড়িটা নামাইতে গেল।

পাঁচুর মা কহিল—ভিজে কাদা মাখা কাপড়খানা ছাড় মা আগে—

সে কথা যেন গিরির কানেই গেল না; সে কহিল—এক কাঁকড় নুন এনে দিতে পার পাঁচুর মা? এক কাঁকড় নুন!

* * *

দিবসান্তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতে না ঘনাইতে সেদিন গিরি ঘুমে ঢলিয়া পড়িল। এ কয়টা দিনের ঘুম যেন নয়ন-রেখার তটভূমিতে অপেক্ষা করিয়াছিল; লক্ষ্মীর প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল।

* *

আরও একটি সুসংবাদে গিরির মন সেদিন আশ্বস্ত হইয়াছিল, পাঁচুর মা তাহার জন্য ধানের ব্যবস্থা করিয়াছে, ও-গাঁয়ের ভবি মোড়ল ধান দিতে রাজী হইয়াছে।

পাঁচুর মা সংবাদ দিতে গিরি যেন মূক হইয়া গেল, কোন্ ভাষায় কেমন করিয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না।

পাঁচুর মা তাহার ওই নীরবতায় শঙ্কিত হইয়া উঠিল—এই সৃষ্টিছাড়া মেয়েটি যে আবার কি কহিয়া বসিবে, সে যে তাহার ধারণার অতীত। এত করিয়াও যে সে মেয়েটির মনের কূল-কিনারা পাইল না। সে শঙ্কিত ভাবে কহিল—কি বলছ মা, আমি ত কথা দিয়ে এসেছি—

গিরির চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; সে কহিল—কি বলব ভেবে যে পাচ্ছি না মা, ইচ্ছে করছে তোমার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে প্রাণ খুলে আজ কাঁদি; পাঁচুর মা, তুমি আমার আর-জন্মে মা ছিলে!

স্বর্গ মানবচক্ষুর অগোচর—স্বর্গীয় বস্তুর সহিত মানুষের পরিচয় নাই, কিন্তু পাঁচুর মার মুখে যে হাসি, যে তৃপ্তির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল তার একমাত্র বিশেষণ ওই স্বর্গীয়, সে কৃত্রিম বিনয়ে এ কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করিল না।

নিরক্ষরা সরলা পল্লীনারীটি একমুখ হাসিয়া কহিল—তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে মা।

আরও দুই-চারিটা কথার পর পাঁচুর মা চলিয়া গেল—গিরি আঁচল পাতিয়া মাটির উপর শুইয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। প্রভাতের কুয়াশা কাটিয়া গেছে—আকাশ প্রগাঢ় নীল; শীতের মধ্যাহ্নের সূর্যকিরণে ধরণী যেন কত উপভোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের বুকে মিশিয়া চলমান বিন্দুর মত কয়টি চিল নিরন্তর উর্ধ্বে উড়িয়া চলিয়াছে। দূরে পালেদের বাঁশ-বনের শীর্ষগুলি বায়ু-প্রবাহে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে।

গিরির আজ এগুলি বেশ লাগিল।

দাওয়ার কোলে করবী গাছটি রাঙা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গিরির মনে পড়িল এ গাছটি তাহার নিজের হাতে রোপিত। কিন্তু যার পরিচর্যায় সে আজ এমন রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে গৌরী!

আহা, আজ যদি গৌরী কাছে থাকিত!

সম্মুখে চালাটার উপর দুইটা পায়রা বসিয়া একটা অপরটার মুখে আহার তুলিয়া দিতেছিল। একটি মা, অপরটি সন্তান। ছানাটা পাখার ঝাপ্টা দিয়া আগাইয়া আসিয়া আহারের দাবী করিতেছিল—মা উড়িয়া গেল, ছানা পারিল না। সে ফিরিয়া ছানাটাকে চঞ্চুর আঘাতে চঞ্চল করিয়া আবার উড়িল, এবার ছানাটাও উড়িল।

গিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ঘুরাইল।

হায়! তাহার বুক জুড়াইয়া যদি একটি শিশু থাকিত! সেও তাহার অবসর তাহাকে লইয়া এমনি ভাবে কাটাইতে পারিত!

ওই বিষণ্ণ অবসন্নতার মধ্যেই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

একটা আর্ত কলরোলে তাহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল, চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল।

বাগ্দীপাড়ায় কাহারা যেন কলরোল করিয়া কাঁদে। গিরি কান পাতিয়া শুনিল—সমস্ত কলরোল ছাপাইয়া নারীকণ্ঠে কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া মর্মস্পর্শী কান্না কাঁদিতেছে। বিলাপের ভাষাও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু স্পষ্ট হইয়া কানে আসিয়া ধরা দেয়।

ওরে সোনা—ওরে যাদু আমার—

গিরির বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি গিয়া সম্মুখের মুক্ত দুয়ারটা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

কতক্ষণ পর কে জানে পাঁচুর মায়ের গলা শোনা গেল—কৈ গো, বৌমা কৈ? বলি ঘরে রয়েছ না কি?

গিরি দুয়ার খুলিয়া দুয়ারের বাজু ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বাগ্দীপাড়ার কলরোল নীরব হইয়া গেছে, কিন্তু নারীকণ্ঠের সকরুণ বিলাপ মন্থর গতিতে তখনও চলিয়াছে। বেশ বোঝা যায় শোকাতুরার দেহ যেন আর পারে না—কিন্তু প্রাণ মানিতেছে না—দূর সুদূর কোন অদৃশ্যলোক পর্যন্ত আহ্বান করিয়া হারানো সোনাকে তাহার ফিরাইতে চায় সে।

ওরে সোনা—ওরে যাদু আমার রে!

পাঁচুর মা বলিতেছিল—মনে করলাম দুপুরবেলায় এসে উঠোনটা ঢেঁকিশালটা নিকিয়ে যাব —তা বাড়ি গিয়ে এক বিপদ—

গিরি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—কে এমন করে কাঁদছে পাঁচুর মা!

পাঁচুর মা কহিল—তাই ত বলছি মা গিয়েই দেখি আমাদের গোকুলের সন্তানটি নষ্ট হ'ল —এই নিয়ে পাঁচটি গেল। কি যে দোষ ধরেছে মা, কোঁকে একটা হলেই কোলেরটা যাবে। এই আবার পোয়াতি—সঙ্গে সঙ্গে কোলেরটা গেল।

আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে গিরি কহিল—যা করতে হয় কর পাঁচুর মা, আমায় আর ডেকো না, আমার বড় মাথা ধরেছে।

পাঁচুর মা কহিল—এই অবেলায়—একেবারে কাপড়-চোপড় কেচে—

গিরি কহিয়া উঠিল—না না পাঁচুর মা, ও কান্না আমি সইতে পারি না, আমায় ডেকো না।

সে আবার ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

* * *

অন্ধকার গৃহ-মধ্যে উপাধানে মুখ গুঁজিয়া গিরি শুইয়া পড়িল। রুদ্ধ-দ্বারে সন্তানহারা হতভাগিনীর বিলাপধ্বনি প্রতিহত হইয়া বায়ুপ্রবাহে দিক-দিগন্তরে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

রুদ্ধদ্বারের এপাশে শুনা যায় বিলাপের অতি ক্ষীণ রেশ একটি, মাঝে মাঝে দুই-একটা শব্দ।

গিরির মনে হইল—তাহার ভাগ্য ভাল, তাহার এই বঞ্চনার বেদনার চেয়ে ওই বিয়োগের

দুঃখ ঢের বড়! কিন্তু এ চিন্তায় সে আনন্দই পাইল না। একটি সকরুণ ম্লানিমায় মন তাহার কেমন উদাসী হইয়া উঠিল—শূন্য মন, শূন্য সংসার—শূন্য দৃষ্টিতে সে ওই অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

এমনি অবস্থায় আবার কখন সে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে নিদ্রা ভাঙিল তাহার রুদ্ধদ্বারে কাহার মৃদু করাঘাতে। কে যেন ডাকে!

গিরি উঠিয়া বসিল।

নিস্তব্ধ নীরব সব—পাখি ডাকে না, মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। ঘরের জীর্ণ ছিদ্রময় চালের মধ্য দিয়া ব্যোমপথ দেখা যায়—অস্পষ্ট অন্ধকার, আরও ঊর্ধ্বে দেখা যায় খানিকটা আকাশ, সে আকাশ গাঢ় কৃষ্ণ নীল—কয়টি প্রদীপ্ত, প্রোজ্জ্বল বিন্দু। গিরি বুঝিল দিনের অবসান হইয়া গেছে, এ রাত্রি!

রুদ্ধদ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। গিরি বুঝিল পাঁচুর মা শুইতে আসিয়াছে; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া ডাকিল—পাঁচুর মা!

দাওয়ার উপর খানিকটা চাঁদের আলো তেরছা ভাবে সুশান্ত মহিমায় পড়িয়াছিল—তাহারই আভায় উপরের অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। গিরি দেখিল দুয়ারের পাশে একটি মানুষ দাঁড়াইয়া, জ্যোৎস্নার স্বচ্ছতার মধ্যে গিরির মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হইল না—সে বিপিন!

চিৎকার করিতে তাহার স্বর ফুটিল না, ঘরে ঢুকিতে পা উঠিল না—একমুহূর্তে গিরি যেন কেমন হইয়া গেল।

নিস্পন্দ, নির্বাক!

দাওয়ার চন্দ্রালোকদীপ্ত অংশটুকুর উপর বিপিন কি নামাইয়া দিল।

চন্দ্রালোকের মৃদু অস্পষ্টতার মধ্যে প্রদীপ্তরূপে দেখা না গেলেও জিনিস চেনা গেল—একখানি ডালায় সাজানো জিনিসের সম্ভার! একদিকে দেখা যায় কাপড়, তাহারই পাশে নতুন বাটিতে বোধ করি আহার্য, এদিকে আরও কত কি পূর্ণরূপে চেনা যায় না, কিন্তু ওই এমন মৃদুস্নিগ্ধ আলোকেও সেগুলা ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে, কাঁচের জিনিস বলিয়া বোধ হয়।

গিরি একদৃষ্টিতে ওই দ্রব্যসম্ভারের পানে চাহিয়া রহিল।

বিপিন মৃদুস্বরে আবার কহিল—তুমি চেয়েছিলে বৌ।

গিরির তবু কোন সাড়া নাই, তাহার দৃষ্টি ওই দ্রব্যসম্ভারের উপর।

বিপিন ভরসা পাইল, কহিল—কাপড় এনেছি, খাবার এনেছি, তেল, সাবান, চিরুনি, আলতা—সব এনেছি, টাকা নাও, গয়না আমি দেব। আরও—সহসা বিপিন নীরব হইয়া চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের ঢেঁকিশালার অস্পষ্ট অন্ধকার হইতে কে ডাকিয়া উঠিল—মোটা মোড়ল!

বিপিন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঢেঁকিশালার দিকে না চাহিয়াও সে বুঝিয়াছিল সে কে। মুহূর্ত-মধ্যে সে আত্মসম্বরণ করিয়া ত্বরিত পদে খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। গিরি তখনও তেমনি দাঁড়াইয়া।

ঢেঁকিশালায় দাঁড়াইয়া ছিল পাঁচুর মা আর পাঁচু। পাঁচু মাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিল।

পাঁচুর মা উঠানে নামিয়া আসিতেই পাঁচু কহিল—মা!

পাঁচুর মা ফিরিয়া দাঁড়াইলে পাঁচু কহিল—ফিরে আয় মা!

পাঁচুর মা কহিল—দাঁড়া।

উত্তেজিত পাঁচু কহিল—না, ফিরে আয় বলছি।

পাঁচুর মা কহিল—চল্ না তুই, আমি যাই।

দৃঢ়ভাবে পাঁচু কহিল—না, এখুনি আয়, নইলে তোর সঙ্গে আমার শেষ!

পাঁচু আর অপেক্ষা করিল না, সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পথের ওপাশেই রামকেষ্ট সাহার বাড়ি, বাড়ি হইতে রামকেষ্ট ডাকিল—পাঁচু!

পাঁচু চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কে?

—আমি রামকেষ্ট।

পাঁচু বিরক্তভাবে কহিল—কি?

খোলা জানালা হইতে রামকেষ্ট কহিল—ধরতে পারলি না রে? কিছু আদায় হয়ে যেত। আর পারলি না দিতে বেটার ধুমসো পিঠে গদাগদ ঘা-কতক।

পাঁচু বিরক্ত ভাবেই কহিল—কি সব আবোল-তাবোল বকছ তুমি?

হাসিয়া সাহা কহিল—আবোল-তাবোলই বটে রে, আবোল-তাবোলই বটে! বাবা, রামকেষ্টর কান খুট্ করলে সাড়া দেয়, চোরের দায়ে ঘুমোবার জো আছে? শালা বিপ্নে ঢুকলো তাও দেখেছি, পালালো তাও দেখেছি—সব—আগাগোড়া।

সাহা হাসিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

পাঁচু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন পথ ধরিল।

পাঁচুর মা গিরির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও গিরি বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া।

পাঁচুর মা কহিল—বৌমা!

গিরি চমকিয়া উঠিল—তারপর পাঁচুর মায়ের পানে চাহিয়া সে কহিল—পাঁচুর মা! এত দেরি কি করে মা!

পাঁচুর মা স্থির দৃষ্টিতে গিরির পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। সহসা গিরির দৃষ্টিতে আবার পড়িল সেই দ্রব্যসম্ভার, সে দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সতেরো

এ সংসারে মানুষকে কঠোর সমালোচক বলিলে তাহার অতি প্রশংসা করা হয়—মানুষ নিন্দুক, পরনিন্দার উপর তাহার একটা সহজাত লিপ্সা আছে, সাদার গায়ে কালি ছিটাইয়া তাহার পরম তৃপ্তি।

প্রভাত হইতে না হইতে রামকেষ্ট-সংবাদ সমগ্র গ্রামের নর-নারীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল। লোকে এখন দিনকতক জাবর-কাটার উপযুক্ত খোরাক পাইয়া প্রবল উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া বসিল। রামকেষ্ট আসিয়া বিপিনকে ধরিল—মিষ্টি খাওয়াতে হবে দাদা। বিপিন উত্তর দিল না, শুধু সলজ্জা বধূটির মত দন্ত বিচ্ছেদ করিয়া হাসিল মাত্র।

রামকেষ্ট কহিল—তুমি আমাকে এ কথা বল নি কেন? তা হ'লে কি ওই বাগ্দী বেটা জানতে পারে, না গাঁয়ে জানাজানি হয়? আমার জানলা থেকে নজর রাখলে কারু এড়িয়ে যাবার উপায়টি নাই বাবা—হুঁ হুঁ!

গভীর আত্মপ্রসাদের সহিত বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সে কথা শেষ করিল। বিপিন তবু কথা কহিল না, রামকেষ্ট কহিল—দাও ত খাইয়ে মিষ্টি তুমি, তারপর নির্ভয়ে চলে যেয়ো দিন-দুপুরে, দেখবো কোন্ শালা কি বলে? আর দেখ না তুমি ওই শালা বাগ্দীর কি করি।

বিপিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তাই ত রামকেষ্ট, মিছিমিছি মেয়েটার কলঙ্ক হ'ল হে—কোন দোষের দোষী নয় সে বেচারী—

জিভের পাশে আর তালুতে সংযোগ করিয়া একটা বিচিত্র শব্দ করিয়া রামকেষ্ট কহিল—মাইরি আমার রসিক নাগর হে—ও নির্দোষী, তুমি নির্দোষী, দুষী লোক আমরা; কেমন? বলি শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়, না কাঁচের আড়ে মানুষ লুকোয়? ওসব চলবে না দাদা, নগদ কিছু ছাড়, এই গোটা বিশ-পঁচিশ, আমরা মদ-মাংস খাই, আর তুমি—

বাকিটা বিপিনের কানে কানে বলিয়া এক তাণ্ডব হাসি হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিপিনকে রাজী হইতে হইল। রামকেষ্ট মাটির উপর একটা চড় কষিয়া উঠিতে উঠিতে কহিল—নির্ভয় তুমি, বে-পরোয়া—যখন খুশি—

মৌন হইয়া বিপিন সম্মতি-লক্ষণ প্রকাশ করিল। রামকেষ্ট প্রবল উৎসাহে উঠিয়া কহিল—ওস্তাদকে একটি খবর দিতে হবে মাইরি, হরিলাল আমাদের হে!

* * *

বেলা দ্বিপ্রহর হইতে না হইতে সারা গ্রামে সংবাদটা বিপুল কলরবে ধ্বনিয়া উঠিল। সে কলরবের প্রচণ্ডতায় গিরি—শ্রীমন্তের আগ্নেয়গিরি মূক বিহ্বল হইয়া গেল।

সে মূক বিহ্বল হইয়া ভাবিতেছিল, আপন অদৃষ্টের কথা—হ্যাঁ, তাহার অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতার চমৎকারিত্ব আছে। নিষ্ঠুরতার ক্রমবিকাশ কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সতেজ একটি লতার মত দিন দিন বাড়িয়া পাকে পাকে তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া চলিয়াছে নাগপাশের মত, লোহার শৃঙ্খলের মত।

হায়, শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনের শেষ যদি এমন করিয়া হইয়া যাইত, গিরি যেন জুড়াইয়া বাঁচিত!

একবার মনে হইল গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়া মরিবে, কিম্বা বিষ—বিষপান করিয়া জুড়াইবে!

চট করিয়া উঠিয়া সে খিড়কির ঘাটে গিয়া কল্কেফুলের গাছটা হইতে কয়টা ফল পাড়িয়া

লইয়া দাওয়ায় আসিয়া ছেঁচিতে বসিল। হাতের পাথরটা উপরে তুলিতেই একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—সেই সেদিনের সেই মৃত্যু-অনুভূতির কথা—সহনাতীত সেই হিমানীশীতল স্পর্শ! সেই উদ্বেগ, সেই যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—যে যন্ত্রণার স্পর্শে সমস্ত চৈতন্য পঙ্গু হইয়া পড়ে—উঃ!

গিরি ফল কয়টা যথাশক্তি সজোরে প্রাচীর পার করিয়া বহুদূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

পাঁচুর মা আসিয়া ডাকিল, বৌমা—

গিরি উত্তর দিল না—তখনও সে মৃত্যুর ভয়ে যেন কাঁপিতেছিল।

পাঁচুর মা কহিল—রান্নাবান্না কর বৌমা। আজ চাল ডাল সব আমি দোকানে ধারে নিয়ে আসচি—কাল ভবি মোড়লের ধান আসবে, কিছু ধান দিয়ে শোধ করলেই হবে।

আবার সে চারিপাশে দেখিয়া কহিল—ও মা, খড়কুটোও যে নাই, দাঁড়াও আমি নিয়ে আসি দুটো।

গিরি অতি ব্যগ্রতায় বাধা দিয়া কহিল—এক কাজ কর ত পাঁচুর মা, খিড়কির ঐ কল্কে ফুলের গাছটা কেটে ফেল। ওতে এখন বেশ ক'দিন রান্নাবান্না চলে যাবে।

—বেশ বলেছ মা, তাই করব, পাঁচুকে বলব আমার, ওবেলা সে কেটে দিয়ে যাবে। আজ-কালের মত আমি দেব এখন, এদিকে গাছটাও শুকিয়ে যাবে।

পাঁচুর মা চলিয়া গেল। কিন্তু গিরির দৃষ্টি বার বার ঐ গাছটার দিকে ছুটিতেছিল। গিরি জোর করিয়া আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল, তবু বার বার ঐদিকে দৃষ্টি যেন ফিরিয়া যায়।

ঠিক কে যেন ডাকে, মাতালের মনকে সুরা যেমন ডাকে।

গিরি অস্থির হইয়া উঠিল। সহসা ঘরের মধ্য হইতে কাটারিখানা বাহির করিয়া আনিয়া গাছটার গোড়ায় নিজেই সে আঘাত করিতে বসিল। আঘাতের পর আঘাত। সে আঘাতে ছোট গাছটা থর্থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

শীতের দিনেও বিপুল উত্তেজনায় ঘর্মাক্তা গিরি বিচিত্র দৃষ্টিতে গাছটার পানে চাহিয়া রহিল।

বাড়ির ভিতর কাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে মানুষ-টিকে গিরি স্পষ্ট চিনিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে আসিয়া মানুষটিকে দেখিয়া যেন পাথর হইয়া গেল।

গিরির ভাগ্যাকাশের ধূমকেতু হরিলাল সম্মুখের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া হি হি করিয়া হাসিতেছে।

একদফা হাসিটা শেষ করিয়া হরিলাল কহিল—জীতা রহো ভাই, জীতা রহো; বহুত আচ্ছা, এহি ত চাহিয়ে।

উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া হরিলাল আবার কহিল—কেয়া ভাই, গরীব আদমী কেয়া কসুর কিয়া আপকো পাশ? একঠো বাত ত বোলনা চাহি—

গিরি এতক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল—কোন্ সাহসে তুমি আমার বাড়িতে মাথা গলাও লজ্জা করে না তোমার ?

হরিলাল হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল—সীত্তারাম—সীত্তারাম, লজ্জাসরম ত হামারা নেহি হ্যায়—উ ত আওরৎ জেনানা কি চিজ ; হাম মর্দানা হ্যায়।

আবার একচোট জোর হাসি হাসিয়া কহিল—আর সাহস ? আরে এ ত আমার শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ি আসতে সাহস দরকার হয় নাকি ?

গিরি প্রবল উত্তেজনায় কহিল—বের হয়ে যাও বলছি আমার বাড়ি থেকে, এখুনি বের হয়ে যাও, নইলে—সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতখানা দুলিয়া উঠিল, সে হাতে তাহার কাটারি।

মানুষের মূর্তি দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম মানুষ অনুমান করিয়া থাকে। উত্তেজনাদৃপ্তা খড়্গহস্তা মেয়েটিকে দেখিয়া হরিলাল ভয় পাইয়া গেল—সে বুঝিল এ সর্বনাশী এখন পারে সব।

হরিলাল পলাইল। কিন্তু দরজার মুখেই একবার ফিরিয়া দুই কলি গান সে গাহিয়া গেল, কহিল—একটা গান বেঁধেছি শোন সখি—

বিপিনে গোপাল বিহার করেন আমার বি-পিন বি-হারী।

দ্বিতীয় কলি আর সে গাহিতে পাইল না, গিরিও আর শুনিল না। বর্ণ-বৈচিত্র্যময়ী সংসার তাহার চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইতেছিল—অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

* * *

মানুষের মনের চেয়ে বড় শত্রু বোধ করি মানুষের আর নাই।

সর্বান্তঃকরণে মানুষ যে-চিন্তা, যে-কল্পনাকে সভয়ে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়, সেই চিন্তা সেই কল্পনাকে মন ডাকিয়া আনিয়া বসে।

বার বার মৃত্যুকে গিরির মন ডাকিয়া ডাকিয়া আনিতেছিল। ঘরের অন্ধকার কোণ হইতে কে যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—বিষ নে।

গিরি সভয়ে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বসে। বাহিরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফুলে ফলে মাধুর্যময়ী পৃথিবীর মধ্যে অনিবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল কোথায় কোথায় বিষের গাছ ফল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহুক্ষণ পর পাঁচুর মা আসিয়া অবাক হইয়া গেল। সে কহিল—ওকি বৌমা, উনোনের কাঠকুটো তেমনি পড়ে রয়েছে। এখনো রাঁধা-বাড়া কর নি ?

মানুষকে দেখিয়া মৃত্যু যেন পলাইল। গিরি পরম আশ্বাস পাইয়া কহিল—তুমি একটু ব'স পাঁচুর মা।

পাঁচুর মা আশ্চর্য হইয়া গেল। সে কহিল—বসব বলেই ত এলাম মা। কিন্তু খাওয়াদাওয়া কর নি যে ?

—এই যে করি। ভাবলাম বেলা একটু যাক, দু'বেলার খাওয়া এক বেলাতেই সারব। সে উঠিয়া উনান ধরাইয়া রান্না চাপাইয়া দিল। পাঁচুর মা কহিল—কাল বুঝলাম বৌমা,

মোটা মোড়লের কথায় তুমি রেগে উঠতে কেন।

গিরি কাঁদিয়া ফেলিল। পাঁচুর মা নিজেই কহিল—কেঁদো না মা, কেঁদো না। যে যা বলবে বলুক, আমি ত জানি বৌমা সব। তাই ত বললাম আমি পাঁচুকে, আমাদের জাত-জ্ঞাতের আর পঞ্চায়েৎকে, যে নিষ্পাপ তাকে পাপী বললেই যখন অপরাধ হয় তখন তাকে আমি ছাড়ব কি করে?

গিরি মুখ তুলিয়া পাঁচুর মায়ের দিকে চাহিল। পাঁচুর মা আশ্বাস দিয়া কহিল—তুমি ভেবো না বৌমা, পাঁচুও যদি আমায় ছাড়ে আমি তোমায় ছাড়ব না।

রাত্রে শুইবার সময় গিরি প্রশ্ন করিল—আচ্ছা পাঁচুর মা, মানুষকে মরণে ডাকে এ কি সত্যি?

প্রশ্নটা না বুঝিয়া পাঁচুর মা গিরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গিরি কহিল—লোকে যে বলে গলায় দড়ি দিতে গিয়ে যদি না মরে তবে মরণ দড়ি হাতে নিয়ে তাকে ডেকে বেড়ায়। বিষ খেতে গিয়ে না খেলে বিষ নিয়ে নাকি সে ডাকে!

পাঁচুর মা উত্তর দিল—হ্যাঁ মা; মানুষের ও-ইচ্ছে বড় মন্দ। ওতেও পাপ হয়। সত্যিই যে আত্মহত্যে করতে গিয়ে না মরতে পারে, কি মরণ না হয়, মরণ তাকে ডাকে।

অন্ধকার শয্যায় গিরি উঠিয়া বসিল। পাঁচুর মা তাহা অনুভব করিয়া কহিল—উঠে বসলে যে বৌমা?

—আমায় একটু দাঁড়াবে পাঁচুর মা?

—কোথা? এত রাত্রে কোথা যাবে?

—এই খিড়কির ঘাটে।

পাঁচুর মা আর কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই গিরি দরজা খুলিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘাটে আসিয়া গিরি কি একটা ভারি জিনিস সশব্দে পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। আর বিস্মিতা হইয়া পাঁচুর মা কহিল—কি বৌমা?

—কাল বলব পাঁচুর মা।

ঘরে শুইয়া আবার কতক্ষণ পরে গিরি ডাকিল—পাঁচুর মা!

পাঁচুর মাও ঘুমায় নাই। সে তখনও ভাবিতেছিল সেই নিক্ষিপ্ত জিনিসটির কথা। সে উত্তর দিল—কি বলছ বৌমা? ঘুম আসছে না?

—আর একটু সরে এসো না এদিক দিয়ে। আমার বড় ভয় করছে।

—ভয় কি মা? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও, আমি জেগে রয়েছি।

আবার অল্প নীরবতার পর গিরি কহিল—তখন কি ফেললাম জান পাঁচুর মা?

—কি?

—দা'খানা।

পাঁচুর মা আশ্চর্য হইয়া গেল। গিরি কহিল—কি জানি কখনও যদি গলায় দিয়ে বসি। মরণ যেন সত্যিই আমায় ডাকছে।

পাঁচুর মা কথা কহিল না। কিন্তু তাহার একখানি হাত গিরির সর্বাঙ্গে একটা নিবিড় স্নেহস্পর্শ মাথাইয়া দিল। নিজের অস্পৃশ্যতার অপরাধ সে ভুলিয়া গিয়াছিল। ভুলিয়া যাইবার কথা। মানুষ যখন মনুষ্যত্বকে বুকের মধ্যে পায় তখন সে মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে মানুষের জাতি নাই, ধর্ম নাই; তখন সে কারও অপেক্ষা ছোট নয়, শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারও তার মধ্যে তখন থাকে না।

গিরিও আজ তাহার স্পর্শে সংকোচ বোধ করিল না। স্নেহ-কাঙালী শিশুর মতই সে স্নেহস্পর্শে উপভোগ করিতেছিল। কতক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কথা বলিল।

—মরণে আমার আক্ষেপ কি বল ত পাঁচুর মা? আমার বেহায়া মনকে সেই কথাই ত বার বার বলি। কিন্তু তার ভয় ঘোচে না—তার আশা মেটে না। এখনও তার আশা হয়! ছি!

আবার সে কহিল—বেশি আশাও ত কোনদিন করি নি আমি। আশা করেছিলাম নিঝ্ঞ্ঝাট একখানি কুঁড়েঘর, স্বামী সন্তান। সংসারের সব চেয়ে কুৎসিৎ একটি ছেলে যে শুধু আমায় মা ব'লে ডাকবে, হেসে কেঁদে আমার ঘর ভ'রে তুলবে। এও কি খুব বেশি পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা কহিল—ভগবান কোঁকেও যদি তোমার একটি দিয়ে থাকেন বৌমা!

অশিক্ষিত বাগ্দীর মেয়েটি এতক্ষণে খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি সান্ত্বনাবাণী আবিষ্কার করিয়াছিল বোধ করি।

গিরি চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল অতি তিক্ত হাসির রেখা। অতি স্বল্প আলোয় বয়স্কা পাঁচুর মায়ের চালসে-ধরা চোখের দৃষ্টি গিরির মুখের সে হাসি দেখিতে পাইল না, দেখিলে সে শিহরিয়া উঠিত। গিরির মনে পড়িল—গলার কবচ মাদুলী পচা পুকুরে বিসর্জন দেওয়ার কথা; মনে পড়িল শ্রীমন্তের সেই কথাগুলো।

মানুষের মন কিন্তু আশ্চর্য। কয়েক মুহূর্ত পরেই গিরির মন ব্যাকুল আগ্রহে পাঁচুর মায়ের কথাগুলি আঁকড়াইয়া ধরিল। সেই সঙ্গে তার পরের মুহূর্তগুলি তাহার নিকট পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিল। একটি শিশু, তাহার রূপ, তাহার অবয়ব, মুখ, চোখ সব সেই অন্ধকারের মধ্যেও পরিস্ফুটরূপে ভাসিয়া উঠিল।

চালের ফুটাটা দিয়া আজও তেমনি আকাশের তারা দেখা যাইতেছিল। সে রাত্রে গিরি কিন্তু তাহার কল্পনার শিশুটিকে স্বপ্ন দেখিল না—দেখিল গৌরীকে।

আঠারো

দিন কয় পর।

জল খাইবার বেলায় পাঁচুর মা আসিয়া সংবাদ দিল আজ নাকি গ্রামে বড় পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে। সমস্ত গ্রামের পঞ্চায়েৎ। বিপিন দশের কাছে একটু সলজ্জ হাসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে

নিজেকে গিরির সহিত জড়াইয়া দিয়াছে। সে কথা শুনিয়া গিরির আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। জীবনে এত বিস্ময় তাহার কোন দিন হয় নাই।

পাঁচুর মা অবশেষে কহিল—চন্দ্র সূর্য ত এখনও উঠছে বৌমা!

নির্বাক বিস্ময়ে শুষ্কচক্ষে গিরি পৃথিবীর চারিদিকে চাহিল। প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হইল না। গিরির চক্ষেও বোধ হইল না। শীতশেষের তপ্ত উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন যেমন ছিল তেমনি রহিল। বাড়ির পিছনে কোন একটা গাছে সেই দিনই বোধ হয় প্রথম ফুলটি ফুটিয়াছে। কাল ত এ মিষ্টি গন্ধটুকু পাওয়া যায় নাই!

আবার পাঁচুর মা বলিল—ও-বেলায় আবার আমাদিগে ডেকেছে মা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গিরি ধীরে ধীরে হাতের কাজটা আবার আরম্ভ করিল। তারপর একসময় সে কহিল—তোমাদের পঞ্চায়েৎ তোমাকে কি বলেছে নয় পাঁচুর মা? সেদিন বলছিলে?

স্বজাতির হৃদয়হীনতার লজ্জা যেন পাঁচুর মায়ের মাথায় চাপিয়া বসিল। অবনত মস্তকে মৃদুস্বরে সে বলিল—হ্যাঁ মা, কাল ত বললাম তোমাকে।

গিরি শুধু বলিল—হুঁ।

পাঁচুর মা কহিল—আমিও ত তোমাকে বলেছি বৌমা—

বাধা দিয়া গিরি কহিল—না পাঁচুর মা, আমার জন্য তুমিই বা দশজনকে ত্যাগ করবে কেন?

পাঁচুর মা বিরক্ত হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল—তোমার মেজাজ বড় খারাপ বৌমা। বিধাতার এত ঘা তুমি সইতে পারছ আর মানুষের দশটা কথা তোমার সহ্য হবে না?

গিরি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠেই সে কহিল—ওকে যে দেখতে পায় না পাঁচুর মা, নইলে জানোয়ারের মত টুঁটি কামড়ে ধরত তার মানুষ। যাক্ তুমি যদি আমার মা হয়েই থাকবে, তবে এক কাজ কর। যাও দেখি, ও-গাঁয়ে ভবি মোড়লের ধানটা পাওয়া যাবে কি না দেখে এস।

পাঁচুর মায়ের ভয় হইতেছিল। সদ্য সদ্য এই বিশ্রী কথাগুলো রটনার পরই সেখানে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা সেই কথাই সে ভাবিতেছিল। সে ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—দু'দিন যাক না বৌমা।

গিরি ঈষৎ হাসিয়া কহিল—যাও না মা। ফিরিয়ে দেয় দেবে। যে মিথ্যে কলঙ্ক আমার মানুষে রটালে সে কি মানুষ কখনও ভুলবে? মিথ্যেকে সত্যি প্রমাণ করবার জন্য দিন দিন তার গায়ে রং চড়াবে। তার চেয়ে তুমি যাও, যা হবার আজই হয়ে যাক্। আজই ঠিক করে ফেলি এ-গাঁয়ে থাকতে পাব কি না। না খেতে পেলে শুধু ত মানুষ পেটে কাপড় বেঁধে পড়ে থাকতে পারবে না।

গিরির কথাগুলার মধ্যে একটা দৃঢ়তা ছিল। পাঁচুর মা সে কথা লঙ্ঘন করিতে পারিল না। অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধে মরণের ভয়ে যে মানুষটি ঠিক আজিকার দিনটির পূর্ব পর্যন্ত আত্মহারা

হইয়া গিয়াছিল, মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সন্ধান পাইয়া সেই মানুষটি একমুহূর্তে পাথরের মত কঠিন ও দুর্জয় হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? পাঁচুর মা গামছাখানা মাথায় দিয়া বাহির হইতে হইতে সেই কথাই ভাবিতেছিল।

মেয়েটির চরিত্রের অন্ত পাইল না সে।

গিন্নি ঘরখানিতে ঝাঁটা বুলানো শেষ করিয়া বালতিতে গোবরমাটি গুলিয়া মেঝে নিকাইতে আরম্ভ করিল।

কাজ করিতে করিতে অকস্মাৎ আপন মনেই সে কহিল—ভাল, মরব না আমি। দেখব, কে আমার কি করতে পারে!

*　　　*　　　*

বিপিনের এতখানি সাহসও ছিল না, বুদ্ধিও খেলিত না। পঞ্চায়েতের তলবের পূর্বে এটুকু যোগাইয়া দিল হরিলাল। কহিল—একটুখানি লজ্জার হাসি হেসে দিস দাদা, সব ঠিক হো যায়েগা।

বিপিন বিস্ফারিত নেত্রে হরিলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল—কিন্তু সে যে একেবারে মিথ্যে ওস্তাদ। আমার পাপে নির্দোষ স্ত্রীলোককে—

হরিলাল তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না। ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—ছাড়ান দাও বাবা ধম্মরাজ, যস্মিন দেশে যদাচার—নেপালে মহিষ ভক্ষণ। এ গাঁয়ের এই আচার রে দাদা। ঠেলে ফেলে না দিলে ও মেয়ে ডুববার নয়।

বিপিন নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। কহিল—না না না; তারপর সমাজে আমার কি হবে?

হরিলাল গান ধরিয়া দিল—পুরুষো পরশ-মণি। পুরুষকে পতিত করে কে কোন্ কালে রে!

হরিলালের বুদ্ধি ও সাহসে বিপিন কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কাজ হাসিল করিল। কিন্তু সেই কাষ্ঠহাসিটুকু হাসিতেই বেচারা ঘামিয়া সারা হইল।

হরিলাল আপন মনেই কহিল—এমন ছোটলোক পাপী আমি খুব কম দেখেছি। শালাদের পাপ করবার ইচ্ছে ষোল আনা, শুধু ভয়ে পারে না।

বিপিন আপন কৃতিত্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। আরও এতক্ষণে সে বুঝিয়াছিল—গিন্নি কেমন পাঁকে পড়িয়াছে। সে হরিলালের কাছে আসিয়া কহিল—ভারি ফন্দি ঠাউরেছিলে ওস্তাদ!

হরিলাল কহিল—ভাগ্।

সে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া বিপিনকে ডাকিয়া কহিল—হামারা ইনাম? ইনাম ত মিলনা চাহি।

বিপিনও হিন্দী বাত ঝাড়িয়া দিল—জরুর। আজ কিন্তু রাতকো একঠো জল্সা হোনা চাহি। মালকোষ একঠো তুমারা পাশ শুননে হোগা ওস্তাদ।

হরিলাল কহিল—সব হোগা ভাই। হামারা রূপেয়া ঠো ত আগাড়ি মিলনা চাহি।

এদিকে তুমুল তর্কে পঞ্চায়েতের আলোচনা চলিয়াছিল। লুচি কি অন্নের ভোজন শাস্তি-স্বরূপ নির্ধারিত হইবে সেইটাই আলোচনার বিষয়। পাঁচুর মা এবং পাঁচু নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে। দণ্ড তাহাদেরও হইবে।

* * *

সন্ধ্যার পর গিরি পাঁচুর মায়ের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। নদীর ধারে একটা প'ড়ো বাড়িতে কোলাহল উঠিতেছে—বিপিনের প্রীতিভোজ—নাচ, গান, বাজনা, চিৎকার—সে এক তাণ্ডব। গিরির বাড়ি হইতে সে কলরব শোনা যাইতেছে ; ঘরে শুইয়া গিরির সর্বাঙ্গ থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। সম্মুখে ঘনান্ধকার রাত্রি। পাঁচুর মা কখন আসিবে !

গিরি চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিল। খুঁজিল সেই দা-খানা। যেখানা জলে সে ফেলিয়া দিয়াছে। নিজের হাতে মরণ হইতে বাঁচিতে গিয়া পরের হাতে মরার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছে।

নাঃ, পাঁচুর মা আজ আর আসিল না, সে আর আসিবে না।

সন্ধ্যায় সমাজের মজলিসে তাহার ডাক হইয়াছিল। পঞ্চায়েৎ তাহাকে বলিয়াছে—ছিমন্তের পরিবারের সঙ্গে কাজকর্মের সন্ধান রাখ ক্ষেতি নাই, কিন্তু রাতে ওর বাড়ি তোমার থাকা হবে না। ওর স্বভাব খারাপ।

পাঁচুর মা কি একটা বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু পঞ্চায়েৎ সেদিন নেশায় বিভোর, সেকথা তাহারা তাহাকে বলিতে দিল না, বলিল—উঁহু, কোন কথাই না, দূতীগিরি মহাপাপ, রাতে তুমি থাকলে কুটনীর কাজ করা হবে।

পাঁচু চুপ করিয়া বসিয়াছিল। গোড়া হইতেই তাহার একটা সন্দেহ ছিল ; বিপিনকে একদিন রাত্রে সে শ্রীমন্তের বাড়ি হইতে পলাইতে দেখিয়াছে, আজ আবার বিপিন যখন পঞ্চায়েতের সম্মুখে অপরাধটা স্বীকার করিয়া দণ্ড লইল—জরিমানা দিল—তখন সে গিরির অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া মাকে বলিল—তুই যদি ওর বাড়ি যাস—তাব আমি গলায় দড়ি দোব।

রাত্রি অধিক হইয়া আসিল, নদীতীরে তাণ্ডব কোলাহল নীরব হইয়া গেল, গিরি স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখের উন্মুক্ত দুইটি পাতা মুদিয়া এক করিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি—শুধু দূরে একটা কুকুর বোধ হয় শীতের তাড়নায় কাতর ধ্বনি করিয়া উঠিতেছে। নদীর ধারে নিশাচর একটা পাখি ঘন ঘন একটা ডাক ডাকিয়াই চলিয়াছে। নিস্তব্ধ সুষুপ্ত জীবরাজ্য।

দুটি লোক শ্রীমন্তের ঘরের প্রাচীর পার হইয়া লাফ দিয়া বাড়ির উঠানে পড়িল।

বিপিন আর হরিলাল।

পা টিপিয়া হরিলাল গিরির রুদ্ধ দ্বারে কান পাতিয়া দাঁড়াইল।

সুষুপ্ত আশ্বস্ত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, চেতনার কোন লক্ষণ নাই। হরিলাল ফিরিয়া ফিস ফিস্ করিয়া বিপিনকে বলিল—জানালাটা ভেঙেই আছে, আমি সেদিনে একবার বাড়ি

ঢুকে এক নজরেই দেখে রেখেছি। একটা ধাক্কা, কিন্তু আমার টাকা—পঞ্চাশ টাকা?

নেশায় মত্ত বিপিনের বুকটা দুরু দুরু করিতেছিল—আশঙ্কা প্রত্যাশায়। সে কহিল—একশো, একশো টাকা দেব আমি—

নোটের তাড়া সে হরিলালের হাতে গুঁজিয়া দিল।

হরিলাল অতি আনন্দে বলিল—আও হামারা সাথ। কুছ্ ডর নেহি হ্যায়। হাম বাহারমে হ্যায়। চলো—উঠো। কিন্তু শোন—গিয়ে হাত দুটো আগে কায়দা করো, বুঝলে!

বিপিন ভীরু, কিন্তু সে লম্পট, তার উপর নেশায় উন্মত্ত, সে নির্ভীকের মত বলিল—উ হাম দেখলেঙ্গে।

বাংলা ভাষায় আপন উত্তেজনার দৃপ্ততা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিল না।

* * *

সহসা বাড়ির গণ্ডীটুকুর ভিতরে রজনীর সুপ্তি বিচলিত করিয়া একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল—তারপর একটা চাপা ক্রন্দনের ধ্বনি।

উনিশ

জেলখানার বড় ফটকটায় প্রবেশ করিতে শ্রীমন্তের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; জানোয়ারের পিঁজরার মত গরাদে-ঘেরা রক্তবর্ণ বিশাল লৌহদ্বার, ভিতরে বাহিরে খাঁকির উর্দিপরা ভীমকায় প্রহরী—কাঁধে হিমশীতল লৌহময় মারণাস্ত্র, অভ্যন্তরে তার অগ্নিগর্ভ সুপ্ত মৃত্যু, সারাটা বুক বেড়িয়া লোহার মোটা শিকলে মোটা মোটা চাবির গোছা। অবিরাম রুক্ষ শাসন করিয়া করিয়া মানুষের কোমল রক্তমাংসের মুখও বিভীষণ ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখের পানে দৃষ্টিমাত্রেই বুকের রক্ত চমকিয়া উঠে।

পিছনের লৌহদ্বারটা তাহাকে গ্রাস করিয়া বন্ধ হইয়া গেল, যেন একটা রাক্ষস আহার গিলিয়া বিরাট মুখটা বন্ধ করিল।

লোহার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে এখনও বিশাল পৃথিবীর শ্যামাঞ্চলখানির অংশ দেখা যাইতেছে, মাত্র কয়পদ ব্যবধান; কিন্তু এই কয়পদ ভূমি অতিক্রম করিতে তাহার লাগিবে দীর্ঘ—সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর! শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, চোখে জলও আসিয়াছিল, কিন্তু সে জল মাটিতে ফেলিতে তাহার সাহস হইল না; সান্ত্বনার মমতার স্পর্শ না পাইলে দুঃখ মূক হইয়া যায়, আত্মপ্রকাশ করিতে তাহারও ভয় হয়।

শ্রীমন্তের ধারণা ছিল, তাহার ওই গ্রামখানির মত নিষ্করুণ মমতাহীন ক্ষেত্র বুঝি দুনিয়ায় আর নাই—কিন্তু মৃত্যুর মত স্তব্ধ হিমশীতল এই পাষাণ-পথ, প্রতি পদক্ষেপে যে স্থান সুকঠোর প্রতিধ্বনিতে গর্জন করিয়া উত্তর দেয়, চোখের জলে যে স্থান গলে না—তার চেয়ে আপন ছায়া-নিবিড় কোমল মৃত্তিকাময়ী গ্রামখানি ঢের ঢের মমতাময়ী।

কিন্তু ভিতরে গিয়া সে কেবল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল নয়—আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

দুর্দান্ত মানুষের মেলা—হাসি, খেলা, গান তাহাদের অফুরন্ত।

শ্রীমন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল—এমন কেমন করিয়া হয়!

কিছু দিন যাইতে যাইতে সে বুঝিল—হায়, এমন হয়—দুঃখের চেয়ে মানুষের প্রাণের শক্তি অনেক বড়—দুঃখ দূর হইতেই অসহ্য ভয়াবহ, কিন্তু তাহাকে যখন মাথায় করিতে হয় তখন সে লঘুভার হইয়া যায়, তাচ্ছিল্যের সহিত তাহাকে বহন করা যায়; প্রাণ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, দুঃখের চাপে সে মরে না।

এতদিনে জেলখানাটা তাহার মন্দ লাগিল না।

বেশ উদরের চিন্তা করিতে হয় না, পাওনাদারের তাগিদ নাই—দিনগত পাপক্ষয়—ঘানির চারপাশে ঘুরিলেই খালাস।

দশ সের সরিষার চৌদ্দ পোয়া তেল, বসিয়া বসিয়া তার দিনের হিসাব কর।

কষ্ট কি নাই?

আছে বৈকি—লোহার ঘানিটার চারপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে সারাটা দেহ যেন পাথরের মত জমিয়া কঠিন হইয়া আসে, স্নায়ু শিরা যেন ছিঁড়িয়া যায়—রক্ত-মাংসের মানুষ পাথর হইয়া পড়ে। কিন্তু কষ্টকে তুচ্ছ করাই ত পুরুষের পৌরুষ! আর পাথর হইলেই বা ক্ষতি কি?

সেই ত ভাল, নির্যাতন লজ্জা পাইবে।

কিন্তু বুকের ভিতরটা যে পাথর হয় না; নিত্য রজনীতে গিরি যেন ওই লোহার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া দাঁড়ায়, অশ্রুমুখী বিশীর্ণা গিরি—

শ্রীমন্তের বুক ফাটিয়া যায়।

বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করিয়া উঠে। শ্রীমন্ত উঠিয়া বসিয়া কত অন্তহীন ভাবনা ভাবে —গিরিও হয়ত এমনি করিয়া জাগিয়া বসিয়া রাত্রির অন্ধকারে চোখের জল শেষ করিয়া রাখিতেছে; দিনে ত তাহার ফেলিবার অবকাশ থাকিবে না—উদরান্নের চেষ্টায় হা হা করিয়া বেড়াইতে হইবে।

কাজ না পাইলে—হয়ত বা ভিক্ষা।

শ্রীমন্ত আর ভাবিতে পারে না, সে চিন্তার দায় হইতে মুক্তি পাইবার প্রত্যাশায় পাশের লোকটিকে ডাকিয়া কহে—শশী, শশী, ও শশী!

ঘুমন্ত শশী উত্তর দেয় না—সে পাশ ফিরিয়া শোয়।

শশীর পার্শ্ব-পরিবর্তনের মধ্যে চেতনার ক্ষীণ আভাস পাইয়া শ্রীমন্ত কহে—তোর মার্কার হিসেব দেখতে বল্‌ছিলি সন্ধ্যেয়!

শশী কহে হুঁ।

—জেল তোর কত দিন—ছ মাস ত?

—হুঁ।

—খাটা হ'ল কতদিন?

—হুঁ।

শ্রীমন্ত তাকে ঠেলা দিয়া কহে—হুঁ কি রে, খাটা হ'ল কতদিন তাই বল্, না—হুঁ!

ঘুমঘোরের মধ্যেও বুঝি মুক্তির ব্যগ্রতা বন্দী ভুলিতে পারে না, শশী জড়িত কণ্ঠে কহে—দেখ কেন হিসেব করে। চার মাস বিশ দিন হ'ল।

শ্রীমন্ত কহে—তবে ত আর মেরে দিয়েছিস রে! তিন ছয় আঠারো দিন বাদ গেলে থাকে তোর পাঁচ মাস বারো দিন, আর ধর্ গিয়ে তোর বছরের দোসরা মাসের দরুণ বাদ যাবে দুদিন —এই তোর হ'ল গিয়ে দশ দিন—পাঁচ মাস দশ দিন—এই তোর চার মাস বিশ দিন—রাত পোয়ালেই একুশ দিন, তা হ'লে আর আছে তোর না? ন'দিন আর ন'দিন আঠারো দিন—দশ দিনের দিন ত খালাসই পাবি।

শশী কহে—কদিন বললি—কদিন?

—আঠারো দিন।

—না—আরও একদিন কমবে, খালাসের দিন রবিবার পড়েছে—শনিবার দিন খালাস দেবে।

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া থাকে—বাহিরে গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকার থম থম করিতেছে—সমস্ত ধরণী যেন ব্যথায় মূর্ছিতা, আর ওই কালো অন্ধকার যেন তার আহত বুকের নীল কাঁচা রক্ত! মানুষের আপন অন্তরের প্রতিবিম্ব এমনি করিয়াই নির্জন মূহূর্তে তাহার চোখের উপর বহিঃপ্রকৃতির বুকে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীমন্ত আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহে—শশী, আমার একটি কাজ করবি ভাই?

শশীর আবার তন্দ্রা আসিতেছে। সে তন্দ্রাযোগেই কহিল—উঁ?

—আমার একটি কাজ করবি?

—হুঁ।

—তোকে ত গোকুল-মাটি হয়ে বাড়ি যেতে হবে, তা তুই যদি নদীটা পার হয়ে আমাদের গাঁ হয়ে একবার যাস—

—হুঁ।

—আমাদের বাড়িতে যদি আমার খবরটা দিয়ে যাস ভাই—

—হুঁ।

—আর আমাকে একখানা চিঠি দিতে বলবি।

শশীর আর সাড়া পাওয়া যায় না, তন্দ্রা বোধ করি ভার হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীমন্তের তাহাতে বিশেষ আসে যায় না—সে আপন মনেই বলে—তোর যত্ন কেমন করবে সে দেখবি, গুরুর আদর করবে। সে-বেলা তোকে যেতে দেবে মনে করেছিস—না খাইয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না।

শশীর তখন নাক ডাকিতেছে, কিন্তু স্মৃতি-স্মরণে ত অপরের সাহচর্যের প্রয়োজন হয় না, বরং নির্জনতাই সে স্মৃতিগাথাকে গাঢ় উপভোগ্য করিয়া তোলে; ওই প্রগাঢ় অন্ধকারের মাঝেও গিরির ম্লান মূর্তি শ্রীমন্তের চোখের সম্মুখে প্রদীপ্ত-হইয়া জাগিয়া উঠে। এই জাগ্রত স্বপ্নে শ্রীমন্ত

অধীর হইয়া উঠে—সে ভাবে কেন, কেন, দেহের মত বুকটাও পাষাণ হয় না কেন ?

আবার প্রভাত হইতে কাজ কাজ কাজ, কাজকর্মের ব্যাপৃতিতে সময় কাটিয়া যায় ; বেলা দশটায় যেই আসিয়া হাঁকে—সোলেমান—আপিসে যাও, চিঠি আছে তোমার !

—আমার ?

—আমার ?

—আমার ?

চারিদিক হইতে পাষাণ-দেহের মধ্যে কোমল মানুষ আত্মপ্রকাশ করিয়া মমতাকরুণ স্বরে প্রিয়জনের বার্তার জন্য জিজ্ঞাসা করে—আমার ? আমার ? অথচ ওরা বেশ জানে যে বার্তা নাই—বার্তা নাই !

শ্রীমন্তও জিজ্ঞাসা করে ; মেট আপন পথে চলিতে চলিতে সমবেত প্রশ্নের জবাব দিয়া যায় —না, না, না !

দুয়ারের শান্ত্রীরা কঠোর ভাবে শাসন-বাণী গর্জন করে—চালাও চালাও—সব কাম চালাও।

কিন্তু 'কাম' যে চলে না, পাথরের মত শক্ত দেহ অবশ হইয়া আসে যে !

সেদিন সকাল বেলায় হুকুম আসিল—শ্রীমন্তকে বদল করা হইয়াছে, তাহাকে যাইতে হইবে অপর জেলে।

সম্বন্ধহীন দুর্দান্ত পর, তবু তারা শ্রীমন্তকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে, কত জন কত গোপন সংবাদ বলিয়া দেয়—অমুকের সঙ্গে দেখা করিস, অমুক আছে সেখানে ; অমুক মেটের সঙ্গে বুঝে চলিস, শালা এক নম্বর বদমাশ। তবে কালো-পাগড়িটা লোক ভাল, আমার নাম করিস।

শ্রীমন্ত শশীকে ডাকিয়া কহিল, তোর ত ভাই আর তিন-চার দিন আছে, দেখিস ভাই, আমার বাড়ি হয়ে যাস, আমার খবরটা দিবি আর একখানি চিঠি আমাকে দিতে বলবি।

শশী কহিল—কোন ভাবনা ক'রো না দাদা, আমি নিশ্চয় বলে যাব। আমি যাব ধর চার দিনের দিন, তোমার সাত দিনের দিন নিট তুমি চিঠি পাবে !

*　　*　　*

আবার নতুন স্থান, নতুন সাথী সহচর, কিন্তু নামই নতুন, সেই সব, সেই নির্মম নীরস পাষাণ-আবেষ্টনী, সেই নির্মম কঠোর শান্ত্রীর দল, সেই দুর্দান্ত বন্দী সহচর সব, সেই কর্মধারা, সেই জীবনধারা, এতটুকু এদিক-ওদিক নাই, শুধু মুখ চিনিতে সময় লাগে।

একদিন পথে কাটিয়াছে, তার পর দিন যায়, আর শ্রীমন্ত দিন গনিয়া যায়—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত।

সকালবেলা হইতেই সেদিন শ্রীমন্তের বুকটা কেমন করে।

বেলা দশটার সময় মেট আসিয়া হাঁকিল—জাফর শেখ, হাবল বাগ্দী, চিঠি আছে, আপিসে—

—আমার ?

শ্রীমন্তের কণ্ঠধ্বনিতে সকলে চমকিয়া উঠিল, মেট আর যাইতে যাইতে উত্তর দিতে পারিল

**

না, সে ফিরিয়া শ্রীমন্তের মুখপানে চাহিল কহিল—কই আর কারু ত চিঠি নাই।

শ্রীমন্ত বুকে ঘানির ডাণ্ডাটা লাগাইয়া দাঁড়াইয়া গেল—শাস্ত্রী তাড়া দেয়, কিন্তু শ্রীমন্ত তবু দাঁড়াইয়া থাকে।

সিপাহী আসিয়া পিঠে পেটির একটা অঘাত করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল।

শ্রীমন্ত বারেক চমকিয়া সিপাহীটার পানে একটা হিংস্র দৃষ্টি হানিয়া আবার ঘানি টানিতে লাগিল—টানিতে টানিতে আপন মনেই সে মৃদু গুঞ্জনে গান ধরল—

"মন তুমি কার, কেবা তোমার,
এ দুনিয়া ভোজের বাজি!"

দুনিয়া হয়ত সত্যই ভোজের বাজি, কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তার সৃষ্টির মধ্যে ওই ভোজ-বাজিরই ক্রীড়াপুত্তলী। তাই বাজির ভেল্কি এড়াইয়া তাহার চলিবার উপায় নাই, তাই কেউ কাহারও নাই, জানিয়াও পরের জন্য মানুষকে ভাবিতে হয়—সে ভাবনার দ্বার ত রোধ করিবার উপায় নাই, চিরদিন অনাহূতই সে আছে—ললাটে নয়নপ্রান্তে গোধূলির আকাশের মত একটি বিষন্ন ছায়া ফেলিয়া। আবার এই ভাবনাই মানুষের জীবনের পাথেয়, এ নহিলে মানুষ বাঁচে না।

শ্রীমন্ত ভাবিল, সারাটা রাত্রি কত সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তাহার প্রিয়ার চিন্তার ধ্যানে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাঘাত দিল।

শশী হয়ত যায় নাই, সংবাদ দেয় নাই।

আবার চিঠি লিখিতে পয়সাও ত চাই!

গিরি হয়ত বাড়িতেই নাই—অভাবের তাড়নায় দেশ-বিদেশে কোথাও দাসীবৃত্তি করিতেছে!

আবার মনে হয় গিরি হয়ত বাঁচিয়াই নাই, অভিমানিনী গিরি! সে হয়ত গলায় দড়ি দিয়া সর্ব জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াইয়া চলিয়া গেছে।

বিপিনের ধান হয়ত অভাবের জ্বালায় ভাঙিয়া খাইয়াছে—বিপিন কটূকাটব্য করিয়াছে, হরিহরের মা সেই দুইটা টাকার জন্য কত কথাই বলিয়াছে; হয়ত বা হরিলাল আসিয়া কত নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছে। আর অভিমানিনী গিরি এমনি এক অন্ধকার রাত্রে ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়া কোন অজ্ঞাত মরণপথে পলাইয়া বাঁচিয়াছে। হু হু করিয়া শ্রীমন্তের চোখ দিয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। কতক্ষণ চলিয়া গেল—সহসা শ্রীমন্তের মনে হইল হয়ত বা ফটকে তাহার চিঠি চাপিয়া রাখিয়াছে, শাস্তি দিবার জন্য ত অগণ্য পন্থা ইহাদের, হয়ত উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে, শ্রীমন্ত ঘোষকে চিঠিপত্র যেন না দেওয়া হয়।

আচ্ছা কাল দেখা যাইবে, একদিন দেরি হওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু কাল তাহার পত্র আসিবেই।

দশটায় মেট আসিয়া হাঁকিয়া গেল—হরেকৃষ্ণ ডোম, জলিল শেখ, মহবুব আলি—পত্র আছে।

শ্রীমন্ত আজ আর জিজ্ঞাসা করিল না—আমার ?

সে ঘানির ডাণ্ডাটা ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের পানে চলিল। দুয়ারের সিপাহীটা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—আরে তু কাঁহা যাতা ? শালা ঘানি উলট্ দিয়া—

শ্রীমন্ত ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া আবার চলিল। সিপাহীটা এবার ছুটিয়া গিয়া পিছন হইতে তাহার জামা ধরিয়া কহিল—চিঠ্যিচিঠ্যি, চিঠ্যি তোমকো কৌন দেগা ?

শ্রীমন্ত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া কহিল, আমার পরিবার আছে ঘরে।

সিপাহী তাহাকে পেটি কষিয়া কহিল—পরিবার আছে, পরিবার আছে, তুমকো লাগিয়ে বসিয়ে আসে উ ; ভাগা কিধার কোইকো সাথ—

শ্রীমন্ত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল, সে বাঘের মত সিপাহীটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, ঘুঁষি কিল চাপড়ে তাহার মুখখানা রক্তাক্ত করিয়া দিল।

পিঁজরায় বন্দী বাঘের পালাইবার ত পথ নাই, সে যত দুর্দান্ত হইয়া উঠে, তত তাহার বন্ধন দৃঢ় হয়।

শ্রীমন্তের হইল, এই অপরাধের জন্য আবার বিচার হইল, জেলের বিচারে তাহার রেমিশন কাটা গেল, আদালতের বিচারে আর দুই বৎসর হাজত তাহার বাড়িয়া গেল।

বিচারশেষের দিন সাজা লইয়া শ্রীমন্ত জেলে ফিরিল একটা নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে হাসিতে।

আবার কতদিন চলিয়া গেল, আবার সে চিঠির জন্য অস্থির হইয়া উঠিল, এবার সঙ্গীরা পরামর্শ দিল—এক কাজ কর্ তুই, দরখাস্ত কর্ তুই যে আমার বাড়ির খবর আনিয়ে দেওয়া হোক।

—দেবে ?

—আলবৎ দেবে।

শ্রীমন্তের সে সাহস হইতেছিল না—সংবাদের নামে তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠে!

জীবনের এতটুকু আশা—কত সুখস্বপ্ন সে দেখায়—সেটুকু মুছিয়া গেলে বাঁচিবে সে কি লইয়া ?

—কিন্তু—তবু—

কুড়ি

অহল্যার মত গিরি পাথর হইয়া গেল।

এমনি করিয়াই নারী পাষাণী হয়।

পৃথিবীতে মানুষের লজ্জার বাঁধ একবার ভাঙিয়া গেলে হয়। তখন আর কিছুতে ঠেকানো যায় না। চক্ষুলজ্জা পাপ-পুণ্য সব ভাসিয়া যায়। এ দুনিয়ায় বিকিকিনির হাটে বেনিয়ার দাঁড়িপাল্লায় উঠিয়া আপনার ওজনভোর স্বর্ণ মানুষ যখন গনিয়া পায় তখন কি আর রক্ষা

থাকে? তখন সে আরও চায়, আরও চায়, ; বার বার, বার বার সে আপনাকে বিনিময় করে! তখনই তার মানুষের মনুষ্যত্ব হৃদয় মন সব জমিয়া গিয়া হয় পাথর। তার উপর নারী আর পুরুষ!

গিরি যাহা চাহিয়াছিল তাহা সে পাইয়াছে, ভোজ্য পাইয়া তাহার উদর তৃপ্ত; যাহার ফলে স্বাস্থ্যে সুকুমার কান্তিতে তাহার যৌবনের দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে—রূপ যেন দেহে আর ধরে না; শাঁখের শাঁখার পাশে আজ তাহার সোনার গহনা উঠিয়াছে; জীর্ণ মলিন কাপড়ের পরিবর্তে তাহার সুন্দর দেহখানি ঘেরিয়া সুকোমল শুভ্র, সূক্ষ্ম বস্ত্রের সৌন্দর্য।

গিরি বসিয়া বসিয়া পান চিবায়—আর মাঝে মাঝে ঠোঁট উল্টাইয়া নতচক্ষে ঠোঁটের লালিমা পরীক্ষা করিয়া দেখে। সেদিনও সে ঠোঁটের উপর পানের রঙ কেমন খুলিয়াছে—দেখিতেছিল।

ওদিকে বাগ্দীপাড়ায় কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া মর্মস্পর্শী কান্না কাঁদিতেছে। বিলাপের ভাষাও কিছু কিছু বোঝা যায়—ওরে সোনা, ওরে যাদু আমার—

অর্থে বোঝা যায় কোন সন্তানহারা হতভাগিনীর কান্না।

গিরির কিন্তু এ কান্নার ব্যাকুলতা ভাল লাগে না, সব আনন্দ যেন ম্লান হইয়া যায়; সামান্য বেদনার আঘাতেই তাহার আনন্দের প্রাসাদ থর্ থর্ করিয়া কাঁপে—এ ঘর যেন তাহার তাসের ঘর। এই ঘর ভাঙিয়া গেলে ইহার মধ্য হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা কল্পনা করিতেও গিরি শিহরিয়া উঠে। মনে হয় ইহারই মধ্যে সঞ্চিত আছে রাশি রাশি কান্না, সে কান্নার পরিমাণ মাটির বুক হইতে ওই আকাশ পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াও কুলাইবে না।

সে ঈষৎ বিরক্তভরেই কহিল—কে এমন করে কাঁদে গো পাঁচুর মা—

গিরির সব আশাই পূর্ণ হইয়াছে, পাঁচুর মা আজ তাহার বেতনভোগী দাসী।

পাঁচুর মা একটা বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আমাদেরই পাড়ার গোকুলের বৌ, এই নিয়ে পাঁচটি সন্তান হ'ল মা, তা পাঁচটিই গেল।

গিরি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার সেই বিরক্তিভরেই কহিল—দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস ত পাঁচুর মা, আমার মাথা ধরেছে। ও সইতে পারি না। আমায় ডেকো না পাঁচুর মা, আমার মাথা ধরেছে। বলিয়াই সে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। পাঁচুর মা গালে হাত দেয়, গিরি দিন দিন তাহার কাছে দুর্বোধ্যতর হইয়া উঠিতেছে।

বৈকালের দিকে বিপিন আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া পাঁচুর মাকে কহিল—কৈ, গেল কোথায় পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা কহিল—ঘরে শুয়ে আছে।

বিপিন চমকিয়া কহিল—অসুখ-বিসুখ করে নাই ত?

ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া পাঁচুর মা কহিল—কে জানে বাপু; ছোটলোক জাত আমরা, ওসব করণ-কারণ বুঝতেও পারি না।

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গিরি ঈষৎ বাঁকা হাসি অধরে টানিয়া বলিল—বুঝবার কথা নয়

পাঁচুর মা, সত্যিই এ তুমি বুঝবে না, কিন্তু অসুখ-বিসুখও কি আমার করতে নাই?

পাঁচুর মা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—তা ত বলি নাই মা, আর তুমিও ত কিছু বল নাই।

—বলি নাই, তা হবে; মাথা ধরেছে বলেছিলাম মনে হচ্ছে; ত থাক,তুমি এখন এস।

পাঁচুর মা পলায়নের সুযোগ পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

বিপিন এবার আসিয়া গিরি যে দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছিল, সে দাওয়ায় বসিয়া কহিল—মাথা ধরেচে?

—না, কিন্তু আমার হারের কি হ'ল?

বিপিন কহিল—না, এখনও কিছু হয় নাই, তবে হবে।

গিরি অনুত্তেজিত দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—কিন্তু সে কথা ত ছিল না।

বিপিন কাকুতি করিয়া কহিল—বড় টানাটানি যাচ্ছে।

গিরি হাসিয়া কহিল—সে কি আমার দেখবার কথা? মনে আছে তোমার, আমি চেয়েছিলাম—টাকা, গয়না, কাপড়!

—তা কি দিতে কশুর করি আমি গিরি? আমি জমি বিক্রি করেছি।

গিরি কহিল—কত দিয়েছ, তোমার আজ জমি গিয়েছে আবার কিনবে, যা ছিল তার চেয়েও বেশি হতে পারবে; কিন্তু আমার যা গিয়েছে তা কি ফিরবে, ফিরিয়ে দিতে পারবে?

বিপিন নীরব হইয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর ত ইহার নাই।

গিরি কহিল—কাল দেবে বায়না?

বিপিন উঠিয়া হাত ধরিয়া কহিল—দোব, দোব, দোব—তিন সত্যি করছি। আমার উপর রাগ করো না তুমি। বলিয়া সে আবেশভরে গিরিকে বুকে টানিয়া লইতে চাহিল, কিন্তু গিরি বাধা দিয়া কহিল—ওই মেয়েটাকে কাঁদতে বারণ করে এস তুমি, আমার বুকের ভেতর কেমন করছে।

সন্তানহারা হতভাগিনীর দুর্বল কণ্ঠ তখনও রহিয়া রহিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছিল—ওরে যাদু রে!

একুশ

মাস পাঁচেক পর।

একটা আলস্যে, ক্লান্তিতে গিরি ক্রমশঃ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

পাঁচুর মা আসিয়া ডাকিল—বৌমা!

সে মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া রহিল। সে পাঁচুর মায়ের কথার কোন জবাব দিল না। দেহ কেমন অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। শরীর তাহার বেশ ভাল বোধ হইতেছিল না। ক্লান্তিতে দেহ আর বয় না। তন্দ্রালসতায় সর্বদাই শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সেই সর্বনাশী আবার তাহাকে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যা করিবার কামনা

তাহারা জাগিয়া উঠে। নির্জন নিঃসঙ্গ অবসরে সে তাহাকে ডাকে—কখনও স্মরণ করাইয়া দেয় —কোথায় বিষ-ফলের গাছ, কোথায় দড়ি, কোথায় খড়্গ, গভীর জলতল কেমন শীতল!

সেদিন আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল। প্রভাত পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখেই ঢেঁকি-শালের চালটার ওপাশে তালগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছিল। বড় দেবদারু গাছটায় নূতন কচি পাতা দেখা দিয়াছে। তাহারই ডালে বসিয়া হলুদ রঙের অতি সুন্দর পাখিটা শিষ দিয়া ডাকিতেছিল—কৃষ্ণের খোকা হোক।

গিরি সেই ডাক শুনিতে শুনিতে কহিল—মিছেই ডেকে মরলি তুই। কৃষ্ণের খোকা কোন কালে হ'ল না; হবেও না।

পাঁচুর মা কহিল—না বৌমা, ওরা ত ও বলে না। বলে গেরস্থের খোকা হোক।

ঈষৎ হাসিয়া গিরি বলিল—একই কথা মা। ওর অভিশাপও ফলে না, আশীর্বাদেও কিছু হয় না।

—তা হয়ত হয় না বৌমা। কিন্তু আশীর্বাদও ত করে। মিষ্টি কথাও ত বলে। তাই বা সংসারে কজন বলে!

—তা বটে।

পাঁচুর মা কহিল—আবার সেদিন একজন বৈরাগী বাবাজী বলছিল ওরা নাকি এসব কিছু বলে না। ওরা বলে 'কৃষ্ণ কোথা হে'!

গিরি কহিল—যা মনে করবে, তাই শুনবে তুমি ওর ডাকে!

ঝিরঝির করিয়া খানিকটা বাতাস বহিয়া গেল। গিরির নিজের হাতে পোঁতা করবী গাছটা সে-বাতাসে লুটোপুটি খাইয়া দুলিয়া উঠিল। গিরি গাছটার দিকে চাহিয়া কহিল—করবী গাছটায় এক কলসী জল দিয়ো ত পাঁচুর মা।

পাঁচুর মায়ের একটা কথা যেন মনে পড়িয়া গেল। সে কহিল—তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছি বৌমা! তোমার গাছে এবার কুঁড়ি ধরেছে দেখেছ?

গিরি অতি-মাত্রায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। গাছটির ডালগুলি সযত্নে নোয়াইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল—আমার তা হ'লে নাতনী হবে পাঁচুর মা।

পাঁচুর মা বিস্মিত হইয়া গেল। গিরি কহিল—আমার নিজের হাতে পোঁতা গাছ—ও আমার মেয়ের মত। ওর ফুল হবে—সে আমার নাতনী হবে না?

পাঁচুর মা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসফেলিয়া সে কাজ করিয়া চলিল। এই ব্যথাতুর নীরব সহানুভূতি গিরিকে স্পর্শ করিল। সে ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল —যার যেমন অদৃষ্ট পাঁচুর মা।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা চলে না। পাঁচুর মা চুপ করিয়াই রহিল।

গিরি কহিল—গাছটাকে সাধ খাওয়াতে হবে পাঁচুর মা! খুব ঘটা ক'রে করব আমি।

পাঁচুর মা এতক্ষণে হাসিল।

সমস্ত দিনটা গিরির মনে মনে একটা পুলক জাগিয়া রহিল। পাঁচুর মা কর্মান্তরে বাহিরে

গেল। গিরি করবী গাছটির নিকটে বসিয়া সস্নেহে গাছটির শাখাপ্রশাখায় মায়ের মতই হাত বুলাইয়া কত আদর করিল। কত ছড়া সে গুন্ গুন্ করিয়া আবৃত্তি করিয়া গেল। গৌরী এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এ গান আর সে গায় নাই।

অপরাহ্ণ-বেলায় মাথার উপরের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, দিগন্তরেখার কোলে কোলে শুধু ছিন্ন বিশৃঙ্খল কালো মেঘের স্তর। সে স্তরমালার সর্বাঙ্গ অস্তমান রক্তবর্ণ সূর্যের কিরণ-প্রভায় গভীর রক্তবর্ণে ঝলমল করিতেছিল। আরও উপরের মেঘে মেঘে ক্রমশঃ ক্ষীণ রক্তাভাব সমারোহ। আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়াছিল। তাহার প্রতিচ্ছটায় সমস্ত পৃথিবী রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম বসন্তের উতলা পাখির দল এমন উপভোগ্য সন্ধ্যায় বিচিত্র কলরবে চারিদিক মুখর করিয়া তুলিয়াছিল।

সন্ধ্যার অনতিপূর্বে গিরি কলসীটা তুলিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া পড়িল। দুঃখদুর্দশা জীবনে তাহার জন্মগত ব্যাধি। তাহার জন্য লজ্জা বা আক্ষেপ গিরির কোনোদিন ছিল না। কিন্তু স্বামীর হঠকারিতার কর্মফলে যেদিন গ্রামসুদ্ধ লোক কানাকানি করিয়া হাসিল—সেইদিন হইতে আপনার মন্দ ভাগ্যের লজ্জায় গিরি মুখ লুকাইয়া ছিল। ঘাটে পথে সে বড় বাহির হইত না। এই মন্দ ভাগ্যের লজ্জারও উপরে ঋিল পাওনাদারদের তাগিদের ভয়। কিন্তু যেদিন পঞ্চায়েতের দরবারে তাহার কলঙ্কের কৈফিয়ৎ-তলবের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিল, সেইদিন হইতে সে আবার পথেঘাটে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারপর বিপিন যখন তাহার যথাসর্বস্ব হইয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল—তখন হইতে তাহার জীবনের কলঙ্কিত পতকাটা আরও উঁচু করিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

গ্রামের প্রান্তে বেনেপুকুর। গ্রাম অতিক্রম করিয়া গিরি মুক্ত মাঠে নামিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে যেন রঙের সায়রে ডুব দিয়া উঠিল। কাপড়খানাকে কে যেন লাল রঙে ছোপাইয়া দিয়াছে। অনাবৃত প্রত্যঙ্গগুলি অপরূপ বর্ণশোভায় সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তিলের সাদা ফুলগুলি আজ যেন রাঙা হইয়া ফুটিয়াছে। পায়ের তলায় সবুজ ঘাসের রং যে সে কি দাঁড়াইয়াছে—তাহা গিরি জানে না। গিরির চিত্ত বড় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ঘাটে কেহ ছিল না। বেনেপুকুরের স্থির কালো জলের তলে রাঙা আকাশ ধরা দিয়াছে। গিরি চঞ্চলা বালিকার মত আলোড়ন তুলিয়া জলে নামিল। জলতলের রাঙা আকাশে ঢেউ উঠিল। পুকুরের পাড়ে সজিনা গাছে ফুলের ফুলঝুরি দেখা দিয়াছে। সে ফুলের ছবিগুলিও দুলিতেছিল। গিরি গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া সেই ছবি দেখিতেছিল। ধীরে ধীরে তরঙ্গিত জল স্থির হইয়া আসিল। স্থির জলতলে রাঙা আকাশের পটভূমির উপর ফুটিয়া উঠিল—বড় সুন্দর একখানি মুখ। আপনার মুখশ্রীতে গিরি আপনি মুগ্ধ হইয়া গেল। চোখের কোলে কোলে দুঃখের কালো রেখাটি রূপ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। সে যেন কাজলের রেখা। জল হইতে হাত দুইখানি তুলিয়া গিরি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। তারপর দেহখানি তুলিয়া অঙ্গবাস মুক্ত করিয়া আপন দেহের পানে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ সে যেন চমকিয়া উঠিল।

তাহার দেহের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিতে শুরু করিয়াছে। কে যেন তাহার দেহশ্রী ভাঙিয়া গড়িতে শুরু করিয়াছে।

লজ্জায় আনন্দে গিরির চিত্ত অধীরে হইয়া উঠিল। সে আপনার স্তনদুটি নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিল। শ্যামশোভাসম্পন্ন স্তনাগ্র দুটি ফলন্ত শস্যশীর্ষের মত ঈষৎ অবনমিত। সে তাড়াতাড়ি ভিজা কাপড়খানি ভাল করিয়া দেহে জড়াইয়া পূর্ণকুম্ভকক্ষে বাড়ি ফিরিল।

কাপড় ছাড়িয়া সে কেরোসিনের ডিবাটি জ্বালাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিল। ডিবার রক্তাভ ক্ষীণ রশ্মিতে ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না। সলিতাটা গিরি অসম্ভব রকম বাড়াইয়া দিল।

সে আলোতে সে দেখিল—সত্যই তাহার রূপ অপূর্ব নবরূপে আকার লইতেছে। তাহার রক্ত-মাংসের দেহ লইয়া কোন অজ্ঞাত শিল্পী অদৃশ্য হস্তে যেন দেবতার শ্রীমন্দির গড়িয়া তুলিতেছে। আপনার রূপ দেখিয়া গিরির নিজেরই আশা মিটিতেছিল না।

তাহার তন্ময়তা ভাঙিল পাঁচুর মায়ের কণ্ঠের আহ্বানে। রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিয়া পাঁচুর মা ডাকিতেছিল বৌমা! বৌমা!

সে অসম্বৃত বসনে দরজা খুলিয়া দিল।

পাঁচুর মা কহিল—ঘরে এত ধোঁয়া কেন বৌমা? আমার যে ভয় হয়েছিল! ওমা—ডিবেটা জ্বলছে যেন মশাল জ্বলছে!

গিরি পাঁচুর মায়ের হাত ধরিয়া কহিল—দেখ ত পাঁচুর মা, দেখ ত।

—কি বৌমা?

গিরি প্রদীপ্ত জ্বলন্ত ডিবাটি আপনার অনাবৃত দেহের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

কহিল—কিছু বুঝতে পারছ না?

পাঁচুর মা একাগ্র দৃষ্টিতে গিরির দেহের দিকে চাহিয়া ছিল।

গিরির যেন বিলম্ব সহিতেছিল না। সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বুঝতে পারছ? একি সত্যি?

পাঁচুর মা সস্নেহে গিরির স্খলিত বসনাঞ্চল তাহার দেহে টানিয়া দিল। বলিল—ভর-সন্ধ্যে-বেলা, গায়ে কাপড় দাও মা। খোলা গায়ে থাকতে নাই।

গিরির তবু সন্দেহ যায় নাই। সে বলিল—কিছু বোঝা গেল না পাঁচুর মা?

স্নেহভরেই পাঁচুর মা কহিল—বেশ ত বোঝা যাচ্ছে বৌমা! তোমার খোকা হবে।

গিরি বোধ করি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে নত হইয়া পাঁচুর মাকে প্রণাম করিতে গেল। তাড়াতাড়ি পিছাইয়া গিয়া পাঁচুর মা কহিল—ছি-ছি-ছি-, ও কি করছ বৌমা? আমাকে পাপে ডোবাচ্ছ কেন?

হাসিয়া গিরি বলিল—কোন পাপ হবে না। তুমি আমার মায়ের মত।

পাঁচুর মা কহিল—এমনি আশীর্বাদ করছি আমি বৌমা। কিন্তু আমি যে ছোট জাত।

জাত! গিরি সেই বাঁকা হাসি হাসিল।

* * *

ছেঁড়া কাপড়ের রঙীন পাড় হইতে সুতা বাহির করা হইতেছিল। কাঁথার উপর নক্শা তোলা হইবে। পাঁচুর মা উঠানে একরাশ ধান লইয়া বসিয়াছিল।

লাল সুতার গোছায় পাক দিতে দিতে গিরি কহিল—সব্জে সুতো শুধু হ'ল না পাঁচুর মা। সব্জে সুতো ভিন্নও ত লতা কি বোঁটা তোলা হবে না।

পাঁচুর মা কহিল—এক নেতি সবুজ কস্তা হাট থেকে নিয়ে এলেই হবে।

হরেকৃষ্ণর ভগ্নী রতন আসিয়া দাওয়ায় বসিল। অনাবশ্যক ভাবেই কৈফিয়ৎ দিয়া কহিল —দিন ভাই অনেকটা বড় হয়েছে। বসে বসে ব্যাজার হয়ে উঠল মন। তাই বলি যাই বৌ কি করছে একবার দেখে আসি।

গিরি ছোট্ট একটি সম্ভাষণ কহিল—এস।

পাঁচুর মা কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিয়া ফেলিল—শাঁখ-কাটা করাত দেখেছ বৌমা, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।

রতন কথাটা গায়ে মাখিল না। সে গিরির হাতের কাজের দিকে চাহিয়া কহিল—ও কি হবে বৌ?

সংক্ষেপে গিরি কহিল—কাঁথা!

—কাঁথা! সই-সাঙাতী কাউকে দিবি?

—না।

—তবে কার? এ যে দেখছি ছোট ছেলের কাঁথা তৈরি হচ্ছে!

গিরি কথা কহিল না। উত্তর দিল পাঁচুর মা। কহিল—বৌমা আমাদের পোয়াতী।

রতন সবিস্ময়ে গিরির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর পরম উৎকণ্ঠার সহিতই যেন সে কহিল —এ তুই সামলাবি কি করে বৌ?

মৃদুস্বরের এই কয়টি কথা নিঃশব্দ মেয়ে দুইটির কানে বাজের মতই গর্জন করিয়া উঠিল। গিরির হাত হইতে সুতার নেতিটি অকস্মাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। পঙ্গুর মত নিশ্চল মূর্তিতে সে রতনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। পাঁচুর মায়েরও হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া রতন উঠিল, কহিল—যাই, বিপিন দাদাকে ধরি গিয়ে— সন্দেশ খাওয়াক।

এক মুহূর্তের জন্য গিরির চোখ দুইটা ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই সে শান্ত হইয়া মুখ নামাইল। কিন্তু বুকের মধ্যে ধৈর্যের বাঁধ আর তাহার থাকিতেছিল না। রতন বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বলিল—তোমার বিপিন দাদাকে একবার ডেকে দিয়ো ত।

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বুক চাপড়াইয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। ভবিষ্যতের বাস্তবতা তাহার চক্ষের উপর ভয়াবহ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিল।

তাহার মাতৃমন্দিরের শিশু-দেবতার অঙ্গে বর্বর মানুষগুলা নরকের কাদা ছিটাইয়া কর্দমাক্ত

বীভৎস করিয়া তুলিল!

আকাশ-পাতাল চিন্তায় সে কূলহারার মত ডুবিয়া গেল।

বিপিনের ভরসায় সে বসিয়া রহিল।

বিপিন সমস্ত শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, গিরি তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিল—কি হবে গো?

বিপিন কহিল—হবে, হবে আর কি? পদা দাইকে ডেকে বলেছি—সে দুদিনে সব সামলে দেবে।

গিরির অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল, তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল একদিনের মনশ্চক্ষে দেখা ছবি। ধরণীর রাক্ষসী রূপ! সে একদৃষ্টে বিপিনের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কহিল—যাও, তুমি যাও, চলে যাও, চলে যাও। আমার বাড়ি থেকে চলে যাও—চলে যাও বলছি।

বিপিন উঠিয়া কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। ভেবে দেখো তুমি, কাল আসব।

গিরি চিৎকার করিয়া বলিল—না—না—না, এসো না তুমি আর, এসো না বলছি।

বলিয়া সে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ তাহার তাসের ঘর ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আজ সত্যই বাহির হইল রাশি রাশি কান্না। জীবনে সে কান্না ফুরাইবার নয়, বুঝি মাটির বুক হইতে আকাশ পর্যন্ত সে কান্নার পরিমাণ কুলাইবে না।

বহুক্ষণ পর সে একটা সংকল্প লইয়া উঠিয়া বসিল। পাঁচুর মা বাহিরে নীরবে বসিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া গিরি কহিল—পাঁচুর মা, তুমি বাড়ি যাও।

পাঁচুর মা চমকিয়া উঠিল, কহিল—কেন?

—আর তোমাকে দরকার হবে না, পাঁচুর মা।

—এ-কথা কেন বলচ বৌমা? কি করবে তুমি আমায় সত্যি করে বল।

তাহার কণ্ঠস্বরের উদ্বেগে গিরি ব্যথিত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—সে তুমি নাই শুনলে পাঁচুর মা।

* * *

নিবিড় অন্ধকার রাত্রি আলোকে আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম জুড়িয়া ঘরের পর ঘরের চালের উপর উর্ধ্বমুখী লেলিহান আগুনের শিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

বিপুল আর্তনাদে নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশের কোল পর্যন্ত ভরিয়া উঠিতেছে—জল! জল! জল!

হে ভগবান রক্ষা কর! ঠাকুর রক্ষা কর!

বৈশাখের শুকনা খড়ের চাল অগ্নির অতি উপাদেয় হইয়া আছে। গ্রীষ্মের বহ্নিদেবতা

দ্বাদশ সূর্যের যৌবনে বীর্যবান হইয়া উঠিয়াছে। আগুন যেন নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল।

গ্রামপ্রান্তে স্বল্পস্রোতা নদীটি পার হইয়া সরকারী পাকা সড়কটা চলিয়া গিয়াছে। নদীর ওপারের ঘাটে সেই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গিরি নির্মিমেষ দৃষ্টিতে এই অগ্নিলীলা দেখিতেছিল। তাহার দু'টি অধর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফুটিয়া ছিল নিঃশব্দ নিষ্ঠুর হাসি।

কিছুক্ষণ পর গ্রামের দিকে পিছন ফিরিয়া শুভ্র রাস্তাটির চিহ্নপথে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিল। পথের দূরত্বের হিসাব ছিল না। হিসাব রাখিবার প্রয়োজনও নাই। ঘরের বন্ধন, সমাজের নাগপাশ নিজের হাতে আগুন ধরাইয়া নিঃশেষে ভস্ম করিয়া পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া আপনাকে সে মুক্ত অনুভব করিল।

রাত্রির অন্ধকার পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। আকাশ ক্রমশঃ রক্তরাঙা হইয়া উঠিল। তারপর সেই রাঙা দিগ্বলয় ভেদ করিয়া উদিত হইল অতি সুকোমল রক্তবর্ণ প্রভাত-সূর্য!

সে অরুণোদয়কে গিরি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বাইশ

দীর্ঘ চার বৎসর পর এমনি আর একটি অন্ধকার রাত্রে গিরি ওই ঘাটের উপরে বসিয়া ছিল। এতদিন পরে গিরি বাহিরের দুনিয়াকে যাচাই করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন নিষ্প্রভ আকাশ। সম্মুখে দু'কূল-স্ফীতা নদী—মাঝে মাঝে আবর্তের শব্দ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে। গিরি বাধ্য হইয়া ঘাটের মাথায় বটগাছটার তলে আশ্রয় লইয়াছিল। পাশে ময়লা একটা কাপড়ের ওপর ঘুমন্ত একটি শিশু—গিরির সন্তান।

ঝিপ্ ঝিপ্ করিয়া মৃদুবর্ষণ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সিক্তপক্ষ পাখির পাখার ঝাপটার মত আর্দ্র বায়ু উতলা হইয়া উঠিল। শীতে ছেলেটা নড়িয়াচড়িয়া গুটিগুটি হইয়া শুইল। গিরি ডাকিল—নীল! নীল!

ছেলেটির নাম রাখিয়াছে নীলকণ্ঠ।

গিরির জীবন-মন্থনে যত কিছু বিষ উঠিয়াছে, ওই তাহা নিঃশেষে পান করিয়া আসিয়াছে। যেদিন ও আসিয়াছিল, সেদিনের কথা গিরির মনে পড়ে না। দুঃখতুর্দশাময় জীবনের ইতিহাসের মধ্য হইতে এ দিনটি তাহার হারাইয়া গেছে। শুধু মনে পড়ে সেদিনও এমনি একটি বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি। একটা ছোট শহরের প্রান্তদেশে গাছতলায় প্রকাণ্ড একটা পুরনো বয়লারের মধ্যে গিরি আশ্রয় লইয়াছিল।

প্রসবের যন্ত্রণায় গিরি চক্ষের সম্মুখ হইতে আকাশ, অন্ধকার, অরণ্য সব যেন মুছিয়া গিয়াছিল। তারপর যে মুহূর্তগুলি আসিল, সে তাহার চেতনার সম্মুখে একটা অস্বচ্ছ যবনিকার আড়াল দিয়া দিল। গিরির চেতনা হইলে দেখিল সে একটা হাসপাতালে। কোলের কাছে নীলকণ্ঠ।

থাক্; গিরি স্মৃতিকে ভুলিতে চাহিতেছিল। স্মৃতির পীড়ন তাহার সহ্য হইতেছিল না।

আর্দ্র বাতাসে শীতার্ত হইয়া গিরি ছেঁড়া কাপড়টা গায়ে ভাল করিয়া টানিয়া দিতে চেষ্টা করিল। শতছিন্ন সিক্ত কাপড়খানায় শীত কাটে না। দুই হাত দিয়া গিরি আপনার পঞ্জর দুটা আঁকড়াইয়া ধরিল।

হাড়! শুধু হাড়—কঙ্কালের মাথা! দুরন্ত বীভৎস ব্যাধি জলৌকার মত ধীরে ধীরে রক্ত মাংস সব হরণ করিয়া লইয়াছে।

গিরির তাহাতে আক্ষেপ নাই। তাহার চিত্ত যেন প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। কেন আক্ষেপ নাই? এই আক্ষেপই জীবনের আজ সব চেয়ে বড় আক্ষেপ! কেন তাহার দেহ গেল? এই বর্বর পৃথিবীতে সে বাঁচিয়া থাকিবে কি লইয়া? একটা দিনের কথা মনে পড়িল।

বড়লোকের দেবালয়ে সে আশ্রয় লইয়াছিল। দেবালয়; অতিথিশালা; উৎসব-আড়ম্বরের অভাব নাই সেখানে। বাড়ির দুয়ারে নীলকণ্ঠকে কোলে করিয়া বসিয়াছিল দুই মুঠা উচ্ছিষ্টের আশায়। দেবালয়ের কর্ত্রী পূজার তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন—কে লা তুই?

সসঙ্কোচে গিরি উত্তর দিল—ভিখেরী মা!

—এমন গতর, কাজ করিস নে কেন? কাজ করবি?

গিরি বর্তাইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—কেন করবো না মা। পাই নে কাজ—

—বেশ, আমাদের এই ঠাকুরবাড়িতে কাজ কর্। এঁটোকাঁটা ঘুচোবি। তুই আর তোর ছেলে খেতে পাবি, মাইনেও কিছু পাবি।

গিরি এই দেবালয়ের বিগ্রহের পায়ে সেদিন অসীম ভক্তিভরে অসংখ্য প্রণতি জানাইয়াছিল। ঈশ্বর সত্যসত্যই সেদিন তাহার নিকটে দয়াল ঠাকুর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অসীম ভক্তি; ত্রুটিহীন নিষ্ঠার সহিত সে দেবালয়ের সেবায় আপনাকে নিয়োগ করিল। দিন পনেরো পর বোধ হয়। নীলকণ্ঠের জ্বর হইয়াছিল। অসুস্থ শিশুকে শোয়াইয়া প্রভাতের কাজ সে কোনমতে সারিল। কিন্তু অসুস্থ ছেলেটার ক্রমশ যেন অসুখ বাড়িতেছিল। গিরি ছেলেকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

দ্বিপ্রহরে ভোগের কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া গেল। গিরি নীলকণ্ঠকে কোলে করিয়া ঠাকুর-বাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল।

রূঢ়কণ্ঠে কর্ত্রীর অদেশ হইল—ঠাকুর, ও মাগীকে ভাত দিয়ো না আজ। কাজ না করলে ভাত পাওয়া যায় না দুনিয়ায়।

গিরি ছেলেটাকে একটু ছায়ায় শোয়াইয়া দিল। তার পর ঝাঁটাগাছটা হাতে করিয়া উচ্ছিষ্ট স্থান মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

আবার তেমনি রূঢ় কণ্ঠে আদেশ হইল—ঝাঁটা রেখে দাও তুমি। তোমায় কাজ করতে হবে না।

গিরি ঝাঁটাগাছটা ফেলিয়া দিল। তার পর ধীর কণ্ঠে সে কহিল—এ ক'দিনের মাইনেটা আমায় দিয়ে দিন মা।

—মাইনে দেব না।

গিরি আর কথা কহিল না। সে ছেলেটাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভিতরে তখন ঠাকুর ব্রাহ্মণ বলিতেছিল—ওর ছেলের অসুখ মা।

সে কথার কেহ কোন জবাব দিল না। ব্রাহ্মণটি আবার কহিল—ওকে আজকের মত দুটো এঁটো ভাত—

এ কথার জবাব আসিল—না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা গিরির চোখের উপর ঘুরিতেছিল। সে পথের ধারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথ বহিয়া লোক যায় আসে। গিরি মৃদুকণ্ঠে কহে,—বাবু!

পথিক ফিরিয়া চায়। শুধ্ ফিরিতে চায় নয়, দৃষ্টি দিয়া সর্বাঙ্গ তাহার লেহন করিয়া যায়। তারপর চলিয়া যায়। কেহ কিছু দিয়াও যায়—একটা পয়সা, একটা আধলা।

একটি ভদ্রলোকের ছেলে ভিক্ষা দিতে পকেটে হাত দিল। বাহির হইল একটা টাকা। সে বার বার টাকাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া পকেটে পুরিল। আবার কিছুক্ষণ পর সে লোকটি ফিরিল। গিরির কাছাকাছি আসিয়া টাকাটা বাহির করিয়া শব্দ পরীক্ষা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গিরি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দুনিয়ার পশুত্ব আর তাহাকে বিচলিত করে না। সন্ধ্যা হইয়া গেল। গিরি হাতের পয়সা গণনা করিয়া দেখিল সাড়ে তিন পয়সা হইয়াছে। দুইটা পয়সা তিনটা আধলা। ঘৃণাভরে সে পয়সা কয়টা পথের অন্ধকারে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। একটা বাঁধা ঘাটে গিয়া কয় আঁচলা জল খাইয়া সে বসিয়া রহিল।

পয়সা কয়টা ফেলিয়া দেওয়ার জন্য ক্রমশ তাহার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। সে উঠিয়া পথের সেই স্থানটা হাত দিয়া খুঁজিতেছিল। হাতে ঠেকিল শুধ্ একটা আধলা। ক্লান্ত হইয়া সে উঠিয়া আসিল।

ঘাটে শুইয়া সে আপনার কথাই ভাবিতেছিল। জীবনের কথা মনে করিয়া রাত্রি কাটাইতে গেলে তাহার সহস্র রজনী প্রভাত হইয়া যায়। নীলকণ্ঠ ঘুমাইয়াছে।

—এই!

শব্দে চমকিয়া গিরি দেখিল ঠাকুরবাড়ির সেই ব্রাহ্মণ। হাতে একটা পাতায় খাদ্য লইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

ঠাকুর কহিল—নে, খা।

গিরির অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ওই অন্ন তাহার মুখে তুলিতে রুচি হইল না। কহিল—না।

ঠাকুর তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিল। সে পাতাটা নামাইয়া দিয়া কহিল—ঠাকুরবাড়ির

ভাত নয়। কিনে আনলাম।

গিরির চোখে জল আসিল। পাতার খাবারে হাত দিতেই হাতে ঠেকিল একটা কঠিন বস্তু। অন্ধকারেও রৌপ্যের রূপ লুকাইল না।

*　　　*　　　*

আবার কিছুক্ষণ পর। কে আসিয়া ঘাটে নামিল। গুন্ গুন্ করিয়া লোকটি গান গাহিতেছিল। গিরি পঙ্গুর মত অসাড় দেহে পড়িয়াছিল, কোন দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

তাহার সে চমক ভাঙিল ঠন্ করিয়া একটা মৃদু শব্দে।

লোকটা জলে পা ধুইতে ধুইতে টাকাটা বাঁধা ঘাটের উপর আছড়াইতেছিল। আর আপন মনেই বলিতেছিল—না—শব্দ ত ঠিক আছে!

এই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে গিরি যেন অনুভব করিল সমস্ত অতীতটা তাহার মিথ্যা হইয়া গেছে।

তার পর?

তার পর কত মানুষকেই সে দেখিল। অধিকাংশই পাষণ্ড নৃশংস। মোটর ড্রাইভার সেই লোকটা। কালো ধূলিধূসর চেহারা, জবাফুলের মত লাল চোখ।

সে বর্বরটাকে তাহার হত্যা করা উচিত ছিল।

নীলকণ্ঠকে সে টুঁটি টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ছায়াছবির মত তাহারই পদচিহ্নিত ধরিত্রীর অংশগুলি চোখের উপর তাহার ভাসিয়া চলিয়াছে।

অকস্মাৎ গিরি অস্থিরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। জলের ধারাগুলি তীক্ষ্ণ হইয়া মুখে-চোখে বিঁধিতেছিল। কিন্তু সেদিকে তাহার গ্রাহ্যই ছিল না।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছিল—আয় আয়।

এ সেই! যে একদিন হিমশীতল অঙ্গুলি তাহার ললাটের সম্মুখেই ধরিয়াছিল। গিরি সভয়ে সরিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার গৃহকোণ হইতে যে একদিন তাহাকে ডাকিয়াছিল, বিষ নে! সে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এতদিন পরে সে-ই আজ আবার অকস্মাৎ আসিয়া তাহার জীবনে দেখা দিয়াছে।

গিরি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিল। কোথাও কিছু দেখা যায় না। এ বিপুল অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী আজ মিথ্যা হইয়া গেছে। শুধু পদতলে দু'কূল-স্ফীতা আবর্তময়ী নদী অন্ধকারের মধ্যে চক্ চক্ করিতেছিল। ওই নদীর মধ্য হইতে ডাক উঠিতেছিল। গিরি একদৃষ্টে নদীর বুকের দিকে চাহিয়া রহিল। মন্থর পদে জলের দিকে সে অগ্রসর হইয়া চলিল।

অকস্মাৎ ওপারে কোথায় সশব্দে নদীর কূল ভাঙিল। সেই শব্দে চমকিয়া উঠিয়া গিরি বোধ করি আত্মস্থ হইয়া উঠিল। সে ডাকিল—নীল!

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবার চেষ্টা করিল। যেমন-তেমন চেষ্টা নয়, ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পিচ্ছিল তটভূমিতেই সেই অদৃশ্য শত্রু বসিয়া ছিল। সে গিরির দুর্বল কম্পিত পদ ধরিয়া আকর্ষণ করিল। গিরি পদস্খলিতা হইয়া নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।

তেইশ

এই কয় বৎসরে এপারের গ্রামখানির মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বিপিন নাই, পাঁচুর মা মরিয়াছে। আরও কত লোক গিয়াছে। কত নতুন মানুষের মেলা। শ্রীমন্তের ঘরখানা একটা মাটির স্তূপে পরিণত হইয়াছে। চিহ্নের মধ্যে বাঁচিয়া আছে একটা করবীব ঝাড়, আর তাহারই সমরেখার ওদিকে সেই লেবুগাছটা। বাস্তুঘরের মাটির উর্বরতায় গাছ দুইটা ঘন বর্ণে সতেজ স্বাস্থ্যে বিস্তৃত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঋতুতে ঋতুতে পুষ্পসম্ভারে অপরূপ শ্রী ধরিয়া উঠে তাহারা। বর্ষার নিশীথ রাত্রে লেবুফুলের উগ্র গন্ধে সুরভিত বর্ষণ-সিক্ত বায়ু চারিদিকে তাহার বার্তা বহিয়া বেড়ায়। করবী গাছটা রক্তরাঙা ফুলে সর্বাঙ্গ ছড়াইয়া বাতাসে দোলে, তাহারও ফুলে ফুলে একটি মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধ উঠে। মানুষের সুখদুঃখের কোন ছায়াই তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই।

গ্রামের লোকে বলে, এই গাছ দুইটার তলে নিশীথ রাত্রে কাহাকে নাকি দেখা যায়। শীর্ণা এক নারী অতি দুঃখে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া গেছে। কোলে তাহার অর্ধদগ্ধ একটি শিশু। মধ্যে মধ্যে সে নাকি বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে। লোকে তাই ওদিক মাড়ায় না। গাছের ফুল গাছে ফুটিয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। লেবুগাছটায় ফল পাকিয়া রসভারে মাটিতে পড়িয়া মাটিতেই মিশাইয়া যায়। বীজ হইতে অসংখ্য চারা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কতক তাহার পশুতে নষ্ট করে, কতক শুকাইয়া যায় উত্তাপে।

শুধু একটা ছেলে মাঝে মাঝে ওখানে যায় আসে। পাকা লেবু সংগ্রহ করিয়া এখানে-ওখানে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। এই বয়সেই ব্যবসা শিখিয়াছে ও। উলঙ্গ ধূলিমাখা দুনিয়ার হেলায় বর্ধিত শিশু আপনার উদরান্নের সংস্থান আপনি করে। গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়। পাখির মত আশীর্বাদের বুলি আওড়ায়। সমস্ত শব্দগুলার অর্থও হয়ত সে জানে না।

গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া ডাকে—অনাথ, দয়া করো গো মা। কল্যাণ হবে মা।

কল্যাণ মানে হয়ত শিশু জানে না। অনাথ যে কি সে ধারণাও তাহার নাই।

সব দিন আশীর্বাদে গৃহস্থের হৃদয় গলে না। রূঢ়বাক্যে তাহাকে খেদাইয়া দেয়। তার জন্যও কোন অভিযোগ নাই, কোন দুঃখ নাই তার।

সে তখন ব্যবসায়ী সাজিয়া বসে। ছেঁড়া গায়ের কাপড়ের আঁচল হইতে লেবু বাহির করিয়া বলে—লেবু লেবে গো? লেবু?

তাহাতেও দয়া না হইলে, গৃহস্থকে ভেঙাইয়া পলাইয়া যায়। অন্তরালে গালিও দেয়।

আবার দশদিন বিশদিন গ্রাম-গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। দশদিন বিশদিনের অদর্শনে বিন্দু

বিন্দু করিয়া করুণা গৃহস্থের বুকে জমিয়া থাকিবে এ জ্ঞানটুকু তাহার হইয়াছে।

কত নূতন গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে—কে রে তুই ?

ছেলেটা উত্তর দেয়—আমি গো—নীলকণ্ঠ।

—নীলকণ্ঠ ! কাদের ছেলে রে ?

—সেই ক্ষেপীর ছেলে গো আমি। হুই গাঁয়ের সেই ক্ষেপী গো ! মা কোথা গিয়েছে আমাকে ফেলে। ভিক্ষে করি গো আমি।

—আহা-হা, থাকিস কোথা রে ?

—গাঁয় গাছতলাতে পড়ে থাকি।

ধরিত্রীর জননীর নিজের হাতে মানুষ করা সন্তান ও। এই পরিচয় ছাড়া অপর পরিচয় সব তাহার মুছিয়া গেছে। ও বসুমতীর সন্তান, জীব, মানুষ !

সংসারে এইটাই বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে বড় পরিচয়। আদিম মানব এই পরিচয় লইয়াই সংসারে আসিয়াছিল। কিন্তু মানুষ সংসারে যেদিন মালিক হইয়া উঠিল সেই দিন সে নিজেকে করিল প্রধান। স্রষ্টা ক্ষেত্র সব মুছিয়া দিয়া আপনাকে আদি করিয়া মানবের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বাঁধিয়া দিল। তাই আজ আপনার পরিচয়ের পূর্বে আর একটি মানুষকে খাড়া করিতে না পারিলে মানুষের সমাজে তার ইতিহাস কলঙ্কিত—সে হয় অপাংক্তেয়।

গৃহস্থ সাবধান হইয়া কহে—সরে দাঁড়া রে, সরে দাঁড়া না বাপু ! ছোঁয়া পড়বে যে। যত অজাত কুজাত কি এইখানেই আসবে রে বাপু !

নীলকণ্ঠ রাগে না। শুধু ও নয়, এ সংসারে নীলকণ্ঠের দলই রাগে না।

ছেলেটা নির্বিকার ভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলে—যাও মা যাও।

ও গাঁয়ের ধর্মপরায়ণা বিধবা সেদিন ঝাঁটা লইয়া তাহাকে তাড়া করিয়াছিল। তাহাতেও ওর বিকার নাই। দূরে দাঁড়াইয়া বিধবাকে সে ভেংচি কাটিয়া কহিল—দাঁড়া দাঁড়া—দেব একদিন ভাতের হাঁড়ি ছুঁয়ে।

কেহ করুণা করিলে সে করুণার সুবিধা পথের শিশু সুচতুর ভাবে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে।

তাহার দুঃখের ইতিহাসে কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে, নীলকণ্ঠ কোমল কণ্ঠে কহে—চারটি মুড়ি দেবে গো ? জল খাব।

জলখাবার মিলিলে ও বেশ মিষ্ট করিয়া বলে—একখানা ছেঁড়া কাপড় দেবে মা ? আর একটা পয়সা ? একদিন লেবু এনে দোব তোমাকে। পাকা পাকা লেবু।

কোমরে আবার একটা গেঁজ্‌লে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে থাকে দুই-চারিটা পয়সা—ওর সঞ্চিত সম্বল।

নীলকণ্ঠের সঙ্গীও একজন মাঝে মাঝে মেলে। বেঁকা বুড়ী তার নাম। তার মাথাটা গলার উপর থর থর করিয়া অবিরাম কাঁপে। লোল হাত-পাগুলাও কাঁপে। বুক পিঠ ধনুকের মত বাঁকিয়া গেছে। কম্পনগ্রস্থ অপটু হাতে একগাছা লাঠি ধরিয়া বুড়ী গ্রামান্তরে

ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। ভিক্ষার পথে নীলকণ্ঠের সঙ্গে দেখা হয়। কত অন্ধকার সন্ধ্যায়, কত বাদল দিনের পিছল পথে নীলকণ্ঠ বুড়ীর হাত ধরিয়া বুড়ীর বাড়ি পৌছাইয়া দেয়। পথে চলিতে চলিতে বুড়ীকে ফেলিয়া দিবার ভান করে। বুড়ী গাল দেয়—মর—মর। মরবি রে খালভরা, মরবি। রক্তের তেজ চিরদিন থাকে না।

নীলকণ্ঠ কৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসে।

আবার পাঁচদিন যদি বুড়ীর দেখা না পায় তবে একদিন বুড়ীর বাড়ি গিয়া খোঁজ করে—বেঁকা বুড়ী আছিস না মরেচিস্?

বুড়ী ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে কহে—কে, কে রে নীলে? আয় আয়। বড় জ্বর রে।

—কি খেলি?

—কি খাব? ভিখ্ না করলে—তা তুই যদি--

নীলকণ্ঠ আর শোনে না। নির্বিকারচিত্তে অনির্দিষ্ট পথ বহিয়া চলিতে আরম্ভ করে। যাইবার সময় গালি দিয়া যায়—ভাগ্ বেটি তেমুণ্ডে বুড়ী, মর্ না তুই।

কিন্তু ফিরিবার সময় ছেঁড়া আঁচল হইতে কতকগুলা মুড়ি ঢালিয়া দিয়া যায়। কোনদিন বা একটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া যায়। কহে—মুড়ি কিনে খাস।

কতদিন আবার বুড়ীর সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে মনের কথা হয়।

নীলকণ্ঠ বলে—আচ্ছা বুড়ী, বড়লোকগুলো যদি মরে যায় ত কি মজা হয় বল্ ত?

বুড়ীর মাথায় আসে না তাহাতে কি এমন মজা হইতে পারে। সে শিহরিয়া বলে—ও সব বলতে নাই, শুনতে পেলে ওরা মারবে।

—মারবে? হিঃ—শুনচে কে তাই মারবে?

ধনীর প্রতি ঘৃণা—ধনের উপর লোভ এই শিশুর বুকে কে দিল? সর্পের মুখে বিষ যে দেয় সেই কি?

এমনি সময়ে বৈশাখের এক খর প্রভাতে—রৌদ্র তখন সবে প্রখর হইয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে, এক আগন্তুক আসিয়া শ্রীমন্তের ধ্বংসাবশেষ ভিটাটির পাশে উপস্থিত হইল। স্থানটাকে যেন সে চিনিবার চেষ্টা করিতেছিল। লোকটির মাথায় একরাশ চুল। অর্ধেক তাহার পাকিয়া গেছে। মুখে দীর্ঘ দাড়িগোঁফ। দেহখানার কাঠামো দেখিয়া মনে হয় এককালে সে দেহ পাথরের মত দৃঢ় ছিল। কিন্তু আজ তাহা শিথিল হইয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতে চায়। মুখেচোখে এবং সর্বদেহ ব্যাপিয়া একটা শ্রান্তির চিহ্ন। সে যেন বিশ্রাম চায়।

সে শ্রীমন্ত!

ভিটাটিকে সে চিনিল ওই গাছ দুটির চিহ্ন দেখিয়া। কয় ফোঁটা জল তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। আপন ভিটার জন্য, গিরির জন্য অশ্রু তাহার সঞ্চয় করা ছিল। গিরির মৃত্যুসংবাদ গিরির মৃত্যুর পূর্বেই শ্রীমন্ত পাইয়াছিল। জেলে থাকিতেই সে বাড়ির সংবাদের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিল। জেলের নিয়মানুযায়ী জেলের কর্তা সংবাদ দিলেন শ্রীমন্তের বাড়ি যে থানার এলাকাভুক্ত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে।

* *

থানার কর্মচারীই সংবাদ দিয়াছিল—

শ্রীমন্তের স্ত্রী গিরিবালা পুড়িয়া মরিয়াছে।

সে আগুনে তাহার ঘর ও পরে সমস্ত গ্রাম পুড়িয়াছে।

আঘাতটা শ্রীমন্তকে বড় বাজিয়াছিল। সে আঘাতের বেদনা ভুলিবার নয়।

জেল হইতে বাহির হইয়াই গিরিমাটি কিনিয়া সে কাপড় রাঙাইয়া ফেলিল। একবার মনে হইয়াছিল গৌরী মাকে তাহার দেখিয়া আসে। গৌরীর শ্বশুরবাড়ির গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত গিয়াও সে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখা করিতে লজ্জা হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়াছে সে ভাল আছে। তাহার শনি ছাড়িয়াছে—হরিলাল মরিয়াছে। দূর হইতে আশীর্বাদ করিয়াই সে ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পদার্পণ করিল আপন ভিটাতে।

সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। অথচ এ সংকল্প তাহার মনের মধ্যে ছিল না।

গাছ ভরিয়া রাঙা করবী ফুটিয়া আছে। কয়টা পাকা লেবুর মিষ্ট গন্ধে স্থানটা ভরপুর। শ্রীমন্তের চোখে আবার জল আসিল। তাহার মনে পড়িল গাছটা গিরির স্বহস্তরোপিত। ছোট গৌরী খেলা-ঘরের মাটির কলসী দিয়া কত জলই না সেচন করিয়াছে ইহাতে!

বসিবার জন্য সে একটু ছায়া খুঁজিতেছিল। দেখিল করবীর বৃহৎ ছায়াযুক্ত তলদেশটি কে যেন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীমন্ত সেই ছায়াতলে আশ্রয় লইল।

অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাসে ঝরিয়া পড়িল কতকগুলি শিথিল-বৃন্ত ফুলদল। যেন কে ঐ পুরানো ফুলগুলি আগন্তুকের শিরে বর্ষণ করিতেই গাছটির নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। শ্রীমন্ত সেই ছায়াতলে শুইয়া কত অতীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙিল তাহার কাহার ডাকে—

—গোসাঁই ঠাকুর, গোসাঁই ঠাকুর—

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখিল একটা উলঙ্গ শিশু কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

সে শিশুর মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি?

উলঙ্গ শিশু কোমরের গেঁজ্‌লেটার দড়িতে পাক দিতে দিতে কহিল—আমার ওটা খেলাঘর।

শ্রীমন্ত মিষ্ট স্বরে কহিল—তোমার খেলাঘর ত আমি ভাঙি নাই।

মিষ্ট স্বরের আভাস পাইয়া শিশুটি তাহার সহিত আত্মীয়তা করিতে বসিয়া গেল। প্রথমেই কহিল—তুমি গাঁজা খাও না গোসাঁই?

শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—খাই।

—তা খাও। আমাদের মহারাজ গাঁজা খায় আর বলে—শিবকে জটা, গঙ্গাবারি, আগ্‌লাগাকে খায় ত্রিপুরারী; হর হর ব্যোম হর হর ব্যোম্ শূলী শম্ভু শঙ্কর—চেৎ চণ্ডী!

শ্রীমন্ত সত্যই আপন পোঁটলা খুলিয়া গাঁজার সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিল। গাঁজা তৈয়ারী করিতে করিতে সে কহিল—কাদের ছেলে তুমি?

—কে জানে? আমার মা ছিল ক্ষেপী। হুই শহর বলে সেই গাঁ আছে, সেই গাঁয়ে আমাদের বাড়ি।

—বাবা ? বাবা নাই বুঝি তোমার ?

—তা জানি না আমি।

আবার চুপিচুপি সে কহিল—জান গোঁসাই, লোকে বলে আমার বাবার ঠিক নাই।

শ্রীমন্ত নীরবে গাঁজা তৈয়ারি করিতেছিল। আপন মনেই কোন খেয়ালে গান ধরিয়া দিল—

দেখে এলাম শ্যাম, সাধের ব্রজধাম—শুধু নাম আ—ছে।

গাঁজা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্ত কহিল—শুকনো পাতা কুড়িয়ে আন ত খোকা।

খোকা তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল। পাতা কুড়াইয়া আনিয়া কহিল—আমি খোকা কেন হব, আমার নাম নীলকণ্ঠ।

শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—তুমি খুব ভাল ছেলে নীলকণ্ঠে !

সোৎসাহে নীলকণ্ঠ কহিল—আমাকে তোমার চেলা করবে গোঁসাই ? আমি খুব ভিক্ষে করতে পারি। খুব জোরে জোরে বলব হর হর বোম্ হর হর বোম্—ভিক্ষা মিলে মায়ী—

—আমার সঙ্গে যেতে পারবে তুমি ?

—খু-ব। আমি ত ভিক্ষে ক'রেই খাই। তিন চার কোশ ভিক্ষে করতে চলে যাই বলে। হুই বামদেবপুর, তি-শূলো, আকধারা—

গাঁজা সাজিতে সাজিতে শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—বেশ, আমার সঙ্গে যাবে তুমি।

পরম উৎসাহভরে নীলকণ্ঠ কহিল—কবে যাবে তুমি ?

—কাল।

—আজ কোথা থাকবে ?

—এইখানে।

ভীত মৃদুকণ্ঠে নীলকণ্ঠ কহিল—এখানে ভূত আছে জান ? রোজ কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

শ্রীমন্তের গাঁজা টানা বন্ধ হইয়া গেল। সে নীলকণ্ঠের মুখপানে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—ঠিক জান তুমি ?

নীলকণ্ঠ চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া কহিল—হ্যাঁ গো, কত লোক দেখেছে। সর্বাঙ্গ তার পুড়ে গিয়েছে। কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

শ্রীমন্ত গাঁজা খাইয়া নিঃশব্দে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নিমীলিত দুইটি চোখ হইতে আবার দুইটি জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। পাখির দল কলরব করিয়া যে যাহার আশ্রয়ের পানে চলিয়াছে। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে দিন-মজুরের দল সারি বাঁধিয়া ফিরিতেছে। শ্রান্তকণ্ঠে তাহাঁদের গান শোনা যাইতেছিল—

দিন কাটিলো খেটে খেটে, রাত কাটিবে ভাঙা ঘরে।

নীলকণ্ঠ কহিল—আমিও তোমার কাছে থাকব সন্ন্যেসী ঠাকুর।

শ্রীমন্ত কহিল—ভয় করবে না ?

—তুমি থাকবে যে ! আর দুজন থাকলে ভূত আসবে না।

অকস্মাৎ রূঢ়স্বরে শ্রীমন্ত কহিল—না। যা তুই এখান থেকে।

নীলকণ্ঠ কহিল—না ; তুমি পালিয়ে যাবে।

কেন পরের ছেলে এ আবদার করে, শ্রীমন্তর ভাল লাগিল না। শিশুটির সান্নিধ্যের জন্য সে যদি দেখা না দেয়।

অতি রূঢ়ভাবে সে কহিল—ভাগ্।

নীলকণ্ঠ সভয়ে দূরে সরিয়া গেল।

প্রহরের পর প্রহর রাত্রি চলিয়াছে। নিস্তব্ধ ধরণী। শুধু রাত্রির রহস্যময় শন্‌শন্ শব্দ শোনা যাইতেছিল। শ্রীমন্ত জাগ্রত চোখে বসিয়া আছে ব্যাকুল প্রত্যাশায়। সাশ্রুনেত্রা দগ্ধ-অঙ্গা গিরিকে একবার দেখিবে সে!

সহসা নিকটের আমগাছটায় কি একটা শব্দ হইল। শ্রীমন্ত চকিত হইয়া সেই দিকে চাহিল। কোথায় কি!

কোন নিশাচর পাখির পাখা ঝাড়ার শব্দ।

উপরে নীল আকাশে অগণ্য তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। লেবুর মিষ্ট গন্ধে, করবী ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধে প্রাণটা যেন উদাস হইয়া যায়! কিন্তু কোথায় গিরি?

তৃতীয় প্রহরে ফালি চাঁদের পাণ্ডুর রূপ হইতে কাকজ্যোৎস্নার আলোক ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত অবসাদ ঘুচাইতে আবার গাঁজা লইয়া বসিল। গাঁজা খাইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ সে হাসিয়া উঠিল।

পরনিন্দুকের দল সব। গিরি প্রেত হইয়াছে। সে স্বর্গে গিয়াছে।

আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল—ধ্যেৎ!

পথে নামিতে গিয়া সে দেখিল পথের পাশেই নীলকণ্ঠ শুইয়া আছে।

শ্রীমন্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। শিশু পথ আগলাইয়া শুইয়া আছে। মরা জ্যোৎস্নায় অযত্ন-মলিন শিশুমুখখানি ম্লান ছবির মত ফুটিয়াছিল। কি ভাবিয়া শ্রীমন্ত তাহাকে ডাকিল—এই!

শিশুর ঘুম ভাঙিল না। শ্রীমন্ত পায়ে করিয়া এবার একটা ঠেলা দিয়া কহিল—এই—এই ছোঁড়া।

ঘুম ভাঙিয়া নীলকণ্ঠ উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে শ্রীমন্তের মুখের দিকে চাহিল। তাহার উর্ধ্বমুখে মাথার উপরের চাঁদের পরিপূর্ণ কিরণ পড়িয়াছিল। শ্রীমন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাত ধরিয়া কহিল—যাবে তুমি?

শিশু কাপড়ের পুঁটুলিটা বগলে তুলিয়া কহিল—হুঁ।

—এস তবে।

সম্মুখেই অসীম-বিস্তার ধরণীর বুক চিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে—বহু পথিকের পদরেখা আঁকা পথখানি।

চলিতে চলিতে নীলকণ্ঠ পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীমন্ত তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিল।

গণদেবতা

এক

কারণ সামান্যই। সামান্য কারণেই গ্রামে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। এখানকার কামার অনিরুদ্ধ কর্মকার ও ছুতার গিরীশ সূত্রধর নদীর ওপারে বাজারে-শহরটায় গিয়া একটা করিয়া দোকান ফাঁদিয়াছে। খুব ভোরে উঠিয়া যায়, ফেরে রাত্রি দশটায়; ফলে গ্রামের লোকের অসুবিধার আর শেষ নাই। এবার চাষের সময় কি নাকালটাই যে তাদের হইতে হইয়াছে, সে তাহারাই জানে। লাঙলের ফাল পাঁজানো, গাড়ীর হাল বাঁধার জন্য চাষীদের অসুবিধার আর অন্ত ছিল না। গিরীশ ছুতারের বাড়ীতে গ্রামের লোকের বাবলা কাঠের গুঁড়ি আজও স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে সেই গত বৎসরের ফাল্গুন-চৈত্র হইতে; কিন্তু আজও তাহারা নূতন লাঙল পাইল না।

এ ব্যাপার লইয়া অনিরুদ্ধ এবং গিরিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সীমা ছিল না। কিন্তু চাষের সময় ইহা লইয়া একটা জটলা করিবার সময় কাহারও হয় নাই। প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কার্যোদ্ধার করা হইয়াছে; রাত্রি থাকিতে উঠিয়া অনিরুদ্ধর বাড়ীর দরজায় বসিয়া থাকিয়া, তাহাকে আটক করিয়া লোকে আপন আপন কাজ সারিয়া লইয়াছে; জরুরী দরকার থাকিলে, ফাল হইয়া, গাড়ীর চাকা ও হাল গড়াইয়া গড়াইয়া সেই শহরের বাজার পর্যন্তও লোকে ছুটিয়াছে। দূরত্ব প্রায় চার মাইল—কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীটাই একা বিশ ক্রোশের সমান। বর্ষার সময় ভরানদীর খেয়াঘাটের পারাপারে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া যায়। শুক্‌নার সময়ে যাওয়া-আসায় আট মাইল বালি ঠেলিয়া গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া সোজা কথা নয়। একটু ঘুর-পথে নদীর উপর রেলওয়ে ব্রীজ আছে; কিন্তু লাইনের পাশের রাস্তাটা এমন উঁচু ও অল্পপরিসর যে গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এখন চাষ শেষ হইয়া আসিল। মাঠে ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে—এখন কাস্তে চাই। কামার চিরকাল লোহা-ইস্পাত লইয়া কাস্তে গড়িয়া দেয়—পুরানো কাস্তেতে সান লাগাইয়া পুরি কাটিয়া দেয়; ছুতার বাঁট লাগাইয়া দেয়। কিন্তু কামার-ছুতার সেই একই চালে চলিয়াছে; যে অনিরুদ্ধের হাত পার হইয়াছে, সে গিরীশের হাতে দুঃখ ভোগ করিতেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রামের লোক এক হইয়া পঞ্চায়েৎ-মজলিস ডাকিয়া বসিল। কেবল একখানা গ্রাম নয়, পাশাপাশি দুখানা গ্রামের লোক একত্র হইয়া গিরীশ ও অনিরুদ্ধকে একটি নির্দিষ্ট দিন জানাইয়া ডাকিয়া পাঠাইল। গ্রামের শিবতলায় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মজলিস বসিল। মন্দিরে ময়ূরেশ্বর শিব, পাশেই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামদেবী মা ভাঙা-কালীর বেদী। কালী-ঘর যতবার তৈয়ারী হইয়াছে, ততবারই ভাঙিয়াছে—সেই হেতু কালীর নাম ভাঙা-কালী। চণ্ডীমণ্ডপটিও বহুকালের এবং এক কোণ ভাঙা হইয়া আছে; মধ্যে নাটমন্দির। তার চাল কাঠামো হাতীশুঁড়-মড়দল-তীরসাঙা প্রভৃতি হরেক রকমের কাঠ দিয়া যেন অক্ষয়

অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়াছিল। নিচের মেঝেও সনাতন পদ্ধতিতে মাটির। এই চণ্ডীমণ্ডপের এই নাটমন্দিরে বা আটচালায় শতরঞ্জি, চাটাই, চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল।

গিরীশ, অনিরুদ্ধ এ ডাকে না আসিয়া পারিল না। যথাসময়ে তাহারা দুজনেই আসিয়া উপস্থিত হইল। মজলিসে দুইখানা গ্রামের মাতব্বর লোক একত্র হইয়াছিল; হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল—ইহারা সব ভারিক্কী লোক. গ্রামের মাতব্বর সদ্গোপ চাষী। পাশের গ্রামের দ্বারকা চৌধুরীও উপস্থিত হইয়াছে। চৌধুরী বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি, এ অঞ্চলে বিশেষ মাননীয় জন। আচার ব্যবহার বিচারবুদ্ধির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। লোকে এখনও বলে—কেমন বংশ দেখতে হবে! এই চৌধুরীর পূর্বপুরুষেরাই এককালে এই দুইখানি গ্রামের জমিদার ছিলেন, এখন ইনি অবশ্য সম্পন্ন চাষীরূপেই গণ্য কারণ জমিদারী অন্য লোকের হাতে গিয়াছে। আর ছিল দোকানী বৃন্দাবন দত্ত—সেও মাতব্বর লোক। মধ্যবিত্ত অবস্থার অল্পবয়স্ক চাষী গোপন পাল, রাখাল মণ্ডল, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিল। এ-গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষাল—ও গ্রামের নিশি মুখুয্যে, পিয়ারী বাঁড়ুয্যে—ইহারাও একদিকে বসিয়াছিল।

আসরের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরু পাল; সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল। ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই দুইখানা গ্রামের নূতন সম্পদশালী ব্যক্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী যাহারা, ছিরু ধন-সম্পদে তাহাদের কাহারও চেয়ে কম নয়—এই কথাই লোকে অনুমান করে। লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয়, সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না। এজন্য ছিরুর ক্ষোভ আছে, লোকে তাহাকে সম্মান করে না বলিয়া সেও সকলের উপর মনে মনে রুষ্ট। প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া আদায় করিতে সে বদ্ধপরিকর। তাই সাধারণের সামাজিক মজলিস হইলেই ঠিক মাঝখানে আসিয়া সে জাঁকিয়া বসে।

আর একটি সবল-দেহ দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ যুবা নিতান্ত নিস্পৃহের মত এক পাশের থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দেবনাথ ঘোষ—এই গ্রামেরই সদ্গোপ চাষীর ছেলে। দেবনাথ নিজ হাতে চাষ করে না, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত সে। এ মজলিসে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও সে আসিয়াছে; অনিরুদ্ধের যে অন্যায় সে অন্যায়ের মূল কোথায় সে জানে। ছিরু পালের মত ব্যক্তি যে মজলিসে মধ্যমণির মত জমকাইয়া বসে, সে মজলিসে তাহার আস্থা নাই বলিয়াই এই নিস্পৃহতা, নীরব অবজ্ঞার সহিত সে একপাশে থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আসে নাই কেবল ও-গ্রামের কৃপন মহাজন মৃত রাখহরি চক্রবর্তীর পোষ্যপুত্র হেলারাম চাটুজ্জে ও গ্রাম্য ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ। গ্রামের চৌকিদার ভূপাল লোহারও উপস্থিত ছিল। আশেপাশে ছেলেদের দল গোলমাল করিতেছিল, একেবারে

একপ্রান্তে গ্রামের হরিজন চাষীরাও দাঁড়াইয়া দর্শক হিসাবে। ইহারাই গ্রামের শ্রমিক চাষী। অসুবিধার প্রায় বারো-আনা ভোগ করিতে হয় ইহাদিগকেই।

অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ আসিয়া মজলিসে বসিল। বেশভূষা অনেকটা পরিচ্ছন্ন এবং ফিটফাট—তাহার মধ্যে শহুরে ফ্যাশানের ছাপ সুস্পষ্ট; দুজনেই সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল—মজলিসের অনতিদূরেই ফেলিয়া দিয়া মজলিসের মধ্যে আসিয়া বসিল।

অনিরুদ্ধ কথা আরম্ভ করিল; বসিয়াই হাত দিয়া একবার মুখটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল—কই গো, কি বলছেন বলুন। আমরা খাটি-খুটি খাই; আমাদের আজ এ বেলাটাই মাটি।

কথার ভঙ্গিমায় ও সুরে সকলেই একটু চকিত হইয়া উঠিল যেন ঝগড়া করিবার মত লোভেই কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছে; প্রবীণের দলের মধ্যে সকলেই একবার সশব্দে গলা ঝাড়িয়া লইল। অল্পবয়সীদের ভিতর হইতে যেন একটা আগুন দপ করিয়া উঠিল। ছিরু ওরফে শ্রীহরি বলিয়া উঠিল—মাটিই যদি মনে কর, তবে আসবারই বা কি দরকার ছিল?

হরেন্দ্র ঘোষাল কথা বলিবার জন্য হাঁক-পাঁক করিতেছিল; সে বলিল—তেমন মনে হলে এখনও উঠে যেতে পার তোমরা। কেউ ধরে নিয়েও আসে নাই, বেঁধেও রাখে নাই তোমাদিগে।

হরিশ মণ্ডল এবার বলিল—চুপ কর তোমরা। এখানে যখন ডাকা হয়েছে, তখন আসতেই হবে। তা তোমরা এসেছ, বেশ কথা—ভাল কথা, উত্তম কথা। তারপর এখন দু'পক্ষে কথাবার্তা হবে, আমাদের বলবার যা বলব—তোমাদের জবাব যা তোমরা দেবে; তারপর তার বিচার হবে। এত তাড়াতাড়ি করলে হবে কেন? ঘোড়া ছুটো বাঁধো।

গিরীশ বলিল—তা হলে, কথা আপনাদের আমাদিগে নিয়েই?

অনিরুদ্ধ বলিল—তা আমরা আঁচ করেছিলাম। তা বেশ কি কথা আপনাদের বলুন? আমাদের জবাব আমরা দোব। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন—আপনারা সবাই যখন একজোট হয়েছেন, তখন এ-কথার বিচার করবে কে? নালিশ যখন আপনাদের, তখন আপনারা বিচার কি করে করবেন—এ তো আমরা বুঝতে পারছি না।

দ্বারকা চৌধুরী অকস্মাৎ গলা ঝাড়িয়া শব্দ করিয়া উঠিল; চৌধুরীর কথা বলিবার এটি পূর্বাভাস। উচ্চ গলা-ঝাড়ার শব্দে সকলে চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। চৌধুরীর চেহারায় এবং ভঙ্গিমাতে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। গৌরবর্ণ রং, সাদা ধবধবে গোঁফ, আকৃতিতে দীর্ঘ। মানুষটি আসরের মধ্যে আপনাআপনি বিশিষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। সে এবার মুখ খুলিল—দেখ কর্মকার, কিছু মনে কর না বাপু, আমি একটা কথা বলব। গোড়া থেকেই তোমাদের কথাবার্তার সুর শুনে মনে হচ্ছে যেন তোমরা বিবাদ করবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছ! এটা তো ভাল নয় বাবা। বস স্থির হয়ে বস।

অনিরুদ্ধ এবার সবিনয়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—বেশ, বলুন কি বলছেন।

হরিশ মণ্ডলই আরম্ভ করিল—দেখ বাপু, খুলে বলতে গেলে মহাভারত বলতে হয়।

সংক্ষেপেই বলছি—তোমরা দুজনে শহরে গিয়ে আপন আপন ব্যবসা করতে বসেছ। বেশ করেছ। যেখানে মানুষ দুটো পয়সা পাবে সেখানেই যাবে। তা যাও। কিন্তু এখানকার পাট যে একেবারে তুলে দেবে, আর আমরা যে এই দু'কোশ রাস্তা জিনিসপত্র ঘাড়ে করে নিয়ে ছুটব ওই নদী পার হয়ে, তা তো হবে না বাপু। এবার যে তোমরা আমাদের কি নাকাল করেছ সে কথাটা ভেবে দেখ দেখি মনে মনে।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, তা অসুবিধে একটুকুন হয়েছে আপনাদের।

ছিরু বা শ্রীহরি গর্জিয়া উঠিল—একটুকুন! একটুকুন কি হে? জান, জমিতে জল থাকতে ফাল পাঁজানোর অভাবে চাষ বন্ধ রাখতে হয়েছে? তোমারও তো জমি আছে, জমির মাথায় একবার ঘুরে দেখে এস দেখি পট্‌পটি ঘাসের ধুমটা। ভাল ফালের অভাবে চাষের সময় একটা পট্‌পটিরও শেকড় ভাল ওঠে নাই। বছর সাল তোমরা ধানের সময় ধানের জন্যে বস্তা হাতে করে এসে দাঁড়াবে, আর কাজের সময় তখন শহরে গিয়ে বসে থাকবে,—তা করলে হবে কেন?

হরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া উঠিল—এই ক—থা! এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতে একটা তালি বাজাইয়া দিয়া বসিল।

মজলিস-সুদ্ধ সকলেই প্রায় সমস্বরে বলিল—এই।

প্রবীণেরাও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। অর্থাৎ এই।

অনিরুদ্ধ এবার খুব সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নড়িয়া-চড়িয়া জাঁকিয়া বসিয়া বলিল—এই তো আপনাদের কথা? আচ্ছা, এইবার আমাদের জবাব শুনুন। আপনাদের ফাল পাজিয়ে দিই, হাল লাগিয়ে দিই চাকায়, কাস্তে গড়ে দিই, আপনারা আমাকে ধান দেন হাল পিছু কাঁচি পাঁচ শলি। আমাদের গিরীশ সূত্রধর—

বাধা দিয়া ছিরু পাল বলিল—গিরীশের কথায়, তোমার কাজ কি হে বাপু?

কিন্তু ছিরু কথা শেষ করিতে পারিল না; দ্বারকা চৌধুরী বলিল—বাবা শ্রীহরি, অনিরুদ্ধ তো অন্যায় কিছু বলে নাই। ওদের দুজনের একই কথা। একজন বললেও তো ক্ষতি নাই কিছু।

ছিরু চুপ করিয়া গেল। অনিরুদ্ধ ভরসা পাইয়া বলিল—চৌধুরী মশায় না থাকলে কি মজলিসের শোভা হয়,—উচিত কথা বলে কে?

—বল অনিরুদ্ধ কি বলছিলে, বল!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার, মানে কর্মকারের হাল পিছু পাঁচ শলি, আর সূত্রধরের হালপিছু চার শলি করে ধান বরাদ্দ আছে। আমরা এতদিন কাজও করে আসছি, কিন্তু চৌধুরী মশাই, ধান আমরা ঠিক হিসেব মত প্রায়ই পাই না।

—পাও না?

—আজ্ঞে না।

গিরীশও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল—আজ্ঞে না। প্রায় ঘরেই দু-চার আড়ি করে বাকী রাখে,

বলে, দু-দিন পরে দোব, কি আসছে বছর দোব। তারপর সে ধান আমরা পাই না।

ছিরু সাপের মত গর্জিয়া উঠিল—পাও না? কে দেয় নি শুনি? মুখে পাই না বললে তো হবে না। বল, কার কাছে পাবে তোমরা?

অনিরুদ্ধ দুরন্ত ক্রোধে বিদ্যুৎগতিতে ঘাড় ফিরাইয়া শ্রীহরির দিকে চাহিয়া বলিল—কার কাছে পাব? নাম করতে হবে? বেশ, বলছি!—তোমার কাছেই পাব?

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ তোমার কাছে। দিয়েছ ধান তুমি দু'বছর? বল?

—আর আমি যে তোমার কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাব! তাতে ক'টাকা উশুল দিয়েছ শুনি? ধান দিই নাই মজলিসের মধ্যে তুমি যে এত বড় কথাটা বলছ।

—কিন্তু তার তো একটা হিসেব-নিকেশ আছে? ধানের দামটা তোমার হ্যাণ্ডনোটের পিঠে উশুল দিতে তো হবে—না কি? বলুন চৌধুরী মশায়, মণ্ডল মশাইরাও তো রয়েছেন, বলুন না।

চৌধুরী বলিল—শোন, চুপ কর একটু। শ্রীহরি, তুমি বাবা হ্যাণ্ডনোটের পিঠে টাকাটা উশুল দিয়ে নিয়ো। আর অনিরুদ্ধ, তোমরা একটা বাকীর ফর্দ তুলে, হরিশ মণ্ডল মশায়কে দাও। এ নিয়ে মজলিসে গোল করাটা তো ভাল নয়। ওঁরাই সব আদায়-পত্র করে দেবেন। আর তোমরাও গাঁয়ে একটা করে পাট রাখ। যেমন কাজকর্ম করছিলে তেমনি কর।

মজলিস সুদ্ধ সকলেই এ কথায় সায় দিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে-ভঙ্গিতেও সম্মতি বা অসম্মতির কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

এতক্ষণে দেবনাথ মুখ খুলিল; প্রবীণ চৌধুরীর এ মীমাংসা তাহার ভাল লাগিয়াছে। অনিরুদ্ধ গিরীশের পাওয়া অনাদায়ের কথা সে জানিত বলিয়াই তাহার প্রথমে মনে হইয়াছিল—অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের উপর মজলিস অবিচার করিতে বসিয়াছে। নতুবা গ্রামের সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবারই সে পক্ষপাতী। তাহার নিজের একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারণা আছে। সেই ধারণা অনুযায়ী আজ দেবু খুসী হইল; অনিরুদ্ধ ও গিরীশের এবার নত হওয়া উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে বলিল—অনি ভাই, আর তো তোমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।

চৌধুরী প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ?

—আজ্ঞে!

—কি বলছ বল।

এবার হাত জোড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, আমাদিকে মাপ করুন আপনারা। আমরা আর এভাবে কাজ চালাতে পারছি না।

মজলিসে এবার অসন্তোষের কলরব উঠিয়া গেল।

—কেন?

—না পারবার কারণ?

—পারব না বললে হবে কেন ?

—চালাকি নাকি ?

—গাঁয়ে বাস কর না তুমি ?

ইহার মধ্যে চৌধুরী নিজের দীর্ঘ হাতখানি তুলিয়া ইঙ্গিত প্রকাশ করিল—চুপ কর, থাম।

হরিশ বিরক্তিভরে বলিল—থাম্‌রে বাপু ছোঁড়ারা ; আমরা এখনও মরি নাই।

হরেন্দ্র ঘোষাল অল্পবয়সী ছোকরা এবং ম্যাট্রিক পাস এবং ব্রাহ্মণ। সেই অধিকারে সে প্রচণ্ড একটা চীৎকার করিয়া উঠিল—এইও ! সাইলেন্স—সাইলেন্স !

অবশেষে দ্বারকা চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার ফল হইল। চৌধুরী বলিল—চীৎকার করে গোলমাল বাধিয়ে তো ফল হবে না। বেশ তো, কর্মকার কেন পারবে না—বলুক। বলতে দাও ওকে।

সকলে এবার নীরব হইল। চৌধুরী আবার বসিয়া বলিল—কর্মকার, পারবে না বললে তো হবে না বাবা। কেন পারবে না, বল ! তোমরা পুরুষানুক্রমে করে আসছ। আজ পারব না বললে গ্রামের ব্যবস্থাটা কি হবে ?

দেবনাথ বলিল—অন্যায়। অনিরুদ্ধ ও গিরীশের এ মহা অন্যায়।

হরিশ বলিল—তোমার পূর্বপুরুষের বাস হল গিয়ে মহাগ্রামে ; এ গ্রামে কামার ছিল না বলেই তোমার পিতামহকে এনে বাস করানো হয়েছিল। সে তো তুমিও শুনেছ হে বাপু। এখন না বললে চলবে কেন ?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, মোড়ল জ্যাঠা, তা হলে শুনুন। চৌধুরী মশায় আপনি বিচার করুন। এ গাঁয়ে আগে কত হাল ছিল ভেবে দেখুন। কত ঘরে হাল উঠে গিয়েছে তাও দেখুন। এই ধরুন গদাই, শ্রীনিবাস, মহেন্দ্র—আমি হিসেব করে দেখেছি, আমার চোখের ওপর এগারটি ঘরের হাল উঠে গিয়েছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কণার ভদ্রলোকদের ঘরে। কঙ্কণায় কামার আলাদা। আমাদের এগারোখানা হালের ধান কমে গিয়েছে। তারপরে ধরুন—আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙ্গলের—গাড়ীর, অন্য সময়ে গাঁয়ের ঘর-দোর হত। আমরা পেরেক গজাল হাতা খুন্তি গড়ে দিতাম—বঁটি কোদাল কুড়ুল গড়তাম,—গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোকে সে সব কিনছেন বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন—তাই কিনছেন। আমাদের গিরীশ গাড়ী গড়ত, দরজা তৈরী করত ; ঘরের চালকাঠামো করতে গিরীশকেই লোকে ডাকত। এখন অন্য জায়গা থেকে সস্তায় মিস্ত্রী এনে কাজ হচ্ছে। তারপর—ধরুন—ধানের দর পাঁচ সিকে—দেড় টাকা, আর অন্য জিনিসপত্র আক্রা। এতে আমাদের এই নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকলে কি করে চলে, বলুন ? ঘর-সংসার যখন করছি—তখন ঘরের লোকের মুখে তো দুটো দিতে হবে। তার ওপর ধরুন, আজকালকার হাল-চাল সে রকম নেই—

ছিরু এতক্ষণ ধরিয়া মনে মনে ফুলিতেছিল, সে সুযোগ পাইয়া বাধা দিয়া কথার মাঝখানেই

বলিয়া উঠিল—তা বটে, আজকাল বার্নিশ-করা জুতো চাই, লম্বা লম্বা জামা চাই, সিগারেট চাই—পরিবারের শেমিজ চাই, বডিস্ চাই—

—এই দেখ ছিরু মোড়ল, তুমি একটু হিসেব করে কথা বলবে। অনিরুদ্ধ এবার কঠিন স্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

ছিরু বারকতক হেলিয়া-দুলিয়া বলিয়া উঠিল, হিসেব আমার করাই আছে রে বাপু। পঁচিশ টাকা ন আনা তিন পয়সা। আসল দশ টাকা, সুদ পনের টাকা ন আনা তিন পয়সা। তুই বরং কষে দেখতে পারিস। শুভঙ্করী জানিস তো?

হিসাবটা অনিরুদ্ধের নিকট পাওনা হ্যাণ্ডনোটের হিসাব। অনিরুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল—সমস্ত মজলিসের দিকে একবার সে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত মজলিসটাও এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অনিরুদ্ধ মজলিস হইতে উঠিয়া পড়িল।

ছিরু ধমক দিয়া উঠিল—যাবে কোথা তুমি?

অনিরুদ্ধ গ্রাহ্য করিল না, সে চলিয়া গেল।

চৌধুরী এতক্ষণে বলিল—শ্রীহরি।

ছিরু বলিল—আমাকে চোখ রাঙাবেন না চৌধুরী মশায়, দুতিনবার আপনি আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন, আমি সহ্য করেছি। আর কিন্তু আমি সহ্য করব না।

চৌধুরী এবার চাদরখানি ঘাড়ে ফেলিয়া বাঁশের লাঠিটি লইয়া উঠিল; বলিল—চললাম গো তা হলে। ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম—আপনাদিগে নমস্কার।

এই সময়ে গ্রামের পাতুলাল মুচি জোড়হাত করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—চৌধুরী মহাশয়, আমার একটুকুন বিচার করে দিতে হবে।

চৌধুরী সন্তর্পণে মজলিস হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিয়া বলিল—বল বাবা, এরা সব রয়েছেন, বল!

—চৌধুরী মশায়!

চৌধুরী এবার চাহিয়া দেখিল—অনিরুদ্ধ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

—একবার বসতে হবে চৌধুরী মশায়! ছিরু পালের টাকাটা আমি এনেছি—আপনারা থেকে কিন্তু আমার হ্যাণ্ডনোটটা ফেরতের ব্যবস্থা করে দিন।

মজলিস-সুদ্ধ লোক এতক্ষণে সচেতন হইয়া চৌধুরীকে ধরিয়া বসিল। কিন্তু চৌধুরী কিছুতেই নিরস্ত হইল না, সবিনয়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অনিরুদ্ধ পঁচিশ টাকা দশ আনা মজলিসের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—এখনি হ্যাণ্ডনোটখানা নিয়ে এস ছিরু পাল!

পরে হ্যাণ্ডনোটখানি ফেরত লইয়া বলিল—ও একটা পয়সা আমাকে আর ফেরত দিতে হবে না। পান কিনে খেয়ো। এস হে গিরীশ, এস।

হরিশ বলিল—ওই, তোমরা চললে যে হে? যার জন্যে মজলিস বসল—

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা আর ও কাজ করব না মশায়, জবাব দিলাম। যে মজলিস ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না।

তাহারা হন হন করিয়া চলিয়া গেল। মজলিস ভাঙিয়া গেল।

পরদিন প্রাতেই শোনা গেল, অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির আধ-পাকা ধান কে বা কাহারা নিঃশেষে কাটিয়া তুলিয়া লইয়াছে।

দুই

অনিরুদ্ধ ফসলশূন্য ক্ষেত্রখানার আইলের উপর স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিল। নিষ্ফল আক্রোশে তাহার লোহা-পেটা হাত দু'খানা মুঠা বাধিয়া ভাইস-যন্ত্রের মত কঠোর করিয়া তুলিল। তাহার পর সে অত্যন্ত দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিয়া হাতকাটা জামাটা টানিয়া সেটার মধ্যে মাথা গলাইতে গলাইতে বাহির দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অনিরুদ্ধের স্ত্রীর নাম পদ্মমণি—দীর্ঘাঙ্গী পরিপূর্ণ-যৌবনা কালো মেয়েটি। টিকালো নাক, টানা-টানা ভাসা-ভাসা ডাগর দুটি চোখ। পদ্মের রূপ না থাক, শ্রী আছে। পদ্মের দেহে অদ্ভুত শক্তি, পরিশ্রম করে সে উদয়াস্ত। তেমনি তীক্ষ্ণ তাহার সাংসারিক বুদ্ধি। অনিরুদ্ধকে এইভাবে বাহির হইতে দেখিয়া সে স্বামী অপেক্ষাও দ্রুতপদে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—চললে কোথায়?

রূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—ফিঙের মত পেছনে লাগলি কেন? যেখানে যাই না, তোর সে খোঁজে কাজ কি?

হাসিয়া পদ্ম বলিল—পেছনে লাগি নাই। তার জন্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আর, খোঁজে আমার দরকার আছে বৈকি। মারামারি করতে যেতে পাবে না তুমি।

অনিরুদ্ধ বলিল—মারামারি করতে যাই নাই, থানা যাচ্ছি, পথ ছাড়।

—থানা?—পদ্মর কণ্ঠস্বরের মধ্যে উদ্বেগ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, থানা। শালা-ছিরে চাষার নামে আমি ডাইরি করে আসব—রাগে অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বর রণ-রণ করিতেছিল।

পদ্ম স্থিরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। সত্যি হলেও ছিরু মোড়ল তোমার ধান চুরি করেছে—এ চাকলায় কে এ কথা বিশ্বাস করবে?

অনিরুদ্ধের কিন্তু তখন এ পরামর্শ শুনিবার মত অবস্থা নয়, সে ঠেলিয়া পদ্মকে সরাইয়া দিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

অনিরুদ্ধের অনুমান অভ্রান্ত,—ধান শ্রীহরি পালই কাটিয়া লইয়াছে।

কিন্তু পদ্ম যাহা বলিয়াছে সে-ও নিষ্ঠুরভাবে সত্য, ধনীকে চোর প্রতিপন্ন করা বড় সহজ নয়। শ্রীহরি ধনী।

এ চাকলায় কাছাকাছি তিনখানা গ্রাম—কালীপুর, শিবপুর ও কঙ্কণা—এ তিনখানা

গামে ছিরু পাল বা শ্রীহরি পালের ধনের খ্যাতি যথেষ্ট। কালীপুর ও শিবপুর সরকারী সেরেস্তায় দু'খানা ভিন্ন গ্রাম হিসাবে জমিদারের অধীন স্বতন্ত্র মৌজা হইলেও কার্যত একখানাই গ্রাম। একটা দীঘির এপার-ওপার মাত্র। শ্রীহরির বাস এই কালীপুরে। এ দুখানা গ্রামের মধ্যে শ্রীহরির সমকক্ষ ব্যক্তি আর কেহ নাই। শিবপুরের হেলা চাটুজ্জেরও টাকা ও ধান যথেষ্ট; তবে লোকে বলে—শ্রীহরির ঘরে সোনার ইঁট আছে, টাকা ধানও প্রচুর, তা হইলেও দুইজনের তুলনা হয় না। ক্রোশখানেক দূরবর্তী কঙ্কণা অবশ্য সমৃদ্ধ গ্রাম। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। সেখানকার মুখুজ্জেবাবুরা লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী,—এ অঞ্চলের প্রায় গ্রামই এখন তাহাদের কুক্ষিগত। মহাজন হইতে তাহারা প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার হইয়া উঠিয়াছে; শিবপুর কালীপুর গ্রাম দুখানাও ধীরে ধীরে তাহাদের গ্রামের আকর্ষণে সর্পিল জিহ্বার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেখানেও শ্রীহরি পালের নামডাক আছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে আধা শহর—রেলওয়ে জংশন; সেখানে ধনী মাড়োয়ারীর গদী আছে—দশ-বারটা চালের কল, গোটা দুয়েক তেল-কল, একটা আটার কল আছে—সেখানেও শ্রীহরি পালকে 'ঘোষ মশায়' বলিয়াই সম্বর্ধিত করা হয়। ওই জংশন-শহরেই এ অঞ্চলের থানা অবস্থিত।

সুতরাং পদ্মের অনুমানের ভিত্তি আছে। কঙ্কণায় অথবা জংশন-শহরে কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু শিবকালীপুরের কেহ একথা অবিশ্বাস করে না। ছিরু ভয়ঙ্কর ব্যক্তি—এ সংসারে তাহার অসাধ্য কিছু নাই! এ ধান কাটিয়া লওয়া তাহার অনিরুদ্ধের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই নয়—চুরিও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কথাও শিবকালীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশ্বাস করে। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস কাহারও নাই।

শ্রীহরির বিশাল দেহ—কিন্তু স্থূল নয়, একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই। বাঁশের মত মোটা হাত-পায়ের হাড়—তাহাতে জড়ানো কঠিন মাংসপেশী। প্রকাণ্ড চওড়া দু'খানা হাতের পাঞ্জা, প্রকাণ্ড বড় মাথা, বড় বড় উগ্র চোখ, থ্যাবড়া নাক, আকর্ণ-বিস্তার মুখগহ্বর, তাহার উপর একমাথা কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। এত বড় দেহ লইয়া সে কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্রুত চলিতে পারে। পরের ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সে রাতারাতি আনিয়া আপনার পুকুরে ফেলিয়া রাখে, শব্দ নিবারণের জন্য সে হাত করাত দিয়া বাঁশ কাটে। খেপলা জাল ফেলিয়া রাত্রে সে পরের পুকুরের পোনামাছ আসিয়া নিজের পুকুর বোঝাই করে; প্রতি বৎসর তাহার বাড়ীর পাঁচিল সে নিজেই বর্ষার সময় কোদাল চালাইয়া ফেলিয়া দেয়, নতুন পাঁচিল দিবার সময় অপরের সীমানা অথবা রাস্তা খানিকটা চাপাইয়া লয়। কেহ বড় প্রতিবাদ করে না, কিন্তু ব্যক্তিগত সীমানা আত্মসাৎ করিলে প্রতিবাদ না করিয়া উপায় থাকে না। তখন ছিরু কোদাল হাতেই উঠিয়া দাঁড়ায়; দন্তহীন মুখে কি বলে বুঝা যায় না। মনে হয় একটা পশু গর্জন করিতেছে। এই চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই সে দন্তহীন; যৌনব্যাধির আক্রমণে তাঁহার দাঁতগুলো প্রায় সবই পড়িয়া গিয়াছে। হরিজন-পল্লীতে সন্ধ্যার পর যখন পুরুষেরা মদে

বিভোর হইয়া থাকে, তখন ছিরু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিকার ধরিতে প্রবেশ করে। কতবার তাহারা উহাকে তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু ছিরু ছুটিয়া চলে অন্ধকারচারী হিংস্র চিতাবাঘের মত।

এই শ্রীহরি ঘোষ, ওরফে ছিরু পাল বা ছিরে মোড়ল!

শ্রীহরিকে ভাল করিয়া চিনিয়াও অনিরুদ্ধ স্ত্রীর কথা বিবেচনা করা দূরে থাক, তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। পদ্ম বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে রাগ অভিমান করিল না, আবার ডাকিল—ওগো, শোন—শোন, ফেরো। অনিরুদ্ধ ফিরিল না।

এবার একটু ক্ষীণ হাসিয়া পদ্ম ডাকিল—পেছন ডাকছি যেও না, শোন!

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ লাঙ্গুলস্পৃষ্ট কেউটের মত সক্রোধে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একটু জল খেয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া পদ্মের গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ডাকবি আর পিছন থেকে?

পদ্মের মাথাটা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া উঠিল, অনিরুদ্ধের লোহাপেটা হাতের চড়—নিদারুণ আঘাত। পদ্ম 'বাবা রে' বলিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ এবার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও হইল। যেখানে-সেখানে চড় মারিলে নাকি মানুষ মরিয়া যায়; সে ত্রস্ত হইয়া ডাকিল—পদ্ম! পদ্ম! বউ!

পদ্মের শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে—সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। অনিরুদ্ধ বলিল—এই নে বাপু, এই নে জামা খুললাম, থানায় যাব না। ওঠ্। কাঁদিস না, ও পদ্ম। ···সে পদ্মের মুখ-ঢাকা হাতখানি ধরিয়া টানিল—ও পদ্ম!—

পদ্ম এবার মুখ হইতে হাত ছাড়িয়া দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; মুখ ঢাকা দিয়া পদ্ম কাঁদে নাই, নিঃশব্দে হাসিতেছিল। অদ্ভুত শক্তি পদ্মের; আর অনিরুদ্ধের অনেক কিল চড় খাওয়া তাহার অভ্যাস আছে—এক চড়ে তাহার কি হইবে।

কিন্তু অনিরুদ্ধের পৌরুষে বোধ হয় ঘা লাগিল—সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। পদ্ম খানিকটা গুড় আর প্রকাণ্ড একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি ও টুকনি-ঘটির এক ঘটি জল আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—তুমি ছিরু মোড়লকে স্বুবে করে এজাহার করবে, গাঁয়ের লোক কে তোমার হয়ে সাক্ষী দেবে বল তো? কাল থেকে তো গাঁয়ের লোক সবাই তোমার ওপর বিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাল সন্ধ্যার পর আবার মজলিস বসিয়াছিল, অনিরুদ্ধের ওই 'মজলিসকে মানি না' কথাটা সকলকে বড় আঘাত দিয়াছে। সন্ধ্যার মজলিসে অনিরুদ্ধ এবং গিরিশের বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে নালিশ জানানো স্থির হইয়া গিয়াছে।

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে পড়িল, কিন্তু তবু তাহার মন মানিল না।

তিন

বেশ পরিপাটি করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ফিরাইয়া পদ্ম স্বামীর আহার-শেষের প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনিরুদ্ধের খাওয়া শেষ হইতেই হাতে জল তুলিয়া দিয়া হুঁকাটি তাহার হাতে দিয়া বলিল—খাও। অনিরুদ্ধ টানিয়া বেশ গল্ গল্ করিয়া নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়াছে, তখন পদ্ম বলিল—আমার কথাটা ভেবে দেখ। রাগ একটু পড়েছে তো ?

—রাগ! অনিরুদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিল—ঠোঁট দুইটা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।—এ রাগ আমার তুষের আগুন, জনমে নিববে না। আমার দু'বিঘে বাকুড়ির ধান—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কারণ তাহার চোখের জলের ছোঁয়াচে পদ্মের ডাগর চোখ দুটিও অশ্রুজলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং অনিরুদ্ধের আগেই তাহার ফোঁটা কয়েক জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ চোখ মুছিয়া বলিল—কাঁদছিস্ কেন তুই ? দু'বিঘে জমির ধান গিয়েছে, যাক্‌গে্। আমি তো আছিরে বাপু! আর দেখ না—কি করি আমি!

চোখ মুছিতে মুছিতে পদ্ম বলিল—কিন্তু থানা-পুলিশ কর না বাপু! তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমি। ওরা সাপ হয়ে দংশায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে। আমার বাপের ঘরে ডাকাতি হল—বাবা চিনলে একজনকে কিন্তু পুলিশ তার গায়ে হাত দিল না। অথচ মুঠো-মুঠো টাকা খরচ হয়ে গেল বাবার। ছেলেমেয়ে গুষ্টি সমেত নিয়ে টানাটানি; একবার দারোগা আসে, একবার নেসপেকটার আসে, একবার সায়েব আসে—আর দাও এজাহার। তার পরে, ক'জনকে কোথা হতে ধরলে, তাগিদে সনাক্ত করতে জেলখানা পর্যন্ত মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি। তাছাড়া গালমন্দ আর ধমক ত আছেই।

—হুঁ। চিন্তিতভাবে হুঁকায় গোটা কয়েক টান দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—কিন্তু এর একটা বিহিত করতে তো হবে। আজ না হয় দু-বিঘে জমির ধান গেল। কাল আবার পুকুরের মাছ ধরে নেবে—পরশু ঘরে—

বাধা পড়িল—আনি ভাই ঘরে রয়েছে নাকি ? অনিরুদ্ধের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বাহির হইতে গিরীশ ডাকিয়া সাড়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম আধঘোমটা টানিয়া, এঁটো বাসন কয়খানি তুলিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দু-বিঘে বাকুড়িয়া ধান একেবারে শেষ করে কেটে নিয়েছে, একটি শীষও পড়ে নাই।

গিরীশও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুনলাম।

—থানায় ডায়রি করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু বউ বারণ করছে। বলছে, ছিরু পাল

চুরি করেছে—এ কথা বিশ্বাস করবে কেন! আর গাঁয়ের লোকও আমার হয়ে কেউ সাক্ষী দেবে না।

—হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যেতে আবার নাকি চণ্ডীমণ্ডপে জটলা হয়েছিল। আমরা নাকি অপমান করেছি গাঁয়ের লোকদের। জমিদারের কাছে নালিশ করবে শুনছি।

ঠোঁটের দিক বাঁকাইয়া অনিরুদ্ধ এবার উঠিল—যা যা, জমিদার, জমিদার আমার কচু করবে।

কথাটা গিরীশের খুব মনঃপূত হইল না, সে বলিল—তাই বলারই বা আমাদের দরকার কি? জমিদারেরও তো বিচার আছে, তিনি বিচার করুন না কেন!

অনিরুদ্ধ বারবার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—উঁহু, ছাই বিচার করবে জমিদার। নিজেই আজ তিন বছর ধান দেয় নাই। জমিদার ঠিক ওদের রায়ে রায় দেবে; তুমি জান না।

বিষণ্ণভাবে গিরীশ বলিল—আমিও পাই নাই চার বছর।

অনিরুদ্ধ বলিল—এই দেখ ভাই, যখন মুখ ফুটে বলেছি করব না তা তখন আমার মরা বাবা এলেও আমাকে করাতে পারবে না; তাতে আমার ভাগ্যে যাই থাক! তুমি ভাই এখনও বুঝে দেখ।

গিরীশ বলিল—সে তুমি নিশ্চিন্দি থাক। তুমি না মিটোলে আমি মিটোব না!

অনিরুদ্ধ প্রীত হইয়া কল্কেটি তাহার হাতে দিল। গিরীশ হাতের ছাঁদের মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া কয়েক টান দিয়া বলিল—এদিকে গোলমালও তোমার চরম লেগে গিয়েছে। শুধু আমরা দু'জনা নই। জমিদার ক'জনার বিচার করবে, করুক না! নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ-আগলদার সবাই আমাদের ধুয়ো নিয়ে ধুয়ো ধরেছে—ওই অল্প ধান নিয়ে আমরা কাজ করতে পারব না। তারা নাপিত তো আজই বাড়ীর দোরে অর্জুনতলায় খান কয়েক ইঁট পেতে বসেছে—বলে পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ কল্কেটি ঝাড়িয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—তাই বৈকি! পয়সা ফেল, মোওয়া খাও; আমি কি তোমার পর?

গিরীশের কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটি বিজ্ঞতা-প্রচারের ভঙ্গি থাকে, ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; সে বলিল—এই কথা! আগেকার কাল তোমার এক আলাদা কথা ছিল। সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল— তখন ধান নিয়ে কাজ করে আমাদের পুষিয়েছে—আমরা করেছি; এখন যদি না পোষায়?

বাহিরে রাস্তায় ঠুন-ঠুন করিয়া বাইসাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল—অনিরুদ্ধ!

ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ।

অনিরুদ্ধ ও গিরীশ দুজনেই বাহির হইয়া আসিল। মোটাসোটা খাটো লোকটি, মাথায় বাবরী চুল—জগন্নাথ ঘোষ বাইসাইকেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তার কোথাও পড়িয়া-

শুনিয়া পাস করে নাই, চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের তিনপুরুষের বংশগত বিদ্যা ; পিতামহ ছিলেন কবিরাজ, বাপ জ্যেঠা ছিলেন কবিরাজ এবং ডাক্তার—একাধারে দুই। জগন্নাথ কেবল ডাক্তার, তবে সঙ্গে দু-চারটি মুষ্টিযোগের ব্যবস্থাও দেয়—তাহাতে চট্ করিয়া ফলও হয় ভাল। গ্রামের সকল লোকই তাহাকে দেখায়, কিন্তু পয়সা বড় কেহ দেয় না। ডাক্তার তাহাতে খুব গররাজী নয়, ডাকিলেই যায়, বাকীর উপরে বাকীও দেয়। ভিন্ন গ্রামেও তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পসার আছে—সেখানকার রোজগারেই তাহার দিন চলে। কোনদিন শাক-ভাত, আর কোনদিন যাহাকে বলে এক-অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন, যেদিন যেমন রোজগার। এককালে ঘোষেরা সম্পত্তিশালী প্রতিষ্ঠাবান লোক ছিল। ধনীর গ্রাম কঙ্কণায় পর্যন্ত যথেষ্ট সম্মান-মর্যাদা পাইত, কিন্তু ওই কঙ্কণার লক্ষপতি মুখুজ্জেদের একহাজার টাকা ঋণ ক্রমে চারি হাজারে পরিণত হইয়া ঘোষেদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এই সম্পত্তি এবং সকলের সম্মানিত প্রবীণগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেই সম্মান-মর্যাদাও চলিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ অকাতরে চিকিৎসা এবং ঔষধ সাহায্য করিয়াও সে সম্মান আর ফিরিয়া পায় নাই। তাহার জন্য তাহার ক্ষোভের অন্ত নাই। সেই ক্ষোভে কাহাকেও রেয়াত করে না, রূঢ়তম ভাষায় সে উচ্চকণ্ঠে বলে—"চোরের দল সব, জানোয়ার।' গোপনে নয়, সাক্ষাতেই বলে। ধনী দরিদ্র যেই হোক প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম অন্যায়েরও অতি কঠিন প্রতিবাদ সে করিয়া থাকে। তবে স্বাভাবিক ভাবে ধনীদের ওপর ক্রোধ তাহার বেশী।

অনিরুদ্ধ ও গিরীশ বাহির হইয়া আসিতেই ডাক্তার বিনা ভূমিকায় বলিল—থানায় ডায়রি করলি ?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে তাই—

—তাই আবার কিসের রে বাপু ? যা, ডায়রি করে আয়।

—আজ্ঞে বারণ করছে সব, বলছে—ছিরু পাল চুরি করেছে কে একথা বিশ্বাস করবে ?

—কেন ? ও বেটার টাকা আছে বলে ?

—তাই তো সাত-পাঁচ ভাবছি ডাক্তারবাবু।

বিদ্রূপতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া জগন্নাথ বলিল—তা হলে এ সংসারে যাদের টাকা আছে তারাই সাধু—আর গরীব মাত্রেই অসাধু, কেমন ? কে বলেছে এ কথা ?

অনিরুদ্ধ এবার চুপ করিয়া রহিল। বাড়ীর ভিতরে বাসনের টুংটাং শব্দ উঠিতেছে। পদ্ম ফিরিয়াছে, সব শুনিতেছে, তাহারই ইশারা দিতেছে। উত্তর দিল গিরীশ, বলিল—আজ্ঞে, ডায়রি করেই বা কি হবে ডাক্তারবাবু, ও এখুনি টাকা দিয়ে দারোগার মুখ বন্ধ করবে। তা ছাড়া থানার জমাদারের সঙ্গে ছিরুর বেশ ভাবের কথা তো জানেন ! একসঙ্গে মদ-ভাং খায়—তারপর—

ডাক্তার বলিল—জানি। কিন্তু দারোগা টাকা খেলে—তারও উপায় আছে। তার উপরে কমিশনার আছে। তার ওপরে ছোট লাট, ছোট লাটের ওপর বড় লাট আছে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তা বুঝলাম ডাক্তারবাবু, কিন্তু মেয়েছেলেকে এজাহার-ফেজাহার দিতে

হবে, সেই কথা আমি ভাবছি।

—মেয়েছেলের এজাহার? ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া গেল। মাঠে ধান চুরি হয়েছে, তাতে মেয়েছেলেকে এজাহার দিতে হবে কেন? কে বলল? এ কি মগের মুলুক নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ উঠিয়া পড়িল।—তা হলে আমি আজ্ঞে এই এখুনি চললাম।

ডাক্তার বাইসাইকেলে উঠিয়া বলিল, যা, তুই নির্ভাবনায় চলে যা। আমি ও-বেলা যাব। চুরি করার জন্যে ধান কেটে নিয়েছে—এ কথা বলবি না, বলবি, আক্রোশবশে আমার ক্ষতি করবার জন্যে করেছে।

অনিরুদ্ধ আর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল না পর্যন্ত, রওনা হইয়া গেল, পাছে পদ্ম আবার বাধা দেয়। সে ডাক্তারের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে আরম্ভ করিল; গিরীশকে বলিল—গিরীশ, কামার-শালের চাবিটা নিয়ে এসো তো ভাই চেয়ে।

ও-পারের জংশনের কামারশালার চাবি। গিরীশকে ভিতরে ঢুকিয়া চাহিতে হইল না, দরজার আড়াল হইতে ঝনাৎ করিয়া চাবিটা আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। গিরীশ হেঁট হইয়া চাবিটা তুলিতেছিল—পদ্ম দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল—ডাক্তার ও অনিরুদ্ধ অনেকখানি চলিয়া গিয়াছে। সে এবার আধঘোমটা টানিয়া সামনে আসিয়া বলিল—একবার ডাক ওকে।

মুখ তুলিয়া একবার পদ্মের দিকে একবার অনিরুদ্ধের দিকে চাহিয়া গিরীশ বলিল—পেছনে ডাকলে ক্ষেপে যাবে।

—তা তো যাবে। কিন্তু ভাত? ভাত নিয়ে যাবে কে? আজ কি খেতেদেতে হবে না?

গিরীশ ও অনিরুদ্ধ সকালে উঠিয়া ও-পারে যায়, তাহার পূর্বেই তাহাদের ভাত হইয়া থাকে —যাইবার সময় সেই ভাত তাহারা একটা বড় কৌটায় করিয়া লইয়া যায়। সেই খাইয়াই তাহাদের দিন কাটে। রাত্রে খাওয়াটা বাড়ীতে ফিরিয়া আরাম করিয়া খায়। গিরীশ বলিল —ভাতের কৌটা আমাকে দাও, আমিই নিয়ে যাই।

* * * *

পদ্ম সংসারে একা মানুষ। বছর দুয়েক পূর্বে শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর হইতেই সমস্ত দিনটা তাহাকে একলাই কাটাইতে হয়। সে নিজে বন্ধ্যা, ছেলে-পুলে নাই। পাড়াগাঁয়ে এমন অবস্থায় একটি মনোহর কর্মান্তর আছে—সে হইল পাড়া বেড়ানো। কিন্তু পদ্মের স্বভাব যেন উর্ণনাভ-গৃহিণীর মত। সমস্ত দিনই সে আপনার গৃহস্থালীর জাল ক্রমাগত বুনিয়া চলিয়াছে। ধান-কলাই রৌদ্রে দিতেছে, তুলিতেছে, সেগুলি মাটি ও কুড়ানো ইঁট মাটি দিয়া গাঁথিয়া ঘরে বেদী বাঁধিতেছে; ছাই দিয়া মাজিয়া-তোলা বাসনেরও ময়লা তুলিতেছে—শীতের লেপ-কাঁথাগুলি পাড়িয়া নতুন পাট করিতেছে। ইহা ছাড়া নিয়মিত কাজ—গোয়াল পরিষ্কার করা, জাব কাটা, ঘুঁটে দেওয়া, তিন-চারবার বাড়ী ঝাঁট দেওয়া এসব তো আছেই।

আজ কিন্তু তাহার কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হইল না। সে খিড়কির ঘাটে পা ছড়াইয়া বসিল। অনিরুদ্ধকে থানায় যাইতে বারণ করিয়াছে, হাসিমুখে রহস্য করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে—সে কেবল ভবিষ্যৎ অশান্তি নিবারণের জন্য। ঐ দু বিঘা বাকুড়ির ধানের জন্য তাহারও দুঃখের সীমা ছিল না। আপন মনেই সে মৃদুস্বরে ছিরু পালকে অভিসম্পাত দিতে করিল।

—কানা হবেন—কানা হবেন—অন্ধ হবেন ;—হাতে কুষ্ঠ হবে, সর্বস্ব যাবে—ভিক্ষে করে খাবেন।

সহসা যেন কোথাও প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে বলিয়া মনে হইল। পদ্ম কান পাতিয়া শুনিল। গোলমালটা বায়েনপাড়ায় মনে হইতেছে। প্রচণ্ড রূঢ়কণ্ঠে অশ্লীল ভাষায় কেউ তর্জন-গর্জন করিতেছে। ওই ছোঁয়াচটা যেন পদ্মকেও লাগিয়া গেল। সেও কণ্ঠ উচ্চে চড়াইয়া শাপ-শাপান্ত আরম্ভ করিল—

—জোড়া বেটা ধড়ফড় করে মরবে ; এক বিছানায় একসঙ্গে। আমার জমির ধানের চালে কলেরা হবে। নিবংশ হবেন—নিবংশ হবেন ; নিজে মরবেন না, কানা হবেন—দুটি চোখ যাবে, হাতে কুষ্ঠ হবে। যথা-সর্বস্ব উড়ে যাবে—পুড়ে যাবে। পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবেন।

বেশ হিসাব করিয়া—ছিরু পালের সহিত মিলাইয়া সে শাপ-শাপান্ত করিতেছিল। সহসা তাহার নজরে পড়িল, খিড়কির পুকুরের ওপারে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিরু পাল তাহার গালিগালাজগুলি বেশ উপভোগ করিয়া হাসিতেছে। একমাত্র ছিরু পাতু বায়েনকে মারপিট করিয়া ফিরিতেছিল, বায়েনপাড়ার কলরবটা তাহারই সেই বিক্রমোদ্ভুত। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের স্ত্রীর শাপ-শাপান্ত শুনিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে হাসির মধ্যে বন্য একটা ক্রুর প্রবৃত্তির প্রেরণা অথবা তাড়নাও ছিল। দেখিয়া পদ্ম উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ছিরু ভাবিতেছিল, লাফ দিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে কি না ? কিন্তু দিবালোককে তাহার বড় ভয়, সে স্পন্দিতবক্ষে দ্বিধা করিতেছিল। সহসা পদ্মের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল। তিন্তু কিসের একটা প্রতিবিম্বিত আলোকচ্ছটা তাহার চোখে আসিয়া পড়িতেই সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

—ধার পরীক্ষে করতে এক-কোপে দুটো পাঁটা কেটে আমার কাজ বাড়িয়ে গেলেন বীরপুরুষ। রক্তের দাগ ধোয়া নাই—ঘরে ভরে রেখে দিয়েছেন। আমি ঘাটে বসে ঝামা ঘষি আর কি।

পদ্মের হাতে একখানা বগি দা ; রোদ পড়িয়া দাখানা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাহারই ছটা আসিয়া চোখে পড়িতেই ছিরু পাল চোখ ফিরাইয়া লইল। পরক্ষণেই দুম্-দুম্ শব্দে পা ফেলিয়া আপনার বাড়ীর পথ ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মের মুখেও নিষ্ঠুর কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

চার

গ্রাম হইতে বাহির হইলেই বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল—প্রস্থে চার মাইল; কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানা গ্রামের অবস্থিতি; এবং পাঁচখানা গ্রামের সীমানার মাঠ ময়ূরাক্ষী নদীর ধার পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মাঠখানার দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ তিন দিকে ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরভূমি জুড়িয়া এই মাঠখানার উর্বরতা অদ্ভুত। অংশের নামই হইল 'অমরকুণ্ডার মাঠ' অর্থাৎ মাঠে ফসলের মৃত্যু নাই। শিবপুরের ইহার মধ্যে আবার শিবকালীপুরের সীমানার জমিই না কি উৎকৃষ্ট। এইটুকু জমির পরিমাণ এদিকে অতি অল্প; শিবপুরের সমস্ত জমি উত্তর দিকে। কালীপুরের চাষের মাঠ অধিকাংশই গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অর্থাৎ এই দিকে। শিবকালীপুর নামে-মাত্র দুইখানা গ্রাম; শিবপুর ও কালীপুর, দুই গ্রামে বসতির মধ্যে কেবল একটা দীঘির ব্যবধান। কালীপুর গ্রামখানাই বড়, ওই গ্রামেই লোকসংখ্যা বেশী; শ্রীহরি, দেবু প্রভৃতি সকলেরই বাস এখানে।

শিবপুর গ্রামখানি বহু পূর্বে ছিল—ছোট একটি পাড়াবিশেষ; তখন অর্থাৎ বর্তমান কাল হইতে প্রায় আশী-নব্বুই বৎসর পূর্বে সেখানে একশ্রেণীর বিচিত্র সম্প্রদায় বাস করিত; তাহারা নিজেদের বলিত 'দেবল-চাষী'। তাহারা নিজ হাতে চাষ করিত না, শিবপুরের বুড়া শিবের সেবাপূজার ভার লইয়া তাহারা মাতিয়া থাকিত। এখন এই দেবল সম্প্রদায়ের আর কেহই নাই। অধিকাংশই মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কয়েক ঘর এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ক্রোশ পাঁচেক দূরবর্তী রক্ষেশ্বর গ্রাম এবং ক্রোশ আষ্টেক দূরবর্তী জলেশ্বর গ্রাম—বাবা রক্ষেশ্বর ও বাবা জলেশ্বর এই নামীয় দুই শিবের আশ্রয় লইয়া পাণ্ডা হিসেবে তাহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাস করিতেছে। শিবভক্ত দেবলদের বাস ছিল বলিয়াই পল্লীটার নাম ছিল শিবপুর। দেবলেরা চলিয়া যাইবার পর কালীপুরের চৌধুরীরা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনিয়া শিবপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জ্ঞাতি সদ্‌গোপ চাষীদের প্রত্যক্ষ সংস্রব এড়াইবার জন্যই তাহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছিল। চৌধুরীরাই শিবপুরকে একটি স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার শিবপুর স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিমে যে গ্রামের মাঠ, সে গ্রামে নাকি লক্ষ্মী বসতি করেন না, গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যে গ্রামের চাষের সীমানা—সেখানে নাকি লক্ষ্মীর অপার করুণা। অন্ততঃ প্রবীণেরা তাই বলে। মাঠ উত্তর ও পশ্চিমদিকে হইলে দেখা যায়। গ্রাম অপেক্ষা মাঠ উঁচু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ক্রমনিম্নতার একটা একটানা প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। বোধহয় গোটা পৃথিবী জুড়িয়া এইটাই এই ক্রমনিম্নতার জন্যই, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে কৃষিক্ষেত্র হইলে—গ্রামের সমস্ত জলই গিয়া মাঠে পড়ে; গ্রাম ধোয়া জলের উর্বরতা প্রচুর।

ইহা ছাড়াও গ্রামের পুকুরগুলির জলের সুবিধা ষোল-আনা পাওয়া যায়। এই কারণে শিবপুর এবং কালীপুর পাশাপাশি গ্রাম হইলেও দুই গ্রামের জমির গুণ ও মূল্যে অনেক প্রভেদ। এজন্য কালীপুরের লোকের অনেক অহঙ্কার শিবপুরের লোককে সহ্য করিতে হয়। শিবপুরের চৌধুরীরা এককালে তাহাদের জমিদার ছিল, তখন কালীপুরকে শিবপুরের আধিপত্য সহ্য করিতে হইয়াছে; কালীপুরের বর্তমান অহঙ্কারের ঔদ্ধত্য তাহারও একটা প্রতিক্রিয়া বটে।

দ্বারকা চৌধুরী সেই বংশোদ্ভূত। চৌধুরীদের সমৃদ্ধি অনেক দিনের কথা। দ্বারকা চৌধুরীর একপুরুষ পূর্বে তাহাদের বংশের সম্মান সমৃদ্ধির ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়াছে। চৌধুরীরও আভিজাত্যের কোন ভান নাই; পূর্বকালের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে সে সমানভাবেই মেলামেশা করে; এক মজলিসে বসিয়া তামাক খায়—সুখ-দুঃখের গল্প করে। তবু চৌধুরীর কথাবার্তার ধরন ও সুরের মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। চৌধুরী কথা বলে খুব কম, যেটুকু বলে—তাহাও অতি ধীর এবং মৃদুস্বরে। কথার প্রতিবাদ করিলে চৌধুরী তাহার আর প্রতিবাদ করে না। কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীর কথা সংক্ষেপে স্বীকার করিয়া লয়, কোন ক্ষেত্রে চুপ করিয়া যায়, কোন ক্ষেত্রে সেদিনকার মত মজলিস হইতে উঠিয়া পড়ে। মোট কথা, চৌধুরী শান্তভাবেই অবস্থান্তরকে মানিয়া লইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে।

বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী সকালেই ছাতাটা মাথায়—বাঁশের লাঠিটি হাতে লইয়া কালীপুরের দক্ষিণ মাঠে নদীর ধারে রবি-ফসলের চাষের তদ্বিরে চলিয়াছিল। কালীপুরের জমিদারীর স্বত্ব চলিয়া গেলেও—সেখানে তাহাদের মোটা জোত এখনও আছে। কালীপুরের দক্ষিণেই 'অমরকুণ্ডার মাঠ', পূর্বেই বলিয়াছি এখানকার ফসল কখনও মরে না, এ মাঠে হাজা-সুখা নাই। মাঠটির মাথায় বেশ বিস্তৃত দুইটি ঝর্নার জলা আছে; প্রশস্ত একটি অগভীর জলা হইতে নালা বাহিয়া অবিরাম জল বহিয়া চলিয়াছে; জলাটি কানায় কানায় অহরহই পরিপূর্ণ, জল কখনও শুকায় না। এই যুগ্ম-ধারাই অমরকুণ্ডার মাঠের উপর যেন ধরিত্রী-মাতার বক্ষ-ক্ষরিত ক্ষীরধারা। নালা বাহিয়া জলাভাবের সময় নালায় বাঁধ দিয়া, যাহার যে দিকে প্রয়োজন জলস্রোতকে ঘুরাইয়া লইয়া যায়।

অগ্রহায়ণ পড়িতেই হৈমন্তী ধান পাকিতে শুরু করিয়াছে, সবুজ রঙ হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অমরকুণ্ডার মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নদীর বাঁধের লোক পর্যন্ত সুপ্রচুর ধানের সবুজ ও হলুদ রঙের সমন্বয়ে রচিত অপূর্ব এক বর্ণ-শোভা ঝলমল করিতেছে। ধানের প্রাচুর্যে মাঠের আল পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। কেবল ঝর্নার দুই পাশের বিসর্পিল বাঁধের উপরের তালগাছগুলি আঁকাবাঁকা সারিতে ঊর্ধ্বলোকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হেমন্তের পীতাভ রৌদ্রে মাঠখানা ঝলমল করিতেছে। আকাশে আজও শরতের নীলের আমেজ রহিয়াছে; এখনও ধুলা উড়িতে আরম্ভ করে নাই। দূরে আবাদী মাঠের

শেষপ্রান্তে নদীর বন্যারোধী বাঁধের উপর ঘন সবুজ সরবন একটা সবুজ রঙের দীর্ঘ প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। মাথায় চুনকাম-করা আলিসার মত চাপ বাঁধিয়া সাদা ফুলের সমৃদ্ধ সমারোহ বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে।

কালীপুরের পশ্চিম দিকে—সম্ভ্রান্ত ধনীদের গ্রামকঙ্কণা; গ্রামের চারিপাশে গাছপালার উপর সাদা-লাল-হলুদ রঙের দালানগুলির মাথা দেখা যাইতেছে। একেবারে ফাঁকা প্রান্তরে স্কুল—হাসপাতাল—বাবুদের থিয়েটারের ঘর আগাগোড়া পরিষ্কার দেখা যায়। বাবুরা হালে টাকায় এক পয়সা ঈশ্বরবৃত্তির প্রচলন করিয়াছেন; টাকা দিতে গেলেও দিতে হইবে—টাকা লইতে গেলেও দিতে হইবে। ঐ টাকায় পার্বণ-উপলক্ষে ধুমধাম যাত্রা-থিয়েটার হয়। চৌধুরী নিঃশ্বাস ফেলিল—দীর্ঘনিঃশ্বাস। বৎসরে দেড় টাকা দুই টাকা করিয়া তাহাকে ঐ ঈশ্বরবৃত্তি দিতে হয়।

অমরকুণ্ডার ক্ষেতে এখনও জল রহিয়াছে, জলের মধ্যে প্রচুর মাছ জন্মায়; আল কাটিয়া দিয়া মুখে ঝুড়ি পাতিয়া হাড়ী বাউড়ী ডোম ও বায়েনদের মেয়েরা মাছ ধরিতেছে। ক্ষেতের মধ্যেও অনেকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের দেখা যায় না—কেবল ধানগাছগুলি চিরিয়া একটা চলন্ত রেখা দেখা যায়, যেমন অগভীর জলের ভিতর মাছ চলিয়া গেলে জলের উপর একটা রেখা জাগিয়া ওঠে ঠিক তেমনি। অনেকে ঘাস কাটিতেছে; কাহারও গরু আছে—কেহ ঘাস বেচিয়া দুই-চার পয়সা রোজগার করে। এই এখানকার জীবন।

অমরকুণ্ডার মাঠের ঠিক মাঝামাঝি একটি প্রশস্ত আলের উপর দিয়া যাওয়া-আসার পথ। প্রশস্ত অর্থে একজন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে চলিতে পারে, দুইজন হইলে গা ঘেঁষাঘেঁষি হয়। এই পথ ধরিয়া গ্রামের গরু বাছুর নদীর ধারে চরিতে যায়। ধান খাইবে বলিয়া তখন তাহাদের মুখে একটি করিয়া দড়ির জাল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রৌঢ় চৌধুরী একটু হতাশার হাসি হাসিল—গরুগুলির মুখের জাল খুলিবার মত গো-চরও আর রহিল না।

বন্যারোধী বাঁধের ওপারে নদীর চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষের একটা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চাষীদের অবশ্য আর উপায়ও ছিল না। অমরকুণ্ডার মাঠের অর্ধেকের উপর জমি কঙ্কণার বিভিন্ন ভদ্রলোকের মালিকানিতে চলিয়া গিয়াছে। অনেক চাষীর আর জমি বলিতে কিছুই নাই। এই তাহারাই প্রথম নদীর ধারে গো-চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। এখন দেখাদেখি সবাই আরম্ভ করিয়াছে। কারণ চরের জমি খুবই উর্বর। সারা বর্ষাটাই নদীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া পলিতে পলিতে মাটি যেন সোনা হইয়া থাকে। সেই সোনা, ফসলের কাণ্ড বাহিয়া শীষ ভরিয়া দানা হইয়া ফলিয়া উঠে। গম যব সরিষা প্রচুর হয়; সকলের চেয়ে ভাল হয় ছোলা। ওই চরটার নামই 'ছোলাকুড়ি' বা ছোলাকুণ্ড। এখন অবশ্য আলুর চাষেরই রেওয়াজ বেশী। আলু প্রচুর হয় এবং খুব মোটাও হয়। নদীর ওপারের জংশনে আলুর বাজারও ভাল। কলিকাতা হইতে মহাজনেরা ওখানে আলু কিনিতে আসে। এ কয় মাসের জন্য তাহাদের এক একজন লোক আড়ত খুলিয়া বসিয়াই আছে—আলু লইয়া গেলেই নগদ টাকা! বড় চাষী যাহারা তাহারা বিশ-পঞ্চাশ টাকা দাদনও পায়।

সকলের টানে চৌধুরীকেও গো-চর ভাঙিয়া আলু গম ছোলার চাষ করিতে হইতেছে। চারিপাশে ফসলের মধ্যে তাহার গো-চরে গরু চরানো চলে না ; অবুঝ অবোলা পশু কখন যে ছুটিয়া গিয়া অন্য লোকের ফসলের উপর পড়িবে—সে কি বলা যায়! তাহার উপর অমর-কুণ্ডার মাঠে উৎকৃষ্ট দোয়েম জমিতে রবি ফসলের চাষও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কঙ্কণার ভদ্রলোকের জমি সব পড়িয়া থাকে, তাহারা রবি ফসলের হাঙ্গামা পোহাইতে চায় না, আর খইল-সারেও টাকা খরচ তাহারা করিবে না। কাজেই তাহাদের জমি ধান কাটার পর পড়িয়াই থাকে। অধিকাংশ জমি চাষ হইলে—সেখানে কতকটা জমি পতিত রাখিয়া গরু চরানো যেমন অসম্ভব, আবার অধিকাংশ জমি পতিত থাকিলে—সেখানে কতকটা জমি চাষ করাও তেমনি অসম্ভব। তবু ত গরু-ছাগলকে আগলাইয়া পারা যায়, কিন্তু মানুষ ও বানরকে পারা যায় না। তাহারা খাইয়াই শেষ করিয়া দিবে। কালীপুরের দোয়েম—সোনার দোয়েম!···

এদিকে যুদ্ধ বাধিয়া সব যেন উল্টাইয়া গেল। (প্রথম মহাযুদ্ধ) কি কালযুদ্ধই না ইংরেজরা করিল জার্মানদের সঙ্গে? সমস্ত একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিল। দুঃখ দুর্দশা সব কালেই আছে, কিন্তু যুদ্ধের পর এই কালটির মত দুর্দশা আর কখনও হয় নাই। কাপড়ের জোড়া ছ-টাকা সাত-টাকা, ওষুধ অগ্নিমূল্য—মায় পেরেক ও স্থচের দাম চার গুণ হইয়া গিয়াছে। ধানচালের দরও প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু কাপড়-চোপড়ের দর বাড়িয়াছে তিনগুণ। জমির দামও ডবল হইয়া গিয়াছে। দর পাইয়া হতভাগা মূর্খের দল জমিগুলা কঙ্কণার বাবুদের পেটে ভরিয়া দিল। ফলে এই অবস্থা, আজ আপসোস করিলে কি হইবে!

মরুক, হতভাগারা মরুক! আঃ—সেই তেরোশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে পঁচিশ সালে ; আজ তেরোশো উনত্রিশ সাল—আজও বাজারের আগুন নিবিল না। কঙ্কণার বাবুরা ধুলামুঠা সোনার দরে বেচিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনিতেছে, আর কালীপুরের জমি কিনিতেছে মোটা দামে। ধুলা বৈকি! মাটি কাটিয়া কয়লা ওঠে—সেই কয়লা বেচিয়া তো তাহাদের পয়সা! যে-কয়লায় মণ ছিল তিন আনা, চৌদ্দ পয়সা, আজ সেই কয়লার দর কিনা চোদ্দ আনা। গোদের ওপর বিষফোড়ার মত-এই বাজারে আবার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতি ঘুচাইয়া ট্যাক্স বাড়াইয়া বসাইল ইউনিয়ন বোর্ড! বাবুরা সব বোর্ডের মেম্বর সাজিয়া দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইয়া বসিল—আর, দাও তোমরা এখন ট্যাক্স! ট্যাক্স আদায়ের ধুম কি! চৌকিদার দফাদার সঙ্গে লইয়া বাঁধানো খাতা বগলে বোর্ডের কেরানী দুগাই মিশ্র যেন একটা লাটসাহেব।

সহসা চৌধুরী চকিত হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। কে কোথায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না? লাঠিটি বগলে পুরিয়া রৌদ্রনিবারণের ভঙ্গিতে ভ্রূর উপরে হাতের আড়াল দিয়া এপাশ ওপাশ দেখিয়া চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। হ্যাঁ, পিছনেই বটে। ওই—গ্রাম হইতে কয়জন লোক আসিতেছে, উহাদের ভিতরেই কেহ কাঁদিতেছে; সে স্ত্রীলোক,

তাহাকে দেখা যাইতেছে না, সামনের পুরুষটির আড়ালে সে ঢাকা পড়িয়াছে। আ-হা-হা! পুরুষটা! পুরুষটা কেউটে সাপের মত ফিরিয়া মেয়েটার চুলের মুঠি ধরিয়া দুম-দাম করিয়া প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। চৌধুরী এখান হইতেই চীৎকার করিয়া উঠে—এই, এই; আ-হা--হা! ওই!

তাহারা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু স্ত্রীলোকটি চীৎকার বন্ধ করিল; পুরুষটিও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। চৌধুরী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া—আবার রওনা হইল। ছোটলোক কি সাধে বলে! লজ্জা-সরম, রীত-করণ উহাদের কখনও হইবে না। জানে না—স্ত্রীলোকের চুলে হাত দিলে শক্তি ক্ষয় হয়। রাবণ যে রাবণ যাহার দশটা মুণ্ড, কুড়িটা হাত, এক লক্ষ ছেলে, একশ লক্ষ নাতি, সে যে সে, সীতার চুলের মুঠি ধরিয়া সে একে-বারে নির্বংশ হইয়া গেল।

বাঁধের কাছাকাছি চৌধুরী পৌছিয়াছে—এমন সময় পিছনে পদ-শব্দ শুনিয়া চৌধুরী ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পাতু বায়েন হন্ হন্ করিয়া বুনো শূকরের মত গোঁভরে চলিয়া আসিতেছে। পিছনে কিছু দূরে ধুপ্ ধুপ্ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে একটি স্ত্রীলোক। বোধ হয় পাতুর স্ত্রী। সে এখনও গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতেছে—আর মধ্যে মধ্যে চোখ মুছিতেছে। চৌধুরী একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাতু যে-গতিতে আসিতেছে, তাহাতে তাহাকে পথ ছাড়িয়া না দিলে উপায় কি। উহার আগে আগে চলিবার শক্তি চৌধুরীর নাই। পাতু কিন্তু নিজেই পথ করিয়া লইল, সে পাশের জমিতে নামিয়া পড়িয়া ধানের মধ্য দিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌধুরীকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল—দ্যাখেন চৌধুরী মশায় দ্যাখেন।

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। কপালে একটা সদ্য আঘাতচিহ্ন হইতে রক্ত ঝরিয়া মুখখানাকে রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—ওগো, বাবুমশায় গো! খুন করলে গো!

—এ্যা-ও! পাতু গর্জন করিয়া উঠিল।···আবার চেঁচাতে লাগিলি মাগী? সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নামিয়া গেল; সে গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—গরীবের কি দশা করেছে দেখেন গো; আপনারা বিচার করেন গো।

পাতু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিঠ দেখাইয়া বলিল- দেখেন পিঠ, দেখেন।

এবার চৌধুরী দেখিল পাতুর পিঠে লম্বা দড়ির মত নির্মম প্রহার চিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দাগ একটা দুইটা নয়—দাগে দাগে পিঠটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত। চৌধুরী অকপট মমতা ও সহানুভূতিতে বিচলিত হইয়া উঠিল, আবেগ-বিগলিত স্বরেই বলিল—আ-হা-হা। কে এমন কল্লে রে পাতু?

—আগে, ওই ছিরু পাল। রাগে গন্ গন্ করিতে করিতে প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই পাতু উত্তর দিল—কথা নাই, বার্তা নাই, এসেই একগাছা দড়ির বাড়িতে দেখেন কি করে দিলে

দেখেন! আবার সে পিছন ফিরিয়া ক্ষতবিক্ষত পিঠখানা চৌধুরীর চোখের সামনে ধরিল। তারপর আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দড়িখানা চেপে ধরলাম তো একগাছা বাখারীর ঘায়ে কপালটাকে একেবারে দিল ফাটিয়ে।

ছিরু পাল—শ্রীহরি ঘোষ? অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই, উঃ! নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। চৌধুরীর চোখে অকস্মাৎ জল আসিয়া গেল। এক এক সময় অপরের দুঃখ-দুর্দশায় মানুষ এমন বিচলিত হয় যে, তখন নিজের সকল সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া নির্যাতিতের দুঃখ যেন আপন দেহমন দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে। চৌধুরী এমনই একটি অবস্থায় উপনীত হইয়া সজলচক্ষে পাতুর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার দন্তহীন মুখের শিথিল ঠোঁট অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গিতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পাতু বলিল—মোড়লদের ফি-জনার কাছে গেলাম। তা কেউ রা কাড়লে না মশায়। শক্তর সব দুয়োর মুক্ত।

পাতুর বউ অনুচ্চ কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলিতেছিল—সর্বনাশী কালামুখীর লেগে গো—

পাতু একটা ধমক কষিয়া বলিল—অ্যাই—অ্যাই, আবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে!

চৌধুরী একটু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—কেন অমন করে মারলে? কি এমন দোষ করেছ তুমি যে—।

অভিযোগ করিয়া পাতু কহিল—সেদিন চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে বলতে গেলাম—তা তো আপনি শুনলেন না, চলে গেলেন। গোটা গেরামের লোকের 'আণ্ডোটজুতি' আমাকে সারা বছর যোগাতে হয়; অথচ আমি কিছুই পাই না। তা কর্মকার যখন রব তুললে, তখন আমিও বলেছিলাম যে, আমি আর 'আণ্ডোটজুতি' যোগাতে লারব। কাল সানঝেতে পালের মুনিষ আণ্ডোটজুতি চাইতে এসেছিল—আমি বলেছিলাম—পয়সা আন গিয়ে। তা আমার বলা বটে! আজ সকালে উঠে এসেই কথা নাই বাত্তা নাই—আথালি-পাথালি দড়ি দিয়ে মার!

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল। পাতুর বউ বার বার ঘাড় নাড়িয়া মৃদু বিলাপের সুরে সেই বলিয়াই চলিল—না গো—বাবুমশায়—

পাতু তাহার কথা ঢাকিয়া দিয়া বলিল—আমার পেট চলে কি ক'রে—সেটা আপনারা বিচার করবেন না, আর এমনি করে মারবেন?

চৌধুরী কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—শ্রীহরি তোমাকে এমন করে মেরেছে—মহা অন্যায় করেছে, অপরাধ করেছে, হাজারবার, লক্ষবার, সে কথা সত্যি। কিন্তু 'আণ্ডোটজুতি'র কথাটা তুমি জান না বাবা পাতু! গাঁয়ের ভাগাড় তোমরা যে দখল কর—তার জন্যেই তোমাদিগে গাঁয়ের 'আণ্ডোটজুতি' যোগাতে হয়। এই নিয়ম। ভাগাড়ে মড়ি পড়লে তোমরা চামড়া নাও, হাড় বিক্রি কর—তারই দরুণ তোমরা ওই 'আণ্ডোটজুতি'—, মাংস কাটিয়া লইয়া যাওয়ার কথাটা আর চৌধুরী ঘৃণাবশে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

পাতু অবাক হইয়া গেল; সে বলিল—ভাগাড়ের দরুণ!

—হ্যাঁ! তোমাদের প্রবীণেরা তো কেউ নাই, তারা সব জানত।

—শুধু তাই লয়, মশায়; ওই পোড়ামুখী কলঙ্কিনী গো। এই ফাঁকে পাতুর বউ আবার সুর তুলিল।

পাতু এবার সঙ্গে সঙ্গে বলিল—আছে হ্যাঁ। শুধু তো 'আণ্ডোটজুতি'ও লয়; আপনারা ভদ্দরনোকরা যদি আমাদের ঘরের মেয়েদের পানে তাকান্—তবে আমরা যাই কোথায় বলুন?

প্রৌঢ় প্রবীণ ধর্মপরায়ণ চৌধুরী বলিয়া উঠিল—রাম! রাম! রাম! রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!

পাতু বলিল—আজ্ঞে, রাম রাম লয়, চৌধুরী মশায়। আমার ভগ্নী দুর্গা একটু বজ্জাত বটে; বিয়ে দেলাম তো পালিয়ে এল শ্বশুরঘর থেকে। সেই তারই সঙ্গে মশায় ছিরু পাল ফষ্টিনষ্টি করবে। যখন তখন পাড়ায় এসে ছুতোনাতা নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে বসবে। আমার মা হারামজাদীকে তো জানেন? চিরকাল একভাবে গেল। ছিরু পালকে বসতে মোড়া দেবে—তার সঙ্গে ফুস-ফাস করবে। ঘরে মশায়, আমার বউ রয়েছে। তাকে, মাকে আর দুর্গাকে আমি ঘা কতক করে দিয়েছিলাম। মোড়লকেও বলেছিলাম, ভাল করেই বলেছিলাম চৌধুরী মশাই,—আমাদের জাত-জ্ঞেতে নিন্দে করে—আর আপনি আসবেন না, মশায়। এ আক্রোশটাও আছে মশাই।

লাঠি ও ছাতায় চৌধুরীর দুই হাত ছিল আবদ্ধ, কানে আঙুল দিবার উপায় ছিল না; সে ঘৃণাভরে থুতু ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—রাধাকৃষ্ণ হে! থাক পাতু, থাক বাবা—সকালবেলা ওসব কথা আমাকে আর শুনিও না। এতে আর আমার কি হাত আছে বল! রাধাকৃষ্ণ!

পাতু কিন্তু ইহাতে তুষ্ট হইল না। সে কোন কথা না বলিয়া চৌধুরীকে পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার পিছন পিছন তাহার স্ত্রী আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। স্বামীর নীরবতার সুযোগ পাইয়া সে আবার কান্নার সুরে সুর করিল—হারামজাদী আবার ঢং ক'রে ভাইয়ের দুঃখে ঘটা ক'রে কানতে বসেছে গো! ওগো আমি কি করব গো!

পাতু বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরিল; সঙ্গে সঙ্গে বউটি আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল—অ্যাঁ—।

পাতু মুখ খিঁচাইয়া বলিল—চেল্লাস না বাপু। তোকে কিছু বলি নাই···তু থাম। ধাক্কা দিয়া স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া পশ্চাদগামী চৌধুরীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—আচ্ছা চৌধুরীমশায়, আলিপুরের রহমৎ স্যাখ যে কঙ্কণার রমন্দ চাটুজ্জের সঙ্গে ভাগাড় দখল করেছে, তার কি করছেন?

আশ্চর্য হইয়া চৌধুরী বলিলেন—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়। ভাগাড়ের চামড়া তাদিগে ছাড়া আর কাউকে বেচতে পাব না আমরা। তারা বলে, ভাগাড় জমিদার আমাদিগে বন্দোবস্ত দিয়েছে। ছাল ছাড়ানোর মজুরী আর নুনের দাম—তার ওপর দু-চার আনা ছাড়া আর কিছু দেয় না। অথচ চামড়ার

দাম এখন আগুন! তাহলে?

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি কথা পাতু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মিছে যদি হয় পঞ্চাশ জুতো খাব, নাকে খৎ দোব।

—তা হলে, চৌধুরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা হলে হাজার বার তুমি বলতে পার ও-কথা, গাঁয়ের লোক পয়সা দিতে বাধ্য। কিন্তু জমিদারের গোমস্তা নন্দীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছ?

পাতু বলিল—গোমস্তা নন্দী কেন, জমিদারের কাছেই যাব আমি। ডাক্তার ঘোষ মশায় বললে, থানায় যা। তা থানা কেন—আগে জমিদারের কাছেই যাই, দুটো বিচারই হয়ে যাক! দেখি, জমিদার কি বলে!

সে আবার ফিরিল এবং সোজা আল-পথটা ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকের একটা আল ধরিয়া কঙ্কণার দিকে মুখ করিল। বৃদ্ধ চৌধুরী ঠুক্ ঠুক্ করিয়া নদীর চরের দিকে অগ্রসর হইল। নদীর ওপারের জংশনের কলগুলার চিমনি এইবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, আর চৌধুরী চরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হতভম্ব হইয়া গিয়াছে বৃদ্ধ চৌধুরী; সব করিয়া সব হইল—শেষে চামড়া বেচিয়া রামেন্দ্র চাটুজ্জে বড়লোক হইবে! ছিঃ ছিঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে!

পাঁচ

গল্পে শোনা যায়, যমজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে যমদূতেরা রামের বদলে শ্যামকে লইয়া যায়, শ্যামের বদলে আসিয়া ধরে রামকে। তাদের অনুকরণে হইলেও ক্ষেত্র বিস্তৃততর করিয়া লইয়া রাম অপরাধ করিলে মানুষ অতিবুদ্ধিবশতঃ প্রায়ই শ্যামকে লইয়া টানাটানি করে। পুলিসও মানুষ, সুতরাং এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। পরদিনই একটা পুলিস তদন্ত হইয়া গেল। অনিরুদ্ধ আক্রোশের কারণ দেখাইয়া ছিরু পালকে সন্দেহ করিলেও পুলিস আসিয়া মাঠ-আগলদার সতীশ বাউড়ীর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া সব তছ্‌নছ্‌ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকটাকে জেরায় নাজেহাল করিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিল। অবশ্য, অনিরুদ্ধের সন্দেহ অনুযায়ী একবার ছিরু পালের খামার-বাড়ীটাও ঘুরিয়া দেখিল,—কিন্তু সেখানে দুই বিঘা জমির আধ-পাকা ধানের একগাছি খড়ও কোথাও মিলিল না।

পুলিস আসিয়া গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিল। গ্রামের মণ্ডল-মাতব্বরেরাও আসিয়া চন্দ্রমণ্ডলের নক্ষত্র সভাসদের মত চারিপাশে জমকাইয়া বসিয়া উত্তেজিতভাবে ফিস ফিস করিয়া পরস্পরের মধ্যে কথা বলিতেছিল। ছিরু পাল বসিয়াছিল—পুলিসের অতি নিকটেই এবং অত্যন্ত গম্ভীরভাবে। তাহার আকর্ণবিস্তৃত মুখগহ্বরের পাশে চোয়ালের হাড় দুইটা কঠিন ভঙ্গিতে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধ সম্মুখেই উবু হইয়া বসিয়া মাটির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। তদন্ত-শেষে পুলিস উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধও উঠিল।

সে চাহিয়া না দেখিয়াও স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল যে, সমস্ত গ্রামের লোক কঠিন প্রতিহিংসা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা সহ্য করা যায়—নিরুপায় হইয়া মানুষকে সহ্যও করিতে হয়—কিন্তু যন্ত্রণারও ভাবী ইঙ্গিত বা নিষ্ঠুর কল্পনা মানুষের পক্ষে অসহ্য। সে পুলিসেরই পিছন পিছন উঠিয়া আসিল।

পুলিস চলিয়া যাইতেই চণ্ডীমণ্ডপে প্রচণ্ড কলরব উঠিল। সমবেত জনতার প্রত্যেকে আপন আপন মন্তব্য ঘোষণা আরম্ভ করিল; কেউ কাহারও কথা শোনে না দেখিয়া প্রত্যেকেই আপন আপন কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে লইয়া গেল। সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের কেহই অবশ্য শ্রীহরি ঘোষকে সুনজের দেখে না; কিন্তু অনিরুদ্ধ কর্মকার যখন পুলিসে খবর দিয়া তাহার বাড়ী খানা-তল্লাস করাইল, বাড়ীতে পুলিস ঢুকাইয়া দিল, তখন অপমানটাকে তাহারা সম্প্রদায়গত করিয়া লইয়া বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া সেদিন অনিরুদ্ধের সমাজকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যজনিত অপরাধের ভিত্তির উপর আজিকার ঘটনাটা ঘটিবার ফলে বিষয়টা গুরুত্বে রীতিমত বড় হইয়া উঠিয়াছে।

দেবনাথ ঘোষের গলাটা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি উচ্চ, এ গ্রামে সকল কলরবের উর্ধ্বে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সে দুই অর্থেই। চাষীর ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম! তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিমান যুবক দেবনাথ! তাহার ছাত্র-জীবনে সে কৃতী ছাত্র ছিল। কিন্তু আর্থিক অসাচ্ছল্য এবং সাংসারিক বিপর্যয় হেতু ম্যাট্রিক ক্লাস হইতে তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইয়াছে। সে এখন এই গ্রামেরই পাঠশালার পণ্ডিত। গ্রাম্যজীবনের ব্যবস্থা শৃঙ্খলার বহু তথ্য সে ব্যগ্র কৌতূহলে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে। সে বলিতেছিল—কামার, ছুতোর, নাপিত কাজ করব না বললেই চলবে না। কাজ করতে তারা বাধ্য।

শ্রীহরি কেবল তেমনি গম্ভীরভাবে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বসিয়াছিল, এতখানি যে হইবে—সে তাহা ভাবিতে পারে নাই। ওদিকে শ্রীহরির খামারবাড়ীতে শুকাইতে দেওয়া ধান পায়ে পায়ে ওলোট-পালোট করিয়া দিতে দিতে ছিরুর মা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ও নিষ্ঠুরতম আক্রোশে নির্মম অভিসম্পাত দিতেছিল অনিরুদ্ধকে।

* * * *

অন্যদিকে অনিরুদ্ধের বাড়ীতে পদ্ম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া বাহির দরজাটিতে দাঁড়াইয়া ছিল। থানা-পুলিসকে তাহার বড় ভয়। ছিরুর মায়ের অশ্লীল গালিগালাজ এবং নিষ্ঠুর অভিসম্পাতগুলি এখান হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। ছিরু পালের বাড়ী এবং তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটা পুকুরের এপার ওপার। শব্দ তেরছা ভাসিয়া আসে। পথটা তিনপাড় বেড় দিয়া খানিকটা ঘুর পথ। গালাগালি শুনিয়া পদ্মের মুখখানা থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল। পদ্ম দুরন্ত মুখরা মেয়ে; গালিগালাজ অভিসম্পাত সে-ও অনেক জানে। সে কাহারও স্পষ্ট নামোল্লেখ না করিয়া তাহাদের অবস্থার সহিত মিলাইয়া এমনভাবে অভিসম্পাত দিতে পারে যে শব্দভেদী বাণের মত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির একেবারে বুকে গিয়া আমূল বিঁধিয়া যায়। কিন্তু আজ দারুণ উৎকণ্ঠায় কে যেন গলা চাপিয়া

ধরিয়াছে। এই সময় অনিরুদ্ধ আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। অনিরুদ্ধকে দেখিয়া গভীর আশ্বাসে সে স্বস্তির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। পরমুহূর্তেই চোখমুখ দীপ্ত করিয়া বলিল—শুনছ তো? আমিও এইবার গাল দোব কিন্তু!

অনিরুদ্ধের অবস্থাটা তখন ঠিক শীতের বরফের মত অনুতপ্ত, স্থির ও কঠিন। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—না, গাল দিতে হবে না—ঘরে চল্।

পদ্ম ঘরের দিকে আসিতে আসিতে বলিল—না। শুধু শুধু ঘরে যাব? কানের মাথা খেয়েছ? গালাগালগুলো শুনতে পাচ্ছ না?

—তবে যা, গাল দিগে; গলা ফাটিয়ে চীৎকার কর্ গিয়ে! মর গিয়ে।

পদ্ম গজ গজ করিতে করিতে গিয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে তেল বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—কি খোয়ারটা আমার করছে শুনতে পাচ্ছ না তুমি?

পদ্ম ও অনিরুদ্ধ নিঃসন্তান—তাই ছিরুর মা অনিরুদ্ধের নিষ্ঠুরতম মৃত্যু কামনা করিয়া পদ্মের জন্য কদর্যতম অশ্লীলতম ভবিষ্যৎ উপজীবিকার নির্দেশ দিয়া অভিসম্পাত দিতেছে। তেলের বাটি পাশে রাখিয়া সে স্বামীর একখানা হাত টানিয়া লইয়া তাহাকে তেল মাখাইতে বসিল। কর্কশ ও কঠিন হাত; আগুনের আঁচে রোমগুলি পুড়িয়া কামানো দাড়ির মত করকরে হইয়া আছে। শুধু হাত নয়, হাত-পা-বুক—মোট কথা সম্মুখভাগের প্রায় অনাবৃত অংশটাই এমনি দগ্ধরোম। তেল দিতে দিতে পদ্ম বলিল—বাব্‌বা, হাত-পা নয় যেন উখো!

অনিরুদ্ধ সে কথায় কান না দিয়া বলিল—আমার গুপ্তিটা বার করে বেশ করে মেজে রাখবি তো।

পদ্ম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমারও দা আছে, কাল মেজে ঘষে সান দিয়ে রেখেছি নিজের গলায় মেরে একদিন দু-খানা হয়ে পড়ে থাকব কিন্তু।

—কেন?

—তুমি খুনখারাপী করে ফাঁসি যাবে—আর আমি হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি ভোগ করে বেঁচে থাকব?

অনিরুদ্ধ কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল বলিল—হু-উ!—অর্থাৎ পদ্মের হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতির সম্ভাবনার কথাটা সে ভাবিয়া দেখে নাই, নতুবা ছিরেকে জখম করিয়া জেল খাটিতে বা হত্যা করিয়া ফাঁসি যাইতে বর্তমানে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল না।

পদ্ম বলিল—বারণ করলাম থানা পুলিস কর না। কথা কানেই তুললে না। কিন্তু কি হল? পুলিস কি করলে? গাঁয়ের সঙ্গে কেবল ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে গেল। আর আমি গাল দোব বললেই একেবারে বাঘের মত হাঁকিয়ে উঠছ—'না, দিতে পাবি না।'

রুদ্ধক্রোধ অনিরুদ্ধ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে তাহার সাহসও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না। বন্ধ্যা পদ্মকে লইয়া তাহাকে বড় সন্তর্পণে চলিতে হয়; সামান্য কারণে নিতান্ত বালিকার মত সে অভিমান করিয়া মাথা খুঁড়িয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া তোলে; আবার কখনও প্রবীণা প্রৌঢ়া যেমন দুরন্ত ছেলের

আবদার-অত্যাচার সহ্য করে তেমনি করিয়া হাসিমুখে অনিরুদ্ধের অত্যাচার সহ্য করে—অনিরুদ্ধের হাতে মার খাইয়াও তখন সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসে। কখন্ কোন্ মুখে পদ্ম চলে—সে অনিরুদ্ধ অনেকটা বুঝিতে পারে। আজিকার কথার মধ্যে তাহার আবদারের সুর ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেইটুকু বুঝিয়াই সে দারুন বিরক্তি সত্ত্বেও আত্মসংবরণ করিয়া রহিল। কোন কথা না বলিয়াই পদ্মর হাত হইতে সে আপনার পা-খানা টানিয়া লইয়া বলিল—কই, গামছা কই?

পদ্ম কিন্তু এইটুকুতেই অভিমানে ফোঁস করিয়া উঠিল; অনিরুদ্ধ ভুল করে নাই। পদ্ম আজ ছোট মেয়ের মতই আবদেরে হইয়া উঠিয়াছে। মুখে সে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু বিদ্যুতের মত চমকাইয়া মুখ তুলিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল,—পরমুহূর্তেই তেলের বাটিটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বেলার পানে তাকিয়ে দেখেছিস? ছায়া কোথা গিয়েছে দেখ্। এদিকে তিনটে বাজে।

গম্ভীর মুখে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বাড়ীর উঠানের ছায়া লক্ষ্য করিয়া পদ্ম গামছাখানা আনিয়া অনিরুদ্ধের হাতে দিয়া বলিল—বস, আমি জল এনে দিই, বাড়ীতেই চান করে নাও।

গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তাতে দেরি হবে, পদ্ম। আমি এই যাব আর আসব। পানকৌড়ির মত ভুক করে ডুবব আর উঠব। ভাত তুই বেড়ে রাখ্। বলিতে বলিতেই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পদ্ম ভাত বাড়িতে গিয়া রান্নাঘরের শিকলে হাত দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ডাল-তরকারি সব ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে! সেসব বাবুর মুখে রুচিবে কি? বাবু নয় নবাব। যত আয় তত ব্যয়। কামার, কুমোর, নাপিত, স্বর্ণকার—ইহাদের অবশ্য খরচে বলিয়া চিরকাল বদনাম, কিন্তু উহার মত খরচে পদ্ম আর কাহাকেও দেখে না। ওপারের শহরে কামারশালা করিয়া খরচের বাতিক তাহার আরো বাড়িয়া গিয়াছে। এক টাকা সেরের ইলিশমাছ এ গ্রামে কে খাইয়াছে? এখন গরম একটা কিছু না করিয়া দিলে নবাব কেবল ভাতে-হাত করিয়াই উঠিয়া পড়িবে! খিড়কির ডোবাটার পাড়ে পদ্ম প্রথম আশ্বিনেই কয়েক ঝাড় পেঁয়াজ লাগাইয়াছিল, সেগুলো বেশ ঝাড়ে-গোছে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পেঁয়াজের শাক আনিয়া ভাজিয়া দিলে কেমন হয়? পদ্ম খিড়কির দিকে অগ্রসর হইয়াই লক্ষ্য করিল—দুয়ারের পাশে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। সাদা কাপড়ের খানিকটা মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল—গত কালের ছিরু পালের সেই বীভৎস হাসি! কয়েক পা পিছাইয়া আসিয়া সে প্রশ্ন করিল—কে? কে দাঁড়িয়ে গো?

সাড়া পাইয়া মানুষটি চকিত গতিতে ঘরে প্রবেশ করিল। পদ্ম আশ্বস্ত হইল—পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। পরমুহূর্তেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল—এ যে ছিরু পালের বউ! বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হইবে না; এককালে সুন্দরী ছিল সে, কিন্তু এখন অকালবার্ধক্যে জীর্ণ এবং

শীর্ণ। চোখে তাহার যত ক্লান্তি তত সকরুণ মিনতি। ছিরু পালের বউ বিনা ভূমিকায় দু'টি হাত জোড় করিয়া সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—ভাই, কামার বউ!

পদ্ম কোন কথা বলিতে পারিল না, ছিরু পালের বউকে সে ভাল করিয়াই জানে, এমন ভাল মেয়ে আর হয় না। কত বড় ভাল ঘরের মেয়ে সে তাও পদ্ম জানে। তাহার কতখানি দুঃখ তাও সে চোখে দেখিয়াছে—কানে শুনিয়াছে, ছিরু পালের প্রহার সে দূর হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে ; তদুপরি ছিরুর মায়ের গালিগালাজ সে নিত্যই শুনিতেছে।

ছিরুর বউ তাহার সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া বলিল—তোমার পায়ে ধরতে এসেছি ভাই।

দুই পা পিছাইয়া গিয়া পদ্ম বলিল—না না না! সে কি!

—আমার ছেলে দুটিকে তোমরা গাল দিও না, ভাই ; যে করেছে তাকে গাল দিও—কি বলব আমি তাতে!

ছিরু পালের সাতটি ছেলের মধ্যে দুইটি মাত্র অবশিষ্ট ; তাও পৈতৃক গুপ্তব্যাধির বিষে জর্জরিত—একটি রুগ্ন, অপরটি প্রায় পঙ্গু।

সন্তানবতী নারীদের উপর বন্ধ্যা পদ্মের একটা অবচেতনগত হিংসা আছে। এই মুহূর্তে কিন্তু সে হিংসাও তাহার স্তব্ধ হইয়া গেল। সে আপনা-আপনি কেবলি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ছিরু পালের স্ত্রী বলিল—তোমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। চাষীর মেয়ে—আমি জানি। তুমি ভাই এই টাকা টকা রাখ—বলিয়া সে স্তম্ভিত পদ্মের হাতে দুখানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া আবার বলিল—লুকিয়ে এসেছি, ভাই, জানতে পারলে আমার আর মাথা থাকবে না—বলিয়াই সে দ্রুতপদে ফিরিল। দরজার মুখে গিয়া আবার একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত দু'টি জোড় করিয়া বলিল—আমার ছেলে দুটির কোন দোষ নাই ভাই। আমি হাত জোড় করে যাচ্ছি।

পরমুহূর্তে সে খিড়কির দরজার ও-পাশে অদৃশ্য হইয়া গেল। পদ্ম যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—

* * * *

কিছুক্ষণ পরে তাহার এই স্তম্ভিত ভাব কাটিয়া গেল অদূরবর্তী একটা কোলাহলের আঘাতে। আবার একটা কোথায় গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে। সকল কোলাহলের ঊর্ধ্বে একজনের গলা শোনা যাইতেছে। পদ্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল ;—অনিরুদ্ধ কি? না, সে নয়। তবে? ছিরু পাল? কান পাতিয়া শুনিয়া পদ্ম বুঝিল—না, এ ছিরু পালের কণ্ঠস্বরও নয়। তবে? সে দ্রুতপদে আসিয়া বাহির-দরজার সম্মুখে পথের উপর নামিয়া দাঁড়াইল। এবার সে স্পষ্ট চিনিতে পারিল এ কণ্ঠস্বর এ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষালের। পদ্ম এবার নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত দুইই হইল। মুখে খানিকটা ব্যঙ্গহাস্যও দেখা দিল। হরেন্দ্র ঘোষালের মাথায় বেশ খানিকটা ছিট আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রামের

সকলকে টেক্কা দিয়া তাহার চলা চাই। ছিরু পাল সাইকেল কিনিলে, সে সাইকেল এবং কলের গান দুইই কিনিয়া ফেলিল, টাকা যোগাড় করিল জমি বন্ধক দিয়া। ছিরু পাল নাকি রহস্য করিয়া একবার রটনা করিয়াছিল—সে এবার ঘোড়া কিনিবে। হরেন্দ্র মান রক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিল—ছিরু পাল ঘোড়া কিনিলে সে একটা হাতী কিনিবে! আজ আবার বামুনের কি রোখ মাথায় চাপিয়াছে কে জানে? পথে কোন একটা ছোট ছেলেও নাই যে জিজ্ঞাসা করে!

ঠিক এই সময়েই পদ্ম দেখিল অনিরুদ্ধ আসিতেছে। কাছে আসিয়া পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পদ্ম বলিল—মরণ—হাসছ কেন?

অনিরুদ্ধ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।

—যা গেল! ব্যাপারটা ব'লে তবে তো মানুষে হাসে! এত চেঁচামেচি কিসের; হ'ল কি? হরু ঠাকুর এমন চেঁচাচ্ছে কেন?

—ঠাকুরকে ভারী জব্দ করেছে। আধখানা কামিয়ে দিয়ে। আবার হাসিতে সে ভাঙিয়া পড়িল।

বহুকষ্টে হাস্য-সংবরণ করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত মহা ধূর্ত।

কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়া এতক্ষণে অনিরুদ্ধ কোনমতে কথাটা শেষ করিল। সেটা এই—তারা নাপিতও তাহাদের দেখাদেখি বলিয়াছে, ধান লইয়া গোটা বৎসর সমস্ত গ্রামের লোকের ক্ষৌরির কাজ সে করিতে পারিবে না।—যাহাদের জমি নাই—হাল নাই—তাহাদের ধান পাওয়া যায় না। যাহাদের আছে তাহারাও সকলে দেয় না সুতরাং ধান লইয়া ক্ষৌরির কারবার ছাড়িয়া সে নগদ কারবার শুরু করিয়াছে। হরুঠাকুর কামাইতে গিয়াছিল —তারা নাপিত পয়সা চাহিয়াছিল! খানিকটা বকাইয়া অবশেষে 'পয়সা দিব' বলিয়াই হরুঠাকুর কামাইতে বসে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত—একে নাপিতধূর্ত, তায় তারা। আধখানা কামিয়ে বলে—কই, পয়সা দাও ঠাকুর। হরু বলে—কাল দোব। তারাও অমনি ক্ষুর ভাড় গুটিয়ে ঘরে ঢুকে বলে দিয়েছে—তা হলে আজ থাক—কাল বাকীটা কামিয়ে দেব। এই চেঁচামেচি গালাগালি—হিন্দী ফার্সী ইংরেজী। গাঁয়ের লোকেরা সব আবার জটলা পাকাচ্ছে!

অনিরুদ্ধ আবার প্রবল কৌতুকে হাসিয়া উঠিল এবং সে হাসির তোড়ে তাহার মুখের ভাত ছিটাইয়া উঠানময় হইয়া গেল।

পদ্মের খানিকটা শুচি-বাতিক আছে; তাহার হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবার কথা, কারণ সব উচ্ছিষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আজ সে কিছুই বলিল না। অনিরুদ্ধের এত হাসিতেও সে এতক্ষণের মধ্যে একবার হাসে নাই। কথাটা অনিরুদ্ধের অকস্মাৎ মনে হইল। সে গভীর বিস্ময়ে পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তোর আজ কি হল বল্ দেখি?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পদ্ম বলিল—ছিরু পালের বউ লুকিয়ে এসেছিল।

—কে? বিস্ময়ে অনিরুদ্ধ সচকিত হইয়া উঠিল।

—ছিরু পালের বউ গো। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কথাগুলি বলিয়া পদ্ম কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা নোট দুইখানি দেখাইল।

অনিরুদ্ধ নীরব হইয়া রহিল।

পদ্ম আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা, মায়ের প্রাণ।

অনিরুদ্ধ আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল, যেন ঝাঁকি দিয়াই নিজেকে টানিয়া তুলিল; বলিল—বাবাঃ! রাজ্যের কাজ বাকী পড়ে গিয়েছে। এইবার খেয়ে-দেয়ে দেড় ক্রোশ পথ ছুটতে হবে।

পদ্ম কোন কথা বলিল না। অনিরুদ্ধ হাতমুখ ধুইয়া মশলা মুখে দিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। এবং একমুখ হাসিয়া বলিল—একখানা নোট আমাকে দে দেখি!

পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। অনিরুদ্ধ আরও খানিকটা হাসিয়া বলিল—লোহা আর ইস্পাত কিনতে হবে পাঁচ টাকার। ছিরে শালাকে টাকা দিতে খদ্দেরের পাঁচ টাকা ভেঙেছি। আর—

পদ্ম কোন কথা না বলিয়া একখানা নোট অনিরুদ্ধের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ কুড়াইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—আমি নিজে একটি—। মাইরি বলছি—একটি টাকার এক পয়সা বেশী পয়সা খরচ করব না। কতদিন খাই নাই তুই বল্?

অর্থাৎ মদ।

তবু পদ্ম কোন কথা বলিল না। অকস্মাৎ যেন অনিরুদ্ধের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ছয়

হরু ঘোষালের আধখানা দাড়ি কামাইয়া বাকীটা রাখিয়া দেওয়ায় তারা নাপিতের যতই পরিহাস রসিকতা প্রকাশ পাইয়া থাকুক এবং গ্রামের লোকে প্রথমটা হরু ঘোষালের সেই অর্ধনারীশ্বরবৎ রূপ দেখিয়া হাসিয়া ব্যাপারটা যতই হাস্যকর করিয়া তুলুক,—প্রতিক্রিয়ার পালাটা কিন্তু সহজ ও আদৌ হাস্যকর হইল না; অত্যন্ত ঘোরালো এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল।

হরিশ মণ্ডল প্রবীণ মাতব্বর ব্যক্তি—লোকটির সূক্ষ্ম বোধশক্তিও আছে। সে-ই প্রথম বলিল—হাসিস না তোরা, হাসির ব্যাপার এটা নয়। গাঁয়ের অবস্থাটা কি হ'ল একবার ভেবে দেখেছিস?

সকলেই হাসির বেগের প্রবলতা খানিকটা সংবরণ করিয়া হরিশের মুখের দিকে চাহিল: হরিশ গম্ভীরভাবে বলিল—ঘোর অরাজক।

ভবেশ পাল—ছিরুর কাকা—স্থূল ব্যক্তি, তবুও বুদ্ধিমত্তার ভান তাহার আছে, সে-ও

গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে!

দেবনাথ হাসি-তামাসায় যোগ দিবার মত লোক নয়;—সে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিল—এ আপনারা আটকাবেন কি করে? গাঁয়ের জোটান আছে আপনাদের? ওই কামার-ছুতোরের পঞ্চাইতি আসরে ছিরু দ্বারিক চৌধুরীর অপমান করলে, চৌধুরী উঠে চলে গেল; জগন ডাক্তার তো এলই না—উল্টে অনিরুদ্ধকে উস্কে দিলে।

ভবেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরিনাম সত্য হে! 'কলিশেষে একবর্ণ হইবে যবন'—একি আর মিথ্যা কথা বাবা? এমনি করেই ধম্ম-কম্ম জাত-জন্ম সব যাবে।

হরিশ বলিল—ওদিকে লুটনী দাই কি বলছে জান? আমার বউমায়ের ন'মাস চলছে তো! তাই বলে পাঠিয়েছিলাম যে, রাত-বিরেতে কোথাও যদি যাস তবে আগে খবর দিয়ে যাস যেন! তা বলেছে—আমাকে কিন্তু নগদ বিদেয় করতে হবে।

গভীর চিন্তায় বিভোর হইয়া ভবেশ বলিল—হুঁ।

হরিশ বলিল—রাজা বিনে রাজ্যনাশ যে বলে—কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের জমিদার যে হয়েছে সে থেকেও না থাকা!

দেবনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলিল—জমিদারের কথা বাদ দেন। জমিদার আমাদের খারাপ কিসের? এ কাজ তো জমিদারের নয়—আপনাদের। আপনারা কই শক্ত হয়ে বসে ডাকুন দেখি মজলিস। ঘাড় হেঁট করে সবাইকে আসতে হবে। আসবে না—চালাকি নাকি? বিপদ-আপদ কি নাই তাদের? লোহাতে মুড় বাঁধিয়ে ঘর করে সব? চৌধুরীকে ডাকুন—জগন ডাক্তারকে ডাকুন—ডেকে আগে ঘর বুঝুন। তারপর, কামার, ছুতোর, বায়েন, দাই, ধোপা, নাপিত এদের ডাকুন; আর ন্যায্য বিচার করুন। তাদের পাওনাটা কড়ায়গণ্ডায় পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হরিশ মাতব্বরদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এ দেবনাথ কিন্তু বলেছেন ভাল। কি বলেন গো সব?

ভবেশ বলিল—উত্তম কথা।

নটবর বলিল—হ্যাঁ, তাই করুন তা হলে।

দেবনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না, সে বলিল—আজই বসুন সব সন্ধ্যের সময়। আমি আসর ক'রে দিচ্ছি, স্কুলের চল্লিশ বাতির আলো দিচ্ছি; খবরও দিচ্ছি সকলকে। কি বলছেন সব?

হরিশ আবার সকলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি গো?

—তা বেশ। খানিকটা তামাক আর আগুনের যোগাড় রেখো বাপু।

* * * *

বহুকাল পর চণ্ডীমণ্ডপের আটচালাটা আবার আলোকোজ্জ্বল হইয়া গ্রাম্য-মজলিসে জমিয়া উঠিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ এমনি ভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য-বিচার হইত, সংকীর্তন হইত, পাশা-দাবাও চলিত, গ্রামখানির

সলাপরামর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা। গ্রামে কাহারও কোন কুটুম্ব সজ্জন আসিলে—এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হইত। ক্রিয়া কর্ম—অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সবই এইখানে অনুষ্ঠিত হইত। কালগতিকে ধূলার অবলেপনে অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। তখন গ্রামে ব্যক্তিগত বৈঠকাখানা বা বাহিরের ঘর কাহারও ছিল না। জগন ডাক্তারের পূর্বপুরুষ—জগনের পিতামহই কবিরাজ হইয়া বাহিরের ঘর বা বৈঠকখানার পত্তন করিয়াছিল। প্রথমে সে অবশ্য এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াই রোগী দেখিত। তারপর অবস্থার পরিবর্তনের জন্যও বটে এবং জমিদারের গোমস্তার সঙ্গে কি কয়েকটা কথান্তরের জন্যও বটে—কবিরাজ, ঔষধালয় ও বৈঠকখানা তৈয়ারী করিয়া ঔষধালয় খুলিল এবং সেখানে পান ও তামাকের সাচ্ছল্যে মজলিস জমাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে ভাঙন ধরাইয়া দিল। তারপর ক্রমে ক্রমে অনেকের বাড়ীতেই একটি করিয়া বাহিরের ঘরের পত্তন হইয়াছে। সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র গ্রাম জুড়িরা এখন অনেকগুলি ছোট ছোট মজলিস বসে। কেহ কেহ বা একাই একটি আলো জ্বালিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তবে এখনও জগন ডাক্তারের ওখানেই মজলিসটি বড হয়। জগনের রূঢ় দাম্ভিকতা সত্ত্বেও রোগীর বাড়ীর লোকজন সেখানে যায়; আরও কয়েকজন যায়—ডাক্তারের অর্ধসাপ্তাহিক খবরের কাগজের সংবাদের প্রত্যাশায়। দেবনাথ ঘোষ এত বিরূপতা সত্ত্বেও যায়। সে-ই চীৎকার করিয়া কাগজ পড়ে, অন্য সকলে শোনে। অসহযোগ আন্দোলন তখন শেষ হইয়াছে, স্বরাজ-পার্টির উগ্র বক্তৃতায় এবং সমালেচনায় কাগজের স্তম্ভগুলি পরিপূর্ণ। শ্রোতাদের মনে চমক লাগে—স্তিমিতগতি পল্লীবাসীর রক্তে যেন একটা উষ্ণ শিহরণ অনুভূত হয়।

আজ চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে দেবনাথই সকলকে সম্ভাষণ জানাইতেছিল, সে-ই উদ্যোক্তা; মজলিস আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই আসর সে বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরের দেবস্থলের আঙিনায় পুরানো বকুলগাছটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা, একটি বাসুদেব-মূর্তি সেখানে গাছের শিকড়ের বন্ধনে একেবারে আঁটিয়া বসিয়া আছে; সেইটিই ষষ্ঠীদেবী বলিয়া পূজিত হয়। সেখানে একটা মোটা শুকনা ডাল জ্বালিয়া আগুন করা হইয়াছে। আগুনের চারিপাশে গ্রামের জনকতক হরিজন আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। ভদ্র সজ্জনেরা প্রায় সকলেই আসিয়াছে। কেবল দ্বারকা চৌধুরী, জগন ডাক্তার, ছিরু পাল এবং আরও দু-একজন এখনও আসে নাই।

চল্লিশ বাতির আলোয় আলোকিত চণ্ডীমণ্ডপটির উপরের দিকে চাহিয়া ভবেশ বলিল—দেখতে বেশ লাগছে বাপু।

হরিশও একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—এইবার কিন্তু একবার মেরামত করতে হবে চণ্ডীমণ্ডপটিকে। বলিয়া সে সপ্রশংসকণ্ঠে বলিল—কি কাঠামো দেখ দেখি! ওঃ—কি কাঠ!

দেবনাথ বলিল—ষড়দলে কি খেলা আছে জানেন—যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী। মানে চন্দ্র-

সূর্য-পৃথিবী যতদিন থাকবে, এও ততদিন থাকবে।

—তা থাকবে বাপু! বলিহারি বলিহারি! ভবেশ পাল অকারণে উচ্ছ্বসিত এবং পুলকিত হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়েই দ্বারকা চৌধুরী লাঠি হাতে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া আসিয়া বলিলেন—ওঃ ত্সব যে বড় জোর গো!

দেবনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল, জগন ডাক্তার ও ছিরুর জন্য আবার সে দু'টি ছেলেকে দু'জনের কাছে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু জগন ডাক্তার আসিল না, সে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে—তাহার সময় নাই। চোখে চশমা লাগাইয়া সে নাকি খবরের কাগজ পড়িতেছে। ছিরুও আসে নাই; তাহার জ্বর হইয়াছে, তবে সে বলিয়াছে—'পাঁচ জনে যা করবেন তাই আমার মত'।

ছিরুর এই অযাচিত বিনয়ে দেবনাথ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল।

* * * *

ছিরুর কথাটা অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট; বিনয়ের ধার ছিরু পাল ধারে না। জ্বর তাহার হয়ই নাই। সে নির্মম আক্রোশে গর্তের ভিতরকার আহত অজগরের মত মনে মনে পাক খাইয়া ঘুরিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে দাওয়ার উপর উবু হইয়া বসিয়া সে প্রকাণ্ড বড় হুঁকাটায় ক্রমাগত একঘেয়ে টান টানিয়া যাইতেছিল ও প্রখর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে উঠানের একটা বিন্দুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া ছিল। নানা চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে।

—'ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলে কি হয়!' মনটা আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে। পরক্ষণেই মনে হয়, না। সদ্য সদ্য আক্রোশের বশে একটা-কিছু করিয়া বসিলে আবার হয়ত ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে। আজই পঞ্চাশ টাকা জমাদার বন্ধুকে দিতে হইয়াছে। তাই লইয়া তাহার মা এখনও গজ গজ করিয়া তাহাকে গালি পাড়িতেছে।

—মর্, তুই মর্ রে! এমন রাগ তোর! একটু সবুর নাই! হাঁদা—গাডোল গোঁয়ার কোথাকার, পঞ্চাশ টাকা আমার খল্ খল্ করে বেরিয়ে গেল! আমার বুকে বাঁশ চাপিয়ে দে তুই —আমার হাড় জুড়োক।

শ্রীহরি সে দিকে কানই দিতেছে না। অন্য সময় হইলে এতক্ষণে সে বুড়ীর চুলের মুঠো ধরিয়া উঠানে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া নির্মম প্রহার আরম্ভ করিত। কিন্তু আজ সে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

অনিরুদ্ধ ওপার হইতে রাত্রি ন'টা-দশটার সময় ফেরে। অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণে —না—সঙ্গে গিরীশ ছুতোর থাকে! থাকিলেই বা, দুজনকে ঘায়েল করিয়া দেওয়াই বা এমন কি কঠিন? শ্রীহরিরও মিতে আছে। মিতে গডাঞী সানন্দে তাহাকে সাহায্য করিবে।

পরক্ষণেই সে চমকিয়া উঠিল। ধরা পড়িলে ফাঁসি হইয়া যাইবে। তাহার সে চমক এত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট যে তাহার ক্ষীণদৃষ্টি বুড়ী মা পর্যন্ত দেখিয়া ফেলিল। অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সে বলিল—মর্ মুখপোড়া! ছোট ছেলের মত চমকে উঠে যেন দেয়ালা করছে!

শ্রীহরি অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া হুঁকা হইতে কল্কেটা নামাইয়া দিয়া বলিল—এই! শুনচিস্? কল্কেটা পাল্টে দিয়ে যা।

কথাটা বলা হইল তাহার স্ত্রীকে। ছিরুর স্ত্রী রন্ধনশালে ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। পাশেই ল্যাম্পের আলোয় ছিরুর বড় ছেলেটা বই খুলিয়া একদৃষ্টে বাপের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। শীর্ণ, রুগ্ন, বছর দশেকের ছেলেটা—গলায় এক বোঝা মাতুলী—বড় বড় চোখে অদ্ভুত স্থির মূঢ় দৃষ্টি। চিন্তাগ্রস্ত বাপের প্রতিটি ভঙ্গিমা সে লক্ষ্য করিতেছে। শ্রীহরির ছোট ছেলেটা প্রায় পঙ্গু এবং বোবা, সেটাও একপাশে বসিয়া আছে—মুখের লালায় সমস্ত বুকটা অনবরত ভিজিতেছে। বড় ছেলেটি উঠিয়া আসিয়া কল্কেটা লইয়া গেল। শ্রীহরি ছেলেটার দিকে একবার চাহিল। ছেলেটা অদ্ভুত, শ্রীহরির মার খাইয়াও কাঁদে না, স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। ছেলেটার জন্য এখন তাহার মাকে প্রহার করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মাকে যেন আগলাইয়া ফেরে! মারিলে পশুর মত হিংস্র হইয়া উঠে। সেদিন সে প্রহাররত শ্রীহরির পিঠে একটা সূচ বিঁধাইয়া দিয়াছিল। ছেলেটার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্রীহরি স্ত্রীর দিকে চাহিল—বিশীর্ণ গৌরবর্ণ মুখখানা উনানের আগুনের আভায় লাল হইয়া উঠিয়াছে—চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালসার মুখ! শ্রীহরি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

—হ্যাঁ, আর এক উপায় আছে! অনিরুদ্ধের অনুপস্থিতিতে পাঁচিল ডিঙাইয়া পদ্ম কামারনীকে বাঘের মত মুখে করিয়া'—। শ্রীহরির বুকখানা ধ্বক ধ্বক করিয়া লাফাইতে লাগিল। দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহা কামারনীর সেই দা-খানা কিন্তু বড় শানিত! চোখের দৃষ্টি তাহার শীতল এবং ক্রূর। সেদিন দা-খানার রৌদ্র প্রতিফলিত ছটায় ছিরুর চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল।

বায়েনদের দুর্গা।—কামারনীর চেয়ে দেখিতে অনেক শ্রী। যৌবন তাহার উচ্ছ্বসিত; দেহবর্ণে সে গৌরী; রঙ্গরসে, লালা-লাস্যে সে অপরূপা। কিন্তু সে বহুভোগ্যা, সেই কারণেই তাহার আকর্ষণ শ্রীহরিকে আর তেমন বিচলিত করে না। দুর্গার দাদা পাতু আবার তাহার নামে জমিদারের কাছে নালিশ করিয়াছে। স্পর্ধা দেখ বায়েনের! শ্রীহরির মুখে তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। জমিদারের ছেলের সোনার নিমফলের গোঠ তাহার কাছে বন্ধক আছে। অকস্মাৎ শ্রীহরি উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীহরির স্ত্রী কল্কেতে নতুন তামাক সাজিয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। কিন্তু তামাক শ্রীহরিকে আর আকর্ষণ করিল না। দেওয়ালে-পোঁতা পেরেকে ঝুলানো জামাটা হইতে বিড়ি-দেশলাই বাহির করিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। অন্ধকার গলি-পথে-পথে ঘুরিয়া সে হরিজন-পল্লীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে। পল্লীর প্রান্তে বহুকালের বৃদ্ধ বকুলগাছ, গ্রামের ধর্মরাজতলা—সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় উহাদের মজলিস বসে। গান-বাজনা হয়, ভাসান, বোলান, ঘেঁটুগানের মহলা চলে—আবার এক-একদিনে দুর্নিবার কলহও বাধিয়া উঠে। আজ কলহ বাধিয়াছে।

শ্রীহরি একটা গাছের অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে আরম্ভ করিল।

পাতু বাইনই আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিতেছে।

দুর্গারও তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের আওয়াজ উঠিতেছে—ভাত দেবার ভাতার লয়, কিল মারার গোঁসাই। দাদা সাজছে, দা-দা! মারবি ক্যানে তু! আমার যা খুশি আমি তাই করব। হাজার নোক আসবে আমার ঘরে, তোর কি? তোর ভাত আমি খাই?

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গার মা-ও চীৎকার করিতেছে। শ্রীহরি হাসিল,—ওঃ। এ যে তাহাকে লইয়াই আন্দোলন চলিতেছে।

সহসা একটা মতলব তাহার মাথায় খেলিয়া গেল। গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া সে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল দুর্গাদের বাড়ির দিকে। বকুল গাছটার ওপাশে পল্লীটা খাঁ খাঁ করিতেছে। মেয়ে পুরুষ সব গিয়া জুটিয়াছে ওই গাছতলায়। শ্রীহরি সন্তর্পণে ঢুকিয়া পড়িল দুর্গাদের বাড়ীতে। বাড়ী অর্থে প্রাচীর বেষ্টনহীন এক টুকরো উঠানের দুই দিকে দু'খানা ঘর; একখানা দুর্গা ও দুর্গার মায়ের, অপরখানা পাতুর। শ্রীহরির তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাতুর ঘরখানার দিকে। শ্রীহরি হতাশ হইল। দরজাটা বন্ধ— দাওয়াটাও শূন্য।

একটা কুকুর অকস্মাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বোধ হয় চুরি করিয়া কাঁচা চামড়ার টুকরা খাইতে আসিয়াছিল। শ্রীহরি হাসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, সুকৌশলে হাতের মধ্যে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে লুকাইয়া টানিতে টানিতে বাহির হইল। দুর্গার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে কে জানে? আবার সে গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে কিন্তু ঝগড়াটা ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শ্রীহরি আবার একটা বিড়ি ধরাইল। কিছুক্ষণ পরে সে গাছতলা হইতে বাহির হইয়া জ্বলন্ত বিড়িটা পাতুর চালের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুত লঘুপদে আপন বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপেও ভদ্র সজ্জনদের প্রবল আলোচনা চলিতেছে।

শ্রীহরি হাসিল।

কিছুক্ষণ পরেই গ্রামের ঊর্ধ্বলোকে অন্ধকার আকাশ রক্তাভ আলোয় ভয়াল হইয়া উঠিল। আকাশের নক্ষত্র মিলাইয়া গিয়াছে। উৎক্ষিপ্ত খড়ের জ্বলন্ত অঙ্গার আকাশে উঠিয়া ফুলঝুরির মত নিভিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে হাউই-এর মত প্রজ্বলিত-বাখারিগুলি সশব্দে বাগানের মাথায় ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। আগুন! আগুন! ভয়ার্ত চীৎকার—শিশু ও নারীর উচ্চ কান্নার রোলে শূন্যলোকের বায়ুতরঙ্গ মুখর, ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

নিমেষে বকুলতলার জটলা এবং তাহার পরই চণ্ডীমণ্ডপের মজলিশ ভাঙ্গিয়া গেল।

সাত

একা পাতুর ঘর নয়, পাতুর ঘরের আগুন ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া সমস্ত হরিজন-পল্লীটাকেই পোড়াইয়া দিল! বড় বড় গাছের আড়াল পাইয়া খান দুই-তিন ঘর কোন রকমে বাঁচিয়াছে। বাকি ঘরগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুড়িয়া গিয়াছে। সামান্য কুটীরের মত নিচু-নিচু ছোট-ছোট ঘর—বাঁশের হালকা কাঠামোর উপর অল্প খড়ের পাতলা ছাউনি; কার্তিকের প্রথম হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় রোদে শুকাইয়া বারুদের মত দাহ্য বস্তু হইয়াই ছিল; আগুন তাহাতে স্পর্শ করিবামাত্র বিস্ফোরণের মতই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গেল। গ্রামের লোক অনেকেই ছুটিয়া আসিয়াছিল—বিশেষ করিয়া অল্পবয়সী ছেলের দল। তাহারা চেষ্টাও অনেক করিয়াছিল, কিন্তু জল তুলিবার পাত্রের অভাব এবং বহ্নিমান সঙ্কীর্ণ চালাগুলিতে দাঁড়াইবার স্থানের অভাবে তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। তাহাদের মুখপাত্র ছিল জগন ডাক্তার। অগ্নিদাহের সমস্ত সময়টা চীৎকার করিয়া সেনাপতির মত আদেশ দিয়া ও উপদেশ বাৎলাইয়া এমন গলা ফাটাইয়া ফেলিল যে, আগুন নিবিতে নিবিতে তাহার গলায় আওয়াজও বসিয়া গেল।

রাত্রে উহাদের সকলকে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শুইতে অনুমতি দেওয়া হইল; কিন্তু—আশ্চর্য মানুষ উহারা—কিছুতেই ওই পোড়া ভিটার মায়া ছাড়িয়া আসিল না। সমস্ত রাত্রি পোড়া ঘরের আশেপাশে কোনরূপে স্থান করিয়া লইয়া হেমন্তের এই শীতজর্জর রাত্রিটা কাটাইয়া দিল। ছেলেগুলা অবশ্য ঘুমাইল; মেয়েগুলা গানের মত সুর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিল, আর পুরুষেরা পরস্পরকে দোষ দিয়া নিজের কৃতিত্বের আস্ফালন করিল এবং দগ্ধগৃহের আগুন তুলিয়া ক্রমাগত তামাক খাইল।

প্রায় ঘরেই দু-একটা গরু দুই-চারিটা ছাগল আছে; আগুনের সময় সেগুলোকে তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছিল। সেগুলা এদিকে-ওদিকে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—রাত্রে সন্ধানের উপায় নাই। হাঁস-মুরগীও প্রত্যেকের ছিল; তাহার কতকগুলা পুড়িয়াছে, চোখে দেখা না গেলেও গন্ধে তাহা অনুমান করা যায়। যেগুলা পলাইয়া বাঁচিয়াছে—সেগুলা ইতিমধ্যেই আসিয়া আপন আপন গৃহস্থের জটলার পাশে পালক ফুলাইয়া যথাসম্ভব দেহ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া গেল। অন্য সম্পদের মধ্যে কতকগুলা মাটির হাঁড়ি, দুই-চারিটা পিতল-কাঁসার বাসন, ছেঁড়া-কাপড়ে তৈয়ারী জীর্ণমলিন দুর্গন্ধযুক্ত কয়েকখানা কাঁথা ও বালিশ, মাদুর চ্যাটাই, মাছ ধরিবার পলুই, দু-চারখানা কাপড়—তাহার কতক পুড়িয়াছে বা পোড়া-চালের ছাইয়ের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। যে যাহা বাহির করিয়াছে—সে সেগুলি আপনার পরিবার বেষ্টনীর মাঝখানে—যেন সকলে মিলিয়া বুক দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শেষরাত্রের হিমেল তীক্ষ্ণতায় কুণ্ডলী পাকাইয়া সকলে কিছুক্ষণের জন্য কাতর ক্লান্তির নীরবতার মধ্যে কখন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

সকাল হইতেই জাগিয়া উঠিয়া মেয়েরা আর একদফা কাঁদিয়া শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে বসিল। একটু রোদ উঠিতেই কোমর বাঁধিয়া মেয়ে-পুরুষে পোড়া খড়ের ছাইগুলা ঝুড়িতে করিয়া আপন আপন সারগাদায় ফেলিয়া ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। পাকা-কাঠগুলি একদিকে গাদা করিয়া রাখা হইল ; পরে জ্বালানির কাজে লাগিবে। ছাইয়ের গাদার ভিতর হইতে চাপা-পড়া বাসন যাহার যাহা ছিল—সেগুলি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল। এ সমস্ত কাজ ইহাদের মুখস্থ। গৃহের উপর দিয়া এমন বিপর্যয় ইহাদের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। প্রবল বর্ষা হইলেও ঘরগুলির জীর্ণ-আচ্ছাদন থুবড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, নদীর বাঁধ ভাঙিলে বন্যার জল আসিয়া পাড়াটা ডুবাইয়া দেয়, ফলে দেওয়ালসুদ্ধ ঘরগুলি ধ্বসিয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে জ্বালানির জন্য সংগৃহীত শুকনা পাতায় তামাকের আগুন ও জ্বলন্ত বিড়ির টুকরা ফেলিয়া মত্ত-বিভোর নিশীথে নিজেরাই ঘরে আগুন লাগাইয়া ফেলে। সব বিপর্যয়ের পর সংসার গুছাইবার শিক্ষা এমনি করিয়া পুরুষানুক্রমেই ইহাদের হইয়া আসিতেছে। ঘর-দুয়ার পরিষ্কারের পর আহার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত সন্ধ্যার বাসি ভাতই ইহাদের সকালের খাদ্য, ছোট ছেলে-দের মুড়ি দেওয়া হয় ; কিন্তু ভাত বা মুড়ি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছোট বাচ্চাগুলা ইহারই মধ্যে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—কিন্তু তাহার আর উপায় নাই। দুই-একজন মা ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলার পিঠে দুম-দাম করিয়া কিল-চড় বসাইয়া দিল।—রাক্ষসদের প্যাটে যেন আগুন লেগেছে। মর্ মর্ তোরা, মর !

ঘরদুয়ার পরিষ্কার হইয়া গেলে মনিব-বাড়ী যাইতে হইবে—তবে আহার্যের ব্যবস্থা হইবে। মনিবেরা এসব ক্ষেত্রে চিরকালই তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ পাড়ার প্রায় সকলেই চাষীদের অধীনে খাটে—বাঁধা বাৎসরিক, বেতন বা উৎপন্ন ভাগের চুক্তিতে শ্রমিকের কাজ করে। কেহ কেহ পেট-ভাতায় বা মাসে ভাতের হিসাব মত ধান লইয়া থাকে এবং ছোটগুলা পেট-ভাতায় বৎসরে চারখানা সাত হাত কাপড় লইয়া রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা মাসে আট আনা হইতে এক টাকা পর্যন্ত মাহিনা পায় -ধানের পরিমাণও তাহাদের বেশী। পূর্ণ জোয়ানদের অধিকাংশই উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে চাষে শ্রমিকের কাজ করে। মনিব সমস্ত চাষের সময়টা ধান দিয়া ইহাদের সংসারের সংস্থান করিয়া দেয়—ফসল উঠিলে ভাগের সময় সুদ-সমেত ধান কাটিয়া লয়। সুদের হার প্রায় শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত। অজন্মার বৎসরের এই ঋণ শোধ না হইলে আসল এবং সুদ এক করিয়া তাহার উপর আবার ঐ হারে সুদ টানা হয়। এই প্রথার মধ্যে অন্যায় কিছু ইহারা বোধ করে না—বরং সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের ভাবই অন্তরে ইহার জন্য পোষণ করে। দায় দৈবে মনিবেরা যে সাহায্য করেন—সেইটাই অতিরিক্ত করুণা। সেই করুণার ভরসাতেই আহার্যের চিন্তায় এখন তাহারা খুব ব্যাকুল নয়। মেয়েরাও অবস্থাপন্ন চাষীর-গৃহস্থের ঘরে সকালে-বিকালে বাসন মাজে, আবর্জনা ফেলিয়া পাঠ-কাম করে। মেয়েরাও সেখান হইতে কিছু কিছু পাইবে। এ ছাড়া দুধের দাম কিছু কিছু পাওনা আছে। সে

পাওনা কিন্তু গ্রামে নয়। চাষীর গ্রামে চাষীদের ঘরের দুধ হয়। হরিজনেরা তাদের গরুর দুধ পাশের বড়লোকের গ্রাম কঙ্কণায় গিয়া বেচিয়া আসে। ঘুঁটেও সেখানে বিক্রয় হয়। কেহ কেহ জংশনে যায়।

পাতুর কিন্তু এসব ভরসা নাই। সে জাতিতে বায়েন বা বাদ্যকর অর্থাৎ মুচি। তাহার কিছু চাকরান জমি আছে। গ্রামের সরকারী শিবতলা, কালীতলা এবং পাশের গ্রামে চণ্ডীতলায় নিত্য ঢাক বাজায়। সেই হেতু বৎসরে দেবোত্তর সম্পত্তির কিছু ধান সে পিতামহদের আমল হইতে পাইয়া আসিতেছে। নিজের দুইটা হেলে বলদ আছে—তাই দিয়া সে নিজের জমির সঙ্গে ঐ কঙ্কণার ভদ্রলোকের কিছু জমিও ভাগে চাষ করিয়া থাকে। এ ছাড়া ভাগাড়ের মরা গরু-মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া পূর্বে সে চামড়া-ব্যবসায়ী শেখদের বিক্রয় করিত। আপদে-বিপদে তাহারাই দু'চারি টাকা দাদন-স্বরূপ দিত। কিন্তু সম্প্রতি জমিদার ভাগাড় বন্দোবস্ত করায় এ দিকের আয় তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। নেহাৎ পারিশ্রমিক অর্থাৎ তিন-চার আনা মজুরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা লইয়া চামড়া-ওয়ালার সঙ্গে মনান্তরও হইয়াছে। সে কি আর এ সময় সাহায্য করিবে? যে ভদ্র-লোকের জমি ভাগে চাষ করে, সে কিছু দিলেও দিতে পারে; কিন্তু ভদ্রলোক খৎ না লেখাইয়া কিছু দিবে না। সেও অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। খৎকে পাতুর বড় ভয়। শেষ পর্যন্ত নালিশ করিয়া বাড়ীটা লইয়া বসিলে সে যাইবে কোথায়? পৃথিবীর মধ্যে তাহার সম্পত্তি এই বাড়ীটুকু।

আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে পাতু দ্রুত গতিতে ছাই জড় করিয়া চলিয়াছিল। ছিরু পালের কাছে সেদিন মার খাইয়া তাহার মনে যে উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে উত্তেজনা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে উত্তেজনাবশেই সেদিন অমরকুণ্ডার মাঠে দ্বারকা চৌধুরীর কাছে ছিরু পাল সম্পর্কে আপনার সহোদরা দুর্গার যে কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া নালিশ করিয়াছিল তাই লইয়াই গত সন্ধ্যায় স্বজাতির মধ্যে তাহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা হইয়াছে। স্বজাতিরা কথাটা লইয়া ঘোঁট পাকাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—তুমি তো আপন মুখেই এই কেলেঙ্কারির কথা চৌধুরী মহাশয়ের কাছে বলেছ, জমিদারের কাছারীতে বলেছ। বলেছ কি না?

—হ্যাঁ, বলেছি!

—তবে? তুমি পতিত হবে না কেন, তা বল?

কথাটা পাতুর ইহার পূর্বে ঠিক খেয়াল হয় নাই। সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হন হন করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়া দুর্গার চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে মজলিশের সম্মুখে হাজির করিয়াছিল। ধাক্কা দিয়া দুর্গাকে মাটির উপরে ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—'সে কথা এই হারামজাদী ছেনালকে শুধাও। ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী; আমি ওর সঙ্গে পেথকান্ন।'

দুর্গার পেছনে পেছনে তাহার মা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়াছিল; সকলের

পিছনে পাতুর বিড়ালীর মত বউটাও গুন গুন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল। তারপর সে এক চরম অশ্লীল বাক-বিতণ্ডা। স্বৈরিণী দুর্গা উচ্চকণ্ঠে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ের কুকীর্তির গুপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া পাতুর মুখের ওপর সদম্ভে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল—'ঘর আমার, আমি নিজের রোজগারে করেছি, আমার খুশী যার ওপর হবে— সে-ই আমার বাড়ী আসবে। তোর কি? তাতে তোর কি? তু আমাকে খেতে দিস, না, দিবি? আপন পরিবারকে সামলাস তু।'

পাতু আরও ঘা কতক লাগাইয়া দিয়াছিল। পাতুর বউটি ঘোমটার ভিতর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ননদকে গাল দিতে শুরু করিয়াছিল। মজলিশের উত্তাপের মধ্যে উত্তেজিত কলরব হাতাহাতির সীমানায় বোধ করি গিয়া পৌঁছিয়াছিল—ঠিক এই সময়েই আগুন জ্বলিয়া উঠে।

এই দুই দিনের উত্তেজনা, তাহার উপর এই অগ্নিদাহের ফলে গৃহহীনতার অপরিমেয় দুঃখ তাহাকে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত করিয়া তুলিয়াছিল। সে নীরবেই কাজ করিয়া চলিতেছিল, এমন সময় তাহার বউ-এর ছিঁচকান্না তাহার কানে গেল। সে এতক্ষণে ছাগল-গরুগুলিকে অদূরবর্তী খেজুরগাছগুলার গোড়ায় খোঁটা পুঁতিয়া দিল। তাহার পর হাঁসগুলিকে নিকটবর্তী পুকুরের জলে নামাইয়া দিয়া, স্বামীর কাজে সাহায্য করিতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই গুনগুনানির কান্নার রেশও টানিয়া চলিল। পাতু হিংস্র জানোয়ারের মত দাঁত বাহির করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল—এ্যাই দেখ, মিহি গলায় আর ঢং করে কাঁদিস না বলছি। মেরে হাড় ভেঙে দোব—হ্যাঁ।

ঘর পুড়িয়া যাওয়ার দুঃখে এবং সমস্ত রাত্রি কষ্টভোগের ফলে পাতুর বউয়ের মেজাজও খুব ভাল ছিল না, সে বন্যবিড়ালীর মত হিংস্র ভঙ্গিতে ফ্যাঁস করিয়া উঠিল—ক্যানে, ক্যানে আমার হাড় ভেঙে দিবি শুনি? বলে—'দরবারে হেরে, মাগকে মারে ধরে'—সেই বিত্তান্ত। নিজের ছেনাল বোনকে কিছু বলবার ক্ষোমতা নাই—

পাতুর আর সহ্য হইল না, সে বাঘের মত লাফ দিয়া বউকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান তখন লোপ পাইয়া গিয়াছে।

পাতুর ঘরের সম্মুখেই—একই উঠানের ওপাশে দুর্গা ও তাহার মায়ের ঘর। তাহারাও ঘরের ছাই পরিষ্কার করিতেছিল। বউয়ের কথা শুনিয়া দুর্গা দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পাতুর নির্যাতন-ব্যবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞভাবে ভাইকেই বলিল—হ্যাঁ, বউকে একটুকুন শাসন কর, মাথায় তুলিস না!

সেই মুহূর্তেই জগন ডাক্তারের ধরা-গলা শোনা গেল, সে হাঁ হাঁ করিয়া বলিল—ছাড়, ছাড়, হারামজাদা বায়েন, মরে যাবে যে!

কথা বলিতে বলিতে ডাক্তার আসিয়া পাতুর চুলের মুঠি ধরিয়া আকর্ষণ করিল। পাতু বউকে ছাড়িয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—দেখেন দেখি হারামজাদীর আস্পদ্দা, ঘরে আগুন-টাগুন লাগিয়ে—

—জল আন্, জল। জলদি, হারামজাদা গোঁয়ার—বলিয়া জগন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। বউটা অচেতন হইয়া অসাড়ের মত পড়িয়া আছে। ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া নাড়ী ধরিল।

পাতু এবার শঙ্কিত হইয়া ঝুঁকিয়া বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ এক মুহূর্তে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো, আমি বউকে মেরে ফেললাম গো।

পাতুর মা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাবা, কি করলি রে?

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওরে জল,—শীগগির জল আন্।

দুর্গা ছুটিয়া জল লইয়া আসিল। সে বউয়ের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল; ডাক্তার ছপাছপ জলের ছিটা দিয়া বলিল—কই, মুখে মুখ দিয়ে ফুঁ দে দেখি দুগ্‌গা।

কিন্তু ফুঁ আর দিতে হইল না, বউ আপনিই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—আমাকে আর কারুর মেমতা করতে হবে না রে, সংসারে আমার কেউ লাই রে। গলা তাহার ধরিয়া গিয়াছে, আওয়াজ বাহির হয় না; তবু সে প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিল।

* * * *

জগন ডাক্তার কতগুলি ঘর পুড়িয়াছে গণনা করিয়া নোটবুকে লিখিয়া লইল; কতগুলি মানুষ বিপন্ন তাহাও লিখিয়া লইল। খবরের কাগজে পাঠাইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা আবেদনের খসড়া সে ইতিপূর্বেই করিয়া ফেলিয়াছে: স্থানীয় চার-পাঁচখানা গ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া খড়, বাঁশ, চাল, পুরানো কাপড়, অর্থ সংগ্রহের জন্য একটা সাহায্য সমিতি গঠনের কল্পনাও মনে মনে ছকিয়া ফেলিয়াছে।

এ পাড়ার সকলকে ডাকিয়া ডাক্তার বলিল—সব আপন আপন মনিবের কাছে যা, গিয়ে বল—দুটো করে বাঁশ, দশ গণ্ডা করে খড়, পাঁচ-সাত দিনের মত খোরাকি আমাদের দিতে হবে। আর যা লাগবে—চেয়ে-চিন্তে আমি যোগাড় করছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত দিতে হবে—আমি লিখে রাখছি, ও বেলায় গিয়ে সব টিপসই দিয়ে আসবি।

সকলে চুপ করিয়া রহিল, ম্যাজিস্ট্রেটের নামে তাহারা ভড়কাইয়া গিয়াছে। সাহেব-সুবাকে ইহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলিয়াই জানে, কনস্টেবল দারোগার উপরওয়ালা হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটের নামে তাহাদের আতঙ্ক বহুগুণ বাড়িয়া যায়। তাহার কাছে দরখাস্ত পাঠাইয়া আবার কোন্ ফ্যাসাদ বাধিবে কে জানে!

জগন বলিল—বুঝলি আমার কথা? চুপ করে রইলি যে সব!

এবার সতীশ বাউড়ি বলিল—আজ্ঞে সায়েবের কাছে—

—হ্যাঁ, সায়েবের কাছে—

—শেষে, আবার কি-না কি ফ্যাসাদ হবে মশায়!

—ফ্যাসাদ কিসের রে ? জেলার কর্তা, প্রজার সুখ-দুঃখের ভার তাঁর ওপর। দুঃখের কথা জানালেই তাকে সাহায্য করতে হবে।

—আজ্ঞে, উ মশায়—

—উ আবার কি ?

—আজ্ঞে, কনেস্টবল-দারোগা-থানা-পুলিস টানা-হ্যাঁচড়া-কৈফেত—সে মশায় হাজার হাঙ্গামা !

ডাক্তার এবার ভীষণ চটিয়া গেল। তাহার কথায় প্রতিবাদ করিলে সে চটিয়াই যায়। তাহার উপর এই লোক-হিতৈষণা উপলক্ষ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত পরিচিত হওয়ার একটা প্রবল বাসনা তাহার ছিল। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার অনেক দিনের ; কেবলমাত্র মান-মর্যাদা লাভের জন্যই নয়, দেশের কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার আছে। কিন্তু কঙ্কণার বাবুরাই ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত সভ্য পদগুলি দখল করিয়া রহিয়াছে। ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামগুলিই কঙ্কণার বিভিন্ন বাবুদের জমিদারি। গতবার জগন ঘোষ বোর্ডের ইলেকশনে নামিয়া মাত্র তিনটি ভোট পাইয়াছিল। সরকার তরফ হইতে মনোনীত সভ্যপদগুলিও কঙ্কণার বাবুদের একচেটিয়া। সাহেব-সুবোরা উহাদিগকেই চেনে, কঙ্কণাতেই তাহারা আসে যায়, সভ্য-মনোনয়নের সময়ও এই দরখাস্তগুলিই মঞ্জুর হইয়া যায়। এই কারণে এমন একটি পরহিত-ব্রতের ছুতা লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিবার সঙ্কল্পটি ডাক্তারের বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং পরম কাম্য। সেই সঙ্কল্প পূরণের পথে বাধা পাইয়া ডাক্তার ভীষণ চটিয়া উঠিল। বলিল—তবে মর্ গে তোরা, পচে মর্ গে। হারামজাদা মুখ্যুর দল সব।

—কি, হ'ল কি ডাক্তার—বলিয়া ঠিক এই মুহূর্তটিতেই বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী পিছনের গাছ-পালার আড়াল অতিক্রম করিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী ইহাদের এই আকস্মিক বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। এ তাঁহাদের পূর্বপুরুষের প্রবর্তিত কর্তব্য। সে কর্তব্য আজও তিনি যথাসাধ্য পালন করেন। ব্যবস্থাটার মধ্যে দয়ারই প্রাধান্য, কিন্তু প্রেমও খানিকটা আছে।

ডাক্তার চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—দেখুন না, বেটাদের মুখ্যুমি। বলছি, ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে একটা দরখাস্ত কর্। তা, বলছে কি জানেন ? বলছে,—থানা-পুলিস-দারোগা সায়েব-সুবো—বেজায় হাঙ্গামা।

চৌধুরী বলিল—তা, মিছে বলে নাই—এর জন্যে আর সায়েব-সুবো কেন ভাই ? গাঁয়ের পাঁচজনের কাছ থেকেই তো ওদের কাজ হয়ে যাবে ! ধর, আমি ওদের প্রত্যেককে দু'গণ্ডা ক'রে খড় দোব, পাঁচটা বাঁশ দোব ; এমনি ক'রে—

ডাক্তার আর শুনিল না, হন্ হন্ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—যাস্ বেটারা এর পর আমার কাছে। আরও কিছুদূর আসিয়া আবার দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—কাল রাত্রে কে কোথায় ছিল রে ? কাল রাত্রে ? চৌধুরীর কথায়

সে বেজায় চটিয়া গিয়াছে।

চৌধুরী একটু চিন্তা করিয়া বলিল—তা দরখাস্ত করতেই বা দোষ কি বাবা সতীশ? ডাক্তার যখন বলছে। আর সায়েবের যদি দয়াই হয়—সে তো তোমাদেরই মঙ্গল! তাই বরং তোমরা যেও ডাক্তারের কাছে।

সতীশ বলিল—হাঙ্গামা কিছু হবে না তো চৌধুরী মশায়? আমাদের সেই ভয়টাই বেশী নাগছে কিনা।

—ভয় কি? হাঙ্গামাও কিছু হবে বলে তো মনে নেয় না বাবা! না—না—হাঙ্গামা কিছু হবে না—

অপরাহ্ণে সকলে দল বাঁধিয়া ডাক্তারের কাছে হাজির হইল। আসিল না কেবল পাতু।

ও বেলার ক্রুদ্ধ ডাক্তার এ বেলায় তাহাদের আসিতে দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিয়াছিল; বেশ করিয়া সকলকে দেখিয়া লইয়া বলিল—পাতু কই, পাতু?

সতীশ বলিল—পাতু আজ্ঞে আসবে না। সে মশাই গাঁয়েই থাকবে না বলছে।

—গাঁয়েই থাকবে না? কেন, এত রাগ কেন রে?

—সে মশায় সে-ই জানে। সে আপনার,—উ-পারে জংশনে গিয়ে থাকবে। বলে যেখেনে খাটবে সেখানেই ভাত।

—দেবোত্তরের জমি ভোগ করে যে!

—জমি ছেড়ে দেবে মশায়। বলে ওতে পেটই ভরে না, তা উ-কি হবে। উ-সব বড়নোকের কথা ছেড়ে দেন। পাতু বায়েন আমাদের বড়নোক উকিল ব্যালেস্টারের সামিল।

—আহা তাই হোক। সে বড়নোকই হোক। তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক। দলের পিছনে ছিল দুর্গা, সে ফোঁস করিয়া উঠিল। তারপর বলিল—সে যদি উঠেই যায় গাঁ থেকে, তাতে নোকের কি শুনি? উকিল ব্যালেস্টার—সাত-সতেরো বলা ক্যানে শুনি? সে যদি চলেই যায়—তাতে তো ভাল হবে তোদেরই। ভিক্ষের ভাগ তোদের মোটা হবে।

জগন ডাক্তার ধমক দিয়া উঠিল—থাম, থাম দুর্গা।

—ক্যানে, থামবে ক্যানে? কিসের লেগে? এত কথা কিসের?—বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া আপনার পাড়ার দিকে পথ ধরিল।

—ওই! এই দুর্গা, টিপ-সই দিয়ে যা!

—না—।

—তা হলে কিন্তু সরকারী টাকার কিছুই পাবি না তুই।

এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ মুচকাইয়া দুর্গা বলিল—আমি টিপ-সই দিতে আসি নাই গো। তোমার তালগাছ বিক্রি আছে শুনে এসেছিলাম কিনতে। গতর থাকতে ভিখ মাঙব ক্যানে? গলায় দড়ি! সে আবার মুহূর্তে ঘুরিয়া আপনার মনেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

পথে বাঁশ-জঙ্গলে ঘেরা পাল-পুকুরের কোণে আসিয়া দুর্গা দেখিল বাঁশবনের আড়ালে শ্রীহরি পাল দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গা হাসিয়া দুই হাত জড়ো করিয়া একটা পরিমাণ ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল—টাকা চাই! এই এতগুলি! ঘর করব। বুঝেছ?

শ্রীহরি কথাটা গ্রাহ্য করিল না, প্রশ্ন করিল—কিসের দরখাস্ত হচ্ছে রে?

—ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে। ঘর পুড়ে গিয়েছে—তাই।

শ্রীহরি শুনিবামাত্র অকারণে চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই মুখখানা ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়া চাপা গলায় বলিল,—তাই আমাকে সুবে করে দরখাস্ত করছে বুঝি শালা ডাক্তার? শালাকে—

দুর্গার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে শ্রীহরিকে চেনে। ছিরু পাল ছোট খোকার মত দেয়ালা করিয়া অকারণে চমকিয়া উঠে না। স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছিরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই অপরাধীকে চিনিয়া ফেলিল এবং বলিল,—হ্যাঁ গো, তুমিই যে দিয়েছ আগুন!

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল,—কে বললে দিয়েছি। তুই দেখেছিস? সে আর কথাটা দুর্গার কাছে গোপন করিতে চাহিল না।

দুর্গা বলিল,—ঠাকুর ঘরে কে রে? না, আমি তো কলা খাই নাই। সেই বৃত্তান্ত। হ্যাঁ দেখেছি বৈকি আমি।

—চুপ কর, এতগুলো টাকাই দোব আমি।

দুর্গা আর উত্তর করিল না। ঠোঁট বাঁকাইয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে শ্রীহরির দিকে মুহূর্তের জন্য চাহিয়া দেখিয়া আপন পথে চলিয়া গেল। দন্তহীন মুখে হাসিয়া ছিরু তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আট

দুর্গা বেশ সুশ্রী সুগঠন মেয়ে। তাহার দেহবর্ণ পর্যন্ত গৌর, যাহা তাহাদের স্বজাতির পক্ষে যেমন দুর্লভ তেমনি আকস্মিক। ইহার উপর দুর্গার রূপের মধ্যেও এমন একটা বিস্ময়কর মাদকতা আছে, যাহা সাধারণ মানুষের মনকে মুগ্ধ করে মত্ত করে—দুর্নিবারভাবে কাছে টানে।

পাতু নিজেই দ্বারকা চৌধুরীকে বলিয়াছিল—আমার মা-হারামজাদীকে তো জানেন? হারামজাদীর স্বভাব আর গেল না।

দুর্গার রূপের আকস্মিকতা পাতুর মায়ের সেই স্বভাবের জীবন্ত প্রমাণ।

এই স্বভাব দমনের জন্য কোন কঠোর শাস্তি বা পরিবর্তনের জন্য কোন আদর্শের সংস্কার ইহাদের সমাজে নাই। অল্পস্বল্প উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বামীরা পর্যন্ত দেখিয়াও দেখে না। বিশেষ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যদি উচ্চবর্ণের সচ্ছল অবস্থার পুরুষ জড়িত থাকে তাহা হইলে তো তাহারা বোবা হইয়া যায়। কিন্তু দুর্গার উচ্ছৃঙ্খলতা সে-সীমাকেও অতিক্রম করিয়া

গিয়াছে! সে দুরন্ত স্বেচ্ছাচারিণী ; ঊর্ধ্ব বা অধঃলোকের কোন সীমাকেই অতিক্রম করিতে তাহার দ্বিধা নাই। নিশীথ রাত্রে সে কঙ্কণার জমিদারের প্রমোদভবনে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সে জানে; লোকে বলে দারোগা, হাকিম পর্যন্ত তাহার অপরিচিত নয়। সেদিন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মুখার্জী সাহেবের সহিত সে গভীর রাত্রে পরিচয় করিয়া আসিয়াছে, দফাদার শরীররক্ষীর মত সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। দুর্গা ইহাতে অহঙ্কার বোধ করে, নিজেকে স্বজাতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে; নিজের কলঙ্ক সে গোপন করে না। এ স্বভাবের জন্য লোকে দায়ী করে তাহার মা নাকি কন্যাকে স্বামী পরিত্যাগ করাইয়া এই পথ দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দায়ী তাহার মা নয়। তাহার বিবাহ হইয়াছিল কঙ্কণায়। দুর্গার শাশুড়ী কঙ্কণার এক বাবুর বাড়ীতে ঝাড়ুদারণীর কাজ করিত। একদিন শাশুড়ীর অসুখ করিয়াছিল—দুর্গা গিয়াছিল শাশুড়ীর কাজে। বাবুর বাড়ীর চাকরটা সকল কাজের শেষে তাহাকে ধমক দিয়া বাবুর বাগানবাড়ী ঝাঁট দিবার জন্য একটা নির্জন ঘরে ঢুকাইয়া দিয়াছিল। ঘরটা কিন্তু নির্জন ছিল না। জনের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং গৃহস্বামী বাবু। সন্ত্রস্ত হইয়া দুর্গা ঘোমটা টানিয়া দরজার দিকে ফিরিল, কিন্তু একি ? এ যে বাহির হইতে দরজা কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ঘণ্টাখানেক পরে সে কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা পাঁচ টাকার একখানি নোট লইয়া বাড়ী ফিরিল। আতঙ্কে, অশান্তিতে ও গ্লানিতে এবং সেই সঙ্গে বাবুর দুর্লভ অনুগ্রহ ও এই অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে —পথ ভুল করিয়া, সেই পথে পথেই সে পলাইয়া আসিয়াছিল আপন মায়ের কাছে। কারণ সে বাবুর কাছে শুনিয়াছিল এই যোগসাজশটি তাহার শাশুড়ীর। সব শুনিয়া মায়ের চোখেই বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; একটা উজ্জ্বল আলোকিত পথ সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সেই পথই সে কন্যাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, যাক আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। তাহার পর হইতে দুর্গা সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সেই পথেই আলাপ হইয়াছে ছিরু পালের সঙ্গে।

ছিরু পালের সহিত দুর্গার আলাপ অনেক দিনের; কিন্তু সম্বন্ধটা একান্তভাবে দেওয়া-নেওয়ার সীমানার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ। তাহার প্রতি এতটুকু কোমলতা কোনদিন্ তাহার ছিল না। আজ এই নূতন আবিষ্কারে তাহার প্রতি দুর্গার দারুণ ঘৃণা ও আক্রোশ জন্মিয়া গেল। পাতুর সহিত তাহার যতই বিরোধ থাক, জাতি-জ্ঞাতিদের যতই সে হীন ভাবুক—আজ তাহাদের জন্য সে মমতাই অনুভব করিল। সারাপথ সে কেবলি ভাবিতে লাগিল—ছিরু পালের মদের সঙ্গে গরু-মারা-বিষ মিশাইয়া দিলে কেমন হয়?

—ডাক্তার কি বললে, গাছ বেচবে?—প্রশ্নটা করিল দুর্গার মা। চিন্তা করিতে করিতে দুর্গা কখন যে আসিয়া বাড়ী পৌঁছিয়াছে—খেয়াল ছিল না।

সচকিত হইয়া দুর্গা উত্তর দিল—না।

—বেচবে না ?

—জিজ্ঞাসা করি নাই।

—মরণ! গেলি ক্যানে তবে ঢং করে ?

দুর্গা একবার কেবল তির্যক তীব্র দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল, কথার কোন জবাব দিল না। হয়তো কোন প্রয়োজন বোধ করিল না।

কন্যার দেহবিক্রয়ের অর্থে যে মা বাঁচিয়া থাকে তাহার কাছে এ তীব্র দৃষ্টির শাসন অলঙ্ঘনীয়। দুর্গার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া মা সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া গেল; কিছুক্ষণ পর আবার বলিল —হামদু শ্যাখ পাইকার এসেছিল।

দুর্গা এবারও কথার উত্তর দিল না।

মা আবার বলিল—আবার আসবে, ধর্মরাজতলায় পাড়ার নোকের সঙ্গে কথা কইছে।

দুর্গা এবার বলিল—ক্যানে? কি দরকার তার ? আমি বেচব না গরু ছাগল। দুর্গার একপাল ছাগল আছে, কয়েকটা গাই এবং একটা বলদ-বাছুরও আছে।

হামদু শেখ পাইকার গরু-বাছুর কেনা-বেচা করিয়া থাকে। সুতরাং অগ্নিকাণ্ডের খবর পাইয়া শেখ নিজেই ছুটিয়া এ-পাড়ায় আসিয়াছে। এখন এই পাড়ার অনেকে ছাগল-গরু বেচিবে। এ পাড়ায় সে ছাগল-গরু কেনে, প্রয়োজন হইলে চার আনা আট আনা হইতে দু'চার টাকা পর্যন্ত অগ্রিমও দেয়। পরে ছাগল-গরু লইয়া টাকাটা সুদ সমেত শোধ লইয়া থাকে। আজও সে আসিয়াছে ছাগল-গরু কিনিতে, দু'একজনকে অগ্রিমও দিবে, এত বড় বিপদে এই দারুণ প্রয়োজনের সময় ইহাদের জন্য হামদু কর্জ করিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছে। দুর্গার পালিত বলদ-বাছুরটার জন্য হামদু অনেকদিন হইতে তোষামোদ করিতেছে কিন্তু দুর্গা বেচে নাই। আজ সে আবার আসিয়াছে এবং দুর্গার মাকে গোপনে চার আনা পয়সাও দিয়াছে। সওদা হইলে, পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া আরও চার আনা দিবার প্রতিশ্রুতিও হামদু দিয়াছে। মেয়ের কথাটা মায়ের মোটেই ভাল লাগিল না—খানিকটা ঝাঁজ দিয়া বলিল—বেচবি না তো, ঘর কিসে হবে শুনি ?

—তোর বাবা টাকা দেবে বুঝলি হারামজাদী। আমি আমার শাখাবাঁধা বেচব। দুর্গা দুই চারিখানা সোনার গহনাও গড়াইয়াছে; অত্যন্ত সামান্য অবশ্য কিন্তু তাহাই ইহাদের পক্ষে স্বপ্ন-সাফল্যের কথা।

দুর্গার মা এবার বিস্ফোরক বস্তুর মত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কিন্তু দুর্গা তাহাতে দমিবার মেয়ে নয়, সে জিজ্ঞাসা করিল—ক'আনা নিয়েছিস হামদু শ্যাখের কাছে ? আমি কিছু বুঝি না মনে করেছিস ! ধান-চালের ভাত আমি খাই না, লয় ?

বিস্ফোরণের মুখেই দুর্গার মা প্রচণ্ড বর্ষণে যেন ভিজিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিল, প্যাটের মেয়ে হয়ে তু এত বড় কথাটা আমাকে বললি !

দুর্গা গ্রাহ্য করিল না, বলিল—থাক, ঢের হয়েছে। এখন দাদা কোথায় গেল বলতে পারিস ? বউটাই বা গেল কোথায় ?

মা আপন মনেই বিলাপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, দুর্গার প্রশ্নের উত্তর তাহার মধ্যেই ছিল—গভ্যে আমার আগুন ধরে দিতে হয় রে! নেকনে আমার পাথর মারতে হয় রে! জ্যান্তে আমায় দগ্ধে দগ্ধে মারলে রে! যেমন বেটা তেমনি বিটী রে! বিটী বলছে চোর। আর বেটা হল স্যাশের বার! স্যাশের লোক তালপাতা কেটে আপন আপন ঘর ঢাকলে, আর আমার বেটা গাঁ ছেড়ে চললো। মরুক, মরুক ড্যাকরা - এই অঘ্রাণের শীতে সান্নিপাতিকে মরুক!

এবার অত্যন্ত রূঢ়স্বরে দুর্গা বলিল—বলি, রান্না-বান্না করবি, না, প্যান প্যান করে কাঁদবি? পিণ্ডি গিলতে হবে না?

—না, মা রে; আর পিণ্ডি গিলব না, মা রে; তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দোব রে। দুর্গার মা বিনাইয়া বিনাইয়া জবাব দিল।

দুর্গা মুখে কিছু বলিল না, উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে একগাছা গরুবাঁধা দড়ি লইয়া মায়ের কোলের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, লে, তাই দেগা গলায়, যা! তারপর সে পাড়ার মধ্যে চলিয়া গেল আগুনের সন্ধানে।

হরিজন-পল্লীর মজলিশের স্থান—ওই ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুলগাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুলগাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল; কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্মরাজের আশ্চর্য মহিমা! এমন শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন্ গাছকে কে জীবিত দেখিয়াছে? গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া; মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়, বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন। আশপাশের ছায়াবৃত স্থানটি বারোমাস পরিচ্ছন্নতায় তক্-তক্ করে। পল্লীর প্রত্যেকে প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায়; সেই মাড়ুলীগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া—গোটা স্থানটাই নিকানো হয়। হামদু শেখ সেইখানে বসিয়া পল্লীর লোকজনের সঙ্গে গরু-ছাগল সওদার দরদস্তুর করিতেছিল। পাঁচ-সাতটা ছাগল, দুইটা গরু অদূরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; সেগুলি কেনা হইয়া গিয়াছে।

পুরুষেরা সকলেই গিয়াছে জগন ডাক্তারের ওখানে। হামদুর কারবার চলিতেছে মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা কেহ মাসী, কেহ পিসী, কেহ দিদি, কেহ চাচী, কেহ বা ভাবী! হামদু একটা খাসী লইয়া এক বাউড়ী ভাবীর সঙ্গে দর করিতেছিল—ইহার গায়ে কি আছে, তুই বল ভাবী, সেরেক খালটা আর হাড় ক'খানা। পাঁচ স্যার গোস্তও হবে না ইয়াতে। জোর স্যার তিনেক হবে। ইয়ার দাম পাঁচ সিকা বলেছি—কি অন্যায় বলেছি বল? পাঁচজনা তো রয়েছে—বলুক পাঁচজনায়। আর এই অসময়ে লিবেই বা কে বল? গরজ এখন তুর, না, গরজ পরের, তু বুঝ কেনে!—বলিতে বলিতেই সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—ও দুগ্গা দিদি, শুন্ গো শুন্। তোর বাড়ী পাঁচবার গেলাম। শুন্—শুন্!

দুর্গা আগুনের সন্ধানেই পাড়ায় বাহির হইয়াছিল, সে দূর হইতেই বলিল—বেচব না আমি।

—আরে না বেচিস, শুন্—শুন্। তুকে বেচতে আমি বলি নাই।

—কি বলছ বল ?—দুর্গা আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

—আরে বাপ রে! দিদি যে একেবারে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আলি গো।

—তাই বটে। ফিরে গিয়ে আমাকে রাঁধতে হবে। কি বলছ, বল ?

—ভাল কথাই বলছি ভাই ; বলছি ঘরে টিন দিবি ? সন্ধানে আমার সস্তায় টিন আছে।

—টিন ?

—হ্যাঁ গো! একেবারে নতুন! কলওয়ালারা বেচবে, কিনবি ? একেবারে নিশ্চিন্তি! দেখ্। গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।

দুর্গা কয়েক মুহূর্ত ভাবিল। মনশ্চক্ষে দেখিল তাহার ঘরের উপর টিনের আচ্ছাদন—রোদের ছটায় রূপার পাতের মত ঝকমক করিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—উঁহু! না।

—তুর টাকা না থাকে আমাকে হুয়ার পরে দিস। ছ'মাস, এক বছর পরে দিস।

দুর্গা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু! ও বলদের নামে তুমি হাত ধোও, হামদু ভাই। ও আমি এখন দু'বছর বেচব না।—বলিয়া দেহের একটা দোলা দিয়া চলিয়া গেল।

আগুন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া দুর্গা দেখিল—দড়িগাছটা সেইখানেই পড়িয়া আছে, মা সেটা স্পর্শ করে নাই। উনানে আগুন দিয়া এখন সে পাতুর সঙ্গে বচসায় নিযুক্ত। বড় বড় দুই বোঝা তালপাতা উঠানে ফেলিয়া পাতু হাঁপাইতেছে এবং মায়ের দিকে ক্রুদ্ধ বাঘের মত চাহিয়া আছে। পাতুর বউ কাঠকুঠা কুড়াইয়া জড় করিতেছে, রান্না চড়াইবে।

দুর্গা বিনা ভূমিকায় বলিল,—বউ, রান্না আর করতে হবে না। আমিই রাঁধছি, একসঙ্গেই খাব সব।

পাতু দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল—দেখ দুগ্গা দেখ! মায়ের মুখ দেখ! যা মন চায় তাই বলছে! ভাল হবে না কিন্তুক!

—তা আমিই বা কি করব বল্? এতক্ষণ তো আমার সঙ্গেই লেগেছিল। মা যে! গভ্ভে ধরেছে মাথা কিনেছে! তাড়িয়ে দিতেও নাই, খুন করতেও নাই—মারধোর করলেও পাপ।

—একশো বার। তোর কথার কাটান্ নাই কিন্তুক, ই গাঁয়ে থাকব কি সুখে—তুই বল দেখি ?

—সত্যিই তু উঠে যাবি নাকি ? হ্যাঁ দাদা ? ভিটে ছেড়ে উঠে যাবি ?

পাতু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—তাতেই তো আবার এই অবেলাতে তালপাতা কেটে আনলাম দুগ্গা। নইলে—জংশনে কলে কাম-কাজ, থাকবার ঘর সব ঠিক করে এসেছিলাম দুপুর বেলাতে।—

দু'হাত ছাদাছাদি করিয়া তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পাতু মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল, ওঠ। ওই দেখ্‌ ক'খানা লম্বা বাঁশ রয়েছে আমার, ওই ক'খানা চাপিয়ে তালপাতা দিয়ে ঘরখানা ঢাক। পিতি-পুরুষের ভিটে ছেড়ে কেউ কখনও যায় নাকি? তুই চালে উঠ, আমি আর বউ দু'জনাতে তুলে দিচ্ছি সব।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাতু উঠিল। দুর্গা কাপড়ের আঁচল কোমরে আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধিয়া বলিল, ওই গাঁদা সতীশ। সতীশ বাউড়ী রে! মিনসে জগন ডাক্তারকে বলছে—পাতু রায়েন বড় নোক, ব্যালেস্টার, উকীল! তা আমি বললাম—আহা, তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক! বলে—বড়-নোক; গাঁ ছেড়ে উঠে চলে যাবে। ওরা যায় তো, তোদিগে ভিটে দানপত্তর নিখে দিয়ে যাবে! তোরা ভোগ করবি!

বিড়ালীর মত হৃষ্টপুষ্ট পাতুর বউটা খুব খাটিতে পারে, খাটো পায়ে দ্রুতগতিতে লাটিমের মত পাক দিয়ে ফেরে। সে ইহারই মধ্যে বাঁশগুলাকে টানিয়া আনিয়া উঠানে ফেলিয়াছে।

নয়

গোটা পাড়াটা পোড়াইয়া দিবার অভিপ্রায় শ্রীহরির ছিল না। কিন্তু যখন পুড়িয়া গেলই, তখন তাহাতেও বিশেষ আফসোস তাহার হইল না। পুড়িয়াছে বেশ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে এমন ধারায় বিপর্যয় ঘটিলে তবে ছোটলোকের দল সায়েস্তা থাকে; ক্রমশঃ বেটাদের আস্পর্ধা বাড়িয়া চলিতেছিল। তাহার উপর দেবু ঘোষ ও জগন ডাক্তারের উস্কানিতে তাহারা লাই পাইতেছিল। হাতের মারে কিছু হয় না, ভাতের মার—অর্থাৎ ভাতে বঞ্চিত করিতে পারিলেই মানুষ জব্দ হয়। বাঘ যে বাঘ, তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া অনাহারে রাখিয়া মানুষ তাহাকে পোষ মানায়।

এ সব বিষয়ে তাহার গুরু ছিল দুর্গাপুরের স্বনামধন্য ত্রিপুরা সিং। দুর্গাপুর এখান হইতে ক্রোশ দশেক দূর। শ্রীহরির মাতামহের বাড়ী ওই দুর্গাপুরে। তাহার মাতামহ ত্রিপুরা সিংয়ের চাষবাসের তদ্বিরকারক ছিল। বাল্যকালে শ্রীহরি মাতামহের ওখানে যখন যাইত, তখন সে ত্রিপুরা সিংকে দেখিয়াছে। লম্বাচওড়া দশাশয়ী চেহারা। জাতিতে রাজপুত। প্রথম বয়সে ত্রিপুরা সিং সামান্য ব্যক্তি ছিল। সম্পত্তি ছিল, মাত্র কয়েক বিঘা জমি। সেই জমিতে সে পরিশ্রম করিত অসুরের মত। আর স্থানীয় জমিদারের বাড়ীতে লগীর কাজ করিত। আরও করিত তামাকের ব্যবসা। হাতে লাঠি ও মাথায় তামাকের বোঝা লইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ফেরি করিয়া বেড়াইত; ক্রমে শুরু করে মহাজনী। সেই মহাজনী হইতে ক্রমত বিশিষ্ট জোতদার, অবশেষে তাহার মনিব জমিদারের জমিদারির খানিকটা কিনিয়া ছোটখাটো জমিদার পর্যন্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা সিংয়ের দাড়ি ছিল, বড় শখের দাড়ি, সেই দাড়িতে গালপাট্টা বাঁধিয়া গোঁফে পাক দিতে দিতে সে বলিত, শ্রীহরি নিজের কানে

শুনিয়াছে,—সে ছেলেবেলায়—'এহি গাঁও হমি তিন-তিনবার পুড়াইয়েসি তব না ই. বেটালোক হমাকে আমল দিল !'

হা-হা করিয়া হাসিয়া সিং বলিত—'এক এক দফে ঘর পুড়ল আর বেটা লোক টাকা ধার দিল। যে বেটা প্রথম দফে কায়দা হইল নাই—সে দু' দফে হইল, দু' দফেও যারা আইল না তারা আইল তিন দফের দফে। পাঁওয়ের পর গড়িয়ে পড়ল।' এই সব কথা বলিতে তাহার এতটুকু দ্বিধা হইত না। বলিত—বড় বড় জমিদারের কুষ্ঠী-ঠিকুজী নিয়ে এস, দেখবে সবাই ওই করেছে। আমার ঠাকুরদা ছিল রত্নগড়ের জমিদার বাড়ীর পোষা ডাকাত। বাবুদের ডাকাতি ছিল ব্যবসা। সীতানগরের চাটুজ্জে বাবুরা সেদিন পর্যন্ত ডাকাতির বামাল সামাল দিয়েছে।

সিং নিজে যে কথাগুলি বলে নাই অথবা সিংয়ের মুখ হইতে ইতিহাসের যে অংশ শুনিবার শ্রীহরির সুযোগ-সৌভাগ্য ঘটে নাই, সে অংশ শ্রীহরিকে শুনাইয়াছে তাহার মাতামহ। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ নিজের নাতিকে সে সব অতীতের কথা বলিত। ত্রিপুরা সিংয়ের শক্তির কাহিনী, সে একেবারে রূপকথার মত; —ত্রিপুরা সিংয়ের জমির পাশেই ছিল সে গ্রামের বহুবল্লভ পালের একখানা আউয়ল জমি—মাত্র কাঠাদশেক তাহার পরিমাণ। সিং ওই জমিটুকুর জন্য, একশো টাকা পর্যন্ত দাম দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বহুবল্লভের দুর্মতি ও অতিরিক্ত মায়া। সে কিছুতেই নেয় নাই! শেষ বর্ষার সময় একদিন রাত্রে সিং নিজে একা কোদাল চালাইয়া দুইখানা জমিকে কাটিয়া আকারে-প্রকারে এমন এক অখণ্ড বস্তু করিয়া তুলিল যে, পরদিন বহুবল্লভ নিজেই ধরিতে পারিল না, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কোথায় কোন্‌খানে ছিল তাহার জমির সীমানার চারিটি কোণ। বহুবল্লভ মামলা করিয়াছিল। কিন্তু মামলাতে বহুবল্লভ তো পরাজিত হইলই উপরন্তু কয়েকদিন পর বহুবল্লভের তরুণী-পত্নী ঘাটে জল আনিতে গিয়া আর ফিরিল না। ঘাটের পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে কে বা কাহারা তাহাকে মুখে কাপড় বাঁধিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃদ্ধ চুপি চুপি বলিত—মেয়েটা এখন বুড়ো হয়েছে, সিংজীর বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে। একটা নয়, এমন মেয়ে সিংজীর বাড়ীতে পাঁচ-সাতটা।

ত্রিপুরা সিংয়ের বিষয়বুদ্ধি, দূরদৃষ্টির বিষয়েও শ্রীহরির মাতামহের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। বলিত—সিংজী লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, কি বিষয়বুদ্ধি! জমিদারের বাড়ীতে লগ্দীগিরি করতে করতেই বুঝেছিল—এ বাড়ীর আর প্রতুল নাই। লাটের খাজনা মহল থেকে আসে; কিন্তু খাজনা দাখিলের সময় আর টাকা থাকে না। সিংজী তখন নিজে টাকা ধার দিতে লাগল। যখন যা দরকার হয়েছে, 'না' বলে নাই, দিয়েছে। তারপর সুদে-আসলে ধার হ্যাণ্ডনোট পালটে পালটে শেষ-মেশ যখন নিজের কাছে না থাকলে আট আনা সুদে কর্জ করে এনে এক টাকা সুদে বাবুদিগে দিলে ধরলে টাকার লেগে, তখন বাবুদের জমিদারিই ঘরে ঢুকল। ক্যাশজন্মা লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ! বলিয়া সে তাহার মনিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত।

শ্রীহরির বাপ ছিল কৃতী চাষী। দৈহিক পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পতিত

জমি ভাঙিয়া উৎকৃষ্ট জমি তৈয়ারী করিয়াছিল। শ্রম ও সঞ্চয় করিয়া বাড়ির উঠানটি ধানের মরাইয়ে মরাইয়ে একটি মনোরম শ্রীভবনে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। বাপের মৃত্যুর পর শ্রীহরি যখন এই সম্পদ হাতে পাইল তখন তাহার মনে পড়িল মাতামহের অনামধন্য মনিব ত্রিপুরা সিংকে। মনে মনে তাহাকেই আদর্শ করিয়া সে জীবন-পথে যাত্রা সুরু করিল।

পরিশ্রমে তাহার এতটুকু কার্পণ্য নাই; তাহার বিনিময়ে ফসলও হয় প্রচুর। সেই ফসল সে বাপের মত কেবল বাঁধিয়াই রাখে না, সুদে ধার দেয়। শতকরা পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ পর্যন্ত সুদে ধানের কারবার। একমণ ধান ধার দিলে বৎসরান্তে একমণ দশ সের বা দেড়মণ হইয়া সে ধান ফিরিয়া আসে। অবশ্য এটা শ্রীহরির জুলুম নয়। সুদের এই হারই দেশে-প্রচলিত। প্রচলনের অভ্যাসে খাতকও এ সুদকে অতিরিক্ত মনে করে না বরং অসময়ে অন্ন দেয় বলিয়া মহাজন তাহার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

শ্রীহরিকেও লোকে খাতির করে না এমন নয়; কিন্তু শ্রীহরি তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না। সে অনুভব করে, লোকে ওই মৌখিক শ্রদ্ধার অন্তরালে তাহাকে ঈর্ষা করে, তাহার ধ্বংস কামনা করে। তাই এক এক সময়ে তাহার মনে হয়, সমস্ত গ্রামখানাতেই সে আগুন লাগাইয়া লোকগুলাকে সর্বহারা করিয়া দেয়।

পথ চলিতে চলিতে জগন ডাক্তারের মত এবং অনিরুদ্ধের মত শত্রুর ঘর নজরে আসিলেই বিদ্যুচ্চমকের মত তাহার ওই দুরন্ত অবাধ্য ইচ্ছাটা অন্তরে জাগিয়া উঠে। কিন্তু ত্রিপুরা সিংহের মত দুর্দান্ত সাহস তাহার নাই। সে আমলও যে আর নাই! ত্রিপুরা সিং যে ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে পারিত, আমলের চাপে শ্রীহরিকে সে ইচ্ছা দমন করিতে হয়। তাছাড়া শ্রীহরির অন্যায়-বোধ—কালের পার্থক্যে ত্রিপুরা সিংয়ের চেয়ে কিছু বেশী।

এই অন্যায় বোধ ত্রিপুরা সিংহের চেয়ে তাহার বেশী বলিয়াই সে বারবার আপনার মনেই গত রাত্রের কাণ্ডটার জন্য নানা সাফাই গাহিতেছিল। বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে অকস্মাৎ উঠিল। এই ভস্মীভূত পাড়াটার দিকেই সে চলিল। যাইতে যাইতেও বার কয়েক সে ফিরিল। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। অবশেষে সে নিজের রাখালটার বাড়ীটাকেই একমাত্র গন্তব্যস্থল স্থির করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার বাড়ীর রাখাল, সে তাহার চাকর, এ বিপদে তাহার তল্লাস করা যে অবশ্য কর্তব্য। কার সাধ্য তাহাকে কিছু বলে, আপনার মনেই সে প্রকাশ্যভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাও!

বোধ করি যে তাহাকে কিছু বলিবে—তাহাকে সে পূর্ব হইতেই ধমকটা দিয়া রাখিল। আসলে সে তাহার মনেই ওই অবাধ্য স্মৃতি উদ্ভূত সঙ্কোচকে একটা ধমক দিল।

রাখালটা মনিবকে যমের মত ভয় করে। ছিরু আসিয়া দাঁড়াইতেই সে ভাবিল আজিকার গরহাজিরের জন্যই পাল তাহার ঘাড় ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। ছেলেটা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ঘর পুড়ে গেইছে মশাই—তাতেই—

পুড়িয়া যাওয়ার পর এই গরীব পাড়াটার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া শ্রীহরি মনে মনে খানিকটা লজ্জাবোধ না করিয়া পারিল না। সে সস্নেহে ছেলেটাকে বলিল—তা কাঁদিস

কেনে? দৈবের ওপর তো হাত নাই। কি করবি বল? কেউ তো আর লাগিয়ে দেয় নাই।

রাখালটার বাপ বলিল,—তা কে আর দেবে মশাই?—কেনেই বা দেবে? আমরা কার কি করেছি বলেন যে ঘরে আগুন দেবে!

শ্রীহরি চুপ করিয়াই পোড়া ঘরগুলার দিকেই চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের তলার মাটি যেন সরিয়া যাইতেছে।

রাখালটার বাপ আবার বলিল,—ছোটলোকদের কাণ্ড, শুকনো পাতাতে আগুন ধরে গেইছে আর কি! আর তা ছাড়া মশাই, বিধেতাই আমাদের কপালে আগুন লাগিয়ে রেখেছে।

শুষ্ক কণ্ঠে শ্রীহরি বলিল, এক কাজ কর। যা খড় লাগে আমার বাড়ী থেকে নিয়ে আয়। বাঁশ কাঠ যা লাগে নিবি আমার কাছে; ঘর তুলে ফেল।—তারপর রাখালটার দিকে চাহিয়া বলিল—বাড়ীতে গিয়ে চাল নিয়ে আয় দশ সের। কাল বরং ধান নিবি, বুঝলি!

রাখালটার বাপ এবার শ্রীহরির পায়ে একরকম গড়াইয়া পড়িল।

ইহারই মধ্যে আরও জন দুয়েক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; একজন হাত জোড় করিয়া বলিল —আমাদিগে যদি কিছু করে ধান দিতেন ঘোষ মশায়।

—ধান?

—আজ্ঞে, তা না হলে তো উপোস করে মরতে হবে মশায়।

—আচ্ছা, পাঁচ সের ক'রে চাল আজ ঘর-পিছু আমি দেব। সে আর শোধ দিতে হবে না। আর ধানও অল্প অল্প দোব কাল! কাল বার আছে ধানের! আর—

—আজ্ঞে—

—দশগণ্ডা করে খড়ও আমি দোব প্রত্যেককে। বলে দিস পাড়াতে।

—জয় হবে মশায়, আপনার জয়-জয়কার হবে। ধনে পুতে লক্ষ্মীলাভ হবে আপনার।

শ্রীহরির দাক্ষিণ্যে অভিভূত হইয়া লোকটা ছুটিয়া চলিয়া গেল পাড়ার ভিতর। সংবাদটা সে প্রত্যেকের ঘরে প্রচার করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলি যেমন শ্রীহরির দাক্ষিণ্যে অভিভূত হইয়া গেল শ্রীহরিও তেমনি অভিভূত হইয়া গেল ইহাদের কৃতজ্ঞতার সরল অকপট গদগদ প্রকাশে। এক মুহূর্তে ও সামান্য দানের ভারে মানুষগুলি পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া শ্রীহরির মনে হইল—যে-অপরাধ সে গত রাত্রে করিয়াছে, সে অপরাধ যেন উহাদেরই ওই কৃতজ্ঞতায় সজল চোখের অশ্রু-প্রবাহে উহারা ধুইয়া মুছিয়া দিতে চাহিতেছে। ভাবাবেগে শ্রীহরিরও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল,—যাস, সব যাস। চাল-খড়-ধান নিয়ে আসবি।

অনেকখানি মধু পবিত্র চিত্ত লইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে অনেক কল্পনা করিল।

গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে লোকের কষ্টের আর অবধি থাকে না। পানীয় জলের জন্য মেয়েদের ওই নদীর ঘাট পর্যন্ত যাইতে হয়। যাহারা ইজ্জতের জন্য যায় না তাহারা খায় পচা পুকুরের দুর্গন্ধময় কাদা-ঘোলা জল। এবার একটা কুয়া সে কাটাইয়া দিবে।

গ্রামের পাঠশালার আসবাবের জন্য সেবার লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাতে পাঁচটা টাকাও সংগৃহীত হয় নাই; সে পঞ্চাশ টাকা পাঠশালার আসবাবের জন্য দান করিবে।

আরও অনেক কিছু। গ্রামের পথটা কাঁকর ঢালিয়া পাকা করিয়া দিবে। চণ্ডীমণ্ডপটার মাটির মেঝেটা বাঁধাইয়া দিবে; সিমেন্ট-করা মেঝের উপর খুদিয়া লিখিয়া দিবে—শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীহরি ঘোষ। যেমন কঙ্কনার চণ্ডীতলায় মার্বেল-বাঁধানো বারান্দার মেঝের উপর সাদা মার্বেলের মধ্যে কালো হরফে লেখা আছে কঙ্কণার বাবুদের নাম।

সে কল্পনা করে, অতঃপর গ্রামের লোক সসম্ভ্রমে সকৃতজ্ঞ চিত্তে মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া নমস্কার করিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

আজ নূতন একটা অভিজ্ঞতা লাভের ফলে শ্রীহরির অন্তরে এক নূতন মন কোন্ অজ্ঞাত-নিক্ষিপ্ত বীজের অঙ্কুর-শীর্ষের মত মাথা ঠেলিয়া জাগিয়া উঠিল। কল্পনা করিতে করিতে সে গ্রামের মাঠে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আসিয়াই দেখিল, বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে ওই দরিদ্রের দলটি নিতান্ত অপরাধীর মত। আর তাহার মা নির্মম কটু ভাষায় গালিগালাজ করিতেছে। শুধু ওই হতভাগ্যদিগকেই নয়—শ্রীহরির উপরেও গালিগালাজ বর্ষণ করিতে মায়ের কার্পণ্য ছিল না। ক্রুদ্ধচিত্তেই সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। মা তাহাকে দেখিয়া দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিয়া গালিগালাজ আরম্ভ করিল—'ওরে ও হতচ্ছাড়া বাঁশবুকো, বলি দাতাকর্ণ-সেন হলি কবে থেকে? ওই যে পঙ্গপাল এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে তুই ডেকে এনেছিস—'

শ্রীহরির নগ্ন-প্রকৃতির একটা অতি নিষ্ঠুর ভঙ্গি আছে; তখন সে চীৎকার করে না, নীরবে ভয়াবহ মুখভঙ্গি লইয়া অতি স্থিরভাবে মানুষকে বা পশুকে নির্যাতন করে—যেমন শীতের স্বচ্ছ জল মানুষের হাত-পা হিম করিয়া জমাইয়া দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে! সেই ভঙ্গীতে সে অগ্রসর হইয়া আসিতেই তাহার মা দ্রুতপদে খিড়কির দরজা দিয়া পলাইয়া গেল।

শ্রীহরি নিজেই নীরবে প্রত্যেককে চাল দিয়া বলিল—খড় আর ধান কাল নিবি সব। সর্বশেষে বলিল · মায়ের কথায় তোরা কিছু মনে করিস না যেন, বুঝলি?

তাহার পায়ের ধুলা লইয়া একজন বলিল,—আজ্ঞে দেখেন দেখি, তাই কি পারি?—তারপর রহস্য করিয়া ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়েই সাধ্যমত বুদ্ধি খরচ করিয়া সে বলিল,—মা আমাদের ক্ষ্যাপা মা গো! রাগলে আর রক্ষে নাই।

শ্রীহরি উত্তর দিল না। সে আপন মনেই চিন্তা করিতেছিল ওই মা হারামজাদীই কিছু করিতে দিবে না। তাহার আজিকার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে এত টাকা খরচ করিলে এই হারামজাদী নিশ্চয়ই একটা বীভৎস কাণ্ড করিয়া তুলিবে। আজ পর্যন্ত বড় কাঠের সিন্দুকটার চাবী ওই বেটী বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। টাকা বাহির করিতে

গেলেই বিপদ বাধিবে। টাকার জন্ত অবশ্য কোন ভাবনা নাই ; কয়েকটা বড় খাতকের কাছে সুদ আদায় করিলেই ওই কাজ কয়টা হইয়া যাইবে।

হ্যাঁ, তাই সে করিবে।

আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি যেন বটবৃক্ষের অতিক্ষুদ্র একটি বীজকণার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সেই এক কণার মধ্যেই লুকাইয়া আছে এক বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার প্রারম্ভেই শ্রীহরি যেন তাহার এতকালের বদ্ধ-অন্ধকার দুর্গন্ধময় জীবন-সৌধের প্রতিটি কক্ষে —দেহের প্রতিটি গ্রন্থিতে—প্রতিটি সন্ধিতে এক বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করিতেছে। সৌধখানি বোধ হয় ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে।

দশ

ভূপাল চৌকীদার ইউনিয়ন বোর্ডের মোহর-দেওয়া একখানা নোটিশ হাতে করিয়া চলিয়াছিল, আগে আগে ডুগ-ডুগ শব্দে ঢোল বাজাইয়া চলিতেছিল পাতু।

'একসপ্তাহের মধ্যে আষাঢ় আশ্বিন—দুই কিস্তির বাকী ট্যাক্স আদায় না দিলে জরিমানা সমেত দেড়গুণ ট্যাক্স অস্থাবর ক্রোক করিয়া আদায় করা হইবেক।'

জগন ডাক্তার একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

—কি ? কি ? 'কি করা হইবেক' ?

ভূপাল সভয়ে হাতের নোটিশখানি আগাইয়া দিয়া বলিল—আজ্ঞে, এই দেখেন কেনে।

জগন কঠিন দৃষ্টিতে ভূপালের দিকে চাহিয়া বলিল,—সরকারী উর্দি গায়ে দিয়ে মাথা নোয়াতেও ভুলে গেলি যে।

অপ্রস্তুত হইয়া ভূপাল তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পায়ের ধুলা কপালে মুখে লইয়া বলিল, আজ্ঞে দেখেন দেখি, তাই ভোলে! আপনকারাই আমাদের মা বাপ!

পাতু বলিল—নিশ্চয়!

জগন নোটিশখানা দেখিয়া একেবার গর্জন করিয়া উঠিল—এয়ার্কি নাকি ? এ সব কি পৈতৃক জমিদারী পেয়েছে সব! লোকের মাঠের ধন মাঠে রইল, বাবুরা একেবারে অস্থাবরের নোটিশ বার করে দিলেন! মানুষকে উৎখাত করে ট্যাক্স আদায় করতে বলেছে গবর্ণমেন্ট ? আজই দরখাস্ত করব আমি।

ভূপাল হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা চাকর, আমাদিগে যেমন বলেছে তেমনি—

—তোদের দোষ কি ? তোরা কি করবি ? তোরা ঢোল দিয়ে যা।

পাতু ঢোলটায় গোটাকয়েক কাঠির আঘাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, 'নবান্ন' হবে বাইশে তারিখ।

—নবান্ন ? বাইশে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর সব লোককে বল গিয়ে। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি নবান্ন করব—আমার যে দিন খুশি।

পাতু আর কোন উত্তর না দিয়া পথে অগ্রসর হইল। ডাক্তার ক্রুদ্ধ গাম্ভীর্যে থমথমে মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—এই পেতো শোন!

—আজ্ঞে! পাতু ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

জগন বলিল—চলে যাচ্ছিস যে?

পাতু আবার বলিল—আজ্ঞে?

ডাক্তার এবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—সেদিন দরখাস্তে টিপসই দিতে এলি না যে বড়? খুব বড়লোক হয়েছিস, না? শহরে গিয়ে বাড়ী করবি, এ গাঁয়েই আর থাকবি না শুনছি!

বিরক্তিতে পাতুর ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া দরখাস্তখানা বাহির করিয়া আনিয়া সস্নেহে শাসনের সুরে বলিল—দে, টিপছাপ দে! তোর জন্যেই আমি ছাড়ি নাই দরখাস্ত।

পাতু এবার বিনা আপত্তিতেই টিপছাপ দিল! সেদিন যে সে আসে নাই, সমস্ত দিনটাই গ্রামত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া জংশন শহর পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে—সে সমস্তই সাময়িক এতটা উত্তেজনার বশে। আজও যে সে মুহূর্ত পূর্বে ডাক্তারের কথায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছে—সেও ডাক্তারের কথার কটুত্বের জন্য। নতুবা সাহায্য বা ভিক্ষা লইতে তাহার আপত্তি নাই। গভীর কৃতজ্ঞতার সহিতই সে টিপছাপ দিল। টিপছাপ দিয়া বুড়া আঙুলের কালি মাথায় মুছিতে মুছিতে কৃতজ্ঞভাবে আবার হাসিয়া বলিল,—ডাক্তারবাবুর মত গরীবগুর্বোর উপকার কেউ করে না।

ডাক্তারের জুতার ধুলা আঙুলের ডগায় লইয়া তাহা ঠোঁটে ও মাথায় বুলাইয়া লইল। ভূপাল চৌকিদারও তাহার অনুসরণ করিল।

ডাক্তার ইহার মধ্যে কিছু চিন্তা করিতেছিল, চিন্তা-শেষে বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—দাঁড়া! আরও একটা টিপছাপ দিয়ে যা।

—আজ্ঞে? পাতু সভয়ে প্রশ্ন করিল। অর্থাৎ, আবার কেন? টিপছাপকে ইহাদের বড় ভয়।

—এই ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে একটা দরখাস্ত দোব! তোদের ঘর পুড়ে গিয়েছে, চাষীদের ধান এখনও মাঠে, এই অসময় অস্থাবরের নোটিশ, এ কি মগের মুলুক নাকি?

এবার ভয়ে পাতুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইউনিয়ন বোর্ডের হাকিমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত! সে ভূপাল চৌকিদারের দিকে চাহিল—ভূপালও বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার তাগিদ দিয়া বলিল—দে, টিপছাপ দে!

—আজ্ঞে না মশায়। উ আমি দিতে লারব! পাতু এবার হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে

আরম্ভ করিল। পিছনে পিছনে ভূপাল পলাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভূপাল ভাবিতেছিল—খবরটা আবার 'পেসিডেন' বাবুকে দিয়া দিতে হইবে। নহিলে হয়ত সন্দেহ আসিবে—তাহারও ইহার সহিত যোগসাজশ আছে।

ডাক্তার ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়নপর পাতু ও ভূপালের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে ফাটিয়া পড়িল—হারামজাদার জাত, তোদের উপকার যে করে সে গাধা! বলিয়াই সে দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

—ছিঁড়ো না, ডাক্তার ছিঁডো না।—বাধা দিল পাঠশালার পণ্ডিত দেবু ঘোষ। সে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবই দেখিয়াছিল। এ-সব ব্যাপারে তাহারও আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

দেবু ঘোষ একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ। এ গ্রামের পাঁচজনের একজন হইয়াও সে যেন সকল হইতে একটু পৃথক। তাহার মতামতগুলিও সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক। আপনাদের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য কাহারও সাহায্যভিক্ষা করিতে চায় না। অনিরুদ্ধকে, ছিরুকে শাসন করিতে জমিদারের দ্বারস্থ হইতে সে নারাজ। কিন্তু পঞ্চায়েতী মজলিসের আয়োজনে সে-ই প্রধান উদ্যোক্তা! তবু আজ সে জগন ডাক্তারকে দরখাস্ত ছিঁড়িতে বাধা দিল।

ডাক্তার দেবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ছিঁড়তে বারণ করছ? ওই বেটাদের উপকার করতে বলছ। দেখলে তো সব!

দেবু হাসিয়া বলিল—তা দেখলাম! ওদের ওপর রাগ করে কি করবে বল! দাও, তোমার ট্যাক্সের দরখাস্ত, আমি সই করছি, আর দশজনার সইও যোগাড় করে দিচ্ছি।

ডাক্তার একটা বিড়ি ও দেশলাই পণ্ডিতকে দিয়া বলিল—ব'স।—তারপর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মিনু, দু'কাপ চা।

মিনু ডাক্তারের মেয়ে।

ডাক্তার আবার আরম্ভ করিল—লোকে ভাবে কি জান, পণ্ডিত? ভাবে—এ সবের মধ্যে আমার বুঝি কোন স্বার্থ আছে। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার হলে বাঁচবে সবাই, কিন্তু রাজা হয়ে যাব আমি!

দেবু বিড়ি ধরাইয়া দেশলাইটা ডাক্তারের হাতে দিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—তা স্বার্থ আছে বৈ কি ডাক্তার।

—স্বার্থ? ডাক্তার রুক্ষ অথচ বিস্মিত দৃষ্টিতে পণ্ডিতের দিকে চাহিল।

পণ্ডিত হাতের বিড়িটার আগুনের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতেই সহজভাবেই বলিল—স্বার্থ আছে বৈ কি! দশজনের কাছে গণ্যমান্য হবে তুমি, দু'দিন বাদে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারও হতে পার। স্বার্থ নেই? আমার মনে হয় সংসারে স্বার্থ-চিন্তা ছাড়া মানুষ টিঁকতেই পারে না।

ডাক্তারের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল—ওটাও যদি স্বার্থ হয়, তবে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের ভগবানের তপস্যা করার মধ্যেও স্বার্থ আছে হে! তাহ'লে বশিষ্ঠ-বুদ্ধদেবও স্বার্থপর!

—স্বার্থ-কথাকে ছোট করে না দেখলে ও কথা নিশ্চয় সত্য। পরমার্থও তো অর্থ ছাড়া নয়।—দেবু তেমনি হাসিয়াই বলিল।

ডাক্তার বলিল,—ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার আমি হতে চাই, আলবৎ হতে চাই। সে হতে চাই দশজনের সেবা করবার জন্যে। পরলোক-ফরলোক জপতপ ও-সবে আমার বিশ্বাস নাই। ওই ছিরু পাল—চুরি করবে—ব্যাভিচার করবে, আর ঘরে বসে জপতপ করবে—ঘটা করে কালীপুজো, অন্নপূর্ণা পুজো করবে, ও-রকম ধর্মের মাথায় মারি আমি পাঁচঝাড়ু।

অতঃপর ডাক্তার আরম্ভ করিল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা। মনুষ্য-জীবন ধন্য করিতে কে না চায় এ সংসারে? কে মানুষের সেবা করিয়া ধন্য হইতে চায়, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

বক্তৃতার উত্তরে দেবু ঘোষও বক্তৃতা দিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা দিল না, কেবল বলিল—দশজনের ভাল করতে চাও, খুব ভাল কথা, ডাক্তার। কিন্তু গাঁয়ের লোককে কেন ছোট ভাব তুমি? আজ বললে—গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নবান্ন করবে না তুমি! কদিন আগে দু-দুটো মজলিস হল গাঁয়ে তুমি তো গেলেই না, উলটে কামারকে তুমি উস্কে দিলে।

—কখনও না। গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে আমি কাউকে উস্কে দিই নাই। অনিরুদ্ধের জমির ধান কেটে নিলে—আমি তাকে ছিরের নামে ডাইরি করতে বলেছি এই পর্যন্ত!

—বেশ কথা! মজলিসে গেলে না কেন?

—মজলিস? যে মজলিসে ছিরু পাল টাকার জোরে মাতব্বর—সেখানে আমি যাই না।

—তার মাতব্বরি ভেঙে দাও তুমি। মজলিসে গিয়ে আপনার জোরে ভাঙ। ঘরে বসে থাকলে তার মাতব্বরি আরও বেড়ে যাবে!

জগন এবার চুপ করিয়া রহিল।

—ভাল। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নবান্ন করবে না কেন তুমি?

এবার ডাক্তার কাবু হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—করব-না, এমন প্রতিজ্ঞা আমি করি নাই।

দেবু ঘোষ এবার খুশী হইয়া বলিল—হাঁ! 'দশে মিলে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ।' যা করবে, দশজনে এক হয়ে কর। দেখ না, তিনদিনে সব ঢিট হয়ে যাবে। অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ ছুতোর, তারা নাপিত, পেতো মুচি—এমন কি তোমার ছিরেকেও নাকে কানে খৎ দিয়েই ছাড়ব। তা না ক'রে হাজারখানা দরখাস্ত ক'রেও কিছু হবে না ডাক্তার। সংসারে একলা থাকে বাঘ সিংহ। মানুষে নয়।

ডাক্তার বলিল—বেশ। কোনও আপত্তি নাই আমার। তবে এক হতে হলে সব কাজেই এক হতে হবে। গাঁয়ের গরজের সময় জগন ডাক্তার আর দেবু পণ্ডিত; আর ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটের সময় কঙ্কণার বাবুরা, ছিরে পাল—

বাধা দিয়া দেবু ঘোষ বলিল—এবার তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুমি আর আমি দাঁড়াব। তা হলে হবে তো?

দেবনাথ ঘোষ—দেবু পণ্ডিত একটু স্বতন্ত্র মানুষ। আপনার বুদ্ধি-বিদ্যার উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাহার এই বুদ্ধি সম্বন্ধে চেতনার সহিত খানিকটা কল্পনা—খানিকটা স্বার্থপরতা আছে। বিদ্যা অবশ্য বেশী নয়, কিন্তু দেবু সেইটুকুকেই লইয়া অহরহ চর্চা করে। খুঁজিয়া পাতিয়া বই যোগাড় করিয়া পড়ে; খবরের কাগজের খবরগুলো রাখে; এ ছাড়াও মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশ্বনাথ এম-এ ক্লাসের ছাত্র, সে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাহাকে সে অনেক বই আনিয়া দেয়। এবং মুখেমুখেও অনেক কিছু সে তাহার কাছে শিখিয়াছে। এই সব কারণে সে বেশ একটু অহঙ্কৃতও বটে। এ গ্রামে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি কাহাকেও দেখিতে পায় না। জগন ডাক্তার পর্যন্ত তাহার তুলনায় কম শিক্ষিত। কঙ্কণার হাইস্কুলে জগন ফোর্থক্লাস পর্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়াছে; বাপের কাছে ডাক্তারি শিখিয়াছে। দেবু পড়িয়াছে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত। পড়াশুনাতে সে ভালই ছিল, পড়িলে সে যে ম্যাট্রিক পাস করিত, ভাল-ভাবেই পাস করিত এ-কথা আজও কঙ্কণার মাস্টারেরা স্বীকার করে। দেবু নিজে জানে—পড়িতে পাইলেই সে বৃত্তি লইয়া পাস করিত। তাহার পর আই-এ, বি-এ—দেবনাথের সে কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারিত সে। অন্তত তাই মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য।

হঠাৎ তাহার বাপ মারা গেল! চাষবাস, সংসার দেখিবার দ্বিতীয় পুরুষ বাড়ীতে ছিল না। তাহার মা অন্য গ্রাম্য মেয়েদের মত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া পাঁচজনের সঙ্গে পুরুষের মত ঝগড়া করিয়া ফিরিবে—এও দেবুর কল্পনায় অসহ্য মনে হইয়াছিল। এবং বাবা যখন মারা গেল তখন সংসার একেবারে ভরাডুবির মুখে। এক পয়সার সঞ্চয় নাই, ধান নাই। ধারও কিছু হইয়াছে। অগত্যা সে পড়াশুনা ছাড়িয়া চাষ ও সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু সন্তুষ্টচিত্তে নয়। একটা অসন্তোষ অহরহই তাহার জাগিয়া থাকিত, তাহা আজও আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে, স্বায়ত্তশাসন আইনে গ্রাম্য পাঠশালার ভার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড গ্রহণ করিবার পর হইতে চাষবাস ছাড়িয়া ঐ স্কুলে পণ্ডিত হইয়া বসিয়াছে। বেতন মাসে বারো টাকা, চাষবাস ভাগেঠিকায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। লোকে এইবার তাহাকে বলিল—পণ্ডিত; খানিকটা সম্মানও করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার পরিতৃপ্তি হইল না।

তাহার ধারণা, গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইল সে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্মানই তাহার প্রাপ্য! অরণ্যানীর শিশু-শাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপরে মাথা তুলিতে চায়, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা অখণ্ড আলোক ভোগের জন্যেই ঊর্ধ্বলোকে উঠিতে চায় না; নিচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহারই সঙ্গে আলোক-রাজ্যের অভিযানে আকাশলোকে চলুক—এই আকাঙ্ক্ষা! ছিরু পালের অর্থসম্পদ এবং বর্বর পশুত্বকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। জগনের নকল দেশপ্রীতি ও আভিজাত্যের আস্ফালন তাহার নিকট যেমন হাস্যকর তেমনি অসহ্য! বংশাভিজাত্যের দাবিতে হরিশ মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডল-ব্যক্তিকেও সে স্বীকার করিতে

চায় না। ভবেশ ও মুকুন্দ বয়সের প্রাচীনত্ব লইয়া বিজ্ঞতার ভানে কথা কয়,—তাহাও সে সহ্য করিতে পারে না।

দেবুর উপেক্ষা অবশ্য অহেতুক নয় অথবা একমাত্র আত্মপ্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত নয়। আপনার গ্রামখানিকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সে যে চোখের উপর গ্রামখানিকে দিন দিন অবনতির পথে গড়াইয়া যাইতে দেখিতেছে! অর্থবলে এবং দৈহিক শক্তিতে ছিরু যথেচ্ছাচার করিতেছে। শুধু ছিরু কেন—গ্রামের কেহই কাহাকেও মানে না, সামাজিক আচার-ব্যবহার সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানুষ মরিলে সহজে মড়া বাহির হয় না, সামাজিক ভোজনে—একই পঙ্‌ক্তিতে ধনী-দরিদ্রের ভেদ দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি কামার ছুতার বায়েন কাজ ছাড়িল; দাই, নাপিত চিরকেলে বিধান লঙ্ঘনে উদ্যত হইল। যাহার মাসে পাঁচ টাকা আয় সে দশ টাকা খরচ করিয়া বাবু সাজিয়া বসিয়াছে। ঋণের দায়ে জমি বিকাইয়া যাইতেছে, ঘটি-বাটি বেচিতেছে,—তবু জামা চাই, শৌখিন-পাড় কাপড় চাই, ঘরে ঘরে হারিকেন লণ্ঠন চাই। ছোকরাদের পকেটে বিড়ি-দেশলাই ঢুকিয়াছে, জংশন-শহরে গেলেই সবাই দু-এক পয়সার সিগারেট না কিনিয়া ছাড়ে না,—তামাক-চকমকি একেবারে বাতিল হইয়া গেল। এ-সবের প্রতিকার করিবার সাধ্য যাহাদের নাই, তাহারা প্রধান হইতে চায় কেন? কিসের জোরে? এ প্রশ্ন যাহাদের অকারণে মাথা ধরাইয়া তোলে দেবু পণ্ডিত সেই তাহাদেরই একজন।

দেবু পণ্ডিত পাঠশালার ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে এই সব ভাবনার অনেক কিছু ভাবে। গ্রামের সকল জন হইতে নিজেকে কতকটা পৃথক রাখিয়া—আপনার চিন্তাকে বিকীর্ণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বকেও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া যায়—অক্লান্তভাবে সামান্য সুযোগও সে কখনও ছাড়িয়া দেয় না।

তাই জগন ডাক্তার যখন ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—তখন ডাক্তারের আভিজাত্যের আস্ফালনের প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও তাহার সহিত মিলিত হইতে সে দ্বিধাবোধ করিল না।

দেবনাথ ও জগন ডাক্তার দুইজনে মিলিত উৎসাহে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। দরখাস্ত পাঠানো হইয়া গিয়াছে। নবান্নের দিনে দুইজনে পরামর্শ করিয়া একটা উৎসবেরও ব্যবস্থা করিল। সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে মনসার ভাসান গান হইবে। ভাসান গানের দলকে এখানে 'বেহুলার দল' বলিয়া থাকে। বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে; সেই দলের গান হইবে। চাঁদা করিয়া চাল তুলিয়া উহাদের মদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহাতেই দলের লোকের মহা আনন্দ। এই ভাসান গানের ব্যবস্থার মধ্যে আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। নবান্নের দিন ছিরু পালের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে; সেই উপলক্ষে সন্ধ্যায় গ্রামের সমস্ত লোকই গিয়া জমায়েত হয় ছিরুর বাড়ীতে। তামাক খায়, গালগল্প করে, খোল বাজাইয়া অল্প অল্প কীর্তন গানও হয়। এবার আবার ছিরু নাকি বিশেষ সমারোহের আয়োজন করিয়াছে। রাত্রে লোকজন খাওয়াইবে এবং একদল কৃষ্ণযাত্রাও নাকি বায়না

করিয়াছে। শ্রীহরির মায়ের নিত্যকার গালিগালাজ ও আস্ফালনের মধ্যে হইতে অন্তত ওই দুইটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক যাহাতে ছিরুর বাড়ী না যায়—জগন ডাক্তার এবং দেবনাথ তাহার জন্য ব্যবস্থাগুলি করিয়াছে। গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় জগন ও দেবনাথের এইটি প্রথম আয়োজন বা ভূমিকা।

চাষীর গ্রামে নবান্নের সমারোহ কিছু বেশী, এইটিই সত্যকারের সার্বজনীন উৎসব। চাষের প্রধান শস্য হৈমন্তী ধান মাঠে পাকিয়া উঠিয়াছে; এইবার সেই ধান কাটিয়া ঘরে তোলা হইবে। কার্তিক সংক্রান্তির দিনে কল্যাণ করিয়া আড়াই মুঠা ধান কাটিয়া আনিয়া লক্ষ্মী পূজা হইয়া গিয়াছে। এইবার আজ লঘু ধানের চাল হইতে নানা উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের ভোগ দেওয়া হইবে। তাহার সঙ্গে ঘরে ঘরে হইবে ধান্যলক্ষ্মীর পূজা। ছেলেমেয়েরা সকালবেলাতেই সব স্নান সারিয়া ফেলিয়াছে। অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহে শীতও পড়িয়াছে, তবুও নবান্নের উৎসাহে ছেলেরা পুকুরে জল ঘোলা করিয়া তবে উঠিয়াছে। তাহারা সব এখনও চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় রোদে দাঁড়াইয়া খোঁড়া পুরোহিতের কঙ্কালসার ঘোড়াটাকে লইয়া কলরব করিতেছে। বুড়ো শিব এবং ভাঙা কালীর মন্দিরে ভোগ না হইলে নবান্ন আরম্ভ হইবে না। কুমারী কিশোরী মেয়েরা ভিজা চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া নতুন বাটিতে নতুন ধানের আতপ চাল, চিনি, মণ্ডা, দুধ, কলা, আখের টিকলি, আদাকুচি, মূলাকুচি সাজাইয়া দক্ষিণা সহ মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া দিতেছে। অধিকাংশই চার পয়সা, কেহ দু পয়সা, কেহ এক পয়সা, দু-চার জনে দিয়াছে দু আনা। যাহাদের বাড়ীতে কুমারী মেয়ে নাই, তাহাদের ভোগসামগ্রী প্রবীণারা লইয়া আসিতেছে। গ্রামের পুরোহিত—খোঁড়া চক্রবর্তী বসিয়া সামগ্রীগুলি লইয়া দেবতার সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণাগুলি ট্যাঁকে পুরিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ধমক দিতেছে ওই ছেলেগুলিকে—এ্যাই এ্যাই! এ্যাই ছেলেগুলো, এ ত ভারী বদ! যাস না কাছে, চাঁট ছোড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে।

অর্থাৎ ওই ঘোড়াটা। ঘোড়াটা পিছনের পা ছুঁড়িলে প্লীহা ফাটিয়া যাইবে। খোঁড়া চক্রবর্তী গ্রাম-গ্রামান্তরে ওই ঘোড়ার সওয়ার হইয়া যজমান সাধিয়া ফেরে। ফিরিবার সময় ঘোড়ার উপর থাকে সে—তাহার মাথায় থাকে চাল-কলা ইত্যাদির বোঝা। ঘোড়া খুব শিক্ষিত, চক্রবর্তী প্রায়ই লাগাম না ধরিয়া দুই হাতে বোঝা ধরিয়া অনায়াসে চলে, অবশ্য ইচ্ছা করিলে চক্রবর্তী মাটিতে পা নামাইয়া দিতে পারে। মাটি হইতে বড় জোর ফুটখানেক উপরে তাহার পা দুইটা ঝুলিতে ঝুলিতে যায়।

ছেলেদের কতকগুলো দূর হইতে ঢেলা ছুঁড়িয়া ঘোড়াটাকে ক্রমাগত মারিতেছিল। কতক-গুলো অতিসাহসী গাছের ডাল লইয়া পিছন দিক হইতে পিটিতেছিল। পুরোহিত ভয়ানক চটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কোন উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ছেলেগুলো যেন তাহার কথা কানেই তুলিবে না বলিয়াই একজোট হইয়াছে। একটি প্রৌঢ়া বিধবা ভোগের সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিল—সে-ই পুরোহিতের উপায় করিয়া দিল; সে বলিল—এ্যাঁ তোরা ওই ঘোড়াটাকে ছুঁলি? বলি—ওরে ও মেলেচ্ছার দল! যা, আবার সব চান করগে যা।

পুরোহিত বলিল—দেখ বাছা দেখ, বজ্জাত ছেলেদের কাণ্ড দেখ। চাঁট ছোড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে। তখন নাম-দোষ হবে আমার!

বিধবা কিন্তু এ কথাটা মানিল না, সে বলিল—ও-কথা আর বল না ঠাকুর। ওই ছাগলের মত ঘোড়া—ও নাকি পিলে ফাটিয়ে দেবে? তুমিও যেমন। ছেলেদের বলছি কেন, তোমারও তো বাপু আচার-বিচার কিছু নাই। সামনের দুটো পায়ে বেঁধে ছেড়ে দাও, রাজ্যের আঁস্তাকুড়, পাতা, ময়লা মাড়িয়ে চলে বেড়ায়। সেদিন আমাদের গাঁয়ে এসে নতুন পুকুরের পাড়ে—মা-গো:, মনে করলেও বমি আসে—চান করতে হয়—সেইখানে দেখি ঘাস খাচ্ছে। আর তুমি ওই ঘোড়াতে চেপে এসে দেবতার পূজো কর?

পুরোহিত বলিল—গঙ্গাজল দি মোড়ল পিসি, রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরলে গঙ্গাজল দিয়ে তবে ওরে ঘরে বাঁধি। আমি তো গঙ্গাজল-স্পর্শ করিই।

—ও সব মিছে কথা।

—ঈশ্বরের দিব্যি। পৈতে ছুঁয়ে বলছি আমি। গঙ্গাজল না দিলে ও বাড়ী ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকবে আর চিঁ হি চিঁ হি করে চেঁচাবে।

মোড়ল পিসি কি বলিতে গিয়া শশব্যস্ত হইয়া সম্মুখের দিকে খানিকটা সরিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—কে লা? হন হন করে আসছে দেখ।—পিছন দিক হইতে কোন আগন্তুকের দীর্ঘচ্ছায়া মাথাটা তাহার পায়ের উপর পড়িতেই মোড়ল পিসি সংস্পর্শের ভয়ে সরিয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

একটি বধূ দীর্ঘাঙ্গী—অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ; সে উত্তর করিল না, নীরবে ভোগসামগ্রীর পাত্রখানি পুরোহিতের হাতের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

—অ! কামার বউ! আমি বলি কে-না-কে!

এই মুহূর্তেই ডাক্তার ও পণ্ডিত আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিল। দেবনাথ বিনা ভূমিকায় বলিল—ঠাকুর, কামারের পূজো গাঁয়ের সামিলে আপনি করবেন না, সে হতে আমরা দেব না।

জগন ও দেবু এই সুযোগটিরই প্রতীক্ষা করিয়া নিকটেই কোথাও দাঁড়াইয়া ছিল, পদ্মকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আসিয়া হাজির হইয়াছে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—সে আবার কি রকম? গাঁ-সামিলে পূজো না হলে কি করে পূজো হবে?

—সে আমরা জানি না, কর্মকার বুঝে করবে। সে যখন গাঁয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, তখন আমরাই বা গাঁয়ের সামিলে ক্রিয়াকর্মে নোব কেন?

পদ্ম তেমনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বলিল—তাহলে আর আমি কি করব মা!

দেবনাথ পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—পূজো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বল গে কর্মকারকে,

পূজো দিতে দিলে না গাঁয়ের লোক।

পদ্ম এবার ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, কিন্তু পূজোর পাত্র তুলিয়া লইয়া গেল না, সেটা এবং দক্ষিণার পয়সা সেখানেই পড়িয়া রহিল।

পুরোহিত বিব্রত হইয়া বলিল—ওগো ও বাছা, পূজোর ঠাঁইটা নিয়ে যাও! ও বাছা, ও কামার বউ!

দেবু আবার বলিল—থাক না। কামার এখুনি তো আসবেই। যা হোক একটা মীমাংসা আজ হবেই।—দেবু ঘোষের গোপনতম অন্তরে কর্মকারের উপর একটু সহানুভূতি এখনও আছে; অনিরুদ্ধ তাহার সহপাঠী, তা ছাড়া, অন্যায় অনিরুদ্ধেরই একার নয় এবং অনিরুদ্ধই প্রথমে অন্যায় করে নাই। গ্রামের লোকই অন্যায় করিয়াছে প্রথম। সে কথাটাও তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল।

পুরোহিত ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার ব্যগ্রতাও তাহার ছিল না। উপস্থিত একবাড়ীর আতপতণ্ডুল দুধ-মণ্ডা প্রভৃতি পূজোর সামগ্রী বাদ পড়িয়া যাইতেছে—সেই চিন্তাটাই তাহার বড়। ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল—বলি ওহে ডাক্তার, ও পণ্ডিত—

জগন বাধা দিয়া দৃঢ় আদেশের ভঙ্গীতে তাহাকে বলিল—গিরিশ ছুতোর তারা নাপিত এদের পূজোও হবে না ঠাকুর, বলে রাখছি আপনাকে। আমরা অবিশ্যি একজন-না-একজন শেষ পর্যন্ত থাকব, তবে যদি না থাকি—সেজন্যে আগে থেকে বলে রাখছি আপনাকে।

ঠিক এই সময়ে ছিরু পাল আসিয়া ডাকিল—ঠাকুর! ছিরুর পরনে আজ গরদের কাপড়, গায়ে একখানি রেশমী চাদর; ভাবে-ভঙ্গিতে ছিরু পাল আজ একটি স্বতন্ত্র মানুষ।

পুরোহিত চক্রবর্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল—এই যাই বাবা। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। ও পণ্ডিত, ও ডাক্তার, কই হে সব আসছে না কেন?

গম্ভীরভাবে জগন ডাক্তার বলিল—এত তাড়াতাড়ি করলে তো হবে না ঠাকুর। আসছে সব, একে একে আসছে। একঘর যজমানের জন্য দশজনকে ব্যতিব্যস্ত করতে গেলেতো চলবে না।

ছিরু বলিল,—বেশ—বেশ! দশের কাজ সেরেই আসুন। ঠাকুর! আমি একবার তাগাদা দিয়ে গেলাম। তারপর ছিরু তাহার প্রকাণ্ড বিশ্রী মুখখানাকে যথাসাধ্য কোমল এবং বিনীত করিয়া বলিল—ডাক্তার, একবার যাবেন গো দয়া করে। দেবু খুড়ো দেখেশুনে দিয়ে এস বাবা—

কথাটা তাহার শেষ হইল না, অনিরুদ্ধের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চীৎকারে চণ্ডীমণ্ডপটা যেন অতর্কিতে চমকিয়া উঠিল।

—কে? কে? কার ঘাড়ে দশটা মাথা? কোন্ নবাব-বাদশা আমার পুজো বন্ধ করেছে শুনি?

অনিরুদ্ধের সে মূর্তি যেন রুদ্র-মূর্তি!

চক্রবর্তী হতভম্ব হইয়া গেল, দেবনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইল, জগন ডাক্তার বিজ্ঞ সান্ত্বনাদাতার মত একটু আগাইয়া আসিল; ছিরু পাল যথাস্থানে অচঞ্চল স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—থাম, থাম, চীৎকার করিস না অনিরুদ্ধ!

ব্যঙ্গভরা ঘৃণিত দৃষ্টিতে চকিতে একবার ছিরু পাল হইতে ডাক্তার পর্যন্ত সকলের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ মন্দিরের দাওয়া হইতে পদ্মের পরিত্যক্ত পূজার পাত্রটা তুলিয়া লইল। পাত্রটা দুই হাতে খানিকটা উপরে তুলিয়া যেন দেবতাকে দেখাইয়া বলিল—হে বাবা শিব, হে মা কালী—খাও বাবা, খাও মা খাও। আর বিচার কর, তোমরা বিচার কর, তোমরা বিচার কর।—বলিয়াই সে ফিরিল।

ডাক্তারের চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল, কিন্তু অনিরুদ্ধকে ধরিয়া নির্যাতন করিবার কোন উপায় ছিল না।

অনিরুদ্ধ খানিকটা গিয়াই কিন্তু ফিরিল, এবং দক্ষিণার পয়সা কয়টা ট্যাকে গুঁজিয়া দেখিল দেবু ঘোষ ও জগন ডাক্তারের অল্প দূরে তখনও দাঁড়াইয়া আছে ছিরু পাল। তাহার ক্রোধ মুহূর্তে যেন উন্মত্ততায় পরিণত হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—বড়লোকের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, আমি কোন শালাকে মানি না, গ্রাহ্য করি না। দেখি—কোন্ শালা আমার কি করতে পারে।

মুহূর্তের জন্যে সে ছিরুর দিকে ফিরিয়া যেন তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

খোঁড়া পুরোহিত ও মোড়ল পিসী একটা বিপর্যয় আশঙ্কা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইহার পরই অনিরুদ্ধের উপর ছিরু পালের বাঘের মত লাফাইয়া পড়ার কথা; কিন্তু আশ্চর্য, ছিরু পাল আজ হাসিয়া অনিরুদ্ধকে বলিল—আমাকে মিছিমিছি জড়াচ্ছ, কর্মকার, আমি এ-সবের মধ্যে নাই। আমি এসেছিলাম পুরুত ডাকতে।

অনিরুদ্ধ আর দাঁড়াইল না, যেমন হন হন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি হন হন করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতেও সে বলিতেছিল—সব শালাকে আমি জানি। ধার্মিক—রাতারাতি সব ধার্মিক হয়ে উঠেছে।

ছিরু অবিচলিত ধৈর্যে স্থির প্রশান্তভাবেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। ছিরুর চরিত্রের এই একটি বৈশিষ্ট্য। যখন সে ইষ্ট স্মরণ করে, কোন ধর্ম-কর্ম বা পূজা-পার্বণে রত থাকে—সে তখন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া যায়। সেদিন সে কাহারও সহিত বিরোধ করে না, কাহারও অনিষ্ট করে না, পৃথিবী ও বস্তু-বিষয়ক সমস্ত কিছুর সহিত সংস্রবহীন হইয়া এক ভিন্ন জগতের মানুষ হইয়া উঠে। অবশ্য সমগ্র হিন্দুসমাজের জীবনই আজ এমনই দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; কর্মজীবন এবং ধর্মজীবন একেবারে স্বতন্ত্র—দুইটার মধ্যে যেন কোন সম্বন্ধ নাই। ইষ্ট স্মরণ করিতে করিতে যাহার চোখে অকপট অশ্রু উদ্গত হয়, সেই মানুষই ইষ্ট

স্মরণ-শেষে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিষয়ের আসনে বসিয়া জাল-জালিয়াতি শুরু করে। শুধু হিন্দু সমাজই বা কেন? পৃথিবীর সকল দেশে—সকল সমাজেই জীবনধারা অল্পবিস্তর এমনই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কথা থাকুক, ছিরুর জীবনে এই বিভাগটা বড় প্রকট— অতি মাত্রায় পরিস্ফুট। আজিকার ছিরু স্বতন্ত্র, এই ছিরু যে কেমন করিয়া ব্যভিচারী পাষণ্ড ছিরুর প্রচণ্ড ভার ঠেলিয়া দেবপূজাকে উপলক্ষ করিয়া বাহির হইয়া আসে—সে অতি বিচিত্র সংঘটন। পাষণ্ড ছিরুর অন্যায় বা পাপে কোন ভয় নাই, দেবসেবক ছিরুরও সে পাপ খণ্ডনের জন্য কোন ব্যগ্রতা নাই। আছে কেবল পরমলোক-প্রাপ্তির জন্য একটি নিষ্ঠাভরা তপস্যা এবং অকপট বিশ্বাস। দিন ও রাত্রির মত পরস্পরের সঙ্গে এই দুই বিরোধী ছিরুর কখনও মুখোমুখি দেখা হয় না, কিন্তু কোন বিরোধও নাই। তবে ছিরুর দিবাভাগগুলি অর্থাৎ জীবনের আলোকিত অংশটুকু শীতমণ্ডলের শীতের দিনের মত—অতি সংক্ষিপ্ত তাহার আয়ু।

আজ কিন্তু আরও একটু নূতনত্ব ছিল ছিরুর ব্যবহারে। আজিকার কথাগুলি শুধু মিষ্টই নয়—খানিকটা অভিজাতজনোচিত, ভদ্র এবং সাধু। বিগত কালের দেবসেবক ছিরু হইতেও আজিকার দেশসেবক ছিরু আরো স্বতন্ত্র, আরো নূতন। উত্তেজনার মুখে সেটা কেহ লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ পরই চণ্ডীমণ্ডপের সামনের রাস্তা দিয়া বাউড়ী, ডোম, মুচীদের একপাল ছেলেমেয়েরা সারি বাঁধিয়া কোথাও যাইতেছিল। কাহারও হাতে থালা, কাহারও হাতে গেলাস, কাহারও হাতে কোন রকমের একটা পাত্র। জগন ডাক্তার প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবি রে সব দল বেঁধে?

—আজ্ঞে, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী গো, অন্নপুন্নোর পেসাদ নিতে ডেকেছেন।

—কে? ঘোষটা আবার কে? ছিরু? ছিরে পাল সে আবার ঘোষ হল কবে থেকে?

অশালীন ভাষায়—ছিরুকে কয়টা গাল দিয়া ডাক্তার বলিল—ওঃ, বেজায় সাধু মাতব্বর হয়ে উঠল দেখছি!

দেবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল।

এগারো

দেবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল অনেক কথা। ওই নবান্নের ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর।

চণ্ডীমণ্ডপেই গ্রাম্য পাঠশালা বসে; পাঠশালার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হইতেই চণ্ডীমণ্ডপই পাঠশালার নির্দিষ্ট স্থান। সে বহুকাল আগের কথা। তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ছিল না, ইউনিয়ন বোর্ড ছিল না। পাঠশালা ছিল গ্রামের লোকের। লোকেরা পণ্ডিতকে মাসে একটা করিয়া সিধা দিত এবং ছেলে পড়াইত। চণ্ডীমণ্ডপে সেকালে কালী ও শিবের নিত্য-পূজার ব্যবস্থা ছিল এবং ওই পূজক ব্রাহ্মণই তখন ছিল পাঠশালার পণ্ডিত। পরবর্তীকালে পূজকের

দেবোত্তর জমি কেমন করিয়া কোথায় উবিয়া গেল কে জানে। লোকে বলে—জমিদারের পূর্ববর্তী এক গোমস্তা দেবোত্তর জমিকে নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া নিজের জোতের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে। এমন কৌশলে লইয়াছে যে, সে আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই। এমন কি চিহ্নিত জমিগুলোকে কাটিয়া এমনি রূপান্তরিত করিয়াছে যে, সে জমি পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। তাহার পরও গ্রাম্য-পৌরোহিত্য, দেব-সেবা এবং পাঠশালাকে অবলম্বন করিয়া এক ব্রাহ্মণ অনেকদিন এখানে ছিল; আজ বৎসর কয়েক আগে সে-ও চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের নূতন নিয়মানুযায়ী অযোগ্যত হেতু তাহাকে বরখাস্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বছর তিনেক পাঠশালার ভারা পড়িয়াছে দেবুর হাতে।

এককালে দেবুও এই পাঠশালায় সেই পুরোহিত-পণ্ডিতমশায়ের কাছে পড়িয়াছে। পণ্ডিত একদিকে পূজা করিত 'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী'—অকস্মাৎ মন্ত্র বন্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত—এ্যাই—এ্যাই চণ্ডে, পাঁচ তেরম পঁগাত্তর নয়, পাঁচ তেরম পঁয়ষট্টি। ছয় তেরম আটাত্তর। হ্যাঁ—

ওই অনিরুদ্ধও তখন তাহার সঙ্গে পড়িত। পণ্ডিত তাহাকে বলিত—এ দেশের লোহাতে চেকন কাজ হয় না বাবা, কর্মকার, তুমি 'বিলাত' যাও। বিলাতে কল-কারখানার কারবার, আলপিন স্থচ তৈরী হয় লোহা থেকে। বিলাতী পণ্ডিত না হলে তোমাকে পড়ানো আমার কর্ম নয়;—

ছিরু দেবুর জ্ঞাতি, সম্বন্ধে ভাইপো, কিন্তু বয়সে অনেক বড়। সে প্রথমে তাহার কয়েক ক্লাস উপরে পড়িত; শেষে এক এক ক্লাসে দুই-তিন বৎসর করিয়া বিশ্রাম লইতে লইতে যেদিন দেবুকে সহপাঠীরূপে দেখিতে পাইল, সেইদিনই সে পাঠশালার মোহ জন্মের মত বিসর্জন দিল। তারপরই সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে—ক্রমে বিষয়-বুদ্ধিতে পাঁচখানা গ্রামের লোককে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। সে আজ গণ্যমান্য ব্যক্তি, গ্রামের মাতব্বর।

অনিরুদ্ধ এবং এই ছিরু পাল—এই দুইজনেই গ্রামখানার সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙিয়া দিল। ওই সঙ্গে গিরিশ ছুতার, তারা নাপিতও আছে। দেবু আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিল—অনিরুদ্ধ ওই যে দম্ভভরে সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ভোগ উঠাইয়া লইয়া গেল, অথচ সমাজের কেহ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? এ কয়েকদিন সে নিজেই লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছে, গ্রামের লোক তাহাকে ভালবাসে, অনেকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু এক্ষেত্রে সকলেই বলিয়াছে এক কথা—এর আর করবে কি দেবু? উপায় কি বল? যদি থাকে তাহলে তুমি কর! তবে বুঝচ কি না—উ হবে না! কি সমাজ সমাজ করছ? সমাজ কই?

নাই! দেবু নিজেই বুঝিয়াছে, নাই! সেকালে যে-সব মানুষ এই সমাজ গড়িয়াছিল, এই সমাজ শাসন করিত, এ সমাজকে ভাল করিয়া জানিত, বুঝিত—সে-সব মানুষই আর নাই। সে শিক্ষাও নাই, সে দীক্ষাও নাই, সে দৃষ্টি নাই। এ-সব মানুষ আর এক জাতের

মানুষ। আর এক ধাতের মানুষ। মানুষের নামে অমানুষ।

জগন ডাক্তার সেদিন বলিয়াছিল—ধ'রে এনে বেটাচ্ছেলে কামারকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লাগাও ঘা-কতক।

জগনের ও-প্রস্তাবে দেবু সায় দিতে পারে নাই। ছি! মানুষকে শিক্ষা দিবার অধিকার আছে, ক্ষেত্রবিশেষে মনুষ্যোচিত শাসন করিবার অধিকারও সে স্বীকার করে; কিন্তু অত্যাচারই একমাত্র শাসন নয়। জীবনে তাহার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য হীন কৌশল, অত্যাচার ও অন্যায়কে অবলম্বন করিতে সে চায় না। জীবনে তাহার একটি আদর্শবোধও আছে। পাঠ্যাবস্থায় আপনার ভাবী জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনায় সেই বোধটিকে দেবু গড়িয়া তুলিয়াছিল। মহাপুরুষদের দৃষ্টান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত সেই আদর্শবোধ। বাল্য-জীবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে কয়েকটি ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইয়া আছে। বারংবার নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি-শাণিত যুক্তির আঘাত দিয়াও সে-ধারণাগুলি আজও তাহার খণ্ডিত হয় নাই।

জমিদারকে, ধনী মহাজনকে সে ঘৃণা করে। তাহাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অন্যায়ের সন্ধান করা যেন তাহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের অতি-উদার দান-ধ্যান-ধর্ম-কর্মকেও সে মনে করে কোন গুপ্ত গো-বধের স্বেচ্ছাবৃত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া। তাহার অবশ্য কারণ আছে।

তাহার বাল্যকালে একবার জমিদারবাবুরা বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাহার বাবাকে সমস্ত দিন কাছারিতে আটক রাখিয়াছিল। আতঙ্কিত দেবু তিনবার বাবুদের কাছারিতে গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিয়াছিল; দুইবার চাপরাসীর ধমক খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। শেষবার বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—এবার যদি আসবি ছোঁড়া, তবে কয়েদখানায় বন্ধ করে রেখে দেব। চাপরাসীটা তাহাকে টানিয়া আনিয়া একটা অন্ধকার ঘরও দেখাইয়া দিয়াছিল। বাবুদের অবশ্য কয়েদখানার জন্য স্বর্গধাম কি বৈকুণ্ঠজাতীয় কোন মহল বা ঘর কোনদিনই ছিল না। নিতান্তই ছোট জমিদার তাহারা, দেবুকে নিছক ভয় দেখাইবার জন্য ও-কথাটা বলা হইয়াছিল—সেটা দেবু আজ বোঝে। কিন্তু জমিদার অত্যাচারী—এ ধারণা তাহাতে একবিন্দু ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

জমিদারের ওই বাকী খাজনা শোধের জন্য তাহার বাপ কঙ্কণার মুখুজ্জে বাবুদের কছে ঋণ করিয়াছিল। তাহারা তিন বৎসর অন্তে হ্যাণ্ডনোটের নালিশ করিয়া অস্থাবর ক্রোকী পরোয়ানা আনিয়া, গাই-বাছুর-থালা-গেলাস ও অন্যান্য জিনিসপত্র টানিয়া রাস্তায় যেদিন বাহির করিয়াছিল সেদিনের সেই লাঞ্ছনা-বিভীষিকা দেবু কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তাহার পর অবশ্য ডিক্রীর টাকা আসল করিয়া তমসুক লিখিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে বাবুরা অস্থাবর ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে-টাকা তাহার বাবার মৃত্যুর পর সে শোধ করিয়াছে। এই বাবুরা অবশ্য বে-আইনী কখনও কিছু করে না, হিসাবের বাহিরে একটি পয়সা অতিরিক্ত

লয় না। লোকে বলে—মুখুজ্জে বাবুদের মত মহাজন বিরল। টাকা আদায়ের জন্ম জোর-জুলুম নাই, অপমান নাই, সুদ শোধ করিয়া গেলে নালিশ কখনও করিবে না; লোকের সম্পত্তির উপর তাহাদের প্রলোভন নাই। নীলাম করিয়া লওয়ার পরও টাকা দিলেই বাবুরা সম্পত্তি ফেরত দেয়। ইহার একবিন্দু অতিরঞ্জন নয়। তবু দেবু মহাজনকে ক্ষমা করিতে পারে না।

এ-সবের উপর আরও একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার মনে অক্ষয় হইয়া আছে। স্কুলে সে ছিল সর্বাপেক্ষা দুইটি ভাল ছেলের একটি। তাহার নিচের ক্লাসে পড়িত মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ,—সে ছিল দ্বিতীয় জন। শিক্ষকেরা প্রত্যাশা করিতেন—এই ছেলে দুইটি স্কুলের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু দেবু আজও ভুলিতে পারে না যে, সে ছিল শিক্ষকদের সস্নেহ করুণার পাত্র; ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ পাইত স্নেহের সহিত শ্রদ্ধা আর কঙ্কণার বাবুদের মধ্যম মেধার কয়েকটি ছাত্র পাইত স্নেহের সহিত সম্মান। এমন কি, এই ছিরুকেও স্কুলের হেডপণ্ডিত তোষামোদ করিতেন,—কারণ প্রয়োজনমত ছিরুর বাপের কাছে তিনি কখনও তালগাছ, কখনও জামগাছ, ক্রিয়াকর্মে দশ-পনেরো সের মাছ চাহিয়া লইতেন। ইহা ছাড়া ঘি, চাল, ডাল, গুড় প্রভৃতি তো নিয়মিত উপহার পাইতেন।

ওই পণ্ডিতটির নির্লজ্জ লোভের কথা মনে করিলে দেবুর সর্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠে। বিশ বৎসর বয়সে ছিরু স্কুলের ফিফথ্ ক্লাস হইতে বিদায় লইলে, পণ্ডিত ছিরুর বাপকে বলিয়াছিল—ছেলেকে সংস্কৃত পড়াও মোড়ল।

ছিরুর বাপ ব্রজবল্লভ ছিল শক্তিশালী চাষী—নিজের পরিশ্রমের সাধনায় সে ঘরে লক্ষ্মীর কৃপা আয়ত্ত করিয়াছিল, কিন্তু নিজে ছিল মূর্খ। তাই বড় সাধ ছিল ছেলেটি তাহার পণ্ডিত হয়। ছিরু বিশ বৎসর বয়সে পশু-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠায় বেচারার মনস্তাপের সীমা ছিল না। পণ্ডিতের কথায় সে ছেলেকে পণ্ডিতের ছাত্র করিয়া দিল। ছিরু প্রথমটা আপত্তি করে নাই। পণ্ডিত পড়াইতে আসিয়া গল্প করিতেন। বিশেষ করিয়া বয়স্ক বিবাহিত ছাত্রের কাছে তিনি আদিরসাশ্রিত সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া এবং ঐ ধরনের গল্প বলিয়া বৎসর চারেক নিয়মিতভাবেই বেশ প্রসন্ন গৌরবের সঙ্গে গ্লানিহীন চিত্তে বেতন লইয়াছিলেন। অবশ্য বেতন বেশী নয় মাসিক দুই টাকা। চারি বৎসর পর ছিরু আবার বিদ্রোহ করিল। ছিরুর বাপ কিন্তু নাছোড়বান্দা। ছিরু তখন পণ্ডিতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বুলি ধরিল—সংস্কৃত পড়িয়া কি হইবে? পড়িতে হইলে সে ইংরাজীই পড়িবে।

ইংরাজী পড়াইবার গৃহশিক্ষক কিন্তু পণ্ডিতের ডবল বেতন দাবী করিল। ছিরু তখন ধরিল—সে স্কুলেই পড়িবে। চব্বিশ বৎসর বয়সে সে আবার আসিয়া ফিফ্‌থ ক্লাসে বসিল। দেবুও তখন ফিফ্‌থ ক্লাসে উঠিয়াছে। হঠাৎ ছিরুর নজর পড়িল দেবুর উপর। দেবুর পাশে অনি-কামার। স্কুলে পড়িবার কথা যখন বলিয়াছিল—তখন এই কথাটা ছিরুর মনে হয় নাই। তাহার কল্পনা ছিল অন্যরকম। স্কুলে পড়িবার নাম করিয়া সে কঙ্কণার অথবা স্বগ্রামের নীচ জাতীয়দের পল্লীতে দিনটা কাটাইয়া আসিবে। কিন্তু দেবুকে এবং অনিরুদ্ধকে

ক্লাসে দেখিয়া সে আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গেই সে বই-খাতা লইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল। বাড়ী চলিয়া আসিল না। সেই পথে-পথেই সে গিয়া উঠিল তাহার মাতামহের বাড়ী। সেখানে গিয়াই সে তাহার জীবনের আদর্শ গুরু ত্রিপুরা সিংকে পাইয়াছিল। তাহার জীবনে পথ দেখায় যে—সে-ই মানুষের গুরু, মাতামহের মনিব ত্রিপুরা সিংকে দেখিয়া ছিরু তাহাকেই মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজের কর্ম-জীবন-যাত্রা শুরু করিল। কিন্তু চব্বিশ বৎসর বয়সে ছিরু যেদিন ক্লাসে আসিয়া বসিয়াছিল—সেদিনও পণ্ডিত আসিয়া বলিয়াছিলেন—খবরদার, ছিরুকে দেখে কেউ হেসো না। তাহার মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল না—ছিল খাতির। —সে কথা দেবুর আজও মনে আছে।

স্কুলের মধ্যে সকলের চেয়ে সম্মানের পাত্র ছিল কঙ্কণার মুখুজ্জেদের মূর্খ ছেলেটা। তিন-তিনজন গৃহশিক্ষক সত্ত্বেও কোন বিষয়ে তাহার পরীক্ষার নম্বর চল্লিশের কোঠাও পৌছিত না। একবার সে সঙ্গীদের মধ্যে রহস্য করিয়া বলিয়াছিল—গাধা পিটে কখনও ঘোড়া হয় না। কথাটা ছেলেটার কানে উঠিতেই সে শোরগোল তুলিয়া ফেলিল। সেই শোরগোলে একেবারে শিক্ষকমণ্ডলী পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিলেন। আপিসে ডাকাইয়া আনিয়া হেডমাস্টার তাহাকে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। একজন শিক্ষক বলিয়াছিলেন—গাধা রে, গাধা নয়, হাতী—হাতীর বাচ্চা। গজেন্দ্রগমন একটু একটু ধীরই বটে। আজ বুঝবি না বড় হ'লে বুঝবি।...

সে-কথাটা এখন সে মর্মে মর্মে বুঝিতেছে। বাবুদের সেই ছেলেটি বার-দু'য়েক ফেল করার পর শেষে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করিয়া আজ লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। প্রতি মাসে দেবুকে ইউনিয়ন বোর্ডে গিয়া পাঠশালার সাহায্যের জন্য তাহার সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত হয়। ছিরু পালও সম্প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে-ও আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি গো, পাঠশালা চলছে কেমন ?

দেবুর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠে।—

সেদিন একখানা ছেলেদের বইয়ে একটা ছড়া দেখিল—'লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।' দেবু সে লাইনটি বার বার কলম চালাইয়া কাটিয়া দিল। তারপর বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া লিখিয়া দিল—লেখাপড়া করে যেই—মহামানী হয় সেই।

তারপর আরম্ভ করিল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প।

* * *

মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, সে যদি ইউনিয়ন বোর্ডের ওই প্রেসিডেন্টের আসনে বসিতে পারিত, তবে সে দেখাইয়া দিত ওই আসনের মর্যাদা কত! কত—কত—কত কাজ সে করিত! সে কল্পনা করিত—অসংখ্য পাকা রাস্তা! প্রতি গ্রাম হইতে লাল কাঁকড়ের সোজা রাস্তা বাহির হইয়া মিলিত হইয়াছে এই ইউনিয়নের প্রধান গ্রামের—একটি কেন্দ্রে; সেখান হইতে একটি প্রশস্ত রাজপথ চলিয়া গিয়াছে জংশন শহরে। ওই রাস্তা দিয়া

চলিয়াছে সারি সারি ধান-চালে বোঝাই গাড়ী, লোকে ফিরিতেছে পণ্য-বিক্রয়ের টাকা লইয়া, ছেলেরা স্কুলে চলিয়াছে ওই পথ ধরিয়া। সমস্ত গ্রামের জঙ্গল সাফ হইয়া—ডোবা বন্ধ হইয়া একটি পরিচ্ছন্নতায় চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত স্থানগুলিতে ছড়াইয়া দিয়াছে দোপাটি ফুলের বীজ; দোপাটি শেষ হইলে গাঁদার বীজ। ফুলে ফুলে গ্রামগুলি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি গ্রামের প্রতি পল্লীতে একটি করিয়া পাকা ইঁদারা খোঁড়া হইয়াছে। কোনো পুকুরে এক কণা আবর্জনা নাই, কালো জল টলটল করিতেছে—পাশে পাশে ফুটিয়া আছে শালুক ও পানাড়ীর ফুল। কোর্ট বেঞ্চের সুবিচারে সমস্ত অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবিধান হইয়াছে—কঠিন হস্তে সে মুছিয়া দিতেছে উৎপীড়ন ও অবিচার।—এই সমস্তই সে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে; সুযোগ পাইলে সে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে যে, স্থূলকায় মন্থরগতি চতুষ্পদ হইলেই সে হাতী নয়, সোনার খুর-বাঁধানো হৃষ্টপুষ্ট হইলেও গর্দভ চিরদিনই গর্দভই।

ঈর্ষার উত্তেজনায়, কর্মের প্রেরণায় সে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, দ্রুতপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, মধ্যে মধ্যে হাতখানা ভাঁজিয়া অতি দৃঢ় মুঠা বাঁধিয়া পেশী ফুলাইয়া কঠিন কঠোর করিয়া তোলে। সকল দেহমন ভরিয়া সে যেন শক্তির আলোড়ন অনুভব করে।

তাহার স্ত্রীটি বড় ভাল মেয়ে। ধবধবে রঙ, খাঁদা নাক, মুখখানি কোমল—অতি মিষ্টি তাহার চোখের দৃষ্টি। আকারে ছোটখাটো, মাথায় একপিঠ চুল—সরল সুন্দর তাহার মন। তাহার উপরে দেবুর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া আপনাকে সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দেবুর এই মূর্তি দেখিয়া সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি হচ্ছে গো? আপনার মনে—

দেবু হাসিয়া বলে—ভাবছি আমি যদি রাজা হতাম।

—রাজা হতে! সে কি গো?

—হ্যাঁ। তা হ'লে তুমি হতে রানী।

—হ্যাঁ—তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কিন্তু কথাগুলি ভারী মজার কথা।

তাই তো—পণ্ডিত রাজা হইলে সে রানী হইত ইহা তো খাঁটি সত্য কথা।

দেবু আরও খানিকটা গোল পাকাইয়া বলিল—কিন্তু রানী হলেও তোমার গয়না থাকত না।

অভিভূতা হইয়া গেল দেবুর বউ—সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

দেবু হাসিয়া বলে—এ রাজার রাজ্য আছে, কিন্তু রাজা তো প্রজার কাছে খাজনা পায় না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বুঝেছ? লোকের কাছে ট্যাক্স নিয়ে গ্রামের কাজ করতে হয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়।

অন্তরে শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ কল্পনা থাকিলেই সংসারে তাহা পূর্ণ হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই পৃথিবীতে বড় শক্তি। বার বার চেষ্টা করিয়া দেবু সেটা উপলব্ধি করিয়াছে। শীতকালে বর্ষা নামিলেও ধানের চাষ অসম্ভব। বর্ষার সময় খুব উঁচু জমি

দেখিয়া দেবু একবার আলুর চাষ করিয়াছিল; কিন্তু আলুর বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই জলের স্যাঁতস্যাঁতানিতে মরিয়া গিয়াছিল। যে দুই চারটি গাছ বাঁচিয়াছিল—তাহাতে যে আলু ধরিয়াছিল, তাহার আকার মটর কলাইয়ের মত বলিলে বাড়াইয়া বলা হইবে না। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে রুদ্ধ রাখিয়া সে নীরবে পাঠশালার কাজ করিয়া যায়। এবং নিজের গ্রামখানির একটি ভবিষ্যৎ রূপকে মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মত বিধাতার কল্পনায় লালন করিয়াও যায় মনে মনে। গ্রামের ছোটখাটো সকল আন্দোলন হইতে সে নিজে যথাসাধ্য পৃথকই থাকিতে চায়। সে জানে ইহাতে তাহার মত অবস্থার লোকের ক্ষতিই হয়। পাঠশালার বাঞ্ছিত দলাদলিতে তাহার না থাকাই উচিত—তবু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা কল্পনা এমনি ধারায় আন্দোলন উত্তেজনার স্পর্শ পাইবামাত্র নাচিয়া বাহির হইয়া আসে।

গ্রামখানির যাবতীয় অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি-বিশৃঙ্খলা তাহার নখদর্পণে। গ্রামের সামাজিক ইতিহাস সে আবিষ্কারকের মত খুঁজিয়া খুঁজিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। গ্রামের কামার, ছুতার, নাপিত, পুরোহিত, দাই, চৌকিদার, ধোপা প্রভৃতির কাহার কি কাজ, কি বৃত্তি, কোথায় ছিল তাহাদের চাকরাণ জমি, সমস্তই সে যেমন জানিয়াছে এমনটি আর কেহ জানে না। বিগত পাঁচপুরুষের কালের মধ্যে গ্রামের পঞ্চায়েৎমণ্ডলীর কীর্তি-অপকীর্তির ইতিহাসও আমূল তাহার কণ্ঠস্থ।

* * *

চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় বসিয়া পাঠশালায় পড়াইতে পড়াইতে দেবু ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপটির কথা ভাবে। এই চণ্ডীমণ্ডপটি একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল। পূজাপার্বণ, আনন্দ, উৎসব, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সব অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। অন্যায়-অবিচার-উৎপীড়ন, বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার-পাপ গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে, এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিত পঞ্চায়েৎ। এই আসরে বসিয়া বিচার চলিত, শাসন করিয়া সে সমস্ত দূর করা হইত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে হাঁক দিলে গ্রামের সমস্ত ঘর হইতে সে ডাক শোনা যায়,—সে ডাক উপেক্ষা করিবার কাহারো সামর্থ্য ছিল না। আরও তাহার মনে আছে, চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া সেকালে যে যতবার যাইত প্রণাম করিয়া যাইত। আজকাল আর মানুষ প্রণামও করে না। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, দেবতাকে—ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা এই পরিণতির পথে চলিয়াছে! দেবু নিত্য নিয়মিত তিন সন্ধ্যা এখানে প্রণাম করে। 'আপনি আচরি ধর্ম' নীরবে সে পরকে শিখাইতে চায়।

নাস্তিকতার পরিণাম সম্পর্কে এক ঘটনার কাহিনী তাহার অন্তরে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহার অবশ্য শোনা কথা, তাহার জীবনকালে ঘটিলেও সে তখন ছিল নিতান্তই শিশু। তাহার বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথ মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র। বিশ্বনাথের পিতা পণ্ডিত শশিশেখরের কাহিনী সেটি। পণ্ডিত শশিশেখর তাঁহার পিতা ওই ঋষিতুল্য ন্যায়রত্নের অমতে ইংরেজী শিখিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ দেশে ব্রাহ্মণ-

সভা ডাকিয়া পুরাতন কালের কুসংস্কার বর্জনের একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিবেশনটার তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। সেই অধিবেশনে তিনি সর্বাগ্রে নারায়ণশিলা স্থাপন করিয়া অর্চনা না করার জন্য ন্যায়রত্ন শিহরিয়া উঠিয়া প্রতিবাদ করেন। নাস্তিক শশিশেখর নাস্তিকতাবাদের যুক্তিতে পিতার সহিত তর্ক করেন। ফলে সভা পণ্ড হয়। শুধু তাই নয়, উদ্‌ভ্রান্ত শশিশেখরের মৃত্যু হয় অপঘাতে, রেল এঞ্জিনের তলায় তিনি স্বেচ্ছায় কাটা পড়েন। ঘটনার সংঘটন তাই বটে, কিন্তু দেবু ঘোষ তাহার মধ্যে দেখিতে পায় কর্মফলের অলঙ্ঘ্য বিধান। দেবুর সব চেয়ে বড় দুঃখ—এই পরিণতি জানিয়াও ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথও নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে। সে এখন কলিকাতায় এম-এ পড়ে। যখন আসে তখন দেবুর সঙ্গে দেখা করে। এম-এ ক্লাসের ছাত্র হইয়াও কিন্তু বিশ্বনাথ এখনও তাহার বন্ধুই আছে। বয়সে সে দেবুর পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট হইলেও দেবুর বন্ধু সে; স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখন বিশ্বনাথ তাহাকে দেবু-দা বলিত। বয়সের সঙ্গে দেবু আপনার ও বিশ্বনাথের সামাজিক পার্থক্য বুঝিয়া বলিয়াছিল—তুমি আমাকে দাদা বলো না কিন্তু ভাই; আমার ওতে অপরাধ হয়। বিশু তখন হইতে দেবুকে বলে দেবু ভাই। এখন তাহার বন্ধু—সত্যকারের বন্ধু। কখনও শ্রেষ্ঠত্বের এতটুকু তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক-স্পর্শ সে তাহার সান্নিধ্যে অনুভব করে না। এই বিশ্বনাথও সন্ধ্যাহ্নিক করে না, এই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়াও কখনও দেবতাকে প্রণাম করে না।

দেবু কিছুদিন আগে এই চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে তাহার চিন্তার কথা বিশ্বনাথকে বলিয়াছিল; কি করিয়া এই চণ্ডীমণ্ডপটির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল—সে আর হবে না, দেবু ভাই। চণ্ডীমণ্ডপটা বুড়ো হয়েছে, ও মরবে এইবার।

—বুড়ো হয়েছে? মরবে মানে?

—মানে, বয়স হলেই মানুষ যেমন বুড়ো হয়, তেমনি চণ্ডীমণ্ডপটা কতকালের বল তো? বুড়ো হয় নি?

চাল-কাঠামোর দিকে চাহিয়া দেবু বলিয়াছিল—ভেঙে নতুন করে করতে বলছ?

বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল; বলিয়াছিল—রঙিন পেনীফ্রক পরলেই বুড়ো খোকা হয় না, দেবু-ভাই! এ যুগে ও চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করতে পার? কর না ওই ঘরটাতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, দেখবে দিনরাত লোক আসবে এইখানে। ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে।

তারপর সে অনেক যুক্তিতর্ক দিয়া দেবুকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল টাকাই সব। সেকালের ধর্মমত সামাজিক ব্যবস্থার ভিতরেও অতি সূক্ষ্ম কৌশলে নাকি ওই টাকাটাই ছিল ধর্ম, কর্ম, স্বর্গ, মর্ত্য, নরক সমস্ত কিছুর ভিত্তি। ভিত্তির সেই টাকার মশলাটা আজ শূন্য হইয়া যাওয়াতেই এই অবস্থা।

দেবু বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল—না—না—না।

বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল।

দেবু প্রতিবাদ করিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল—ছি—ছি—ছি, বিশু-ভাই। তুমি ঠাকুর মশায়ের নাতি, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

বিশ্বনাথ আরও কিছুক্ষণ হাসিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—আমি কতকগুলো বই পাঠিয়ে দেব, দেবু-ভাই, তুমি পড়ে দেখ।

—না। ওই সব বই ছুঁলে পাপ হয়। ও-সব বই তুমি পাঠিয়ো না।

সে প্রাণপণে আপন সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাহাকে সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। তাই নবান্নের দিনে অনিরুদ্ধকে এই চণ্ডীমণ্ডপে পূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে সামাজিক শাস্তি দিবার জন্য জগনের সহিত মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সারা গ্রামটার আর একজনও কেহ তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল না। অনিরুদ্ধও বিনা দ্বিধায় অবলীলাক্রমে ভোগপূজার থালা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধের পিতৃপিতামহের কিন্তু এ সাধ্য ছিল না।

দেবু দিশাহারা হইয়া কয়েকদিন ধরিয়াই এইসব ভাবিতেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়, হয়তো দেবতা একদিন আপন মহিমায় জাগ্রত হইবেন—অন্যায়ের ধ্বংস করিবেন, ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। শাস্ত্রের বাণীগুলি সে স্মরণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কিছুক্ষণ পরেই সে হতাশায় অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পাতু মুচী সেই একটি দিনের দিকে চাহিয়াই বাঁচিয়া আছে। সেই ভরসায় সে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের বোঝা মাথায় লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেবু যে তাহাদের মত কোনমতেই ওই ভরসায় এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

* * *

পাঠশালায় ছুটি দিয়াও দেবু একা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। পথ হইতে কে ডাকিল—পণ্ডিতমশায় গো!

—কে?

—ওরে বাস্ রে! বসে বসে কি এত ভাবছ গো?—মুচীদের দুর্গা দুধ বেচিতে যাইতেছিল, পথ হইতে দেবুকে ডাকিয়া সে-ই কথা বলিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—সে খবরে তোর দরকার কি রে?

মেয়েটাকে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না; সে স্বৈরিণী—সে ভ্রষ্টা—সে পাপিনী; বিশেষ করিয়া সে ওই ছিরুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাহাকে সে ঘৃণা করে।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—খবরে আমার দরকার নাই, দরকার তোমার বউয়ের। পথের পানে চোখ চেয়ে বিলু দিদি বাড়ীর দুয়োরে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই তো!—দেবুর এতক্ষণে চমক ভাঙিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ওঃ, এ যে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে! চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া সে হন্ হন্ করিয়া আসিয়া বাড়ী

ঢুকিল। ভালমানুষ বউটি সত্যই পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। সে বলিল—রান্না হয়ে গিয়েছে, চান কর!

দেবুর জীবনে এই এক পরম সম্পদ। ঘরে তাহার কোন দ্বন্দ্ব নাই, অশান্তি নাই। তাই বোধ হয় বাহিরে বাহিরে সমগ্র গ্রামখানি জুড়িয়া দ্বন্দ্ব অশান্তি সন্ধান করিয়া ফিরিয়াও তাহার ক্লান্তি আসে না।

দেবু চলিয়া গেলেও দুর্গা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, দেবু যে পথে গেল, সেই পথ-পানে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। পণ্ডিতকে তাহার ভাল লাগে—খুব ভাল লাগে। ছিরুকে সে এখন ঘৃণা করে; সেই আগুন লাগানোর সংবাদ সে কাহাকেও বলে নাই; ঘৃণায় তাহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ছিরুর সহিত যখন তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল—তখনও তাহার পণ্ডিতকে ভাল লাগিত; ছিরু অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল লাগিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই দুই ভাল লাগার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। আজ পণ্ডিতকে পূর্বাপেক্ষা যেন আরও বেশী ভাল লাগিল।

পণ্ডিতের সহিত তাহার একটা সম্বন্ধও আছে। রক্তের সম্বন্ধ নয়, পাতানো সম্বন্ধ। দেবুর বউ বিলুকে তাহার মা এককালে কোলেপিঠে করিত। সেই কারণে সে বিলুকে দিদি বলে। দেবু পণ্ডিত তাহার বিলু দিদির বর।

বারো

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে 'ইতুলক্ষ্মী'-পর্ব আসিয়া গেল।

অন্যান্য প্রদেশে—বাংলাদেশে বিশেষ অঞ্চলে কার্তিক-সংক্রান্তি হইতেই ইতু বা মিত্র-ব্রত আরম্ভ হয়, শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। রবিশস্যের কল্যাণকামনা করিয়া সূর্য-দেবতার উপাসনা হইতেই নাকি ইহার উদ্ভব। দেবুদের দেশে কিন্তু সমগ্র মাস ধরিয়া সূর্য-দেবতার আরাধনার প্রচলন নাই। এদেশে রবিশস্যের চাষেরও বিশেষ প্রসার নাই; ধান-চাষ এখানকার প্রধান কৃষিকর্ম। ইতু-পর্বকে এখানে ইতুলক্ষ্মী বা ইতু-সংক্রান্তি পর্ব বলা হয়। হৈমন্তী-ধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার শুভ প্রারম্ভের পর্ব এটি এবং রবিশস্যের আবাহনও বটে। চাষীদের আপন খামারে ইহার অনুষ্ঠান হয়। খামারের ঠিক মধ্যস্থলে শক্ত একটি বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া সেই খুঁটির তলায় আল্পনা দিয়া সেইখানে লক্ষ্মীর পূজা ভোগ হয়। ধান মাড়াইয়ের সময় ওই খুঁটিটির চারদিকেই ধানসুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়া দেওয়া হইবে এবং গরু-মহিষগুলি ওই খুঁটাতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃত্তাকারে পোয়ালের উপর পাক দিয়া ফিরিবে। তাহাদের পায়ের খুরের মাড়াইয়ে খড় হইতে ধান ঝাড়াই হইয়া যাইবে।

এ পর্বের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের সম্বন্ধ বিশেষ নাই। তবে মেয়েরা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম না করিয়া লক্ষ্মী পাতিবে না। পূর্বকালে আরও খানিকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দেবুর মনে আছে, পনেরো বৎসর পূর্বেও লক্ষ্মীপূজার শেষে সমস্ত গ্রামের মেয়েরা

আসিয়া এইখানে সমবেত হইয়া সুপারী হাতে ব্রত-কথা শুনিতে বসিত। গ্রামের প্রবীণা কেহ ব্রত-কথা বলিতেন। অপর সকলে শুনিত। আজকাল সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। এখন দুই-তিন বাড়ীর মেয়েরা কোন এক বাড়ীতে একত্রিত হইয়া ব্রত-কথা শুনিয়া লয়। দেবুর বাড়ীতেও এই ব্রত-কথার আসর বসে। আজ দেবু পাঠশালায় পড়াইতে পড়াইতে ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে সেদিন হইতে সমস্ত প্রেরণা ও শক্তি ক্ষুব্ধ ও আহত হইয়া অহরহ তাহাকে পীড়িত করিতেছে। যে কোন সুযোগ পাইলেই তাহা অবলম্বন করিয়া আবার সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে চায়। জগন ডাক্তারের সহিত যোগাযোগ আবার স্বাভাবিক নিয়মের বশে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। জগন ডাক্তারের ওই দরখাস্ত করার পন্থাটাকে সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। দরখাস্তের কথায় তাহার হাসি আসে। অন্তর জ্বলিয়া উঠে।

যে সাহিত্য পড়াইতেছিল—

"অট্টালিকা নাহি মোর নাহি দাস-দাসী
ক্ষতি নাই, নহি আমি সে সুখ-প্রয়াসী।
আমি চাই ছোট ঘরে বড় মন লয়ে,
নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে!
পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান,
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান?"

সহসা তাহার নজরে পড়িল—একটি দীর্ঘাঙ্গী অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে পথের ধার হইতেই চণ্ডীমণ্ডপের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। চণ্ডীমণ্ডপে সে বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই উঠিল না; কারণ তাহার পদক্ষেপে কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। দেবু তাহাকে চিনিল—অনিরুদ্ধের স্ত্রী। বুঝিল নবান্নের দিনের সেই ঘটনার জন্যই অনিরুদ্ধের স্ত্রী চণ্ডীমণ্ডপের উপরে উঠিল না। মুহূর্তে দেবুর মন খারাপ হইয়া গেল। অনিরুদ্ধের স্ত্রী ওই যে নীরবে পথের উপর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, তাহার প্রতিটি ভঙ্গি যেন রুদ্ধ-বেদনায় ব্যথিত বিষণ্ণ বলিয়া তাহার মনে হইল। একা আসিয়া একা চলিয়া গেল, যেন বলিয়া গেল—একা আমিই কি দোষী? দেবু অনিরুদ্ধের স্ত্রীর গমন-পথের দিকেই চাহিয়া রহিল, মেয়েটির ধীর পদক্ষেপ যেন ক্লান্ত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। কাজটা সত্যই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তটিতে তাহার বিচারবুদ্ধির ত্রুটি স্বীকার না করিয়া পারিল না। অনিরুদ্ধের অন্যায়ের চেয়ে গ্রামের লোক যে অনিরুদ্ধের প্রতি অন্যায় করিয়াছে বেশী! ধান না দেওয়ার জন্যই অনিরুদ্ধ কাজ বন্ধ করিয়াছে। মজলিসে ছিরু আগে অপমান করিয়াছে, তবে অনিরুদ্ধ উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির ধান কাটিয়া লওয়ার প্রতিকার যখন কেহ করিতে পারে নাই, তখন অনিরুদ্ধকে শাস্তি দিবার অধিকারই বা কাহার আছে? অকস্মাৎ সে বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল, মনের চিন্তাধারায় একটা ছেদ পড়িয়া গেল—একি! অনিরুদ্ধের স্ত্রী তাহার বাড়ীর

দিকেই যাইতেছে কেন ?—

পাঠশালার ছেলেগুলো পণ্ডিতের স্তব্ধতার অবকাশ পাইয়া উস্‌খুস্ করিতে শুরু করিয়াছিল। একটি ছেলে বলিল—আজ ইতুলক্ষ্মী, মাস্টার মশায় আজ আমাদের হাপ-ইস্কুল হয়। ন'টা বেজে গিয়েছে ঘড়িতে।

দেবুর সম্মুখেই থাকে একটা টাইমপিস্। দেবু ঘড়িটার দিকে চাহিয়া আবার পড়াইতে শুরু করিল—

"শৈশব না যেতে ক্ষেতে শিখিয়াছি কাজ,
সেই তো গৌরব মোর তা'তে কিবা লাজ ?"

ধীরে ধীরে সমস্ত কবিতাটি শেষ করিয়া দেবু বলিল—কালকে এই পদ্যটির মানে লিখে আনবে সবাই। মানে বলতে কথার মানে নয়, কে কি বুঝেছ লিখে আনবে।

পাঠশালার ছুটি দিয়া সে আজ সঙ্গে-সঙ্গেই আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। বাড়ীর উঠানে তখন তাহার স্ত্রীর সম্মুখে বসিয়া আছে পদ্ম, অদূরে বসিয়া আছে দুর্গা; তাহার স্ত্রী ইতুলক্ষ্মীর ব্রতকথা বলিতেছে। দেবুর স্ত্রী বড় ভাল উপকথা বলিতে পারে, এ পাড়ায় ব্রতকথার আসর তাহার ঘরেই বসে। সে আসর শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বোধ হয় দ্বিতীয় দফা। দেবুর শিশু-পুত্রটিকে কোলে লইয়া পদ্ম বসিয়াছিল, দেবুকে দেখিয়া সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। দেবুর স্ত্রীও ঘোমটা অল্প একটু টানিয়া হাসিল। দুর্গা কাপড়চোপড় সামলাইয়া গুছাইয়া বেশ একটু বিন্যাস করিয়া বসিল। তাহারও মুখে ফুটিয়া উঠিল মৃদু হাসি। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা দেবুর ছিল না। ব্রতকথা তাহার স্ত্রী ভাল বলে—চমৎকার বলে, তাহাদের পাড়ার সকলেই প্রায় ব্রতকথা শুনিতে তাহার বাড়ীতে আসে। কিন্তু আজ কামার-বউয়ের তাহার বাড়ীতে আসাটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি বিস্ময়কর।

নবান্নের দিন দেবু ওই বধূটিকে কঠোরভাবে ভোগ ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিল। আজও কিছুক্ষণ আগেই পদ্ম পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপের দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপে উঠে নাই, অথচ তাহারই বাড়ীতে ব্রতকথা শুনিতে আসিয়াছে,—এ ব্যাপারটা সত্যই তাহার কাছে বিস্ময়কর মনে হইল। দেবু থমকিয়া দাঁড়াইল, পদ্মকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল দুর্গাকে—কি রে দুর্গা ?

দুর্গার মুখে মৃদু হাসি বিকশিত হইয়া উঠিল, হাসিয়া সে বলিল—কথা শুনতে এসেছি দিদির কাছে। এমন কথা কেউ বলতে পারে না, বাপু। হাজার হোক পণ্ডিত-গিন্নী তো!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—দিদি ? কথাটা তাহাকে পীড়া দিয়াছিল।

—হাঁা গো। দিদি! তোমার গিন্নী যে আমার বিলু দিদি, তুমি যে আমার জামাইবাবু!

দেবুর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কঠোর স্বরেই বলিল—মানে? ও দিদি কি করে হ'ল তোর ?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—হেই মা! আমার মামার বাড়ী যে তোমার শ্বশুরদের গাঁয়ে গো! আমার মামারা যে দিদিদের বাপের বাড়ীর খেয়ে মানুষ—পুরানো

চাকর! দিদি যে আমার মামাকে কাকা বলে; তা হলে আমার দিদি নয়?

ভাল না লাগিলেও প্রসঙ্গটা সম্পর্কে তাহাকে নীরব হইতে হইল। শুধু বলিল—হুঁ। তারপর স্ত্রীকে বলিল—উটি আমাদের কর্মকারের, মানে অনিরুদ্ধের স্ত্রী নয়?

দীর্ঘ অবগুণ্ঠন পদ্ম আরও একটু বাড়াইয়া দিল। দেবুর স্ত্রী চাপাগলায় বলিল—হ্যাঁ।

দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল—কামার-বউয়ের কথা শোনা হয় নাই। ওদের বাড়ী গেলাম তো দেখলাম—ভাম হয়ে বসে ভাবছে। উ পাড়ায় কথা হয় ওই পালের বাড়ীতে—ছিরু পালের বাড়ীতে! ওদের বাড়ী যায় না কামার-বউ; তাতেই বললাম—এসে', আমার দিদির বাড়ীতে এস।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—কামার-বউ ভয় করছিল, পণ্ডিতমশায় যদি কিছু বলে! সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে তুমি নাকি বলেছিলে—

মধ্যপথেই বাধা দিয়া দেবু বলিল—অনিরুদ্ধ যে মহা অন্যায় করেছে!

অকুণ্ঠিত স্বরে অভিযোগ করিয়া দুর্গা বলিল—তোমার মতো লোকের যুগ্যি কথা হ'ল না, পণ্ডিতমশায়। অন্যায় কি একা কর্মকারের? বল তুমি?

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা বটে। বুঝতে আমার ভুল খানিকটা হয়েছিল।

সুযোগ পাইয়া বিনা দ্বিধায় সে ওই দুর্গার মারফতে কামার-বউয়ের কাছে কথাটা স্বীকার করিয়া ভারমুক্ত হইতে চাহিল।

দেবুর স্ত্রী চাপা গলাতেই ব্যস্ত হইয়া বলিল—কেঁদো না কামার-বউ, কেঁদো না!

পদ্ম ঘোমটার আঁচল দিয়া বার বার চোখ মুছিতেছিল; সেটা লক্ষ্য করিয়াছিল।

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—না, তুমি কেঁদো না। অনিরুদ্ধ আমার ছেলেবেলার বন্ধু; এক-সঙ্গে পাঠশালায় পড়েছি। তাকে বলো, আমি যাব—আমি নিজেই যাব তার কাছে।

দুর্গা পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তোমাকে বলেছিলাম তো কামার-বউ, ওই জগন ডাক্তারের মোড়লির পাল্লায় পড়ে জামাই আমাদের এ কাজ করেছে।

—না, না, মিছে পরকে দোষ দিসনে দুর্গা। আমারই বুঝবার ভুল।

এমন আন্তরিকতা-মাখা কণ্ঠে অকপট স্বীকারোক্তি সে করিল যে দুর্গা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। দেবুই আবার বলিল—ওগো, অনিরুদ্ধের বউকে জল খাইয়ে তবে ছেড়ে দিও।

—আর আমি? দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।—ওঃ আমি-বুঝি বাদ যাব? বেশ জামাই-দাদা যা হোক।

স্বৈরিণী মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গি, আত্মীয়তার সুর এমন মিষ্ট এবং মনকাড়া যে, কিছুতেই রাগ করা যায় না তাহার উপর। তাহার কথায় দেবুর বউ হাসিল, পদ্ম হাসিল; দেবুও না হাসিয়া পারিল না। হাসিয়া দেবু বলিল—তোর জন্য ভাবনা তো আমার নয়, সে ভাবনা ভাববে তোর দিদি। আপনার জন থাকতে কি পরের আদর ভাল লাগে রে?

—লাগে গো লাগে। টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি ; দিদির চেয়ে দিদির বর ইষ্টি, আদর আরও মিষ্টি। আমার কপালে মেলে না!

দেবু হাসিয়াই বলিল—নে আর ফাজলামি করতে হবে না, এখন কথা শোন। বলিয়া সে যেন ভারমুক্ত হইয়া লঘুহৃদয়ে ঘরে ঢুকিল।

* * *

"দরিদ্র ব্রাহ্মণের পিঠে খাবার সাধ হয়েছে।"

দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা বলিতেছিল। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবেন—চালের পিঠে, সরুচাকলি, মুগের পিঠে, নারকেল পুরের পিঠে, রাঙা আলুর পিঠে, ভাবেন আর তার জিভে জল আসে।

ঘরের ভিতর বসিয়া দেবু আপন মনেই হাসিল। জল তাহার জিভে আসিতেছে ; বোধ করি ব্রতকথার কথক ঠাকরুন—মায় শ্রোতাদের জিহ্বা পর্যন্তও সজল হইয়া উঠিয়াছে।

"কিন্তু সাধ হলেই তো হয় না, সাধ্যি থাকা চাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, জমি নাই, জেরাত নাই, চাকরি-বাকরি নাই, ব্যবসা নাই, বাণিজ্য নাই, যজ্ঞি নাই, যজমান নাই—আজ খেতে কাল নাই আর কোথায় চাল কোথায় কলাই কোথায় গুড়, রাঙা আলুই বা আসে কোথা থেকে ? আর ব্রাহ্মণ হয়েও চুরি করতে তো পারেন না! কি করেন ?"

দেবু ব্রাহ্মণের সততার তারিফ না করিয়া পারিল না।

"কিন্তু ব্রাহ্মণের বুদ্ধি তো! তিনি এক ফন্দি বার করলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাসের শেষ। মাঠ থেকে গেরস্তের গাড়ী গাড়ী ধান আসছে, কলাই আসছে, আলু আসছে, গাড়ীর চাকায় পথের মাটি গুঁড়ো হয়ে একহাঁটু করে ধুলো হয়েছে। ব্রাহ্মণ বুদ্ধি করে সন্ধ্যার পর বাড়ীর সামনেই পথের ধুলোর ওপর আরও খানিকটা কেটে বেশ একটি গর্ত করলেন—তারপর ঢাললেন ঘড়া ঘড়া জল। পরের দিন যত গাড়ী আসে, সব পড়ে ওই গর্তের কাদায়। চাকা আটকে যায়। ব্রাহ্মণ সেই গাড়ী তুলিতে সাহায্য করেন আর চাষীদের কাছে আদায় করেন—ধানের গাড়ী থেকে ধান, কলাইয়ের গাড়ী থেকে কলাই, গুড়ের নাগরি থেকে গুড়। এমনি করে ধান, কলাই, গুড়, আলু যোগাড় করে ঘরে তুললেন, তারপর ব্রাহ্মণীকে বললেন, নে, বামনি এবার পিঠে তৈরী কর।"

দেবু এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার হাসিতে ব্রতকথা বন্ধ হইয়া গেল। বাহির হইতে দুর্গা প্রশ্ন করিল—পণ্ডিত-মশায়, হাসছ ক্যানে গো তুমি ?

দেবু বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—বামুনের বুদ্ধির কথা শুনে। আচ্ছা বামুন!

দেবুর স্ত্রী মৃদু হাসিয়া ঘোমটা আরও একটু বাড়াইয়া দিল। বলিল—কথাটা শেষ করতে দাও, বাপু!

—আচ্ছা—আচ্ছা! বলিতে বলিতে দেবু বাহির হইয়া গেল।

* * *

পরিতুষ্ট লঘু মন লইয়া দেবু বাহিরে আসিয়া পথের ধারে বাহিরের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইল। পল্লীগ্রামে জলখাবার বেলা হইয়াছে। মাঠ হইতে চাষীরা বাড়ী ফিরিতেছে। চাষী-শ্রমিকেরা মাঠেই জল খায়, তাহাদের জলখাবার লইয়া মেয়েরা চলিয়াছে মাঠে; মাথায় তাহাদের গামছায় বাঁধা জলখাবারের পাত্র—কাঁকালে ঝুড়ি, হাতে জলের ঘটি। পুরুষদের জলখাবার খাওয়াইয়া, এই ধান কাটার সময় তাহার ধানের শীষ সংগ্রহ করিবে, বনজঙ্গল হইতে শুকনা কাঠ ভাঙিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করিবে।

দুই-চারিখানা ধান বোঝাই গাড়ীও মাঠ হইতে ফিরিতেছে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি—ইহারই মধ্যে গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা ময়দার মত ধুলায় ভরিয়া উঠিয়াছে; হেমন্তের শেষ দিন—রৌদ্রের রঙের মধ্যে যেন বৃদ্ধের পাংশু দেহবর্ণের মত শীতের পীতাভ আমেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাড়ীর চাকায় উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় সে রৌদ্রও ধূলি-ধূসর। চণ্ডীমণ্ডপের একপ্রান্তে ষষ্ঠীতলার বুড়া বকুল গাছটার গাঢ় সবুজ পাতাগুলোর উপর ইহারই মধ্যে একটা ধুলার প্রলেপ পড়িয়া গিয়াছে। দেবু অন্যমনস্কভাবে আবার চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপটারও সর্বাঙ্গে ধুলার আস্তরণ। ঘুরিয়া ফিরিয়া সে এইখানেই আসিয়া দাঁড়ায়। এই স্থানটির সঙ্গে তাহার এক নিবিড় যোগাযোগ আছে যেন।

—হ্যাঁ হে নাতি, বলি, পাঠশালা ভাঙল তোমার? সাড়া-শব্দ কিছু নাই যেন লাগছে? এত সকালে? জরা-জীর্ণ কোন নারীকণ্ঠের সাড়া আসিল পথ হইতে।

—এস এস, রাঙাদিদি, এস। আজ ইতু-লক্ষ্মী, হাফ-স্কুল। দেবু সাগ্রহে তাহাকে একটু অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল।

এক বৃদ্ধা—এ গ্রামের রাঙাদিদি, প্রবীণদের রাঙাপিসি। তেল মাখিয়া একগাছি ঝাঁটা হাতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিল। বৃদ্ধা এই গ্রামেরই মেয়ে, সন্তানহীনা; শুধু সন্তানহীনাই নয়, সর্ব-স্বজনহীনা—আপনার জন তাহার আর কেহ নাই। চোখে এখন ভাল দেখিতে পায় না, কানেও খাটো হইয়াছে; কিন্তু দেহে এখনও বেশ সমর্থ আছে। এই সত্তরের উপর বয়সেও সে সোজা খাড়া মানুষ এবং রাঙাদিদি নামটিও নিরর্থক নয়; এখনও তাহার দেহবর্ণ গৌর এবং তাহাতে বেশ একটা চিক্কণতা আছে। লোকে বলে—বুড়ী তেলহলুদে তাহার দেহটাকে পাকাইয়া তুলিয়াছে; দুই বেলায় পোয়াটাক তেল সে সর্বাঙ্গে মাখে, মধ্যে মধ্যে আবার হলুদও মাখে। সে বলে—তোরা সাবাং মাখিস—আমি হলুদ মাখব না? রোজ স্নানের পূর্বে বুড়ী চণ্ডীমণ্ডপে ঝাঁটা বুলাইয়া পরিষ্কার করিয়া যায়। এটি তাহার নিত্যকর্ম।

—ইতুলক্ষ্মীতে হাপ-স্কুল বুঝি? তা বেশ করেছিস। বুড়ী অবিলম্বে ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।—কত গান শুনেছি এখানে ভাই নাতি—নীলকণ্ঠ, নটবর, যোগীন্দ্র; মতিরায়ও একবার এসেছিল। বড় যাত্রার দল। কেত্তন, পাঁচালী, কত হ'ত ভাই! তোরা আর কি দেখলি বল? সে রামও নাই—সে অযুধ্যেও নাই। চণ্ডীমণ্ডপ নিকুবার জন্যে তখন মাইনে করা লোক ছিল, দিনরাত তক-তক্ ঝক্-ঝক্ করত। সিঁদুর পড়লে তোলা যেত।

বুড়ী আপন মনেই বকিয়া যায়। জীবনের যত সমারোহের সুখস্মৃতি—সে সমস্তই সে আহরণ করিয়াছে এই স্থানটি হইতে। এখানে আসিয়া তাহার সব কথা মনে পড়িয়া যায়। রোজ সে এই কথাগুলি বলে।—কত বড় বড় মজলিস ভাই, গাঁয়ের মাতব্বরেরা এসে বসত, বিচার হ'ত; ভাল-মন্দতে পরামর্শ হ'ত। তখন কিন্তুক মেয়েদের পা বাড়াবার যো থাকত না। ওরে বাস্ রে, মোড়লদের সে হাঁকাড়ি কি?

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি মলেই দিদি চণ্ডীমণ্ডপে আর ঝাঁট পড়বে না!

বুড়ীর ঝাঁটা মুহূর্তে থামিয়া গেল, উদাসকণ্ঠে বলিল—মা কালী—বুড়ো বাবা আপনার কাজের ব্যবস্থা করে নেবে রে ভাই।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বুড়ী বলিল—মরবার সময় যেন তোরা ধরাধরি করে এইখানে এনে বুড়ীকে শুইয়ে দিস, ভাই!

দেবু বলিল—তা দোব! তুমি কিন্তু তোমার কিছু পোঁতা টাকা আমাদের দিয়ে যেও—চণ্ডীমণ্ডপটা মেরামত করাব।

অন্য কেহ এ কথা বলিলে বুড়ী আর বাকী রাখিত না, তাহাকে গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে কাঁদিতে বসিত। কিন্তু দেবু যেন এ গ্রামের অন্য সকল হইতে পৃথক মানুষ। বুড়ী তাহাকে গালিগালাজ না দিয়া বলিল—হ্যাঁ নাতি, তুইও শেষে এই কথা বল্‌লি ভাই? গোবর কুড়িয়ে ঘুটে বেচে, দুধ বেচে, এক পেট খেয়ে টাকা জমানো যায়? তুইই বল ক্যানে!

বুড়ী এবার খস খস করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে ঝাঁটা চালাইতে আরম্ভ করিল। টাকার কথাটা সে আর বাড়াইতে চায় না। টাকার কথা হইলেই বুড়ীর ভয় হয়—হয়তো কেহ কোনদিন রাত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া সর্বস্ব লইয়া পালাইবে। বুড়ীর কিছু টাকা আছে সত্য,—দুই-তিন জায়গায় মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। বেশী নয়, সর্বসমেত দশ কুড়ি পাঁচ টাকা।

* * *

মন্থরগতি—উত্তেজনাহীন পল্লীজীবন। ইহারই মধ্যে রাস্তায় মানুষ চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল দুই-একখানা গরুর গাড়ীতে মাঠ হইতে ধান আসিতেছে। কাঁচ-কোঁচ-ক্যোঁ—একঘেয়ে করুণ শব্দ উঠিতেছে। কর্মহীন দেবুও অলসভাবে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছিল। পৌষমাস গেলে—মাঠের ধান ঘরে আসিলে, এ গাড়ী কয়খানাও আর যাওয়া-আসা করিবে না। সেবার বিশু ভাই একটা কথা বলিয়াছিল—'আমাদের গ্রামের সেই গরুর গাড়ী চ'ড়ে জীবন-যাত্রা আর বদলাল না। গ্রামগুলো গরুর গাড়ী চড়ে বলেই এমন পিছিয়ে আছে, জীবনটাই হয়ে গেছে 'ঢিমে তেতলা'। অন্যদেশে চাষের কাজে এখন চলছে কলের লাঙল, মোটর-ট্র্যাক্টর। তাদের গ্রাম চলে লরীতে ট্রাকে।

দেবু অবশ্য বিশ্বনাথের কথা স্বীকার করে না। কিন্তু গরুর গাড়ী চড়িয়া এখানে যে

জীবন চলিয়াছে সে কথা মিথ্যা নয়। ঢিমা-ঢিলা চালে কোনমতে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে···ওই চাকার ক্যাঁ-কোঁ শব্দের মত কাতরাইতে কাতরাইতে।

ভূপাল বাগ্দী চৌকিদার আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল—পেনাম পণ্ডিতমশায়! ভূপালের পিছনে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে, হাতে একটি হাঁড়ি।

দেবু অন্যমনস্কভাবেই হাসিয়া বলিল—ভূপাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার নিকিয়ে-চুকিয়ে দিয়ে যাই চণ্ডীমণ্ডপটি। লে গো লে, সেই উ-পাশ থেকে আরম্ভ কর।

মেয়েটার হাতের হাঁড়িতে ছিল গোবর-মাটির গোলা, সে নিকাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। ভূপাল—সরকারী চৌকিদার আবার জমিদারের লগ্দীও বটে; আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র—এই তিন কিস্তির প্রারম্ভে তিনবার চণ্ডীমণ্ডপ তাহাকে গোলা দিয়া নিকাইতে হয়। লগ্দীর পাঁচটার কর্তব্যের মধ্যে এটাও একটা।

দেবু এবার সচেতন হইয়া হাসিয়া বলিল—এ যে হরিঠাকুরের পূজো করা হ'চ্ছে ভূপাল। চক্রবর্তী ঠাকুরের পূজো করার মত কাণ্ড হচ্ছে ভূপাল। পাঁচখানা গাঁয়ে চক্রবর্তী ঠাকুর পূজো করে। একদিন এক গাঁয়ে গিয়ে একেবারে পাঁচদিনের পূজো ক'রে আসে। আবার পাঁচদিন পরে যায়। পৌষ-কিস্তির যে এখনও অনেক দেরি হে!

পণ্ডিতের কথায় ভূপাল না হাসিয়া পারিল না, বলিল—আজ্ঞে আমাদের যুধিষ্ঠির থানাদারও (চৌকিদার) তাই করে; সন্ঝে-বেলায় বার হয়, রাত্রে তিনবার হাঁক দেবার কথা—ও একেবারেই তিনবার হাঁক দিয়ে ঘরে এসে শোয়।

দেবু সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ভূপাল বলিল—আমি সেটা করি না,—পণ্ডিতমশায়। গোমস্তামশায় এসে গিয়েছেন আজ।

—এসে গিয়েছেন? এত সকালে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার সকাল-সকালই বটে। সেটেল্‌মেণ্টার এসেছে কিনা।

—সেট্‌লমেণ্ট ক্যাম্প?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ধুমধাম কত, তাঁবুটাবু নিয়ে সে বিশ-পঁচিশখানা গাড়ী। শুনেছি 'খানাপুরী' আরম্ভ হবে ৭ই পৌষ হ'তে। আজই সন্ঝেতে বোধ হয় ঢোল সহরত হবে। খেয়েই আমাকে কঙ্কণা যেতে হবে।

সেটেল্‌মেণ্টের খানাপুরী? সমস্ত মাঠ জুড়িয়া পাকাধান—সেই ধানের উপর শেকল টানিয়া—বুটজুতায় ধান মাড়াইয়া—খানাপুরী?

ভূপাল বলিল—ধান এবার মাঠেই ঝাড়াই হবে পণ্ডিতমশায়।

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইল। এ যে অন্যায়! এ যে অবিচার!

তেরো

"যিনি করেন 'ইতুলক্ষ্মী' তাঁর ভাগ্যি হয় ব্রতকথার 'ঈশনে'—মানে 'ঈশানী'র মত ধান, কলাই, ছোলা, মুগ, যব, সরষে, তিসি নানান ফসলে থৈ থৈ করে ক্ষেত, গাড়ীতে গাড়ীতে তুলে ফুরোয় না। খামার জুড়ে মরাই বেঁধে কুলোয় না। একমুঠো তুলতে দু-মুঠো হয়। তার ক্ষেত-খামার ভাঁড়ার ভরে মা লক্ষ্মী অচল হয়ে বাস করেন। ঘর ভরে যায় সন্তান-সন্ততিতে, গোয়াল ভরে ওঠে গরুতে-বাছুরে ; গাছ-ভরা ফল, পুকুর-ভরা মাছ, লক্ষ্মীর হাঁড়িতে কড়ি, আট অঙ্গ সোনারূপোয় ঝল্-ঝল্ করে। বউ বেটা আসে, নাতি-নাতনী পাশে শুয়ে স্বামীর কোলে মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে।"

ব্রতকথা শেষ করিয়া 'উলু' 'উলু' হুলুধ্বনি দিয়া দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা শেষ করিয়া প্রণাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা এবং পদ্মও হুলুধ্বনি দিয়া প্রণাম করিল। দুর্গার কণ্ঠস্বর যেমন তীক্ষ্ণ, তাহার জিভখানিও তেমনি লঘু চাপল্যে চঞ্চল,—তাহার হুলুধ্বনিতে সমস্ত বাড়ীটা মুখরিত। প্রণাম করিয়া সুপারীটি দেবুর স্ত্রীর সম্মুখে রাখিয়া সে সরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বিলু দিদি, ভাই কামার-বউ, মরণকালে তোমরা কেউ আমাকে স্বামী ধার দিয়ো ভাই কিন্তুক!

দেবুর স্ত্রীর নাম বিল্ববাসিনী—ডাকনাম বিলু। বিলু হাসিল। তাহার স্বামীকে সে জানে, সে রাগ করিল না। অন্য কেহ হইলে এই কথা লইয়া একটা ঝগড়া বাধাইয়া দিত। এই স্বরূপা স্বৈরিণী মেয়েটা যখন মৃদু বাঁকা হাসি হাসিতে হাসিতে পথে বাহির হয়, তখন এই অঞ্চলের প্রতিটি বধূই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। লজ্জা নাই—ভয় নাই—পুরুষ দেখিলেই তাহার সহিত দুই-চারিটা রসিকতা করিয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যায়।

পদ্মও রাগ করিল না। কয়েকদিন হইতেই দুর্গা তাহার বাড়ী আসা-যাওয়া সুরু করিয়াছে। অনিরুদ্ধকে সে একখানা দা গড়িতে দিয়াছে, সেই তাগাদায় সে এখন দুইবেলা যায় আসে—অনিরুদ্ধের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করে—হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে পদ্মের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু খরিদ্দারকে কিছু বলা চলে না। তাহা ছাড়াও, ইদানীং পদ্ম যেন অকস্মাৎ পাল্টাইয়া অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ যেন তাহার জীবনে একটা সকরুণ উদাসীনতা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সারা জীবনটাকে জুড়িয়া বসিয়াছে এই শীতকালের ভোরবেলায় কুয়াশার মত। ঘর ভাল লাগে না, অনিরুদ্ধ সম্পর্কেও তাহার সেই সর্বগ্রাসী আসক্তিও যেন হতচেতন মানুষের বাহুবন্ধনের মত ক্রমশ এলাইয়া পড়িয়াছে। অনিরুদ্ধ-দুর্গার রহস্য-লীলা সে চোখে দেখিয়াও কিছু বলে না, দেবুর শিশুপুত্রকে আপনার কোল হইতে বিলুর কোলে তুলিয়া দিয়া বলিল—আমার তো ভাই ওইটুকুই পুঁজি! বাদবাকী গরু-বাছুর-বউ-বেটা—বলে 'শির নেই তার শিরঃপীড়া!'—নাতি-নাতনী!—বলিয়া সে একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল—চলি ভাই, পণ্ডিতগিন্নী।

বিলু তাহার হাত ধরিয়া বলিল—জল খাবার নেমতন্ন দিয়ে গিয়েছে—তোমার বরের বন্ধু। দাঁড়াও একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও।

বিলুর কোলের শিশুটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বার বার চুমা খাইয়া পদ্ম বলিল—খোকামণির 'হামি' খেয়ে পেট ভরে গিয়েছে। এর চেয়ে মিষ্টি আর কিছু হয় নাকি?

—না, তা হবে না।

—তবে দাও ভাই খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাই। ইতুর পেসাদ মুখে দিয়ে খাই কি করে বল? পণ্ডিত না হয় এসব জানে না, পণ্ডিতগিন্নীকে তো আর বলে দিতে হবে না!

পথে বাহির হইয়া দুর্গা বলিল—বিলুদিদি আমার ভারী ভাল মানুষ। যেমন পণ্ডিত তেমনি বিলুদিদি! তবে পণ্ডিত একটুকুন কাঠ-কাঠ, রস কম।

পদ্ম কিন্তু দুর্গার কথা যেন শুনিলই না—আমাকে ভাই ছিরু পালের বাড়ীর সামনেটা পার করে দাও।

—মরণ! এত ভয় কিসের? দিনের বেলায় ধরে খেয়ে নেবে নাকি? দুর্গা মুখ বাঁকাইয়া হাসিল। কথাটা বলিয়াও দুর্গা কিন্তু পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পদ্ম বলিল, ওকেই বলি ভাগ্যিমানী। বড়লোক না হোক 'ছচল-বচল' সংসার, তেমনি স্বামী আর ছেলেটি! আহা, যেন পদ্মফুল! যেমন নরম তেমনি কি গা ঠাণ্ডা। কোলে নিলাম—তা শরীর আমার যেন জুড়িয়ে গেল।

—মা সোন্দার, তার ওপর বাপ কেমন সোন্দার, ছেলে সোন্দার হবে না!

পদ্ম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—কোন কথা সে বলিল না। পথে একটা বছর ছয়-সাতের ছোট ছেলে আদিম কালের বর্বর আনন্দে পথের ধুলোর উপর বসিয়া মুঠা-মুঠা ময়দার মত ধুলা আপন মাথায় চাপাইয়া পরমানন্দে হাসিতেছিল। দুর্গা বলিল—এই দেখ, যেমন কপাল—তেমনি গোপাল। যেমন লক্ষ্মীছাড়া বাপ-মা—তেমনি ছেলের রীতিকরণ।

ছেলেটি সদ্গোপবংশীয় তারিণীচরণের। তারিণীচরণ একজন সর্বস্বান্ত চাষী, যথাসর্বস্ব তাঁহার বাকী খাজনার দায়ে নীলাম হইয়া গিয়াছে। সে এখন বাউড়ী, ডোম প্রভৃতি শ্রমিকদের মত দিনমজুর খাটিয়া খায়। তারিণীর স্ত্রীও উপযুক্ত সহধর্মিণী, প্রায় সমস্ত দিনটাই ওর বাউড়ী-ডোমের মেয়েদের মত ঝুড়ি লইয়া বনে-বাদাড়ে কাঠ সংগ্রহ করে, শাক খুঁটিয়া আনে, ডোবার পাঁক ঘাঁটিয়া মাছ ধরে। ওগুলো কিন্তু তারিণীর স্ত্রীর বাহাড়ম্বর, ওই অজুহাতে সে চুরি করিবার বেশ একটি সুযোগ করিয়া লয়। আম-কাঁঠাল শসা-কলা-লাউ-কুমড়া কোথায় কাহার ঘরে আছে—সে সব নখদর্পণে। শাক-কাঠ সংগ্রহের অছিলায় সে আশেপাশেই ঘুরিয়া বেড়ায়। আর সুযোগ পাইলেই পটাপট ছিঁড়িয়া ঝুড়ির তলায় ভরিয়া লইয়া পালাইয়া আসে। আর ওই শিশুটা এমনি করিয়া পথে বসিয়া ধুলা মাখে—কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া আপনিই ঘুমাইয়া পড়ে হয়তো আপনাদের ঘরের অনাচ্ছাদিত দাওয়ায় অথবা কোন গাছের তলায়, ঠাঁই বাছাবাছি নাই। কোন কোন দিন দূর-দূরান্তেও গিয়া পড়ে; বাপ-মায়ে খোঁজে না, চিন্তিত হয় না। ছেলেটা আপনি

আবার ফিরিয়া আসে।

—সর রে, ছেলেটা সর। ধুলো দিস না বাপু, কাল ধোয়া কাপড় পরেছি। দুর্গা রূঢ় তিরস্কারে সাবধান করিয়া দিল।

—ইঃ! বলিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া ছেলেটা একমুঠো ধুলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—দোব ছেলের কষা নিঙ্‌ড়ে। দুর্গা কঠোর স্বরে শাসাইয়া দিল। ধোয়া কাপড়ে ধুলোর ছিটা তাহার কোনমতেই সহ্য হইবে না।

—মিষ্টি দোব, বাবা? মিষ্টি খাবে? পদ্ম ছেলেটিকে তাহার বঞ্চিত জীবনের সকল আকুতি জড়াইয়া সাদরে সম্ভাষণ করিল।

ধুলোর মুঠাটা নামাইয়াও ছেলেটা বলিল—মিছে কথা। উঃ, ভারী চালাক তুই!

আপনার খুঁট খুলিয়া পদ্ম বিলুর দেওয়া মিষ্টিটি বাহির করিয়া বলিল—এইবার ধুলো ফেলে দাও। লক্ষ্মীটি!

—উঁ-হু। তু আগে ওইখানে ফেলে দে!

—ছি, ধুলো লাগবে। হাতে নাতে নাও।

—হিঃ! তাহ'লে তু ধরে মারবি।

—না, তু ফেলে দে ক্যানে।

—দাও হে, তাই ফেলে দাও। ধুলো! বলে—আঁস্তাকুড়ের পাতা কুড়িয়ে খায়। ধুলো! দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তাহার রাগ হইতেছিল। সেও বন্ধ্যা কিন্তু তাহার ছেলে-ছেলে করিয়া আকুতি নাই।

পদ্ম কিন্তু মিষ্টিটি ফেলিয়া দিতে পারিল না, একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে সন্তর্পণে নামাইয়া দিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপরেই নীরবেই পথে অগ্রসর হইল।

—কামার-বউ! সকৌতুকে দুর্গা তাহাকে ডাকিল।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া মাটির উপর চোখ রাখিয়া পদ্মর পথে চলা অভ্যাস; সে তেমনি ভাবেই চলিতেছিল। মুখ না তুলিয়াই সে উত্তর দিল—কি?

—ওই দেখ!

—কি? কোথা? কে?

—ওই যে ছামুতে হে!

দুর্গা খুক খুক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাথার ঘোমটা খানিকটা সরাইয়া মাথা তুলিয়া চারিদিক চাহিয়াই সে আবার তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। সম্মুখেই ছিরু পাল খামারবাড়ীর দরজার মুখে মোড়া পাতিয়া বসিয়া আছে। একা নয়, পাশেই বসিয়া আছে আরও একটা লোক; লোকটার চোখ দুইটা ভাঁটার মত গোল-গোল এবং লালচে। নাকটা থ্যাবড়া এবং নাকের পাশে প্রকাণ্ড একজোড়া বাহারের গোঁফ লোকটাকে বেশ একটা চেহারা দিয়াছে। যে চেহারা দেখিয়া মেয়েরা অস্বস্তি বোধ করে। তাহারা দু'জনেই তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। ও-লোকটাকেও পদ্ম চেনে—

লোকটা জমিদারের গোমস্তা। দ্রুতপদে পদ্ম স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গার কিন্তু সেই মন্থর গতি-ভঙ্গিমা।

গোমস্তা একবার দুর্গার দিকে চাহিল—তারপর ফিরিয়া তাকাইল শ্রীহরির দিকে। তারপর প্রশ্ন করিল—দুর্গার সঙ্গে কে হে পাল?

—অনিরুদ্ধের পরিবার!

—হুঁ! দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে জোট বেঁধে বেড়াচ্ছে ক্যানে হে?

—পরচিত্ত অন্ধকার, কি করে জানব বলুন!

—দুর্গা কি বলে? থায়?

শ্রীহরি গম্ভীরভাবে বলিল—আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি, দাশ মশায়; দুর্গার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলি না।

সবিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাশ বলিল—বল কি হে? সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিকারী গোঁফজোড়াটা নাচিয়া উঠিল। ওইটা দাশের মুদ্রাদোষ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হঠাৎ? ব্যাপার কি?

—নাঃ। ও নীচ-সংসর্গ ভাল নয় দাশজী। সমাজে ঘেন্না করে, ছোটলোকে হাসে। নিজের মান-মর্যাদাও থাকে না।

ঘরে আগুন দিবার ব্যাপারটা লইয়া দুর্গার সঙ্গে শুধু তাহার কলহই হয় নাই, মনে মনে সে একটা প্রবল অস্বস্তি বোধ করিতেছে। মনে হইতেছে শুইবার ঘরে সে সাপ লইয়া বাস করিতেছে। সাপ নয়, সাপিনী। সে দুর্গা!

হাসিয়া দাশ বলিল—বেশ তো, কামারনী তো আর নীচ-সংসর্গ নয়? বেটাকে যখন জব্দই করবে—তখন ঘরের হাঁড়িসুদ্ধ এঁটো করে দাও না!

শ্রীহরি চুপ করিয়া রহিল। এ কামনাটা তাহার বুকে আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহের মতোই রুদ্ধমুখ চাপা হইয়া আছে। নাড়া খাইয়া সেই প্রচ্ছন্ন অগ্নিশিখা ভিতরে ভিতরে প্রবল হইয়া উঠে।

ওদিকে দাশ ফ্যা-ফ্যা করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরির উগ্র চোখ দুইটি সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলিয়া উঠিল। ওই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী বধূটির প্রতি তাহার অন্তরের নগ্ন-কামনার একটি প্রগাঢ় আসক্তি আছে। তাহার মনে পড়ে, ডোবার ঘাটে দণ্ডায়মানা পদ্মের অবগুণ্ঠিত মুখ;—বড় বড় চোখ, ছোট কপাল ঘিরিয়া ঘন কালো একরাশি চুল, ঈষৎ বাঁকা নাক, গালে পাশে বড় একটি তিল,—তাহার হাতে শাণিত দা, নিষ্ঠুর কৌতুকের মৃদু হাসিতে বিকশিত ছোট ছোট সুন্দর দাঁতের সারিটি পর্যন্ত তাহার মনোমধ্যে ঝলমল করিয়া উঠে।

দাশ হাসি থামাইয়া বলিল—তোমার টাকা আছে, ভাগ্যিমান লোক তুমি, তুমি যদি ভোগ না কর তো করবে কি রামা-শ্যামা?

বহুক্ষণ পরে অজগরের মত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীহরি বলিল—ছাড়ান দেন, দাশজী, ওসব কথা। এখন আমি যা বললাম তার কি করছেন বলুন।

—তার আর কি, 'পাল' কেটে 'ঘোষ' করতে আর কতক্ষণ? তবে—জমিদারী সেরেস্তার নিয়ম জান তো—'ফেল কড়ি মাখ তেল', জমিদারকে কিছু নগদ ছাড়, দস্তুরী দাও! আর তা ছাড়া একটা খাওয়াও। শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া দাশ বলিল—হ্যাঁ হে, মদও ছেড়েছ নাকি? যে রকম গতিক তোমার। দাশ একটু বাঁকা হাসি হাসিল।

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—না, না, সে হবে বৈকি। তবে কথা হচ্ছে ওসব আর ঢাক পিটিয়ে হৈ-হৈ করে কিছু করব না। গোপনে আপনার ঘরে বসে বসে যা হয় একটু—মাঝে মাঝে—।

—নিশ্চয়! ভদ্রলোকের মত! দাশজী বার বার ঘাড় নাড়িয়া শ্রীহরির যুক্তি স্বীকার করিয়া বলিল—একশোবার, আমি আগে কতবার তোমাকে বারণ করিচি, মনে আছে? বলেছি 'পাল, ঐ রকম ধারা-ধরন তোমাকে শোভা পায় না'; যাক, শেষ পর্যন্ত তুমি যে বুঝে সামলেছ—এ ত ভাল।

দাশজীর কথা শ্রীহরিও স্বীকার করিয়া বলিল—হ্যাঁ, সে আমি বুঝে দেখলাম দাশজী, মান-সম্মান আপনার ও-রকম করে হয় না, সে-কাল এখন আর নাই।

জমিদারী সেরেস্তার বহুদর্শী বিচক্ষণ কর্মচারী দাশজী, সে হাসিয়া বলিল—কোনকালেই হয় না বাবা, কোনকালেই হয় না। ত্রিপুরা সিংয়ের কথা বল তুমি—তাকে লোকে আজও বলে ডাকাত। সেইটা কি মান-সম্মান নাকি? এই দেখ, এই কঙ্কণার মুখুজ্জেবাবুদের কথা দেখ। বড়লোক হ'ল—তাতেও লোকে বাবু বলত না। তারপর ইস্কুল দিলে, হাসপাতাল দিলে, ঠাকুর পিতিষ্ঠে করলে—আমনি লোকে ধন্যি-ধন্যি করলে, বাবু তো বাবু একেবারে বড়বাবু—বড়-বাড়ীর বড়বাবু খেতাব হয়ে গেল।

—এবার চণ্ডীমণ্ডপটা আমিও বাঁধিয়ে পাকা করে দেব, দাশজী। আর চণ্ডীমণ্ডপের পাশে একটা কুয়ো।

—ব্যস্, ব্যস্, পাকা করে খুদে লিখে দাও কুয়োর গায়ে, চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে—সেবক শ্রী শ্রীহরি ঘোষেণ প্রতিষ্ঠিতং, তারপর তোমার ঘোষ খেতাব মারেং কে? একেবারে পাকা হয়ে যাবে।

—আপনি কিন্তু ওটা করে দেন, সেট্‌লমেণ্টের পরচাতেও ঘোষ লেখাব আমি।

—কাল—কালই করে নাও না তুমি।

শ্রীহরিদের বংশ-প্রচলিত উপাধি পাল। শ্রীহরি পাল উপাধিটা পাল্টাইতে চায়। অনেকদিন হইতেই সে নিজেকে লেখে ঘোষ; কিন্তু আদালতে ঘোষ চলে না। তাই জমিদারী সেরেস্তায় তাহার নামের জমাগুলিতে পাল কাটাইয়া ঘোষ করিতে চায়। ওদিকে গভর্নমেণ্ট হইতে নূতন সার্ভে হইতেছে; রেকর্ড অব রাইট্‌সের দপ্তরেও ঘোষ

উপাধি তাহার পাকা হইয়া যাইবে। পাল উপাধিটা অসম্মানজনক; যাহারা নিজের হাতে চাষ করে, তাহাদের—অর্থাৎ চাষীদের ঐ উপাধি।

দাশজী আবার বলিল—আর সে-কথাটার কি করছ?

—কোন্ কথা, কামার-বউয়ের কথা?

হো হো করিয়া দাশজী হাসিয়া উঠিল। বলিল—সে তো হবেই হে। সে কথা আবার শুধোয় নাকি? আমি বলছিলাম গোমস্তাগিরির কথাটা।

শ্রীহরি লজ্জিত হইয়া পড়িল। অতর্কিতে সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অপ্রস্তুতের মতই বলিল—আচ্ছা ভেবে দেখি।

ঠিক এই মুহূর্তেই ক্ষুর-ভাঁড় বগলে করিয়া আসিয়া হাজির হইল তারাচরণ পরামাণিক। গভীর ভক্তির সহিত একটি নমস্কার করিয়া মোলায়েম হাসি হাসিয়া সম্ভাষণ জানাইল—পেনাম আজ্ঞে।

কপালের উপরে দৃষ্টি টানিয়া তুলিয়া তারাচরণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাশজী বলিল —এস বাপধন এস। কি সংবাদ?

মাথা চুলকাইয়া তারাচরণ বলিল—গিয়েছিলাম কঙ্কণায়। বাড়ী এসেই শুনলাম, মা বললে—গোমস্তামশাই এসেছেন,—শুনেই জোর-পায়ে আজ্ঞে আসছি—সে অকারণে হাসিতে লাগিল।

তারাচরণের এই হাসিটি তাহার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। যাহার ডাকে সে সর্বাগ্রে না যায়—সেই-ই চটিয়া উঠে। তাই তারাচরণ মনস্তুষ্টির জন্য এই মিষ্টি হাসিটি হাসে, শ্লেষে-তিরস্কারেও সে এমনি করিয়া হাসে। আরও একটি সত্য সে আবিষ্কার করিয়াছে—সেটিকেও সে কাজে লাগায়। প্রতিবেশীর গোপন তথ্য জানিবার জন্য মানুষের অতি ব্যগ্র কৌতূহল। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সে গ্রামে-গ্রামান্তরে নানাজনের বাড়ীতে যায়। রামের বাড়ীর খবর সে শ্যামকে বলে, শ্যামের সংবাদ যদুকে দেয়; আবার যদুর কথা মধুকে নিবেদন করিতে করিতে তাহার বিরক্তি অপনোদন করিয়া তাহাকে খুসী করিয়া তোলে। সেই অবসরে আবার তাহাদের বাড়ীরও দুই-চারিটি গোপন সংবাদ জানিয়া লয়।

গাড়ু হইতে বাটিতে জল ঢালিয়া লইয়া সে আরম্ভ করিল—কঙ্কণাতে হৈ-হৈ কাণ্ড। আজ্ঞে বুঝলেন কিনা! তাঁবু পড়েছে আট-দশটা,—গাড়ী গাড়ী কাগজ জড়ো হয়েছে।

—হুঁ—সেলট্‌মেণ্ট ক্যাম্প বসেছে।

কৌশলী তারাচরণ বুঝিল—এ সংবাদে গোমস্তার চিত্ত সরস হইবে না। চকিতদৃষ্টিতে শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—শ্রীহরির মুখও গম্ভীর। মুহূর্তে সে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া বলিল—এবার পোয়া বারো হ'ল দুর্গা-টুর্গার। দু'হাতে টাকা লুটবে। টেরিকাটা আমিনের দল যা দেখলাম! বুঝলে ভাই পাল?

গোমস্তা ধমক দিল—পাল কি রে, ভাই কি রে? ভাই পাল বলিস কেন? ওকে তুই

'ভাই পাল' বলবার যুগ্যি ? 'বুঝলেন' বলতে পারিস না, না ?

—আজ্ঞে ?

—ঘোষমশায় বলবি। পাল হ'ল যারা নিজের হাতে চাষ করে। এ গাঁয়ের মাথার ব্যক্তি হলেন শ্রীহরি।

তারাচরণ নীরবে সব শুনিতে আরম্ভ করিল। অনেক কথাই শুনিল—মায় এ গ্রামের গোমস্তাগিরিও যে শ্রীহরি ঘোষ মহাশয় লইতেছেন, সে কথাটা আভাসে সে অনুমান করিয়া লইল। তৎক্ষণাৎ বলিল—একশোবার হাজারবার, ঘোষ মহাশয়ের তুল্য ব্যক্তি এ ক'খানা গাঁয়ে কে আছে বলুন ? গোমস্তার গালের উপর ক্ষুরের একটা টান দিয়া সে চাপা গলায় বলিল—উনি ইচ্ছে করলে দুর্গার মত বিশটা বাঁদী রাখতে পারেন।

হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে ক্ষুর চালাইতে নিষেধ করিয়া দাশজী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ কামারের বউটা দুর্গার সঙ্গে জোট বেঁধে বেঁধে বেড়ায় কেন রে ? ব্যাপার কি বল্ তো ?

—তাই নাকি ? আজই খোঁজ নিচ্ছি দাঁড়ান ! তবে কর্মকারের সঙ্গে দুর্গার আজকাল একটুকু—তারাচরণ হাসিল।

—নাকি ?

—হ্যাঁ !

শ্রীহরি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পদ্মকে লইয়া এমনভাবে আলোচনা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। ওই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির প্রতি তাহার আসক্তি প্রচণ্ড—কামনা প্রগাঢ়, যে আসক্তি ও যে কামনাতে মানুষ মানুষকে, পুরুষ নারীকে একান্তভাবে একক ও নিতান্তভাবে নিজস্ব করিয়া পাইতে চায়, এক জনশূন্য লোকে—সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মতো ; অন্ধকার গুহার নিস্তব্ধতম আবেষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিণীর মতো—শতপাকের নাগপাশের বন্ধনের মধ্যে !

* * * *

পদ্মের বাড়ী আসিয়া দুর্গা দেখিল—পদ্ম আবার স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। পদ্ম দ্রুতপদে চলিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পর দুর্গা কিছুক্ষণ একটা গলির আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। গোমস্তাটিকে সে ভাল করিয়াই জানে। শ্রীহরির তো নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত তাহার নখদর্পণে। তাহাদের কথাবার্তা শুনিবার জন্যই সে লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোমস্তার কথা শুনিয়া সে হাসিল ; শ্রীহরির কথাবার্তার ধরনে সে অনুভব করিল বিস্ময়। তারাচরণ আসিতেই সে চলিয়া আসিয়াছে। গামছা কাঁধে ফেলিয়া পদ্ম তখন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল। দুর্গা প্রশ্ন করিল—এ কি ? আবার চান ?

—হ্যাঁ।

—ছোঁয়াচ পড়লো বুঝি ? যে পাঁচহাত 'সান' তোমার ! কিছু ছোঁয়াটা আর আশ্চয্যি কি !

অপ্রস্তুতের মত হাসিয়া পদ্ম বলিল—না—মাড়াই নাই কিছু।

—তবে ?

—ছেলেতে ময়লা করে দিলে কাপড় ।

—তোমার ওই এক বাতিক, ছেলে দেখলেই কোলে নেবে। নিজের নাই পরের নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট বাড়াও ক্যানে বল তো ? এর মধ্যে আবার কার ছেলে নিতে গেলে !

পদ্ম এবার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া একটু হাসিল,—ছিরু পালের ছেলে।

দুর্গা অবাক হইয়া গেল।

পদ্ম বলিল—গলির মুখে বউটি দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, কোলে ছোটটা ঘ্যান-ঘ্যান্ করছে, পায়ের কাছে বড়টা কোলে চাপবার জন্যে মায়ের কাপড় ধরে টেনে ছিঁড়ে একাকার করছে আর চেঁচাচ্ছে; বাড়ীর ভেতরে শাশুড়ী গাল পাড়ছে—বিয়েনখাগী, সব খেয়েছিস, আর ও দু'টো ক্যানে ? ও দু'টোকেও খা, খেয়ে তুইও যা, আমি বাঁচি। তাই ছোটটাকে একবার নিলাম—মা তখন বড়টাকে নিয়ে চুপ করালো। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—পালের বউটি কিন্তুক বড় ভাল মেয়ে, বড় ভাল! তাহার মনে পড়িয়া গেল সেই সেদিনের কথা।

শ্রীহরির স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্গার কোন অভিযোগ নাই, বরং তাহার কাছে তাহার নিজেরই একটি গোপন অপরাধ-বোধ আছে। এ গ্রামের বধূদের সকলেই তাহাকে অভিসম্পাত দেয়, কটু কথা বলে—সে-কথা সে জানে। কেবল দুটি বউয়ের বিরুদ্ধে সে এ অভিযোগ করিতে পারে না; একজন বিলু দিদি—পণ্ডিতের স্ত্রী, অপর জন শ্রীহরির স্ত্রী। পণ্ডিতের স্ত্রী না করিবারই কথা—পণ্ডিত সম্বন্ধে তো তাহার আশঙ্কার কিছু নাই, সে সাধু লোক; কিন্তু ছিরুর সহিত তার প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও শ্রীহরির স্ত্রী কোনদিন তাহাকে কটু কথা বলে নাই——অভিসম্পাত দেয় নাই। পালের স্ত্রীর সঙ্গে চোখে চোখ রাখিতে তাহার সত্যই লজ্জাবোধ হয়। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া, অকস্মাৎ বোধ হয় শ্রীহরির স্ত্রীর প্রসঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই সে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিল; বলিল—কে জানে ভাই, কচি-কাঁচা দেখলে আমার তো গা ঘিন্-ঘিন্ করে! মা গো ?

পদ্ম অত্যন্ত রূঢ়দৃষ্টিতে তাহার-দিকে চাহিল।

দুর্গা তাহা লক্ষ্যই করিল না, অবশ্য লক্ষ্য করিলেও সে গ্রাহ্য করিত না। তাচ্ছিল্যের একটা বাঁকা হাসির শাণিত ছুরিতে উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দিত। তেমনি উপেক্ষার ভঙ্গিতে সে বলিয়া গেল—আমাদের বউটার আবার এই বুড়ো বয়সে ছেলেপিলে হবে। আমি ভাই এখন থেকে ভাবছি—সেই ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদবে, পাখীর বাচ্চার মতো ক্ষণে ক্ষণে ক্যাঁথা কাপড় ময়লা করবে,—মা গোঃ।

মুহূর্তে পদ্মের বিচিত্র রূপান্তর হইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল—কোন্ দেবতার দোর ধরেছিল তোমাদের বউ ?

—দেবতা ? দেবতা তো অনেককেই দয়া করেছে। তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল —শেষ ওই ঘোষালের—

—ঘোষালেরা কবচ দেয় নাকি ?

—মরণ তোমার ! ওই হরেন ঘোষালের সঙ্গে বউ-এর এতকালে আশনাই হয়েছে। বউ তো আর বাঁজা নয়, তাই সন্তান হবে।

পদ্ম স্থিরদৃষ্টিতে দুর্গার দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—শুধু তো মেয়েই বাঁজা হয় না, পুরুষেরও দোষ থাকে। তা জান না বুঝি ?

সে দৃষ্টান্ত দিতে আরম্ভ করিল ; আশ-পাশ গ্রামের বহু দৃষ্টান্তই সে জানে। এই জীবনের—এই পথের পথিকদের প্রতিটি সংবাদ সে জানে, প্রতিটি জনকে চেনে। তাহারা হয়তো আড়াল দিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চলিতে চায়—কিন্তু সে যে অহরহ পথের উপর অনবগুণ্ঠিত মুখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে পথের যাযাবরীর মত ; ওই পথেই যে সে বাসা বাঁধিয়াছে।

শীতের দিন—জলের হিম মানুষের দেহে যেন সুচ ফুটাইয়া দেয়। সকাল বেলাতেই দুইবার স্নান করিয়া পদ্মের শরীর যেন অসুস্থ হইয়া পড়িল। সমস্ত দিনেও বেচারী সে অসুস্থতা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। রান্নাশালায় আগুনের আঁচেও সে আরাম পাইল না। রান্নাবান্না শেষ করিয়াও সে কিছু খাইল না, সমস্ত অনিরুদ্ধের জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। কর্মকার সকালেই খাবার বাঁধিয়া লইয়া ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশনে তাহার নূতন কামারশালায় গিয়াছে।

অপরাহ্ণে সে ফিরিল। পদ্ম চুপ করিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিল, অসুস্থ উদাসীনতা তাহার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। অনিরুদ্ধ একে ক্লান্ত, তাহার উপর পথে দুর্গার বাড়ীতে খানিকটা মদ খাইয়া আসিয়াছে। পদ্মের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নির্বাক পদ্মের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া উঠিল—বলি, তোর হ'ল কি ?

পদ্ম এতক্ষণে অনিরুদ্ধের দিকে চাহিল।

অনিরুদ্ধ আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—হ'ল কি তোর ?

শান্তস্বরে পদ্ম জবাব দিল—কি হবে ? কিছুই হয় নাই।...শরীরের অসুস্থতার কথা অনিরুদ্ধকে বলিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না, ভালও লাগিল না। পাথরকে দুঃখের কথা বলিয়া কি হইবে ? অরণ্য-রোদনে ফল কি ? কথার শেষে একটি বিষণ্ণ মৃদু হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তবে ? তবে উদাসিনী রাই-এর মত বসে রয়েছিস—চালকাঠের দিকে চেয়ে ?

মুহূর্তে পদ্ম যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—তাহার অলস শিথিল দেহের সর্বাঙ্গে চকিতের জন্য একটি অধীর চাঞ্চল্য যেন খেলিয়া গেল, তাহার চোখ দু'টি ক্রোধে রক্তাভ,

উগ্রভঙ্গিতে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধের মনে হইল—দুই টুকরা লোহা যেন কামারশালায় জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে আগুনের চেয়েও দীপ্তিময় এবং উত্তপ্ত হইয়া গলিবার উপক্রম করিতেছে। পদ্মের দেহখানা পর্যন্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দুঃসহ উত্তাপ ছড়াইতেছে। এ মূর্তি পদ্মের নূতন। অনিরুদ্ধ ভয় পাইয়া গেল। এইবার পদ্ম কি বলিবে, কি করিবে—সেই আশঙ্কায় সে অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। পদ্ম কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। তাহার ক্রোধ পাত্রে-আবদ্ধ জ্বলন্ত ধাতুর মতোই তাহার দৃষ্টি ও দেহভঙ্গির মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হইয়া রহিল ;—কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনিরুদ্ধ দেখিল—পদ্ম যেন কাঁপিতেছে ; সে শঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—কি হ'ল পদ্ম ? পদ্ম !

সর্বদেহ সঙ্কুচিত করিয়া পদ্ম বোধ হয় অনিরুদ্ধের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না—কাঁপিতে কাঁপিতেই সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

* * *

অনিরুদ্ধ ছুটিয়া জগন ডাক্তারের কাছে চলিয়াছিল।

পথে চণ্ডীমণ্ডপের উপরে ডাক্তারের আস্ফালন শুনিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপেই উঠিয়া আসিল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ডাক্তার কেবল আস্ফালন করিতেছে—দরখাস্ত করব। কমিশনারের কাছে টেলিগ্রাম করব।

উর্দি-পরা একজন সরকারী পিওন চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালের গায়ে একটা নোটিশ লটকাইয়া দিতেছে। "আগামী ৭ই পৌষ হইতে এই গ্রামে সার্ভে-সেটেল্‌মেণ্টের খানাপুরী আরম্ভ হইবেক। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন আপন জমির নিকট উপস্থিত থাকিয়া সীমানা সরহদ্দ দেখাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য করা যাইবেক।"

গ্রামের লোকগুলি চিন্তিতমুখে গুঞ্জন করিতেছে।

শ্রীহরি ও গোমস্তা কথা বলিতেছে সেটেল্‌মেণ্ট হাকিমের পেশ্‌কারের সঙ্গে।—মাছ—একটা বড় মাছ !

দেবু নীরবে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। অনিরুদ্ধ তাহারই কাছে ছুটিয়া গেল। জংশন হইতে ফিরিবার পথে দুর্গার বাড়ীতে সকালবেলার কথা সব শুনিয়াছে। দেবুকে সে বরাবরই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে ; সেদিন সে তাহার উপর রাগ ঠিক করে নাই—অভিমানই করিয়াছিল। আজও দুর্গার কাছে সব শুনিয়া, দেবুর উপর তাহার অভিমান দূর হইয়া প্রগাঢ় অনুরাগে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে।

আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে সে বলিল—দেবু ভাই !

—কি, অনি ভাই কি হ'ল ?

অনিরুদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবুই জগন ডাক্তারকে ডাকিল,—শীগ্‌গির চল, অনিরুদ্ধের স্ত্রী মূর্ছা হয়েছে।

জগন ভ্রূকুঞ্চিতে অনিরুদ্ধের দিকে একবার চাহিল, তারপর নিজেই অগ্রসর হইয়া ডাকিল—এস তাহলে।

সেটেল্‌মেণ্ট সংক্রান্ত বক্তৃতা আপাততঃ মুলতবী থাকিল; চলিতে চলিতে সে আরম্ভ করিল গ্রাম্য লোকের অকৃতজ্ঞতার উপর এক বক্তৃতা।—তবু আমার কর্তব্য করে যাব আমি। চিকিৎসক যখন হয়েছি তখন ডাকবামাত্র যেতে হবে আমাকে, যাব আমি! তিনি পুরুষ ধরে গাঁয়ে ফি দেয়নি, আমিও নেব না ফি! ফি? ডাক্তার হাসিল—ওষুধের দামই কেউ দেয় না তো—ফি।

দেবু পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া বলিল—বিড়ি খাও ডাক্তার।

—দাও। বিড়িটা দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া ডাক্তার বলিল—তোমায় খাতা দেখাব পণ্ডিত—দশ হাজার টাকা! আমাদের দশ হাজার টাকা ডুবিয়ে দিলে লোকে, খাতিরের লোক হ'ল মহাজন—যারা সুদ নেয়; কঙ্কণার বাবুরা—ছিরে পাল—এরাই।

জগনের ডাক্তারখানার সম্মুখেই সকলে আসিয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারখানা হইতে একটা শিশি লইয়া ডাক্তার বলিল—চল। এক মিনিট—এক মিনিটেই চেতন হয়ে যাবে; ভয় নেই।

চৌদ্দ

আকাশের ভোরের আলো ভাল করিয়া তখনও ফোটে নাই—দেবু বিছানা ছাড়িয়া উঠে। শৈশব হইতেই তাহার এই অভ্যাস। একা দেবুর নয়—পল্লীর অধিকাংশ লোকই, দিন সুরু হইবার পূর্ব হইতেই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে। মেয়েরা উঠিয়া দুয়ারে জল দেয়, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে, নিকায়, পুরুষেরা গরু-বাছুরকে খাইতে দেয়। ইহা ছাড়াও যাহার বাড়ীতে যখন ধান-ভানার কাজ থাকে তখন তাহার বাড়ীতে জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠে রাত্রির শেষ-প্রহর হইতে। রাত্রির নিস্তব্ধ শেষ-প্রহরে ঢেঁকির শব্দ উঠে দুম-দুম-দুম করিয়া একটি নির্দিষ্ট তালে; মৃদু কথাবার্তার সাড়া পাওয়া যায়, কেরোসিনের ডিবের আলোর আভাস জাগে। পল্লীর এই সময় ওই নূতন ধানের সময় অনেক বাড়ী হইতে ঢেঁকির সাড়া উঠেই। আজ কোন বাড়ীতেই সাড়া উঠে নাই। 'ইতুলক্ষ্মী'র পর্ব, শস্তের উপর ঢেঁকি আঘাত দিতে নাই; আজ শস্যের দিন।

বিলুকে দেবু বলিল—দেখ আজ বাইরের উঠানটাও নিকুতে হবে। গোমস্তা এসেছে—এখন কিছুদিন বাড়ীতেই পাঠশালা বসবে।

গোমস্তা আসিয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপে এখন গোমস্তার কাছারী বসিবে। গ্রাম্য দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত হিসাবে চণ্ডীমণ্ডপের মালিক জমিদার, তবে সাধারণের ব্যবহারে স্থান—[illegible] অধিকার আছে। [illegible]

[illegible]

সেই দায়িত্বে চণ্ডীমণ্ডপটির রক্ষণাবেক্ষণও তাহারাই করে। চাঁদা করিয়া খড় তুলিয়া তাহারাই ছাওয়ায়, প্রয়োজন হইলে ভাঙা-ফুটো তাহারাই মেরামত করায়, এমন কি চণ্ডীমণ্ডপটি তাহারাই একদা নিজেরা চাঁদা তুলিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। সে অনেক পূর্বের কথা,—তখনকার জমিদার মালিক হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন মাত্র! তাহার অধিক দিয়াছিলেন গোটা দুই তাল গাছ—চাল কাঠের জন্য।

চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিয়া দেবু মাঠের দিকে বাহির হইয়া গেল; গ্রামের প্রবীণারা তখন বাবা-শিব ও মা-কালীর দুয়ারে জল ছিটাইয়া প্রণাম করিতেছে। জলে-জলে দেবতার ঘরের চৌকাঠের নিচের কাঠ একেবারে পচিয়া খসিয়া গিয়াছে, কপাটের নিচের খানিকটাও ক্ষয়িষ্ণু হইয়াছে। এবার মেরামত না করাইলে পূজার সময় ভোগের সামগ্রীর গন্ধে বিড়াল তো ঢুকিবেই—কুকুর প্রবেশ করিলেও আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে না!

খোঁড়া পুরোহিত বলে—এত করে জল দিও না, মা-সকল, জল একটুকুন কম করেই দিও; তোমাদেরই পরলোকের পথে কাদা হবে, পেছল হবে—তাতেই বলছি। শেষে রথের চাকা গেড়ে গিয়ে আর উঠবে না।

মোড়লপিসি মুখের মত জবাব দেয়, বলে—রথের ঘোড়া তো আর তোমার ওই তে-ঠেঙে খেতো ঘোড়া নয়, ঠাকুর; তার লেগে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

পুরোহিত হাসিয়া বলে—আমার ঘোড়া সেই রথের ঘোড়ারই বাচ্চা মোড়লপিসি। আমার ঘোড়ার তো তিনটে ঠ্যাঙ, ওর মা-বাবার মাত্তর দুটো, শোন নাই, 'ডান ঠ্যাঙটা লটর-পটর, বাঁ ঠ্যাঙটা খোঁড়া, বাবা বদ্দিনাথের ঘোড়া।'

জগন ডাক্তার বলে আরো কর্কশ কঠোর কথা, বলে—কেউ চোর, কেউ ছ্যাচড়, কেউ ছেনাল; হিংসুটে-বদমাস-কুঁদুলী তো সবাই; সকালে আসেন সব পুণ্যি করতে! নিয়ম করে দাও, দেবতার দোরে জল দিতে হলে সবাইকে রোজ একটি করে পয়সা দিতে হবে; দেখবে একজনাও আর আসবে না। দেখ না, পুকুরের জল সব ঘড়াঘড়া আনছে আর ঢালছে।

দেবু কোন কথাই বলে না। জগনের কথা অবশ্য মিথ্যা নয়, যে অপবাদ সে দেয়, তাহা অনেকাংশেই সত্য! কিন্তু নিত্য-নিয়মিত প্রথম প্রভাতে দেবু যখন ইহাদের দেখে, তখন ওই পরিচয়গুলির কোন চিহ্নই তাহাদের চোখেমুখে ভাবেভঙ্গিতে সে দেখিতে পায় না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একদল মানুষকে সে দেখে। তখন ইহারা প্রত্যেকেই যেন এক এক কল্পলোকের যাত্রী। ইহারা যদি সদা-সর্বদা এমনই মানুষ থাকিত! কিন্তু এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া বাড়ীতে পা দিতে-না-দিতেই প্রতিটি জনই আবার নিজমূর্তি ধারণ করে। কেহ আপনার দুঃখকষ্টের জন্য ভগবানকে শতমুখে গালি পাড়ে; কেহ হয়তো ঘাট হইতে অন্যের বাসন তুলিয়া লয়, কেহ হয়তো রাস্তায় প্রতীক্ষা করে 'পাইকারের' অর্থাৎ গরু-বাছুরের দালালদের,—বুড়ো গাইটাকে বেচিয়া দিবে, দালালেরা বুড়ো গাই লইয়া কি করে সে সকলেই জানে। কিন্তু কয়েকটা টাকার লোভও সম্বরণ করা তখন ইহাদের সাধ্যের অতীত।

মানুষেরা আশ্চর্য, মানুষেরা বিচিত্র—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবু চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল।

কৃষাণেরা মাঠে চলিয়াছে ; বাউড়ী, ডোম, মুচী প্রভৃতি শ্রমিক চাষীর দল। পরনে খাটো কাপড়, মাথায় গামছাখানা পাগড়ী করিয়া বাঁধা। তাহার সঙ্গে একখানা পরনের কাপড়ই— গায়ে র‍্যাপারের মত জড়াইয়া হুঁকো টানিতে টানিতে চলিয়াছে, অন্য হাতে কাস্তে। ধান-কাটার পালা এখন। গ্রামের চাষী গৃহস্থেরাও অধিকাংশই নিজ-হাতে কৃষাণদের সঙ্গেই চাষ করে, তাহারাও কাস্তে হাতে চলিয়াছে। 'খাটে-খাটায় দুনো পায়'—অর্থাৎ চাষে যাহারা নিজেরাও সঙ্গে খাটিয়া চাষী মজুরদের খাটায়, তাহাদের চাষে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়—এই প্রবাদ-বাক্যটা ইহারা আজও মানিয়া চলে। এ গ্রামে কেবল দুই-চারিজন নিজেরা চাষে খাটে না। হরেন্দ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণ, জগন ঘোষ একে কায়স্থ তায় আবার ডাক্তার, দেবু ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত, শ্রীহরি সম্প্রতি কুলীন সদগোপ এবং বহু ধন-সম্পত্তির মালিক, এই কয়জনই চাষে খাটে না।

সতীশ বাউড়ী তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতব্বর গোছের লোক। লোকটির নিজের হাল-গরু আছে। জমি অবশ্য তাহার নিজের নয়—পরের জমি ভাগে চাষ করে। বেশ বিজ্ঞ-ধরনের কথা কয়। দেবুকে দেখিয়া হেঁট হইয়া সে প্রণাম করিল, বলিল—পেনাম হই, পণ্ডিত মশায়!…সঙ্গে সঙ্গে দলের সকলেই প্রণাম করিল।

দেবু প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—মাঠে যাচ্ছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সতীশ নিজের সঙ্গীদের বলিল—পণ্ডিতমশায়ের মতো মানুষটি আর দ্যাখলাম না। পেনাম করলে অনেক মণ্ডল মশাইরা তো রা পর্যন্ত কাড়ে না। পণ্ডিতমশায় কিন্তুক কপালে হাতটি ঠেকাবেই। কখনও তুই-তুকারি শুনলাম না উঁহার মুখে।

দেবু কথা বলিল না, দ্রুতপদে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সতীশ বলিল—হাঁ গো, পণ্ডিতমশায়—এ কি হবে বলেন দেখি।

—কিসের ? কি হ'ল তোদের ?

—আজ্ঞে, একা আমাদের লয়, গোটা গাঁয়ের লোকেরই বটে। এই সেটেলমেণ্টোরের কথা বলছি। সাতদিন পরেই বলছে আরম্ভ হবে। দিনরাত হাজির থাকতে হবে, লোয়ার শেকল টেনে মাপ হবে ; তা হলে ধানকাটাই বা কি করে হয়, আর পাকা ধানের ওপর শেকল টানলে ধানই বা থাকে কি করে ?

—গোমস্তা কি বললেন ? পালই বা কি বললো ?

—আজ্ঞে ঘোষ মশাই বলুন !

—ঘোষ মশায় ?

—আজ্ঞে, উনি এখন ছিহরি ঘোষ মশাই গো। ঘোষ বলতে হুকুম হয়েছে। জমিদারের কাগজ-পত্তরে, বার আদালতে পর্যন্ত ঘোষ করে নিয়েছেন পাল কাটিয়ে'।

—তাই নাকি ? ওঁরা কি বললেন ? কাল তো তোমরা গিয়েছিলে সব।

—আজ্ঞে ডাক হয়েছিল, গিয়েছিলাম। তা ওঁরা বললেন—দিনরাত খেটে ধান কেটে ফেল সব সাতদিনের মধ্যে! তাই কি হয় গো ? আপনিই বলেন ক্যানে পণ্ডিতমশায় ?

দেবু চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কাল সমস্ত রাত্রি সে এই কথাটাই ভাবিয়াছে। কিন্তু কোন উপায়ই স্থির করিতে পারে নাই।

সতীশ বলিল—হোথা থেকে এলাম তো দেখি, ডাক্তোর বাবু পাড়ায় এসেছেন, বলছেন—টিপছাপ দিতে হবে, দরখাস্ত পাঠাবেন। তা হ্যাঁ মশায়, দরখাস্তে কি হবে গো ? এই তো ঘর-পোড়ায় লেগে দরখাস্ত করলাম—কি হ'ল ? তা ছাড়া দরখাস্ত করলে সেটেলমেণ্টোর হাকিম যদি রেগে যায়।

* * *

বাংলাদেশে ইংরাজী ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোন জরিপবন্দী হয় নাই। তখনকার দিনে সীমানা-সরহদ্দ লইয়া দাঙ্গা, হাঙ্গামা, মামলা-মকদ্দমার আর অন্ত ছিল না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জরিপ করিয়া মাত্র গ্রামগুলির সীমানা নির্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জরীপ আইন পাস হইবার পর বাংলা দেশে নূতন জরীপের এক পরিকল্পনা হয়। প্রতিটি টুকরা জমি, তাহার বিবরণ এবং তাহার স্বত-স্বামিত্ব নির্ধারণ করিবার জন্যই এ জরিপের আয়োজন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাহার জের এই গ্রামাঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য লোকগুলি বিভীষিকায় একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জরিপের সময়ে এতটুকু ত্রুটিতে হাকিম নাকি বেত লাগায়, হাতকড়ি দিয়া জেলে পাঠাইয়া দেয়। এই ধরনের নানা গুজবে অঞ্চলটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আরও আছে, জরিপের পর প্রজাদের জরিপের খরচের অংশ দিতে হইবে। না দিলে অস্থাবর ক্রোক হইবে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে।

তাহার পর জমিদার দাবী করিবে খাজনা-বৃদ্ধি ; প্রতি টাকায় চার আনা, আট আনা, এমন কি—টাকায় টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিও হইতে পারে, হাইকোর্টের নাকি নজির আছে। নাখরাজ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। বজায় থাকিলে সেস লাগিবে, সে সেসের পরিমাণ নাকি খাজনারই সমান—কম নয় ; এমনি আরও অনেক কিছু হইবে।

ফিরিবার পথে দেবু দেখিল—জনকয়েক মাতব্বর ইতিমধ্যেই চণ্ডীমণ্ডপে সমাবেত হইয়াছে ; সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবু চণ্ডীমণ্ডপেই উঠিয়া আসিল। হরিশ প্রশ্ন করিল—হয়েছে ?

রাত্রে তাহার একখানা দরখাস্ত লিখিয়া রাখিবার কথা ছিল। কিন্তু দেবুর দরখাস্ত লেখা হইয়া উঠে নাই। দরখাস্তে তাহার আস্থা নাই। দরখাস্তের প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গিয়াছিল কয়েকটি তিক্ত ঘটনার স্মৃতি। নিজে সে এককালে কয়েকবার দরখাস্ত করিয়াছিল ; সেই [illegible] মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন বাপের মৃত্যুর পর [illegible] সে স্কুল ছাড়িয়া নিজের হাতেই চাষ করিত। [illegible]

সে হাল চালাইতেছিল। খাকী পোশাক-পরা টুপী মাথায় পুলিসের এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মাঠের পথে যাইতে যাইতে তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—এই—শোন্।

দেবু এই অভদ্রজনোচিত সম্ভাষণে অসন্তুষ্ট হইয়াই উত্তর দেয় নাই।

—এই উল্লুক!

দেবু এবারও উত্তর দেয় নাই। দেবুর সেই প্রথম দরখাস্ত। দরখাস্ত করিয়াছিল পুলিশ সাহেবের কাছে। তদন্ত হইল মাস কয়েক পর। তদন্তে আসিলেন ইন্সপেক্টর।

দেবুর অভিযোগ শুনিয়া তিনি মিষ্ট কথায় ব্যাপারটা মিটাইয়া দিলেন, বলিলেন—দেখ বাপু, জমাদার বাবু তোমার বাপের বয়সী। 'তুই' বললেও তোমার রাগ করা উচিত নয়। 'উল্লুক' বলাটা অন্যায় হয়েছে, যদি উনি বলে থাকেন।

দেবু বলিল—উনি বলেছেন।

—বুঝলাম কিন্তু সাক্ষী কে বল?

—সাক্ষী ছিল না। ইন্সপেক্টর বলিলেন—যাক, তুমি বাড়ী যাও। কিছু মনে করো না।

দেবুর ক্ষোভ কিন্তু মেটে না।

দ্বিতীয় দরখাস্তের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। জমিদার বৈশাখ মাসে খাসপুকুর হইতে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেইটিই একমাত্র পানীয় জলের পুকুর। জল অল্পই ছিল, সেই জল আরও খানিকটা বাহির করিয়া দিয়া মাছ ধরিবার কথা হইল। গ্রামের লোকে শিহরিয়া উঠিল। বলিল—ওটুকু জল, কেটে বের করে দিলে থাকবে কতটুকু? তার উপর মাছ ধরলে যে কাদা ছাড়া কিছু থাকবে না। আমরা খাব কি?

গোমস্তা বলিল—জমিদারের বাড়ীতে কাজ, তিনিই বা মাছ কোথায় পাবেন বল?

প্রজারা খোদ জমিদারের কাছে গেল; জমিদার বলিলেন—তোমরা মাছ দাও, নয় মাছের দাম দাও।

তরুণ দেবু এক দরখাস্ত করিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। কিন্তু কিছুই হইল না। জমিদারের চাপরাসীরা শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়া মাছ ধরাইয়া পুকুরটাকে পঙ্ক-পল্বলে পরিণত করিয়া দিয়া গেল। দেবুর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। হঠাৎ সাতদিন পর, অকস্মাৎ দারোগা-কনস্টেবল-চৌকিদারের আগমনে গ্রামখানা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে একজন সাহেবী পোশাকপরা অল্পবয়সী ভদ্রলোক। দারোগা আসিয়া দেবুকে ডাকিল। বলিল—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর ডাকছেন তোমাকে।

দেবু অবাক হইয়া গেল। সাহেব নিজে আসিয়াছেন। কিন্তু এখন আসিয়া ফল কি? সাহেবকে সে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব প্রতিনমস্কার করিলেন। সে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল সাহেবের কথায়।

—আপনি দেবনাথ ঘোষ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা বলিল—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর' বলতে হয়।

সাহেব বলিলেন—থাক। তারপর সমস্ত শুনিলেন—পুকুর নিজে দেখিলেন। পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া জলের অবস্থা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দেবুর আজও মনে আছে ভদ্রলোকের চোখ হইতে ফোঁটাকয়েক জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। রুমালে চোখ মুছিয়া সাহেব বলিলেন—তাই তো দেবুবাবু, এসে তো কিছু করতে পারলাম না আমি।

দেবু বলিল—আমি দরখাস্ত করেছিলাম পাঁচ দিন আগে হুজুর!

—ডাকে যেতে একদিন লেগেছে! দরখাস্ত যথানিয়মে পেশ হতেও কোন কারণে দেরি হয়েছে। সে কারণে আমি এন্‌কোয়ারী করব। তারপর—সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—দেবনাথবাবু, এসব ক্ষেত্রে দরখাস্ত করবেন না। নিজে যাবেন, একেবারে আমাদের কাছে গিয়ে সরাসরি গিয়ে জানাবেন। দরখাস্ত?—শব্দটা উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি হাসিয়াছিলেন।

সাহেব গ্রামের জন্য একটা ইঁদারা মঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও শেষ পর্যন্ত হয় নাই। কারণ সাহেব এ জেলা হইতে চলিয়া যাওয়ার সুযোগে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কঙ্কণার বাবু সেটা অন্য গ্রামে মঞ্জুর করিয়া দিয়াছে। এ গ্রামের মেম্বার হিসাবে শ্রীহরিও তাহাতে সম্মতি-ভোট দিয়াছে। দেবনাথ জমিদারের মাছ ধরার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। সাজাটা তাহারই জন্য গোটা গ্রামের লোক ভোগ করিল।

দরখাস্ত! একটা গল্প তাহার মনে পড়ে। কোন রাজার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল; রাজা ছিলেন দার্জিলিঙে। আগুন নিভাইবার হাঁড়ি বালতি কিনিবার জন্য বরাদ্দ না থাকায় রাজার নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। হুকুম টেলিগ্রামে আসিলেও চব্বিশ ঘণ্টার পর। ততক্ষণে সব কিছুকে ভস্মসাৎ করিয়া আগুন আপনা-আপনি নিভিয়া গিয়াছে। দরখাস্তের কথায় ওই গল্প তাহার মনে পড়ে, মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই সাহেবকে। মিঃ এস. কে. হাজরা, আই-সি-এস। দেবু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে।

দেবু উত্তর দিল—না হরিশ-কাকা, লেখা হয় নাই।

লেখা হয় নাই শুনিয়া, হরিশ, ভবেশ প্রভৃতি প্রবীণগণ সকলেই অসন্তুষ্ট হইল। হরিশ বলিল—তুমি বললে লিখে রাখবে, ভার নিলে! জলখাওয়ার পর গাঁয়ের লোক সব আসবে, দস্তখৎ করবে। এখন বলছ হয় নাই? এ কি রকম কথা হে? পারবে না বললে ডাক্তারই লিখে রাখত।

ভবেশ বলিল—এ্যাই কথা। স্পষ্ট কথায় কষ্ট নাই। বললেই তো অন্য ব্যবস্থা হ'ত।

দেবু হাসিল, বলিল—দরখাস্ত না হয় আমি এখনি লিখে দিচ্ছি ভবেশদাদা; কিন্তু দরখাস্ত করে হবে কি বলতে পার?

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিশ বলিল—তা হলে কি করব বল? কিছু করতে তো হবে; এমন করে—ধর—আপনাকেই বা 'পেবোধ' দিই কি বলে?

—এক কাজ করেন ?

—কি বল ?

—পাঁচখানা গাঁয়ের লোক ডাকুন, তারপর চলুন সকলে মিলে সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

—তাতে ফল হবে বলছ ?

—দরখাস্তের চেয়ে বেশী হবে নিশ্চয়।

সকলে আপনাদের মধ্যেই আবার গুঞ্জন সুরু করিল।

পাঠশালার ছেলেরা ইতিমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; দেবু তাহাদের বলিল—এইখানেই এসেছ সব ? আচ্ছা আজ এইখানেই ওই পাশে বসে সব পড়তে আরম্ভ কর। কালকে যে পত্তের মানে লিখতে দিয়েছিলাম সবাই লিখেছো তো ? খাতা আন সব—রাখ এইখানে।

হরিশ ডাকিল—দেবু!

—বলুন ?

—তবে না হয় তাই চল। না, কি গো ? তোমাদের মত কি ? হরিশ জিজ্ঞাসু নেত্রে সকলের দিকে চাহিল।

ভবেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলিল—হরির নাম নিয়ে তাই চল সব। ধরে তো আর খেয়ে ফেলবে না সায়েব! আমি রাজি। বল হে সব বল, আপন আপন কথা বল সব!

মনে মনে সকলেই একটা উত্তেজনার উচ্ছ্বাস অনুভব করিল। হরেন ঘোষাল সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তেজিত হইয়াছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বুকে হাত রাখিয়া বলিল—আই য়্যাম রেডি! এস্পার কি ওস্পার, যা হয় হয়ে যাক।

—ব্যস, তাই চল, কাল সকালেই!

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ!—

এবার একটা সমবেত সম্মতি প্রায় ঐক্যতানের মত ধ্বনিত হইল।

—কিন্তু—! ভবেশের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

—কিন্তু কি ? হরিশ বলিল—আবার কিন্তু করছ কেনে ?

—পাঁজিটা একবার দেখবে না ? দিন-খ্যান কেমন—?

—তা বটে। ঠিক কথা।

সকলে মুহূর্তে সায় দিয়া উঠিল।

দেবু তিক্ত স্বরে বলিল—আপনারা মানেন—কিন্তু রাজার কাজে তো পাঁজি মানে না। দশ-দিন যদি ভাল দিন-ক্ষণ না থাকে ?

ঘোষাল উত্তেজিত স্বরে বলিল—ড্যাম ইওর পাঁজি! বোগাস্ ওসব।

দেবু বলিল—মামলার দিন থাকলে যে মঘাতেও যেতে হয়।

হরিশ একটু ভাবিয়া বলিল—তা ঠিক। রাজদ্বারে পাঁজি-পুঁথি নাই।

দেবু বলিল—ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লে দশটা নাগাদ ঠিক কোর্টের সময়েই গিয়ে

পৌঁছানো যাবে। আপন আপন খাবার সকলে সঙ্গে নেবেন, চিঁড়ে গুড় যে যা পারেন। একটা দিন বৈ তো নয়!

ঠিক এই সময় চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইল—গোমস্তা দাশজী, শ্রীহরি ঘোষ, ভূপাল নন্দী এবং আরও কয়েকজন, তাহার মধ্যে একজন থোকন বৈরাগী—লোকটি এ অঞ্চলে রাজ-মিস্ত্রির কাজ করিয়া থাকে।

দাশজী হাসিয়া বলিল—কি গো, দেবু মাস্টারের পাঠশালায় সব আবার নূতন করে নাম লেখালেন নাকি? ব্যাপার কি সব?

কে কি উত্তর দিত কে জানে, কিন্তু সে দায় হইতে সকলকে নিষ্কৃতি দিয়া হরেন ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—উই আর গোয়িং টু দি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট—কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাচ্ছি সব ধানকাটা না হওয়া পর্যন্ত খানাপুরী স্টপ্ড্—বন্ধ রাখতে হবে।

ভ্রূ নাচাইয়া দাশজী প্রশ্ন করিল—ঘোষাল মহাশয়ের হাত ক'টা? দুটো না চারটে?

এমন ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলিল যে, ঘোষাল কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া গেল। তারপর সে-ই চীৎকার করিয়া উঠিল—ব্রাহ্মণকে তুমি এত বড় কথা বল?

দাশজী সে কথার উত্তর দিল না, শ্রীহরির হাতে একখানা কাগজ ছিল, সেখানা টানিয়া লইয়া বলিল—এই দেখো। বেশী লাফিয়ো না। 'জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। সেটেল্-মেন্টের কার্যে বাধা দেওয়ার অপরাধে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।' এই নাও, পড়ে দেখ। সে কাগজখানা মজলিসের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ঘোষালই কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া হেড লাইনে চোখ বুলাইয়া বলিয়া উঠিল—মাই গড্। পাংশু বিবর্ণ মুখে কাগজখানা দেবুর দিকে বাড়াইয়া দিল। দেবু কাগজখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরি বলিল—আমাকে তো আপনারা বাদ দিয়েই সব করছেন, তা করুন। আমি কিন্তু আপনাদের কথা না ভেবে পারি না। ওসব করতে যাবেন না। পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়। তার চেয়ে চলুন বিকাল-বেলা সেটেল্‌মেণ্ট হাকিমের সঙ্গে দেখা করে আসি। দাশজী যাবেন, আমি যাব, মাতব্বর জন-কয়েক আপনারাও চলুন। ভাল রকমের ডালিও একটা নিয়ে যাই। মাছ একটা ভালই পড়েছে, বুঝলেন হরিশখুড়ো, পাকি বারো সের!

বলিতে বলিতেই বোধ করি তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। দাশজীকে বলিল—হ্যাঁ গো, সেই ইয়ে, মানে মুরগীর জন্ত লোক পাঠানো হয়েছে তো? সবাই মিলে ধরে পেড়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আর, ওই না-রাজী দরখাস্ত করা, কি একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরবার করতে যাওয়া—ও একরকম সরকারের হুকুমের বিরোধিতা করা। তাতে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। না কি গো?—শ্রীহরি কথাটা জিজ্ঞাসা করিল গোমস্তা দাশজীকে।

দেবু কাগজখানা দাশজীর হাতেই ফেরত দিল, তারপর মজলিসের দিকে পিছন ফিরিয়া

অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে ছেলেদের পড়াইতে আরম্ভ করিল। সে ইহাদের জানে। ইহারই মধ্যে সব সঙ্কল্প তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে উঠিয়া গিয়া ব্ল্যাক বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া লিখিল, মুখে বলিতে লাগিল, এক মণ দুধের দাম যদি পাঁচ টাকা দশ আনা হয়—।

ওদিকে মজলিসে আবার পরামর্শের গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। হরেন ঘোষালেরই চাপা-গলা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল—ভেরি নাইস হবে! ভেরি গুড পরামর্শ!

দাশজী এবার খোকন মিস্ত্রীকে বলিল—ধর্ দড়ি ধর্। ভূপাল তুই ধর্ একদিকে।

খোকন বৈরাগী খানিকটা বাবুই ঘাসের দড়ি হাতে অগ্রসর হইয়া আসিল, সর্বাগ্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবদেবীকে প্রণাম করিল—তারপর জোড়হাতে বলিল—আরম্ভ করি তাহলে?

দাশজী বলিল—দুগ্‌গা বলে, তার আর কথা কি? শুনছেন গো—হরিশ মণ্ডল মশায়, ভবেশ পাল! চণ্ডীমণ্ডপ পাকা করে বাঁধানো হচ্ছে। আপনারাও একটা অনুমতি দেন।

—বাঁধানো হচ্ছে? পাকা করে? সমস্ত মজলিস-সুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল।

—হ্যাঁ। একটা কুয়োও হচ্ছে—ওই ষষ্ঠীতলায়! ঘোষ মশায়, মানে, আমাদের শ্রীহরি ঘোষ গ্রামের উপকারের জন্য এই সব করে দিচ্ছেন।

শ্রীহরি নিজে হাতজোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল—অনুমতি দেন আপনারা সবাই।

হরিশ বলিল—দীর্ঘজীবী হও বাবা। এই তো চাই। তা মা-সষ্ঠীকে আর ধুলোয় মাটিতে রাখছ ক্যানে? ষষ্ঠীতলাটিও বাঁধিয়ে দাও।

শ্রীহরি বলিল—বেশ তো, তাও হোক। ষষ্ঠীতলা বলে খেয়ালই হয় নাই আমার।

হরিশ মজলিসের দিকে চাহিয়া বলিল—তা হ'লে সেটেল্‌মেণ্টারের সম্বন্ধে দাশজী যা বলেছেন তাই ঠিক হ'ল, বুঝলেন গো সব? দরখাস্ত-টরখাস্ত লয়।

শ্রীহরির খুড়া ভবেশ অকস্মাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের গৌরবে ভাবাবেগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, উঠিয়া আসিয়া শ্রীহরির মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিল—মঙ্গল হবে, তোমার মঙ্গল হবে বাবা।

শ্রীহরি খুড়াকে প্রণাম করিল।

ঘোষাল চুপি চুপি বলিল, হি উইল ডাই—ছিরু এইবার নিশ্চয় মরবে। হঠাৎ এত বড় সাধু? এ তো ভাল লক্ষণ নয়! মতিভ্রম—দিস ইজ্ মতিভ্রম!

মজলিস ভাঙিয়া গিয়াছে। সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ওদিকে জলখাবারের বেলা হইয়াছে। রোদ মন্দিরের চূড়া হইতে গা বাহিয়া আটচালার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়াছে। দেবু ছেলেদের ছুটি দিয়া বলিল—কাল থেকে আমার বাড়ীতে পাঠশালা বসবে, বুঝেছ? সেইখানে যাবে সবাই।

—বাঁধানো হয়ে গেলে আবার এইখানেই বসবে তো পণ্ডিত মশায়?

—পাকা হোলে বসবে বৈকি! যাও আজ ছুটি।

সে উঠিল, উঠিতে গিয়া তাহার নজরে পড়িল—বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী এতক্ষণে ঠুক ঠুক করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের উপরে উঠিতেছে—দেবু সম্ভাষণ করিয়া বলিল—চৌধুরী মশায় এত বেলায় ?

—হ্যাঁ একটু বেলা হয়ে গেল। সকালে আসতে পারলাম না। দরখাস্তে সই করবার ডাক ছিল।

দেবু হাসিয়া বলিল—কষ্টই সার হল আপনার, দরখাস্ত করা হল না।

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—পথে আসতে তা সব শুনলাম। সদরে যাবার পরামর্শ হয়েছিল তা ও শুনলাম। আবার নতুন হুকুম শুনলাম, বিকেলে আসতে হবে। তাই চলুন, বিকেলে দেখা যাক কি হয়।

—আমি যাব না চৌধুরী মশাই।

বৃদ্ধ দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—যা পাঁচজনে ভাল বোঝে করুক, পণ্ডিত, আপনি মন খারাপ করবেন না।

দেবু জোর করিয়া একটু হাসিল।

—চলুন পণ্ডিত, আপনার ওখানে একটু জল খাব।

—আসুন, আসুন। দেবু ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইল।

চলিতে চলিতে বৃদ্ধ বলিল—ও কিছু হবে না, পণ্ডিত! একদিন আমারও ভাল দিন ছিল —আর তখন ডালি দেওয়া তো হরিরলুটের সামিল ছিল গো। আজকাল বরং একটু কম হয়েছে। তা দেখেছি—বিশেষ কিছু হয় না। তার চেয়ে বরং সবাই মিলে গিয়ে পড়লে—। 'কিছু হইত' এ কথাও ভরসা করিয়া বলিতে পারিল না।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এতটুকু সাহস নাই, মতিস্থির নাই; এরা মানুষ নয়, চৌধুরী মশায়! সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, চোখ ফাটিয়া জল আসিল। চোখ মুছিয়া হাসিয়া সে আবার বলিল—জানেন, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক যদি সদরে যেতো, আমি বলতে পারি, চৌধুরী মশায় কাজ নিশ্চয় হ'ত। সায়েব নিশ্চয় কথা শুনত। প্রজার দুঃখ শুনবে না কেন? হাজরা সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সেবার বলেছিলেন। আমার মনে আছে।

বৃদ্ধ হাসিল—আপনি মিছে দুঃখু করছেন পণ্ডিত!

—দুঃখ একটু হয় বৈ কি।

—একটা গল্প বলব চলুন।

জল খাইয়া কলার পেটোয় তামাক খাইতে খাইতে চৌধুরী বলিল—অনেক দিন আগে মহাগ্রামের ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম প্রয়াগে কুম্ভস্নান করতে। হরেক রকমের সন্ন্যাসী দেখে অবাক হয়ে গেলাম। নাগা সন্ন্যাসী দেখলাম—উলঙ্গ বসে রয়েছে সব। কেউ বুক পর্যন্ত বালিতে পুঁতে রয়েছে, কেউ উর্দ্ধবাহু, কেউ বসে আছে লোহার কাঁটার আসনে,

কেউ চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে বসে রয়েছে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—স্বর্গ এদের হাতের মুঠোয়। আঃ! শুনে ঠাকুরমশায় বললেন—চৌধুরী, একটা গল্প বলি শোন।

তখন সত্যযুগের আরম্ভ। সবে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সবাই তখন সাধু; সত্যযুগ তো! বনে কুটীর বেঁধে সব থাকেন—ফলমূলে জীবন ধারণ চলে, ভগবানের নাম করেন, আর পরমানন্দে দিন কাটে। মা-লক্ষ্মী তখন বৈকুণ্ঠে, অন্নপূর্ণা কৈলাসে, মানে সোনা-রুপো, এমন কি—অন্নেরও পর্যন্ত প্রচলন হয় নাই সংসারে। যাক্, এইভাবে একপুরুষ কেটে গেল। তখন অকাল মৃত্যু ছিল না, কাজেই হাজার বছর পরে একসঙ্গে একপুরুষের মৃত্যুর সময় হয়ে এল। মানুষেরা ঠিক করলেন—চল, আমরা সশরীরে স্বর্গে যাব। যেমন সঙ্কল্প তেমনি কাজ। বেরিয়ে পড়ল সব।

বদরিকাশ্রম পার হয়ে হিমালয়ের পথে পিঁপড়ের সারির মত মানুষ চলতে লাগল। ওদিকে স্বর্গ-দ্বারে দ্বারী ছিল, সে দেখতে পেলে, কোটী কোটী মানুষ কলরব করতে করতে সেই দিকেই চলে আসছে। সে ভয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে—দেবরাজ, মহা বিপদ উপস্থিত!

—কিসের বিপদ হে?

—কোটী কোটী কারা স্বর্গের দিকে চলে আসছে পিঁপড়ের সারির মত। বোধহয় দৈত্য-সৈন্য?

—দৈত্য-সৈন্য? বল কি?

সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এমন সময় এলেন দেবর্ষি নারদ। বললেন—দৈত্য নয় দেবরাজ, মানুষ!

—মানুষ?

—হ্যাঁ, মানুষ। তোমাদের অস্ত্রে তাদের কিছুই হবে না; কারণ পাপ তো তাদের দেহে নাই, সুতরাং দেব-অস্ত্র অচল। দিব্যাস্ত্র ফুলের মালা হয়ে যাবে তাদের গায়ে ঠেকে।

—তবে উপায়? এত মানুষ যদি সশরীরে এখানে আসে তবে—? ইন্দ্র আর কথা বলতে পারলেন না। সবাই হয়তো দাবি করবে এই সিংহাসন!

শেষে বললেন—চল নারায়ণের কাছে চল সব।

নারায়ণ শুনে হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, চল দেখি। বলে প্রথমেই তিনি পাঠালেন মা অন্নপূর্ণাকে।

অন্নপূর্ণা এসে পথে পুরী নির্মাণ করে ফেললেন—ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে রাখলেন এক-অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনে। তারপর মানুষের সেই দল সেখানে আসবামাত্র তাদের বললেন—পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত তোমরা, আজকের মতো তোমরা আমার আতিথ্য গ্রহণ কর।

মানুষেরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল, রান্নার সুগন্ধে সকলেই মোহিত হয়ে গেল। দলের কতক লোক কিন্তু মোহ কাটিয়ে বললে—স্বর্গের পথে বিশ্রাম করতে নাই! তারা চলে গেল। যারা থাকল তারা অন্ন-ব্যঞ্জন খেয়ে পেট ফুলিয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়ল।

বললে—মা, আমরা এইখানেই যদি থাকি, রোজ এমনি খেতে দেবে তো ?

মা বললেন—নিশ্চয় ।

থেকে গেল তারা সেইখানেই ।

যারা থামে নি, তারা চলল এগিয়ে । নারায়ণ তখন পাঠিয়ে দিলেন লক্ষ্মীকে । লক্ষ্মীর পুরী—সোনার পুরী ! সোনার পথ, সোনার ঘাট ; সোনার ধুলো পুরীতে । দেখে মানুষের চোখ ধেঁধে গেল ।

মা বললেন—এসব তোমাদের জন্যে বাবা । এস—এস ; পুরীতে প্রবেশ কর ।

একদল প্রবেশ করলে ।

পথে আরও এক পুরী তখন নির্মাণ হয়ে আছে । ফুলের বাগান চারিদিকে, কোকিল ডাকছে, ভুবন-ভুলানো গান শোনা যাচ্ছে—আর এক অপূর্ব সুগন্ধ ভেসে আসছে । দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অপ্সরার দল, একহাতে তাদের অপরূপ ফুলের মালা আর এক হাতে সোনার পানপাত্র । তারা ডাকছে—আসুন, বিশ্রাম করুন ; আমরা আপনাদের দাসী, সেবা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি । আপনারা তৃষ্ণার্ত—এই পানীয় পান করুন ।

সে পানীয় হচ্ছে স্বর্গীয় সুরা । দলে দলে লোকে সেখানে ঢুকে পড়ল ।

নারায়ণ বললেন—দেখ তো ইন্দ্র, আর কেউ আসছে কিনা ?

ইন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—না ।

—ভাল করে দেখ ।

—একটা কি নড়ছে, বোধহয় একজন মানুষ ।

নারায়ণ বললেন—স্বর্গদ্বার খুলে রাখ, তুমি নিজে পারিজাতের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাক । আমার মত সম্মান করে স্বর্গে নিয়ে এস । ওর পায়ের ধুলোয় স্বর্গ পবিত্র হোক ।

হাসিয়া চৌধুরী বলিল—জানলেন পণ্ডিত, গল্পটি শেষ করে ঠাকুরমশায় বলেছিলেন—চৌধুরী, এরপর কেউ গুরু হয়ে ভক্তের রসাল খাদ্যদ্রব্যে ভুলবে, কেউ মোহন্ত হয়ে সোনা-রুপো সম্পত্তি নিয়ে ভুলবে, কেউ সেবাদাসীর দল নিয়ে স্ত্রীলোকে আসক্ত হবে । স্বর্গে যাবে কোটী কোটীর মধ্যে একজন । দুঃখ করবেন না পণ্ডিত ! মানুষের ভুল-ভ্রান্তি-মতিভ্রম পদে পদে । এরা মানুষ নয় বলে দুঃখ করছেন ? মানুষ হওয়া কি সোজা কথা ? আচ্ছা আমি উঠি তা হলে । ওই ডাক্তার আসছেন—উনি এসে পড়লে আবার খানিকক্ষণ দেরি হয়ে যাবে । আমি চলি ।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল ।

গল্পটি দেবুর বড় ভাল লাগিল । বিলুকে আজ গল্পটি বলিতে হইবে । আশ্চর্য বিলুর ক্ষমতা, একবার শুনিলেই সে গল্পটি শিখিয়া লয় ।

ডাক্তার আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিল—শুনলাম সব ।

দেবু হাসিল, বলিল—তুমি সকাল থেকে কোথায় ছিলে হে ?

—অনিরুদ্ধের বাড়ী। কামার-বউয়ের আজ আবার ফিট্ হয়েছিল।

—আবার ?

—হ্যাঁ। সে সাংঘাতিক ফিট্, ঘরে মেয়ে নাই, ছেলে নাই, সে এক বিপদ। তবু দুর্গা মুচিনী ছিল, তাই খানিক সাহায্য হ'ল। বউটার বোধ হয় মৃগীরোগে দাঁড়িয়ে গেল। অনিরুদ্ধ তো বলছে অন্য রকম। মানুষে নাকি তুক্ করেছে।

—মানুষে তুক্ করেছে ?

—হ্যাঁ, ছিরে পালের নাম করছে। যাক গে! এদিকের এ যা হয়েছে ভাল হয়েছে দেবু। পরে সব ঝুঁকি পড়তো তোমার আর আমার ঘাড়ে। জে. এল. ব্যানার্জীর এ্যারেস্টের খবর জান তো? হয়তো আমাদেরও এ্যারেস্ট করতো। আর সব শালা সুড়-সুড় করে ঘরে ঢুকতো। আচ্ছা, আমি চলি। সকাল থেকে রোগী বসে আছে, ওষুধ দিতে হবে।

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল। দেবু একটু হাসিল। ডাক্তারের এই ব্যস্ততার অর্ধেকটা সত্য, বাকীটা কৃত্রিম। রোগীদের জন্য জগনের দরদ অকৃত্রিম; চিকিৎসকের কর্তব্য সম্বন্ধে সে সত্যই সজাগ। শত্রু হোক মিত্র হোক—সময় অসময় যখনই হোক—ডাকিলে সে বাহির হইয়া আসিবে, যত্ন করিয়া নিজে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিবে। কিন্তু আজিকার ব্যস্ততাটা কিছু বেশী, একটু অস্বাভাবিক। জে. এল. ব্যানার্জীর গ্রেপ্তারের সংবাদে ডাক্তার বেশ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছে, আসলে সে আলোচনাটা এড়াইতে চাহিল।

—পণ্ডিত মশাই গো! বাড়ীর ভিতর থেকে কে ডাকিল।

পণ্ডিত পিছন ফিরিয়া দেখিল—বিলু দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, সে-ই ডাকিয়াছে।

রাগের ভান করিয়া দেবু বলিল—দুষ্ট বালিকে, হাসিতেছ কেন ? পড়া করিয়াছ ?

বিলু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, দেবু উঠিয়া আসিয়া বলিল—আজ ভারী সুন্দর একটা গল্প শুনেছি, তোমাকে বলব, একবার শুনেই শিখতে হবে।

বিলু বলিল—খোকার কাছে একবার বস তুমি। কামার-বউকে একবার আমি দেখে আসি।

পনেরো

পদ্মের মূর্ছা রীতিমত মূর্ছা-রোগে দাঁড়াইয়া গেল। এবং মাসখানেক ধরিয়া নিত্যই সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

ফলে মাসখানেকের মধ্যে বন্ধ্যা মেয়েটির সবল পরিপুষ্ট দেহখানি হইয়া গেল দুর্বল এবং শীর্ণ। একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে সে; এই শীর্ণতায় এখন তাহাকে অধিকতর দীর্ঘাঙ্গী বলিয়া মনে হয়; দুর্বলতাও বড় বেশী চোখে পড়ে। চলিতে ফিরিতে দুর্বলতাবশত সে যখন কোন কিছুকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আত্মসম্বরণ করে, তখন মনে হয় দীর্ঘাঙ্গী পদ্ম যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সেই বলিষ্ঠ ক্ষিপ্রচারিণী পদ্মের প্রতি পদক্ষেপে এখন ক্লান্তি ফুটিয়া উঠে,

ধীরে মন্দগতিতে চলিতেও তাহার পা যেন টলে। কেবল তাহার চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে অস্বাভাবিক প্রখর। দুর্বল পাণ্ডুর মুখের মধ্যে পদ্মের ডাগর চোখ দুইটা অনিরুদ্ধের শখের শাণিত বগি-দা'খানায় আঁকা পিতলের চোখ দুইটার মতই ঝকঝক করে। স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ শিহরিয়া উঠে।

অনটনের দুঃখের উপর এই দারুণ দুশ্চিন্তায় অনিরুদ্ধ বোধ করি পাগল হইয়া যাইবে। জগন ডাক্তারের পরামর্শে সেদিন সে কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল।

জগন বলিয়াছিল—মৃগী রোগ।

হাসপাতালের ডাক্তার বলিল—এ একরকম মূর্ছা-রোগ। বন্ধ্যা মেয়েদেরই, মানে—যাদের ছেলেপুলে হয় না তাদেরই এ রোগ বেশী হয়। হিস্‌টিরিয়া।

পাড়া-পড়শীরা কিন্তু প্রায় সকলেই বলিল—দেবরোগ! কারণও খুঁজিয়া পাইতে দেরি হইল না। বাবা বুড়োশিব ভাঙাকালীকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কোন কালে পার পায় নাই! নবান্নের ভোগ দেবস্থলে আনিয়া সে বস্তু তুলিয়া লওয়ার অপরাধ তো সামান্য নয়! অনিরুদ্ধের পাপে তাহার স্ত্রীর এই রোগ হইয়াছে। কিন্তু অনিরুদ্ধ ও-কথা গ্রাহ্য করিল না। তাহার মত কাহারও সহিত মেলে না। তাহার ধারণা, দুষ্ট লোকে তুক করিয়া এমন করিয়াছে। ডাইনী-ডাকিনী বিদ্যার অভাব দেশে এখনও হয় নাই। ছিরুর বন্ধু চন্দ গড়াঞী এ বিদ্যায় ওস্তাদ। সে বাণ মারিয়া মানুষকে পাথরের মত পঙ্গু করিয়া দিতে পারে। পদ্মের একটা কথা যে তাহার মনে অহরহ জাগিতেছে!

প্রথম দিন পদ্মের মূর্ছা জগন ডাক্তার ভাঙাইয়া দেওয়ার পর সেই রাত্রের ভোরের দিকে সে ঘুমের ঘোরে একটা বিকট চীৎকার করিয়া আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই নিষুতি রাত্রে অনিরুদ্ধ আর জগনকে ডাকিতে পারে নাই এবং সেই রাত্রে মূর্ছিতা পদ্মকে ফেলিয়া যাওয়ারও উপায় তাহার ছিল না। বহু কষ্টে পদ্মের চেতনা সঞ্চার হইলে নিতান্ত অসহায়ের মত পদ্ম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—আমার বড় ভয় লাগছে গো!

—ভয়? ভয় কি? কিসের ভয়?

—আমি স্বপ্ন দেখলাম—

—কি? কি স্বপ্ন দেখলি? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি ক্যানে?

—স্বপ্ন দেখলাম—মস্ত বড় একটা কালো কেউটে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

—সাপ?

—হ্যাঁ, সাপ। আর—

—আর?

—সাপটা ছেড়ে দিয়েছে ওই মুখপোড়া—

—কে? কোন্ মুখপোড়া?

—ওই শত্তুর—ছিরে মোড়ল! সাপ ছেড়ে দিয়ে আমাদের সদর দুয়োরের চালাতে দাঁড়িয়ে হাসছে।

পদ্ম আবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে আছে। পদ্মের অসুখের কথা মনে হইলেই ওই কথাটাই তাহার মনে পড়িয়া যায়। ডাক্তারেরা যখন চিকিৎসা করিতেছিল, তখন মনে হইলেও কথাটাকে সে আমল দেয় নাই কিন্তু দিন দিন ধারাণাটা আহার মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এখন সে রোজার কথা ভাবিতেছে, অথবা কোন দেবস্থল বা ভূতস্থল!

তাহার এই ধারণার কথা কেহ জানে না, পদ্মকেও সে বলে নাই। বলিয়াছে—কেবল মিতা গিরীশ ছুতারকে। জংশনের দোকানে যখন দু'জন যায়, তখন পথে অনেক সুখদুঃখের কথা হয়। দু'জনে ভালমন্দ অনেক মন্ত্রণা করিয়া থাকে। সমস্ত গ্রামই প্রায় একদিকে, তাহাদিগকে জব্দ করিবার একটা সজ্ঘবদ্ধ ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। অনিরুদ্ধ ও গিরীশের সঙ্গে আর একজন আছে, পাতু মুচি। ছিরু পালকে এখন শ্রীহরি ঘোষ নামে গ্রামের প্রধানরূপে খাড়া করিয়া গোমস্তা দাশজী বসিয়া বসিয়া কল টিপিতেছে; গ্রামের দলের মধ্যে নাই কেবল দেবু পণ্ডিত, জগন ঘোষ এবং তারা নাপিত। দেবু নিরপেক্ষ, তাহার প্রীতি-স্নেহের উপর অনিরুদ্ধের অনেক ভরসা; কিন্তু এ সকল কথা লইয়া অহরহ তাহাকে বিরক্ত করিতেও অনিরুদ্ধের সঙ্কোচ হয়। জগন ডাক্তার দিবারাত্র ছিরুকে গালাগালি করে, কিন্তু ওই পর্যন্ত—তাহার কাছে তাহার অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করা ভুল। তারাচরণকে বিশ্বাস করা যায় না। তারাচরণ নাপিতের সঙ্গে গ্রামের লোকের হাঙ্গামাটা মিটিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকই মিটাইতে বাধ্য হইয়াছে, কারণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নাপিতের প্রয়োজন বড় বেশী। জাতকর্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই নাপিতকে চাই। তারাচরণ এখন নগদ পয়সা লইয়াই কাজ করিতেছে, রেট অবশ্য বাজারের রেটের অর্ধেক;—দাড়ি-গোঁফ কামাইতে এক পয়সা. চুল কাটিতে দু-পয়সা, চুলকাটা এবং কামানো একসঙ্গে তিন পয়সা।

অন্যদিকে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে নাপিতের প্রাপ্যও কমিয়া গিয়াছে। নগদ বিদায় ছাড়া—চাল, কাপড় ইত্যাদি যে-সব পাওনা নাপিতের ছিল তাহার দাবি নাপিত পরিত্যাগ করিয়াছে। তারাচরণ নাপিত ঠিক কোনো পক্ষভুক্ত নয়, অনেকটা নিরপেক্ষ ব্যক্তি। অনিরুদ্ধ বা গিরীশ জিজ্ঞাসা করিলে চুপি চুপি সে গ্রামের লোকের অনেক পরামর্শের কথাই বলিয়া যায়। আবার অনিরুদ্ধ ও গিরীশের সংবাদ গ্রামের লোক জিজ্ঞাসা করিলে তা-ও হাঁ না করিয়া দুই চারিটা বলে। তবে তারাচরণের আকর্ষণ অনিরুদ্ধ গিরীশের দিকেই বেশী! পাতুর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাদেরই সে দুই-চারিটি বেশী খবর দেয়, কিন্তু অযাচিতভাবে সকল খবর দিয়া যায় দেবুকে। দেবুকে সে ভালবাসে। আর কিছু কিছু খবর বলে জগন ডাক্তারকে। বাছিয়া বাছিয়া উত্তেজিত করিবার মতো সংবাদ সে ডাক্তারকে বলে। ডাক্তার চীৎকার করিয়া গালিগালাজ দেয়; তারাচরণ তাহাতে খুশী হয়, দাঁত বাহির করিয়া হাসে। কৌশলী তারাচরণ কিন্তু কোনদিন প্রকাশ্যে অনিরুদ্ধ-গিরীশের সঙ্গে হৃদ্যতা দেখায় না। কথাবার্তা যাহা-কিছু হয় সে-সব ওপারের জংশন শহরে বটতলায়। সেও

আজকাল গিয়া ক্ষুর-ভাঁড়ে লইয়া হাটের পাশেই একটা গাছতলায় বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিবকালী, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর, মহুগ্রাম, কঙ্কণা—এই পাঁচখানা গ্রামে তাহার যজমান আছে, তাহার দুইখানার কাজ সে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। বাকি তিনখানার একখানি নিজের গ্রাম—অপর দুইখানি মহুগ্রাম ও কঙ্কণা। মহুগ্রামের ঠাকুরমশায় বলেন মহাগ্রাম। এই ঠাকুরমশায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন জীবিত থাকিতে ও-গ্রামের কাজ ছাড়া অসম্ভব। ন্যায়রত্ন সাক্ষাৎ দেবতা। এই দুইখানা গ্রামে দুদিন বাদে—সপ্তাহের পাঁচদিন সে অনিরুদ্ধ-গিরীশের মত সকালে উঠিয়া জংশনে যায়! হাটতলায় অনিরুদ্ধের কামারশালার পাশেই বটগাছের ছায়ায় কয়েকখানা ইট পাতিয়া সে বসে। সেই তাহার হেয়ার কাটিং সেলুন। দস্তুরমত সেলুনের কল্পনাও তাহার আছে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে কথাবার্তা হয় সেইখানে। কঙ্কণা তাহাকে বড়ো একটা যাইতে হয় না। বাবুরা সবাই ক্ষুর কিনিয়াছে। যাইতে হয় ক্রিয়াকর্মে পূজাপার্বণে। সেগুলা লাভের ব্যাপার।

পদ্মের অসুখ সম্বন্ধে নিজের ধারণার কথা অনিরুদ্ধ গিরীশকে বলিলেও তারাকে বলে নাই—তারাচরণকে তাহারা ঠিক বিশ্বাস করে না।

কিন্তু তারাচরণ অনেক সন্ধান রাখে, ভাল রোজা, জাগ্রত দেবতার অথবা প্রেতদানার স্থান; যেখানে ভর হয়—এ সবের সন্ধান তারা নাপিত দিতে পারে। অনিরুদ্ধ ভাবিয়াছিল—তারা নাপিতকে কথাটা বলিবে কি না।

সেদিন মনের আবেগে অনিরুদ্ধ কথাটা তারাচরণের পরিবর্তে বলিয়া ফেলিল জগন ডাক্তারকে। দ্বিপ্রহরে জংশনের কামারশালা হইতে ফিরিয়া অনিরুদ্ধ দেখিল, পদ্ম মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইদানীং পদ্মর মূর্ছা-রোগের পর সে দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া আসে। সেদিন ফিরিয়া পদ্মকে মূর্ছিত দেখিয়া বারকয়েক নাড়া দিয়া ডাকিল, কিন্তু সাড়া পাইল না। কখন যে মূর্ছা হইয়াছে—কে জানে! মুখে-চোখে জল দিয়াও চেতনা হইল না। কামারশালায় তাতিয়া পুড়িয়া এতটা আসিয়া অনিরুদ্ধের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তিতে ক্রোধে সে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। জলের ঘটিটা ফেলিয়া দিয়া, পদ্মের চুলের মুঠি ধরিয়া সে নিষ্ঠুরভাবে আকর্ষণ করিল। কিন্তু পদ্ম অসাড়! চুল ছাড়িয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অনিরুদ্ধের বুকের ভিতরটা কান্নার আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পাগলের মতো ছুটিয়া আসিল। জগনের তেজী ওষুধের ঝাঁঝে পদ্ম অচেতন অবস্থাতেই বারকয়েক মুখ সরাইয়া শেষে গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল।

ডাক্তার বলিল—এই তো চেতন হয়েছে! কাঁদছিস কেন তুই?

অনিরুদ্ধের চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতেছিল। সে ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠেই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখুন দেখি, ডাক্তার! আগুন-তাতে পুড়ে এই এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ রাস্তা এসে আমার ভোগান্তি দেখুন দেখি একবার!

ডাক্তার বলিল—কি করবি বল? রোগের উপর তো হাত নাই! এ তো আর মানুষে করে দেয় নাই!

অনিরুদ্ধ আজ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, সে বলিয়া উঠিল—মানুষ, মানুষেই করে দিয়েছে ডাক্তার ; তাতে আমার এতটুকুন সন্দেহ নাই। রোগ হলে এত ওষুধ-পত্র পড়ছে তাতেও একটুকু বারণ শুনছে না রোগ ! এ রোগ নয়—এ মানুষের কীর্তি।

জগন, ডাক্তার হইলেও, প্রাচীন সংস্কার একেবারে ভুলিতে পারে না। রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইনজেকশন দিয়াও সে দেবতার পাদোদকের উপর ভরসা রাখে। অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—তা-যে না হতে পারে তা নয়। ডাইনী-ডাকিনী দেশ থেকে একেবারে যায় নাই। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে তো বিশ্বাস করে না ! ওয়া বলছে—

বাধা দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বলুক, এ কীর্তি ওই হারামজাদা ছিরের।

ক্রোধে ফুলিয়া সে এতখানি হইয়া উঠিল।

সবিস্ময়ে জগন প্রশ্ন করিল—ছিরের ?

—হ্যাঁ, ছিরের। ক্রুদ্ধ আবেগে অনিরুদ্ধ পদ্মের সেই স্বপ্নর কথাটা আনুপূর্বিক ডাক্তারকে বলিয়া সে বলিল—ওই যে চন্দর গড়াই, ছিরে শালার প্রাণের বন্ধু—ও শালা ডাকিনী-বিদ্যে জানে। যোগী গড়ায়ের বিধবা মেয়েটাকে কেমন বশীকরণ করে বের করে নিলে—দেখলেন তো ! ওকে দিয়েই এই কীর্তি করেছে। এ একেবারে নিশ্চয় করে বলতে পারি আমি।

জগন গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পর বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হুঁ।

ক্রোধে অনিরুদ্ধের ঠোঁট থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। পদ্ম এই কথাবার্তার মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছিল ; দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া সে হাঁপাইতেছিল। অনিরুদ্ধের ধারণার কথাটা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল।

জগন বলিল—তাই তুই দেখ্‌ অনিরুদ্ধ, একটা মাদুলি কি তাবিজ হলেই ভাল হয় ! তারপর বলিল—দেখ, একটা কথা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ; দেখিস তুই—এ ঠিক ফলে যাবে ; নিজের বাণে বেটা নিজেই মরবে।

অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে জগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জগন বলিল—সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয় জানিস তো ?

—কি হয় ?

—বংশবৃদ্ধি হয়, ছেলে হয়, তোদের কপালে ছেলে নাই, কিন্তু ছিরে নিজে যখন সাপ ছেড়েছে, তখন ওই বেটার ছেলে ম'রে—তোর ঘরে এসে জন্মাবে ! তোর হয়তো নাই, কিন্তু ও নিজে থেকে দিয়েছে !

জগনের এই বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া অনিরুদ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল ; তাহার চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে জগনের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পদ্মের মাথার ঘোমটা অল্প সরিয়া গিয়াছে, সে-ও স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল সম্মুখের দিকে। তাহার মনে পড়িয়া গেল—ছিরুর শীর্ণ গৌরবর্ণা স্ত্রীর কথা। তাহার চোখ-মুখের মিনতি, তাহার সেই কথা—'আমার ছেলে দু'টিকে যেন গাল দিয়ো না ভাই ! তোমার পায়ে ধরতে এসেছি আমি !'

জগন ও অনিরুদ্ধ কথা বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। জগন বলিল—চিকিৎসা এর তেমন কিছু নাই। তবে মাথাটা যাতে একটু ঠাণ্ডা থাকে, এমনি কিছু চলুক। আর তুই বরং, একবার সাওগ্রামের শিবনাথ-তলাটাই না হয় ঘুরে আয়! শিবনাথ-তলার নাম-ডাক তো খুব আছে!

শিবতলার ব্যাপারটা ভৌতিক ব্যাপার। কোন পুত্রহারা শোকার্ত মায়ের অবিরাম কান্নায় বিচলিত হইয়া নাকি তাহার মৃত পুত্রের প্রেতাত্মা নিত্য সন্ধ্যায় মায়ের কাছে আসিয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার মা খাবার রাখিয়া দেয়, আসন পাতিয়া রাখে; প্রেতাত্মা আসিয়া সেই ঘরে বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সেই অবসরে নানা স্থান হইতে লোকজন আসিয়া আপন আপন রোগ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ প্রেতাত্মার কাছে নিবেদন করে; প্রেতাত্মা সে-সবের প্রতিকারের উপায় করিয়া দেয়। কাহাকেও দেয় মাদুলি, কাহাকেও তাবিজ, কাহাকেও জড়ি, কাহাকেও বুটি, কাহাকেও আর কিছু!

অনিরুদ্ধ বলিল—তাই দেখি।

—দেখি নয়, শিবনাথ-তলাতেই যা তুই। দেখ না, কি বলে!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিরুদ্ধ একটু হাসিল—অত্যন্ত ম্লান হাসি। বলিল—এদিকে যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, এগিয়ে যাই কি করে?

ডাক্তার অনিরুদ্ধের দিকে চাহিল, অনিরুদ্ধ বলিল—পুঁজি ফাঁক হয়ে গেল ডাক্তারবাবু, বর্ষাতে হয়তো ভাতই জুটবে না। বাকুড়ির ধান মূলে-চুলে গিয়েছে, গাঁয়ের লোকে ধান দেয় নাই, আমিও চাইতে যাই নাই। তার ওপর মাগীর এই রোগে কি খরচটা হচ্ছে, তা তো আপনি সবই জানেন গো! শিবনাথের শুনেছি বেজায় খাঁই।

প্রেত-দেবতা শিবনাথ রোগ-দুঃখের প্রতিকার করিয়া দেয়, কিন্তু বিনিময়ে তাহার মাকে মূল্য দিতে হয়। সেটা লাগে প্রথমেই।

জগন বলিল—পাঁচ-সাত টাকা হলে আমি না-হয় কোন রকমে দেখতাম অনিরুদ্ধ কিন্তু বেশী হলে তো—

অনিরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—ডাক্তারের অসমাপ্ত কথার উত্তরে সে বলিয়া উঠিল, তাতেই হবে ডাক্তারবাবু, তাতেই হবে, আরও কিছু আমি ধার-ধোর করে চালিয়ে নোব। দেবুর কাছে কিছু আপনার আর দুগ্‌গার কাছে যদি—'

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—দুগ্‌গা?

অনিরুদ্ধ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর মাথা চুলকাইয়া একটু লজ্জিত ভাবেই বলিল—পেতো মুচির বোন দুগ্‌গা গো!

চোখ দুইটা বড় করিয়া ডাক্তারও একটু হাসিল—ও! তারপর আবার প্রশ্ন করিল—ছুঁড়ির হাতে টাকাকড়ি আছে, নয়?

—তা আছে বৈকি। শালা ছিরের অনেক টাকা ও বাগিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া কঙ্কণার বাবুদের কাছেও বেশ পায়। পাঁচ টাকার কমে হাঁটেই না।

—ছিরের সঙ্গে নাকি এখন একবারেই ছাড়াছাড়ি শুনলাম ?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আমার কাছে একখানা বগি-দা করিয়ে নিয়েছে, বলে—খ্যাপা কুকুরকে বিশ্বাস নাই। রাত্রে সেখানা হাতের কাছে নিয়ে ঘুমোয়।

—বলিস্ কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কিন্তু তোর সঙ্গে এত মাখামাখি কিসের ? আশনাই নাকি ?

মাথা চুলকাইয়া অনিরুদ্ধ বলিল—না—তা নয়, দুগ্‌গা লোক ভাল, যাই-আসি গল্প-সল্প করি।

—মদ-টদ চলে তো ?

—তা—এক-আধ দিন মধ্যে-মাঝে—

অনিরুদ্ধ লজ্জিত হইয়া হাসিল।

* * *

পথের উপর দাঁড়াইয়া ডাক্তারকে অকপটে সে সব কথাই খুলিয়া বলিল।

দুর্গার সঙ্গে সত্যিই অনিরুদ্ধের ঘনিষ্ঠতা হৃদ্য হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল দুর্গা শ্রীহরির সহিত সকল সংস্রব ছাড়িয়া নূতনভাবে জীবনের ছক কাটিবার চেষ্টা করিতেছে।

আজকাল দুর্গা জংশনে যায় নিত্যই, দুধের যোগান দিতে। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের কামারশালায় একটি বিড়ি বা সিগারেট খাইয়া, সরস হাস্য-পরিহাসে খানিকটা সময় কাটাইয়া তবে বাড়ী ফেরে। অনিরুদ্ধও সকালে দুপুরে বিকালে জংশনে যাওয়া-আসার পথে দুর্গার বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই যায়; দুর্গাও একটি করিয়া বিড়ি দেয়, বিড়ি টানিতে টানিতে দাঁড়াইয়াই দুই-চারিটা কথাবার্তা হয়। দা'খানাকে উপলক্ষ করিয়া হৃদ্যতাটুকু স্বল্পদিনের মধ্যেই বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে; মধ্যে একদিন লোহা কিনিবার একটা গুরুতর প্রয়োজনে—টাকার অভাবে বিব্রত হইয়া অনিরুদ্ধ চিন্তিতমুখেই কামারশালায় বসিয়াছিল, সেদিন দুর্গা আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—এমন করে গুম মেরে বসে কেন হে ?

দুর্গাকে বিড়ি দিয়া নিজেও বিড়ি ধরাইয়া অনিরুদ্ধ কথায় কথায় অভাবের কথাটা খুলিয়া বলিয়াছিল। দুর্গা তৎক্ষণাৎ আঁচলের খুঁট খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া বলিয়াছিল—চারদিন পরেই কিন্তুক শোধ দিতে হবে ভাই।—

অনিরুদ্ধ সে টাকাটা ঠিক চারদিন পরেই দিয়াছিল। দুর্গা সেদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—সোনার চাঁদ খাতক আমার!—

অনিরুদ্ধকে দুর্গার বড় ভাল লাগে। ভারী তেজী লোক, কাহারও সে তোয়াক্কা রাখে না। অথচ কি মিষ্ট স্বভাব! সব চেয়ে ভাল লাগে কামারের চেহারাখানি। লম্বা মানুষটি দেহখানিও যেন পাথর কাটিয়া গড়া! প্রকাণ্ড লোহার হাতুড়িটা লইয়া সে যখন অবলীলা-

ক্রমে লোহার উপর আঘাতের পর আঘাত করিতে থাকে তখন ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে ; কিন্তু তবুও ভাল লাগে, একটি আঘাতও বেঠিক পড়ে না !

* * *

ডাক্তারকে বিদায় করিয়া অনিরুদ্ধ বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া দেখিল পদ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছে, রান্নাবান্নার নাম-গন্ধ নাই। পদ্মকে সে আর কিছু বলিল না, কতকগুলো কাঠ-কুটা উনানের মুখে আনিয়া উনান ধরাইতে বসিল। রান্না করিতে হইবে ; তাহার পর আবার ছুটিতে হইবে জংশনে। রাজ্যের কাজ বাকী পড়িয়া গিয়াছে।

পদ্ম কাহাকে ধমক দিল—যা !

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কেহ কোথাও নাই। কাক কি কুকুর, কি বিড়াল, তাও কোথাও নাই। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি ?

পদ্ম উত্তরে প্রশ্ন করিল—কি ?

অনিরুদ্ধ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল, বলিল—খেপেছিস নাকি তুই ? কিছু কোথাও নাই, ধমক দিচ্ছিস কাকে ?

পদ্ম এইবার লজ্জিত হইয়া পড়িল, শুধু লজ্জিতই নয়, একটু অধিক মাত্রায় সচেতন হইয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া উনানশালে আসিয়া বলিল—সর। আমি পারব। তুমি যাও।

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল। আর সে পারিতেছে না।

কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে যদি পদ্মের রোগ উঠিয়া পড়ে ! সে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইল। পড়ে পড়ুক, সে আর পারে না। সে বাহির হইয়া গেল।

পদ্ম রান্না চাপাইল। ভাতের সঙ্গে কতকগুলো আলু, একটা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া কতকগুলি মসুরির ডাল ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ বাহিরে গিয়াছে। বাড়ীতে কেহ কোথাও নাই। নির্জন নিঃসহ অবস্থায় আজ অহরহ মনে হইতেছে তাহার সেই স্বপ্নের কথাগুলি, জগন ডাক্তারের কথাগুলি। ছিরু পালের বড় ছেলেটা তাহার মাকে কি ভালই না বাসে !

ওই—ওই কি আসিবে ?

ধবক্ ধবক্ করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ছেলেটির শীর্ণ গৌরাঙ্গী মা ওই খিড়কীর দরজার মুখেই আধকালো আধ-অন্ধকারের মধ্যে পদ্মের দিকে মিনতিভরা চোখে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে একটা সকাতর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বার বার আপন মনেই বলিল—না-না-না, তোমার বুকের ধন কেড়ে নিতে আমি চাই না। আমি চাই না। অমি চাই না।

উনানের মধ্যে কাঠগুলা জলিয়া উঠিয়াছে, হাঁড়ি-কড়া সম্মুখেই—এইবার রান্না চড়াইয়া দেওয়া উচিত ; কিন্তু সে তাহার কিছুই করিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্তরের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ চকিতের মত অধীর অতৃপ্ত কেহ অতি নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলিয়া

উঠিতেছে—মরুক, মরুক! মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে পাল-বধূর সন্তান। সভয়ে চাঞ্চল্যে শিহরিয়া উঠিয়া নীরবেই পদ্ম বলিতেছিল—না-না-না।

পাল-বধূর আটটি সন্তান হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি অবশিষ্ট আছে; আবারও নাকি সে সন্তানসম্ভবা। তাহার গেলে সে আবার পায়। যাক, তাহার আর একটা যাক। ক্ষতি কি!

উনানের আগুন বেশ প্রখরভাবেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তবুও সে কাঠগুলাকে অকারণে ভিতরে ঠেলিয়া দিল, অকারণেই স্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—আঃ ছি-ছি-ছি। ছি-ছিকার করিল সে আপন মনের ভাবনাকে।

তারপরই সে ডাকিল পোষা বিড়ালটাকে—মেনী মেনী, আয় আয়, পুষি আয়!

ছেলে না হইলে কিসের জন্য মেয়েমানুষের জীবন! শিশু না থাকিলে ঘরসংসার! শিশু রাজ্যের জঞ্জাল আনিয়া ছড়াইবে,—পাতা, কাগজ, কাঠি, ধুলা, মাটি, ঢেলা, পাথর, কত কি! কি তিরস্কার করিবে, আবার পরিষ্কার করিবে, রূঢ় তিরস্কারে শিশু কাঁদিবে, পদ্ম তখন তাহাকে বুকে লইয়া আদর করিবে! তাহার আবদারে নিজের ধুলার মুঠা মুখের কাছে লইয়া খাওয়ার অভিনয় করিবে—হাম-হাম-হাম! শিশু কাঁদিবে হাসিবে, বক্ বক্ করিয়া বকিবে, কত বায়না ধরিবে, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মও আবোল-তাবোল বকিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষে তাহাকে একটা চড় কষাইয়া দিবে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কোলে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া, দুটি গালে দুটি চুমা খাইয়া তাহাকে লইয়া উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইবে আর চাঁদকে ডাকিবে—আয় চাঁদ, আয় আয়, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা!

এই সব কল্পনা করিতে করিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

তাহার নিজের নাই, কেহ যদি তাহাকে একটি শিশু পালন করিতেও দেয়! একটি মাতৃহীন শিশু! শিশুসন্তানের জননী কেহ মরে না! ওই পালবধূ মরে না! পণ্ডিতের স্ত্রী মরে না! না হয় তো তাহার নিজের মরণ হয় না কেন! সে মরিলে তো সকল জ্বালা জুড়ায়!

বাহিরে অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। ওখানে আর যাচ্ছি না। আমার পৌষ-আগলানো আমার নিজের বাড়ীর দরজায় হবে।

পদ্মের মনের মধ্যে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল একটা দুরন্ত ক্রোধ। ইচ্ছা হইল—উনানের জ্বলন্ত আগুন লইয়া এই ঘরের চারিদিকে লাগাইয়া দেয়। যাক, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাক। অনিরুদ্ধ পর্যন্ত পুড়িয়া মরুক। পরমুহূর্তেই সে জ্বলন্ত উনানের উপর হাঁড়িটা চাপাইয়া দিল, তাহাতে জল ঢালিয়া, চাল ধুইতে আরম্ভ করিল।

কাল আবার লক্ষ্মীপূজা, পৌষ-সংক্রান্তিতে পৌষ-লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী! তাহার আবার লক্ষ্মী! কার জন্য লক্ষ্মী? কিসের লক্ষ্মী?

ষোল

পৌষ-সংক্রান্তির দিন পৌষ-লক্ষ্মী অর্থাৎ পৌষ-পার্বণ। নবান্নের দিন হইতে মাস দেড়েক পর পল্লীবাসীর জীবনে আর একটি সর্বজনীন উৎসব আসিল। যে জীবনে উদয়কাল হইতে অস্তকাল পর্যন্ত বারো ঘণ্টা সময়ের অর্ধেকটা চলে হল-আকর্ষণকারী কুব্জপৃষ্ঠ বলদের অতি-মন্থর পদক্ষেপের পিছনে পিছনে অথবা ঘরের সমান উঁচু ধান ও খড়-বোঝাই গরুর গাড়ীর চাকা ঠেলিয়া অথবা শ্বাসরোগীর মত দুঃসহ কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধানের বোঝা মাথায় করিয়া আনিতে আনিতে কাটিয়া যায় টানিয়া টানিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া, সেখানে দেড়মাস সময় পরিমাপে নগর-জীবনের তুলনায় নিশ্চয়ই দীর্ঘ। একটানা একঘেয়ে জীবন।

মধ্যে ইতুলক্ষ্মী গিয়াছে ; কিন্তু ইতুলক্ষ্মীতে নিয়ম আছে, পালন আছে, পার্বণের সমারোহ নাই। পৌষ-পার্বণে ঘরে ঘরে সমারোহ, পিঠা-পরব। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী পাতিয়া চিঁড়া, মুড়কি, মুড়ি, মুড়ির নাড়ু, কলাই-ভাজা ইত্যাদিতে পূজা হইয়াছিল। পৌষ-সংক্রান্তিতে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া ধান-কড়ি সাজাইয়া সিংহাসনের দুইপাশে দুইটি কাঠের পেঁচা রাখিয়া লক্ষ্মীপূজা হইবে। এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর সঙ্গে নানা দেবতার ভোগ দেওয়া হইবে। রাশীকৃত চাল ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া প্রস্তুত হইয়াছে—পিঠা তৈয়ারী হইবে হরেক রকমের। রস প্রস্তুত হইয়াছে, রসে সিদ্ধ পিঠা হইবে। তাহা ছাড়া গুড়েনারিকেলে, গুড়ে-তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছে, পাতলা ক্ষীর হইয়াছে, চাঁচি বা খোয়া ক্ষীর হইয়াছে—লোকে আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদ পাইবে।

অনিরুদ্ধের এসবের আয়োজন কিছুই হয় নাই। একে পদ্মের দেহ অসুস্থ, তার ওপর একটি পয়সাও তাহার. হাতে নাই। গোটা পৌষটাই অনিরুদ্ধের কামারশালা একরকম বন্ধ গিয়াছে বলিলেই হয়। লোহার কাজ এসময়ে বেশী না হইলেও কিছু হয় ; ধান-কাটার কাস্তে পাঁজানো এবং গরুর গাড়ীর চাকার খুলিয়া-পড়া লোহার বেড় লাগানো কাজ না করাইয়া চাষীদের উপায় নাই। কিন্তু অবসরের অভাবে অনিরুদ্ধ তাহাও করিতে পারে নাই। অবসর পাইবে কোথায় ? পদ্মের অসুখ লইয়াই মাথা খারাপ করিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে। আজ এখানে গিয়াছে, কাল ওখানে গিয়াছে। শিবনাথতলা, কোন্ এক মুসলমান ওস্তাদের বাড়ী যাইতে সে বাকী রাখে নাই। সব করিয়াছে ধার করিয়া। খরিদ্দারের টাকা ভাঙিয়া। এদিকে পাঁচবিঘা বাকুড়ির ধান তাহার গিয়াছে। বাকি জমির ধান ভাগ জোতদারের সঙ্গে নিজে লাগিয়া কাটিতেছে ও ঘাড়ে করিয়া আনিয়া ঘরে তুলিতেছে।

আবার সরকারের সেটেলমেন্ট আসিয়াছে, নোটিশ হইয়াছে—'আপন আপন জমিতে স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রমাণাদি সহ উপস্থিত থাকিতে হইবে। অন্যথায় সেটেলমেন্ট কার্যবিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেক।'

এক টুকরা জমির জন্য কানুনগো ও আমিন বাবুদের সঙ্গে সেই ভোর হইতে বেলা তিন

প্রহর কাটিয়া যায়, পাকা ধানের উপর দিয়া শিকল টানিতে টানিতে সেই জমিটুকুতে আসিতে চার পাঁচ দিন সময় লাগে। সে টুকরাটা হইয়া গেলে দুই-তিন দিন কি চার-পাঁচ দিন নিশ্চিন্ত, তাহার পর হয়তো আবার এক টুকরা। শুধু অনিরুদ্ধ নয়, সমস্ত গ্রামের লোকেরই এইভাবে লাঞ্ছনা-দুর্বিপাকের আর শেষ নাই! পৌষ-সংক্রান্তিতে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর সিংহাসন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে; কিন্তু এবার লক্ষ্মী এখনও মাঠে! গোটা গাঁয়ের মধ্যে একটি গৃহস্থেরও 'দাওন' আসে নাই। ওই আবার একটা হাঙ্গামা রহিয়া গেল। ধান তোলার শেষ দিনে 'দাওন' আসিবে—অনিরুদ্ধের নিজেকেই শেষ ধানগুচ্ছটি কাটিতে হইবে—কাটা ধানের গোড়ায় জল দিয়া ধানগুচ্ছটি লইয়া আসিতে হইবে মাথায় করিয়া। অনিরুদ্ধের কৃষাণ নাই, ভাগ-জোতদারকে পায়েস রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইবে। অন্যান্য বার এই লক্ষ্মীর সঙ্গেই ও পর্বটি সারা হইয়া যায়—এবার সেটেলমেণ্টের দায়ে বাকী পড়িয়া রহিল।

*   *   *

ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া পদ্ম ফেন গালিয়া ফেলিল। খুঁজিয়া বাছিয়া ভাতের ভিতর হইতে একটা ছোট পুঁটলি টানিয়া বাহির করিল, পুঁটলিটার মধ্যে আছে খানিকটা মসুর কলাই, গোটাচারেক বড় আলু, এবং একটুকরা কুমড়ার ফালি। এগুলা মাখিয়া ফেলিয়া আবার মাছ দেখিতে হইবে; মাছ নহিলে অনিরুদ্ধের ভাত উঠিবে না। এইজন্য খিড়কীর ডোবার জলের কিনারায় কতকগুলা 'আপা' অর্থাৎ গর্ত করা আছে—পাঁকাল মাছগুলা তাহার মধ্যে ঢুকিয়া থাকে; সতর্ক ও ক্ষিপ্রভাবে হাত চালাইয়া দিলেই ধরা যায়। পদ্ম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাহিরের দরজার দিকে চাহিল। এ কাজটুকুও তো সে করিলে পারিত! কোথায় গেলেন নবাব? সেই একবার বাহির-দরজায় সাড়া শোনা গিয়াছিল—চণ্ডীমণ্ডপ না ছাঁটিবার সঙ্কল্পের আস্ফালন হইতেছিল, তারপর আর সাড়া নাই। 'চণ্ডীমণ্ডপ ছাঁটিব না'। তবে তো মা কালী ও বাবা শিবের বেগুন ক্ষেত জলপ্লাবিত হইয়া গাছগুলা পচিয়া নিদারুণ ক্ষতি হইয়া গেল! ওইরূপ মতি না হইলে এই দুর্গতি হইবে কেন?

—কম্মকার রইছ নাকি হে? কম্মকার। অ কম্মকার। কম্মকার হে!

কে লোকটা? উত্তর না পাইয়াও একনাগাড়ে ডাকিয়াই চলিয়াছে।

—অ কম্মকার! এই তোমার দুগ্‌গা বললে—বাড়ী গেল কম্মকার, আর সাড়া দিচ্ছ না। ওহে ও কম্মকার।

অনিরুদ্ধ তাহা হইলে দুর্গার বাড়ী গিয়াছিল। রূপ আছে বলিয়াই ওই মুচিনীর বাড়ী? ছি-ছি-ছি।…লক্ষ্মী? এই লোকের বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকে? না এই লোকের বংশ থাকে? পদ্ম যেন পাগল হইয়া উঠিল—সে উনান হইতে জলন্ত কাঠ একখানা টানিয়া বাহির করিল। আগুন ধরাইয়া দিবে—ঘর-সংসারে সে আগুন ধরাইয়া দিবে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাড়ীর ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল ভূপাল চৌকিদার।

—বলি, কম্মকার, তুমি কি রকম মানুষ হে? ডেকে ডেকে গলা আমার ফেটে গেল!

কই, কম্মকার কই ?

বাড়ীর মধ্যে অনিরুদ্ধকে না পাইয়া ভূপাল খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া গেল, অবশেষে পদ্মকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল—তুমি বাপু কম্মকারকে ব'ল—আমি এসেছিলাম। আমার হয়েছে এক মরণ। ডাকলে লোকে যাবে না, আর গোমস্তা বলবে—শালা, বসে বসে ভাত খাবার জন্য তোকে মাইনে দিই!

—কে রে। কে কি বলবে কম্মকারকে? কম্মকার কার কি ধার ধারে? বাহির দরজা হইতেই কথা বলিতে বলিতে অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকিল।

—এই যে কম্মকাব। ভূপাল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।—তুমি বাপু একবার চল, গোমস্তা তো আমাব মুণ্ডুপাত করছে।

অনিরুদ্ধ খপ করিয়া তাহাব হাতখানা ধরিযা ফেলিযা বলিল—এই। বাড়ীর ভেতর ঢুকলি ক্যানে তুই ?

তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া ভূপাল এবার কষ্টস্ববে বলিল—হাত ছাড কম্মকার।

—বাড়ী ঢুকলি ক্যানে তুই? খাজনাব তাগাদা আছে, বাড়ীর বাইরে থেকে করবি। জমিদারের নগ্দী—বেটা ছুঁচোব গোলাম চামচিকে।

হাতটা মোচড দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া ভূপাল এবাব হুঙ্কার দিয়া উঠিল—এ্যাও। মুখ সামলে, কম্মকার, মুখ সামলে বল। দুবছর খাজনা বাকী, খাজনা দাও নাই ক্যানে? আলবৎ বাড়ী ঢুকব। ইউনান বোর্ডের ট্যাক্স—তাও আজ পর্যন্তও দাও নাই।...ভূপালও বাগ্দীব ছেলে; সেও এবার বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

খাজনা, ইউনিয়ান বোর্ডের ট্যাক্স। অনিরুদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ও-সব কথা আমলে না আনিয়া সে তাহার নিজের অভিযোগটাই আবার জাহির করিল—আমি যদি বাড়ীতে থাকতাম, তা হলে নয় ঢুকতিস—ঢুকতিস। বাড়ীতে বেটাছেলে নাই—আমার বাড়ী ঢুকবি ক্যানে তুই ?

ভূপাল বলিল—চল তুমি, গোমস্তা ডাকছে।

—যা যা বল গে, কারুব ডাকে আমি যাই না।

—খাজনার কি বলছ বল ?

—যা, বল গে, খাজনা আমি দোব না।

বেশ। ভূপাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধও সাফ-জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আস্ফালন আরম্ভ করিয়া দিল—আদালত আছে, উকিল আছে, আইন আছে, নালিশ কর গিয়ে। বাড়ীর ভেতর ঢুকবে, বাড়ীর ভেতর! ওঃ আস্পদ্ধা দেখ!

অকস্মাৎ সে কাঁদো-কাঁদো সুরে আবার বলিল—গরীব বলে আমাদের যেন মান-ইজ্জৎ নাই। আমরা মানুষ নই!

পদ্ম একটি কথাও বলে নাই, নীরবেই সিদ্ধ সামগ্রীগুলি নুন-তেল দিয়া মাখিতেছিল। এতক্ষণে বলিল—হ্যাগা, মাছের কি হবে ?

—মাছ? মাছ চাই না। কিছু খাব না, মা। পিত্তিতে আমার অরুচি ধরেছে।

পদ্ম আর কোন কথা না বলিয়া ভাত বাড়িতে আরম্ভ করিল।

অনিরুদ্ধ অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—তুই আমার লক্ষ্মী ছাড়ালি!

—আমি?

—হাঁ, তুই! রোগ হয়ে দিনরাত পড়ে আছিস, ঘরে সন্ধ্যে নাই, ধুপ নাই! এ ঘরে লক্ষ্মী থাকে? বলি, কাল যে লক্ষ্মীপুজো—তার কি কুটোগাছটা ভেঙে আয়োজন করেছিস? অনিরুদ্ধ রাগে ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

পদ্ম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের ক্ষোভের উন্মত্ততা ইতিমধ্যে অদ্ভুতভাবে প্রশান্ত উদাসীনতায় পরিণত হইয়া আসিয়াছে। অনিরুদ্ধের এই অপমানে ক্ষোভে তাহার তৃপ্তি হইয়াছিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার নিজের ক্ষোভের উন্মত্ততা—যে উন্মত্ততাবশে কিছুক্ষণ পূর্বে সে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল—সে উন্মত্ততা বিচিত্রভাবে শান্ত হইয়া গিয়াছে। আঁচল বিছাইয়া সেইখানেই সে শুইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর যেন একরাশ কান্না উথলাইয়া পড়িতেছে।

* * *

পদ্ম নীরবে কাঁদিতেছিল; দর্-দর্ ধারে তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া গাল ভিজাইয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। কাঁদিলে তাহার বুকের ভিতরে গভীর যন্ত্রণাদায়ক আবেগটা কমিয়া যায়। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কিছুক্ষণ পর তৃপ্তি অনুভব করে, তাহার পর একটা আনন্দ পায়।

—কই হে? কামার-বউ কই হে?

কে ডাকিতেছে? পদ্ম নিঃশব্দে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। মুছিয়া ফেলিয়াও কিন্তু সাড়া দিল না, সাড়া দিতে ইচ্ছা হইল না।

—কামার-বউ! ওমা, এই বিকেলবেলা উনোনের মুখে শুয়ে ক্যানে হে?

তাহাকে দেখিয়া পদ্মের সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। যে ডাকিতেছিল সে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে। সে দুর্গা।

কি আস্পর্ধা মুচিনীর। ডাকিবার ধরন দেখ না। অত্যন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠেই সে বলিল—ক্যানে? কি দরকার?

হাসিয়া দুর্গা বলিল—একটা কথা আছে ভাই তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে? কি কথা? কিসের কথা, শুনি?

—বলব, তা উঠেই বস।

—আমার শরীরটা ভাল নাই।

দুর্গা শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—অসুখ করেছে? দাওয়ার ওপর উঠব?

তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত পদ্ম উঠিয়া বসিল, বলিল—না।

দুর্গা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ওমা, কাঁদছিলে বুঝি? কি হ'ল?

কর্মকারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? সে হি-হি করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

—সে খবরে তোমার দরকার কি? কি বলছ বল না? খোঁজ দেখ না! যেন আমার কত আপনার জন!

—আপনার জন তো বটে, ভাই। 'সই' কি না—তুমিই বল।

—তুই আমার আপনার জন? পদ্ম ক্রোধে এবার 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিল।

দুর্গা কিন্তু তাহাতেও রাগ করিল না, হাসিল। হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হে হ্যাঁ! যদি বলি আমি তোমার সতীন! তোমার কর্তা তো আমাকে ভালবাসে হে!

পদ্ম এবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দুরন্ত ক্রোধে রান্নাশালার ঝাঁটা গাছটা কুড়াইয়া লইল।

দুর্গা হাসিয়া খানিকটা সরিয়া গিয়া বলিল—ছোঁয়া পড়লে অবেলায় চান করতে হবে! আমার কথাটাই আগে শোন ভাই, তারপর না-হয় ঝাঁটাটা ছুঁড়েই মেরো।

পদ্ম অবাক হইয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দাঁড়াও ভাই, বার দরজাটা আগে বন্ধ করে দি। কে কখন এসে পড়বে।

পদ্ম তখনও শান্ত হয় নাই, সে ঝাঁঝালো সুরে বলিল—দরজা দিয়ে কি হবে? গণ্ডায় গণ্ডায় আমার তো নাগর নাই।

দুর্গা আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল—আমার তো আছে ভাই। তারা যদি গন্ধে গন্ধে এসে পড়ে!

—আমার বাড়ী এলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না?

দুর্গা ততক্ষণে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফিরিয়া সে সংস্পর্শ বাঁচাইয়া খানিকটা দূর হইতে বলিল—পরকে না হয় পার। কিন্তু তোমার আপন কত্তাটিকে? সেও যে আমার তুমি যা বললে—তাই! যাক, শোন ভাই ঠাট্টা নয়, এইগুলো ঘরে তুলে রাখ দেখি।—সে ততক্ষণে কাঁখাল হইতে কাপড়-ঢাকা একটা চুপ্‌ড়ি নামাইল। তাহার মধ্য হইতে নামাইয়া দিল—এক ঘটি দুধ, এক ভাঁড় গুড়, গোটাদুয়েক ছাড়ানো নারিকেল, সেরখানেক তিল, একটা পাত্রে আধসেরটাক্ তেল—আরও কতকগুলি মসলাপত্র। বলিল, যাও, লক্ষ্মীপুজোর উয্যুগ করে ফেল। আতপ চাল তো আমার নাই, আর আমাদের চালগুঁড়োতে তো হবে না! আমি শুনলাম তোমার কর্তার কাছে।

পদ্মর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া জিনিসগুলোকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। তাহাই সে দিত। কিন্তু ঠিক তখনই বাহির দরজায় ধাক্কা দিল। হয়তো অনিরুদ্ধ। ভাল, সে-ই আসুক—তারপর সামনেই সে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে।

দ্রুতপদে সে নিজেই গিয়া খুলিয়া দিল। কিন্তু সে অনিরুদ্ধ নয়—বুড়ী রাঙাদিদি। পদ্ম শান্ত ভাবে সম্ভাষণ করিল—কে, রাঙাদিদি?

—হ্যাঁ। তা হ্যাঁলো নাতবউ।—বলিতে বলিতে বৃদ্ধার দৃষ্টি পড়িল দুর্গার উপর।—ওমা, ও কে বসে? ওটা কে?

—আমি। কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া দুর্গা বলিল—রাঙাদিদি, আমি দুগ্‌গা, বায়েনদের দুগ্‌গা।

—দুগ্‌গা। তোর কি আ-ছাটা 'মিস্তিকে' নাই লা? এই হেথা, এই হোথা, একেবারে দুই মুলুকে। কঙ্কণা, জংশন, কোথায় বা না যাস। তা হেথা কি করছিস লা? ওগুলো কি বটে?

—এই, কামার-বউ টাকা দিয়েছিল জংশন থেকে জিনিস কিনতে; তাই এনে দিলাম, রাঙাদিদি।

—তা আমাকে বলতে নাই? গাঁয়ে বসে চার আনার বাজার করলাম আজ, চাল বেচলাম এক টাকার। জংশনে চার আনার বাজারেও একটা পয়সা বাঁচত, চালের দরেও দুটো পয়সা বেশী পেতাম। আমার তো শক্তসোমথ সোয়ামী নাই, আবাগী আমি—আমার 'উব্‌গার' করবি ক্যানে বল?

হাসিয়া দুর্গা বলিল—এইবার একদিন দিও দিদি, এনে দোব।

—তা দিস। তুই মানুষ তো ভাল, তবে বড় নচ্ছার। তা তুই যা করবি করগে, আমার কি?

দুর্গা সশব্দে হাসিয়া উঠিল—তা বই কি, দিদির তো আর বুড়ো নাই। ভয়-ভাবনা কিসের? তা বাজার তোমার করে দোব দিদি!

বৃদ্ধা বলিল—মরণ। তার আবার হাসি কিসের লা?

—বেশ, আর হাসব না। এখন কি বলছ বল?

—মর! তোকে কে বলছে? বলছি নাতবউকে। হ্যাঁ লা নাতবউ, এবার যে বড় আমার বাড়ীতে চাল কুটতে গেলি না?

রাঙাদিদির বাড়ীতে ঢেঁকি আছে, পদ্ম বরাবরই রাঙাদিদির ঢেঁকিতে পিঠার চাল কুটিয়া আনে। এবার যায় নাই; তাই বৃদ্ধা আসিয়াছে।

—বলি হ্যাঁ লা, তোকে আমি কখনও কিছু বলেছি নাকি? বল কিছু বলেছি কিনা? মনে তো পড়ছে না ভাই!

কাহাকে কখন যে বুড়ী কি বলে সে আর পরে তাহার মনে থাকে না।

ম্লান হাসি হাসিয়া পদ্ম বলিল—তার জন্য নয়, এবার চাল কোটাই হয় নাই রাঙাদিদি।

—চাল কোটাই হয় নাই? বলিস্ কি?

—না।

—আ-মরণ! তা আর কবে চাল কুটবি? রাত পোহালেই তো লক্ষ্মী—

পদ্ম চুপ করিয়া রহিল। দুর্গা মাঝখান হইতে বলিল—নাতবউয়ের অসুখ, তো জান রাঙাদিদি। অসুখ শরীরে কি করবে বল?

—তবে? লক্ষ্মী হবে কি করে? তোর সেই 'হাঁদামুখল' মিন্সে কোথা? সেই অনিরুদ্ধ? সে পারে না?

দুর্গাই বলিল—হবে কোন রকম করে। কর্ম্মকার আসুক, দোকান থেকে কিনে আনবে।

—কিনে আনবে? না-না। কলে কোটা গুঁড়োয় কি লক্ষ্মী হয়? ও নাতবউ, এক কাজ কর, আমার ঘর থেকে নিয়ে আয় চাট্টি গুঁড়ো। তা দু'সের আড়াই সের দিতে পারব। আচ্ছা, আমিই না হয় দিয়ে যাব। ওমা! তা বলতে হয়। আমি এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছি।

যাইতে যাইতে দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা বলিল—ইছু শেখ পাইকারের কত্তণটা দেখ দেখি দুগ্‌গা, বুড়ো গাইটার দাম বলছে চার টাকা। শেষমেষ বলে, পাঁচ টাকা। তোদের পাড়ায় আর কেউ পাইকার এলে পাঠিয়ে দিস্ তো বুন্।

দুর্গাও ঝুড়িটা লইয়া উঠিল, বলিল—বাটি-ঘটি কাল এসে নিয়ে যাব ভাই। আজ চললাম।

—এইখানে কাল খাবে।

—বেশ। দুর্গা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অকস্মাৎ কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। রাঙাদিদির সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে কেমন করিয়া তাহার অন্তরের ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল। আবার সব ভাল লাগিতেছে। দুর্গার জিনিসগুলা সে প্রত্যাখ্যান করিল না; লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল না। দুর্গার ওই মিথ্যা কথাটা তার বড় ভাল লাগিয়াছে; রাঙাদিদিকে সে বলিল—কামার-বউ তাহাকে জংশন শহর হইতে বাজার করিয়া আনিতে টাকা দিয়াছিল—এ সেই জিনিস!

সে রাঙাদিদির চালগুঁড়োর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বাড়ীতে আতপ চাল নাই। চাল গুঁড়াইয়া একবার বাটিয়া লইয়া আল্‌পনার গোলা তৈয়ারি করিতে হইবে। আল্‌পনা আঁকিতে হইবে—বাহির-দরজা হইতে ঘরের ভিতর পর্যন্ত থামারে, মরাইয়ের নিচে গোয়াল ঘরে পর্যন্ত। চণ্ডীমণ্ডপে আবার পৌষ আগলানোর আল্‌পনা আছে। মনে পড়িল, 'আউরী-বাঁউরী' চাই। কার্তিক-সংক্রান্তি 'মুঠলক্ষ্মীর' ধানের খড় পাকাইয়া সেই দড়িতে বাঁধিতে হইবে বাড়ীর প্রতিটি জিনিস। ঘরের বাক্স-পেটরা তৈজস-পত্র সবেতেই পড়িবে মা-লক্ষ্মীর বন্ধন। ঘরের চালে পর্যন্ত আউরী-বাঁউরীর বন্ধন পড়িবে। তাহা হইলেই বৈশাখের ঝড়ে আর চাল উড়িবে না।

* * *

সেই পুরাকালে ছিল এক রাখাল ছেলে। বনের ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সে আপনার গরু-গুলিকে লইয়া চরাইয়া ফিরিত। গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের বাতাস তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে দুঃখ-কষ্ট হইলে সে চোখের জল ফেলিত, আর ঊর্ধ্বমুখে দেবতাকে ডাকিত—ভগবান্, আর পারি না, এ কষ্ট তুমি দূর কর, আমাকে বাঁচাও।

একদিন লক্ষ্মী-নারায়ণ চলিয়াছিলেন আকাশ-পথে। রাখালের কাতর কান্না আসিয়া পৌঁছিল তাঁহাদের কানে। মা-লক্ষ্মীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। দূর কর ঠাকুর, রাখালের দুঃখ দূর কর।

নারায়ণ হাসিলেন। বলিলেন—এ দুঃখ দূর করিবার শক্তি তো আমার নাই লক্ষ্মী, সে শক্তি তোমার।

লক্ষ্মী বলিলেন—তুমি অনুমতি দাও।

নারায়ণের অনুমতি পাইয়া লক্ষ্মী আসিলেন মর্ত্যে। চারিদিক হাসিয়া উঠিল—সোনার বর্ণচ্ছটায়, বাতাস ভরিয়া উঠিল দেবীর দিব্যাঙ্গের অপরূপ সৌরভে। রাখাল অবাক হইয়া গেল। দেবী রাখালের কাছে আসিয়া বলিলেন—দুঃখ তোমার দূর হইবে, তুমি আমার কথামত কাজ কর। এই লও ধানের বীজ; বর্ষার সময় মাঠে এইগুলি ছড়াইয়া দাও, বীজ হইতে গাছ হইবে। সেই গাছের বর্ণ যখন হইবে আমার দেহবর্ণের মতো, আমার গাত্র-গন্ধের মতো, গন্ধে যখন ভরিয়া উঠিবে তাহার সর্বাঙ্গ, তখন সেগুলি কাটিয়া ঘরে তুলিবে।

রাখাল লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। বর্ষায় প্রান্তরের বুকে ছড়াইয়া দিল ধানের বীজ; দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাঠ ভরিয়া গেল সবুজ ধানের গাছে। ক্রমে ক্রমে বর্ষা গেল—সবুজ ধানের ডগায় দেখা দিল শীষ। রাখাল নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল, কিন্তু এখনও সেই ঠাকরুনের মতো বর্ণ হয় না, সে গন্ধও উঠিতেছে না। রাখাল অপেক্ষা করিয়া রহিল। হেমন্তের শেষ অগ্রহায়ণে একদিন রাত্রে ঘরে শুইয়াই রাখাল পাইল সে গন্ধ। সকালে উঠিয়াই সে ছুটিয়া গেল মাঠে। অবাক হইয়া গেল। সোনার বর্ণে গোটা মাঠটা আলো হইয়া উঠিয়াছে, দিব্য-গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত। সোনার বর্ণে, দিব্য গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আকাশে নানাবিধ কীট-পতঙ্গ-পাখী উড়িতেছে—পশুরা আসিয়া জুটিয়াছে চারিপাশে, সেই ঠাকরুন যেন তাহার দুঃখে বিগলিত হইয়া মাঠ জুড়িয়া অঙ্গ এলাইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ধান কাটিয়া ভারে ভারে ঘরে তুলিল।

দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া আসিয়া সোনা দিয়া কিনিতে চাহিলেন সমস্ত ধান। রাজার ভাণ্ডারের সোনা ফুরাইয়া গেল—কিন্তু রাখালের ধান অফুরন্ত। রাজার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তখন রাজা আপনার কন্যাকে আনিয়া দান করিলেন রাখালের হাতে। সম্মুখেই পৌষ-সংক্রান্তিতে রাখাল লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিল। ওই ধানকেই স্থাপিত করিল সিংহাসনে, সিন্দুর-কজ্জলে বসনে-ভূষণে তাহাকে বিচিত্র শোভায় সাজাইল, সম্মুখে স্থাপন করিল জলপূর্ণ ঘট, ঘটের মাথায় দিল ডাব—আমের পল্লব। রাজকন্যা ঐ ধান ভানিয়া চাল করিলেন, চাল হইতে প্রস্তুত হইল সেই নানাবিধ সুখাদ্য,—ঘৃতে-অন্নে ঘৃতান্ন, দুধে-অন্নে মিষ্টান্ন-পায়সান্ন-পরমান্ন, হরেক রকমের পিঠা সরুচাকুলি, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চপুষ্পে ধূপে-দীপে চন্দনে গন্ধে দেবীর পূজা করিয়া রাখাল ও রাজকন্যা দেবীর ভোগ দিয়া সর্বাগ্রে দিলেন কৃষাণকে, রাখালকে—নিজের স্বামীকে, ঘরের জনকে—তাহার পর বিলাইলেন পাড়া প্রতিবেশীকে, হেলে বলদ, গাই গরু ছাগল-ভেড়া—এমন কি বাড়ীর উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরটা পর্যন্ত প্রসাদ পাইল।

লক্ষ্মীদেবী মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিলেন, আপন পরিচয় দিলেন, বর দিলেন, তোমার মতো এই পৌষ-সংক্রান্তিতে যে আমার পূজার্চনা করিবে—তাহার ঘরে আমি অচলা হইয়া বাস করিব। পৃথিবীতে তাহার কোন অভাব বা কোন দুঃখ থাকিবে না। পরলোকে সে করিবে বৈকুণ্ঠে বাস।

* * *

ব্রত-কথাটি মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক বাঁধিয়া পরিতুষ্ট মনেই পদ্ম লক্ষীর আয়োজন আরম্ভ করিল। ঘর-দুয়ার, খামার হইতে গোয়াল পর্যন্ত আলপনা আঁকিয়া এবার সে যেন একটু বেশী বিচিত্রিত করিয়া তুলিল, দুয়ার হইতে আঙিনার মধ্যস্থল পর্যন্ত আলপনায় আঁকিল চরণ-চিহ্ন। ওই চরণ-চিহ্ন। ওই চরণ-চিহ্নে পা ফেলিয়া লক্ষী ঘরে আসিবেন। ঘরের মধ্যস্থলে সিংহাসনের সম্মুখে আঁকিল প্রকাণ্ড এক পদ্ম। অপরূপ তাহার কারুকার্য। মা আসিয়া বিশ্রাম করিবেন। শাঁক ধুইল, ধূপ বাহির করিল, প্রদীপ মার্জনা করিল, সিন্দুর রাখিল, কাজল পাড়িল। এদিকের আয়োজন শেষ করিয়া গুড়ে-নারিকেলে, গুড়ে-তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবে, দুধ জাল দিয়া ক্ষীর হইবে। কত কাজ, কত কাজ! কাজের কি অন্ত আছে? আজ যদি তাহার একটা ছোট মেয়ে থাকিত, তবে সে-ই জিনিসপত্রগুলি হাতে হাতে আগাইয়া দিতে পারিত। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—আলপনার কাজে তাহার একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে পৌষ-আগলানোর আলপনা চাই—সেটা দেওয়া হয় নাই।

একমুহূর্তে সে দাঁড়াইয়া ভাবিয়া লইল। মনে পড়িল, অনিরুদ্ধ তখন বলিতেছিল, চণ্ডীমণ্ডপে তাহার কেহ যাইবে না, তাহার পৌষ-আগলানো পর্ব হইবে তাহার বাড়ীর দুয়ারে!

না, সে হইবে না। পদ্ম তাহা করিবে না, করিতে দিবে না। 'মা কালী, বাবা বুড়োশিবের চরণতল ওই চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়া,—না, সে হইবে না।' পদ্ম আলপনা গোলার বাটী হাতে চণ্ডীমণ্ডপ অভিমুখেই বাহির হইয়া গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়াইয়া পদ্মের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এ কি সেই চণ্ডীমণ্ডপ? কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তাহার আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়া এমন অপরূপ শোভায় হাসিতেছে! এ যে সব পাকা হইয়া গিয়াছে। পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিবার পাকা সিঁড়ির দুই পাশে দুইটি হাতীর শুঁড় সিঁড়িগুলিকে বেষ্টন করিয়া যেন ধরিয়া রাখিয়াছে। ষষ্ঠীতলার বকুল গাছটির চারিপাশ পাকা গোল বেদী করিয়া বাঁধানো। চণ্ডীমণ্ডপের মেঝে পাকা হইয়াছে, মসৃণ সিমেন্টের পালিশ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। থামগুলিতে পলেস্তারা করা হইয়াছে। তাহাতে দুধবরণ কলি-চুন দেওয়া হইয়াছে। ওপাশে নূতন একটা কুয়া। পদ্মর মনে পড়িয়া গেল—এসব শ্রীহরি ঘোষের কীর্তি! সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আলপনা আঁকিতে বসিল। 'পৌষ পৌষ পৌষ, বড় ঘরের মেঝেয় এসে বস'—একটা ঘর আঁকিতে হইবে। মরাই আঁকিতে হইবে। 'এস পৌষ বস তুমি, না যেও ছাড়িয়া।' পৌষ মাস তো শ্রীহরির, তাহাদের আবার পৌষ মাস কিসের।

—কে গা, কে তুমি? একরাশ আলপনা যেন দিও না, বাছা। মুঠো মুঠো খরচ করে একজনা বাঁধিয়ে দিলে—আর তোমরা তো আপনার কল্যাণ করে চাল-গোলা ঢালছ। এর পর ধোবে মুছবে কে?

পদ্ম মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শ্রীহরির মা পথের উপর হইতে চীৎকার করিতেছে। পদ্ম

প্রতিবাদ করিতে পারিল না। শ্রীহরির মায়ের এ-কথা বলিবার অধিকার আছে বইকি! সে কোনমতে আলপনা শেষ করিয়া চলিয়া আসিল।

বাড়ী ঢুকিতে গিয়াই দেখিল, দেবু তাহাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। ঘোমটা টানিয়া সে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দেবুর পিছনে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল অনিরুদ্ধ। দেবু হাসিয়া পদ্মকেই বলিল—কাল তাহলে পণ্ডিতগিন্নীর কাছে লক্ষ্মীর কথা শুনতে যেয়ো মিতেনী। সে বলে দিয়েছে।

পদ্ম অবগুণ্ঠিত মস্তকে সায় দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, সে যাইবে।

দেবু চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ বলিল—পণ্ডিত এসেছিল; কার কাছে শুনেছে, লক্ষ্মীর উয্যুগ হয় নাই আমার, তাই দুটো টাকা দিয়ে গেল। এমন মানুষ আর হয় না! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল, কিন্তু সংসারে বাড়-বাড়ন্ত তো ওর হবে না, হবে ছিরের।

পদ্ম চুপ করিয়া রহিল। সে-ও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

অনিরুদ্ধ আবার প্রশ্ন করিল, আর কিছু আনতে হয় তো বল?

—না।

—তবে নে, কাজগুলো সেরে নে। আগে একবার তামুক সেজে দে দেখি।

অনিরুদ্ধকে তামাক সাজিয়া দিয়া সে উনানে কড়া চড়াইয়া আরম্ভ করিল গুড়-নারিকেলের পাক। তাহার অন্তর আবার দুঃখের আক্ষেপের আবেগে ভরিয়া উঠিয়াছে। দেবু পণ্ডিতের কথা ছাড়িয়াই দিতে হইবে—পণ্ডিত সত্যই দেবতার মত মানুষ! কিন্তু ওই দুর্গা, তাহারও দয়াধর্ম আছে, ভালবাসা আছে, রাঙাদিদির মত কৃপণ, সেও পুণ্যকর্ম করে। শ্রীহরি ঘোষের কীর্তি—তাহার মহত্ব দেখিয়া সে তো অবাক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জীবনে কি হইল!

দুঃখ তাহার নিজের জন্য, কিন্তু আজ সে হিংসা কাহাকেও করিল না। বরং সকলকেই সে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। আর বার বার কামনা করিল, মাগো! দুঃখ আমার দূর কর। সন্তানে-সম্পদে আমার ঘর ভরিয়া দাও, আমি ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব, আঙুল কাটিয়া প্রদীপের সলিতা করিব, চুল কাটিয়া চামর বাঁধিয়া সে চামরে তোমায় বাতাস করিব, বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া সেই রক্তে তোমার পায়ে আলতা পরাইব। তোমার পূজায় পঞ্চ-শঙ্খের বাজনা করিব, পট্টবস্ত্রের চাঁদোয়া টানাইব। রূপার সিংহাসনে সোনার ছাতার তলায় তোমাকে বসাইব; আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী, দীন-দুঃখী, পশু-পক্ষীকে বিতরণ করিব তোমার প্রসাদ—এক-অন্ন, পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন!

অনিরুদ্ধ বাড়ীর বাহির হইতেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল—পদ্ম! ও পদ্ম!

পদ্ম চমকিয়া উঠিল। কি হইল আবার?

* * *

অনিরুদ্ধ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল—কড়াইটা নামিয়ে রেখে আমার সঙ্গে আয় দেখি।

—কেন?

—পণ্ডিতকে ধরে নিয়ে গেল। পণ্ডিতের বাড়ী যাব।

—ধরে নিয়ে গেল? কে?

—সেটেল্‌মেণ্টের হাকিম পরোয়ানা বার করেছিল; থানা থেকে লোক এসে ধরে নিয়ে গেল।

—সেটেল্‌মেণ্ট! সেটেল্‌মেণ্ট! উঃ—কোথা হইতে ইহারা আসিয়া গ্রামখানার ঝুঁটি ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া সর্ব অঙ্গ-স্নায়ু-তন্ত্রী-মন এমন করিয়া অস্থির অবশ করিয়া দিল। নিত্য নূতন নোটিশ, নূতন হুকুম! তকমা-আঁটা পিওনগুলোর যাওয়া-আসার বিরাম নাই। পথে-ঘাটে সাইকেলের পর সাইকেল চলিয়াছে। কিন্তু হায় হায় একি কাণ্ড! দেবু পণ্ডিতের মত লোককে তাহারা ধরিয়া লইয়া গেল!

সতেরো

দেবু ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি নয়। সরকারী জরিপের কাজে বাধা দেওয়া ও সার্ভে ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারী আমীনকে প্রহার করার অপরাধে সে অভিযুক্ত হইয়াছে। স্থানীয় সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারের নির্দেশমতো এখানকার থানার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টার একজন কনস্টেবল লইয়া আসিয়াছে। গ্রাম্য চৌকিদার ভূপালও তাহাদের সঙ্গে আছে। তাহারা চণ্ডীমণ্ডপে অপেক্ষা করিতেছিল। দেবু অনিরুদ্ধের বাড়ী হইতে আসিবামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখন হাতে হাতকড়ি দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আজ রাত্রিতে থাকিবে হাজতে, কাল সকালে সেটেলমেণ্ট-অফিসারের নিকট হাজির করা হইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে জামিন দিবেন কিংবা বিচারাধীন আসামী হিসাবে তাহাকে সদর জেলে পাঠাইবেন। আবার ইচ্ছা করিলে সঙ্গে সঙ্গে বিচারের দিন ধার্য করিয়া নিজে বিচার করিবেন। দেবুকে লইয়া তাহারা চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া আছে।

দেবুও চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। মাথার ভিতরটাই কেমন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে; কিসে কি হইয়া গেল তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত নাই। শুধুই সে ভাবিতে পারিল যে, যাহা সে করিয়াছে—ভালই করিয়াছে; এখন যাহা হইবার হইয়া যাক!

দেখিতে দেখিতে গ্রামের প্রায় সকল লোকই জমিয়া গেল। শ্রীহরি ও দাশজী গোমস্তা, ছোট দারোগা সাহেবের পাশেই বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে তিন জনে কথাও হইতেছে। হরিশ আসিয়াছে, ভবেশ আসিয়াছে, হরেন ঘোষাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল ও গ্রামের দোকানী বৃন্দাবন, রামনারায়ণ ঘোষ এমন কি এই স্তরের

সন্ধ্যায় বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জগন ডাক্তার দেবুর পাশে বসিয়া আছে। প্রগল্‌ভ জগনও আজ স্তব্ধ, বিষণ্ণ—এমন আকস্মিক অভাবনীয় পরিণতিতে সে-ও হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। একপাশে গ্রামের হরিজনেরা দাঁড়াইয়া আছে। সতীশ, পাতু সকলেই আসিয়াছে। দুর্গা বসিয়া আছে ষষ্ঠীতলার একপাশে—একা, নীরবে, মাটির পুতুলের মতো।

চীৎকার করিতেছে কেবল বুড়ী রাঙাদিদি। চণ্ডীমণ্ডপের ও-পাশে গ্রামের প্রবীণারা পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাঙাদিদি বলিতেছিল—এ একেবারে হাতে করে মাথা কাটা! দারোগা! দারোগা হয়েছে তো সাপের পাঁচ পা দেখেছে। বলি হ্যাঁ গো দারোগা, চুরি না জোচ্চরি না ডাকাতি, কি করেছে বাছা যে, এই দিন সন্ধ্যেবেলা—রাতপোয়ালে লক্ষ্মী—তুমি বাছার হাতে দড়ি দিতে এলে?

হরিশ বলিল—ওগো রাঙা পিসি, তুমি থাম।

—ক্যানে? থামব ক্যানে? দেখব একবার কত বড় ওই দারোগা মিনসে!

একবার ধমক দিয়া শ্রীহরি বলিল—রাঙাদিদি, তুমি থাম। যা হয় আমরা করছি, তুমি একটু চুপ কর। তোমরা মেয়ে-লোক—

—মেয়ে-লোক! আমার সাড়ে-তিনকুড়ি বয়স হ'ল—আমি আবার মেয়েলোক কি রে? একশোবার বলব, হাজারবার বলব; আমাকে কি করবে? বাঁধবি তো বাঁধ ক্যানে, দেখি। পণ্ডিতের মতন লোককে দড়ি দিয়ে বাঁধছিস—আমাকেও বাঁধ'। লে বাঁধ! আহা, পণ্ডিতের মতন মানুষ, দেবুর মত ছেলে—! বুড়ী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবু এবার নিজে উঠিয়া আসিয়া বলিল—একটু চুপ কর, রাঙাদিদি, আমি তোমার কাছে হাত জোড় করছি।

বৃদ্ধা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—আমি তোকে আশীর্বাদ করছি ভাই, সায়েব তোকে দেখবামাত্তর ছেড়ে দেবে, চেয়ারে বসিয়ে বলবে—পণ্ডিত লোক, তোমাকে কি জেহেল দিতে পারি বাপ!

দেবু হাসিল।

ওদিকে ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া কৌশলে মুক্তিলাভ করাইবার কথাবার্তা হইতেছিল। শ্রীহরি ঘোষ তাহার অগ্রণী, সঙ্গে জমিদারের গোমস্তা দাশজী আছে। ছোট দারোগা শ্রীহরি ঘোষের বন্ধু লোক, শ্রীহরি তাহাকেই ধরিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে দেবু শ্রীহরির বিরোধীপক্ষ; অন্তরে অন্তরে দেবু তাহাকে ঘৃণা করে—তাহা শ্রীহরি জানে। কিন্তু গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে শ্রীহরি আজ দেবুর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া পারে না। সে থাকিতে তাহার গ্রামবাসী—বিশেষ করিয়া তাহার জাতি একজনকে হাতে দড়ি দিয়া লইয়া গেলে লোকে কি বলিবে? সে ছোট দারোগাকে খুশী করিয়া একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছে।

ছোট দারোগা বলিল—পেশকারের কাছে যাও, ধরে-পেড়ে হয়ে যাবে একরকম করে।

যে আমিন-কানুনগোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—তাদেরই খুশী কর, বিনয় করে মাফ চেয়ে নিক দেবু ঘোষ, ব্যস—মিটে যাবে। এ তো আকছার হচ্ছে!

শ্রীহরি বলিল—খুড়োর যে আমার বেজায় মাথা গরম গো—আমি প্রথম দিন শুনেই বলে পাঠিয়েছিলাম,—খুড়ো, একবার কানুনগো বাবুর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে এস। রাজকর্মচারী—তুই-তুকারি করলে তো হ'ল কি?

ভবেশ অমনি বলিয়া উঠিল—এ্যাই, গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ে নাই।

শ্রীহরি বলিল—যখন ঘটনা ঘটল, তখুনি তখুনি জানতে পারলে তো সে ঢেউ আমিই তখুনি মেরে দিতাম—ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতাম। আমি যে অনেক পরে শুনলাম।

ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটিয়া গিয়াছিল। এও সেই তুই-তুকারি লইয়া ঘটনা।

দেবু আপনার দাওয়ায় বসিয়া ছিল—তখন বেলা প্রায় বারোটা। সাইকেলে চড়িয়া সম্মুখের পথ দিয়া যাইতেছিল একজন কানুনগো। বোধ হয় বহুদূর হইতে আসিতেছিল—শীতের দিনে এক গা ঘামিয়া ধুলায় ও ঘামে আচ্ছন্ন এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ভদ্রলোক; দেবুকে দেখিয়া সাইকেল হইতে নামিয়াই সম্ভাষণ করিল—এই! ওরে! এই শোন!

এই সম্ভাষণ শুনিলেই দেবু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে; তাহার তিক্ত কটু অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তবু লোকটির মাথায় টুপি, সাদা সার্ট, খাকি হাফপ্যাণ্ট ও সাইকেল দেখিয়া সরকারী কর্মচারী অনুমান করিয়া সে চুপ করিয়াই রহিল।

—এই ইডিয়েট, শুনতে পাচ্ছিস?

এবার দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লোকটির দিকে চাহিল—ইচ্ছা ছিল কোন উত্তর না দিয়াই সে উঠিয়া গিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিবে, উত্তর দিবে না, ওই লোকটার কোন কথাই শুনিবে না। কিন্তু উঠিতে-উঠিতেও একবার সে লোকটির দিকে না চাহিয়া পারিল না।

চোখোচোখি হইতেই কানুনগো বলিল—যা, এক গ্লাস জল আন দেখি। বেশ ঠাণ্ডা জল। পরিষ্কার গ্লাসে, বুঝলি?

দেবু বিপদে পড়িয়া গেল। তৃষ্ণার জলের জন্য এই আবেদন অভদ্র হইলেও—সে 'না' বলিতে পারিল না। তবুও সে মুখে কোন কথা বলিল না, ঘরের ভিতর হইতে একটা মোড়া আনিয়া দাওয়ায় রাখিল; পিচবোর্ডে তৈয়ারী একখানা পাখা আনিয়া দিল। ঐগুলির মারফতেই নীরব আমন্ত্রণ জানাইয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই এক হাতে ঝকঝকে মাজা একখানি থালায় একটি বড় কদমা ও এক গ্লাস জল এবং অন্য হাতে একটি বড় ঘটির এক ঘটি জল ও পরিষ্কার একখানি গামছা আনিয়া হাজির করিল।

লোকটি হাত-মুখ ধুইল, গামছা আগাইয়া দিলে বাঁ হাত দিয়া কানুনগো গামছাখানা সরাইয়া দিল। হাত মুখ মুছিয়া ফেলিল সে আপনার রুমালে; তার পর কদমাটার খানিকটা ভাঙিয়া মুখে দিয়া বোধ হয় চাখিয়া দেখিল। কদমাটা টাটকা কদমা, বেশ ভালই লাগিবার কথা! লাগিলও বোধ হয় ভাল; কারণ গোটা কদমাটাই নিঃশেষ করিয়া জল খাইয়া কানুনগো পরিতৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—আঃ!

দেবু ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়াছিল। পান বা মসলা আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল। বিলুকে বলিল—সুপারি লবঙ্গ আর দুটো পান দাও দেখি! শীগগির।

পান সাজাই ছিল। একটুকরা পরিষ্কার কলাপাতার উপর দুইটি পান ও সুপারি, লবঙ্গ সাজাইয়া সে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

ঠিক এই সময়েই বাহির হইতে ডাক আসিল—ওরে! এই ছোক্‌রা!

দেবু আর সহ্য করিতে পারিল না। পানের পাতাটা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া সে বলিল—কিরে, কি বলছিস?

এমন অতর্কিত রূঢ় প্রত্যুত্তরের জন্য কানুনগো প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ে ক্রোধে প্রথমে সে কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া রহিল, তারপর বলিল—হোয়াট! আমায় তুই-তুকারি করিস?

নির্ভয়ে দেবু উত্তর দিল—সে তো তুই-ই আগে করলি।

—কি নাম তোর শুনি? তারপর দেখছি তোকে!

—দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর নির্ভয়ে বলিল—আমার নাম শ্রীদেবনাথ ঘোষ! তাহার দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল—কি করবি কর!

কানুনগো বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গিয়াছিল।

ওদিকে জরিপ স্থগিত রাখিবার জন্য শ্রীহরিদের দরবারে বিশেষ ফল হয় নাই; ধান কাটিবার জন্য মাত্র আর সাতদিন সময় মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু পৌষের চৌদ্দদিনের মধ্যে বিস্তীর্ণ মাঠের ধান কাটা ও তোলা অসম্ভব ব্যাপার। অসম্ভব কোনমতেই সম্ভবই হয় নাই। হইয়াছে কেবল শ্রীহরির এবং আর জন দুই-তিনের—হরিশ দোকানী বৃন্দাবন দত্ত এবং কৃপণ হেলারাম চাটুয্যের। তাহাদের পয়সা আছে, বহু নগদ মজুর নিযুক্ত করিয়া তাহারা কাজ শেষ করিয়াছে। বাকী লোকের পাকাধানের উপর দিয়াই জরিপ চলিতে আরম্ভ করিল। সরকার হইতে অবশ্য যথাসম্ভব সাবধান অবলম্বন করিয়া ধান বাঁচাইয়া আইলের উপর দিয়া কাজ করিতে নির্দেশ রহিল।

দেবু প্রথম দিন মাঠে গিয়া দেখিল—সার্ভে-টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে সেই কানুনগো লোকটি। কানুনগোও দেবুকে দেখিল। দুজনের চিত্তই তিক্ত হইয়া উঠিল। কানুনগো লোকটি ডিস্‌পেপটিক, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক, লোকজনের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা তাহার স্বভাব। দেবু সাবধানে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েকটা ক্ষুদ্র ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া কানুনগো তাহাকে ক্যাম্পে হাজির হইতে নোটিশ দিল।

তিক্তচিত্তে দেবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল—যাহা হয় হউক, সে কিছুতেই ওই কানুনগোর সম্মুখে হাজির হইয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইবে না।

কানুনগো সুযোগ পাইয়া এই অনুপস্থিতির কথা সেটেলমেন্ট-ডেপুটিকে রিপোর্ট করিল। ডেপুটি সাহেব নোটিশগুলি দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। এই তুচ্ছ কারণে নোটিশ করা

হইয়াছে? তাহার উপর তিনি এই কানুনগোটির স্বভাবও জানিতেন। তবুও আইনানুযায়ী দেবুকে নোটিশ করিলেন। দেবু এ নোটিশও অমান্য করিল। তারপরই ওয়ারেণ্ট হওয়ার নিয়ম। এদিকে ঠিক এই সময়েই এক চরম ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

দেবুরই একটা জমি পরিমাপের সময় কানুনগোর সঙ্গে তাহার বচসা আরম্ভ হইল। দেবু জমির রসিদ আনে নাই। বচসার উপলক্ষ তাই। কথার উত্তর দিতে দিতেই দেবুর নজর পড়িল,—তাহার জমির ঠিক মাঝখানে পাকা ধানের উপর জরীপের শিকল টানা হইতেছে। সে ভাবিল—এটাও কানুনগোর ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। কিন্তু সত্য বলিতে কি এটা কানুনগোর ইচ্ছাকৃত ছিল না, দেবুর জমিটার আকারই এমন অসমান যে, মাঝখানে প্রস্থের একটা মাপ না লইয়া উপায় ছিল না। রাগের মাথায় ভুল বুঝিয়া দেবু চরম কাণ্ড করিয়া বসিল। জরিপের চেন টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিল। কানুনগো সঙ্গে সঙ্গে টেবিল শিকল লইয়া মাঠ হইতে উঠিয়া একেবারে ডেপুটির ক্যাম্পে হাজির হইয়া রিপোর্ট করিল।

ডেপুটিবাবু সত্যকারের ভদ্রলোক, তিনি বাংলার চাষীর নিরীহ প্রকৃতির কথা জানেন, তিনিও এই দেশেরই মানুষ; তিনি অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু কানুনগোর বন্ধু পেশকারটি ধুরন্ধর লোক, সে তাঁহাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল—লোকটা ওই জে. এল. ব্যানার্জীর শিষ্য।

ডেপুটি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

তারপরই এই পরিণতি! একেবারে ওয়ারেণ্ট অব য়্যারেস্ট!

শ্রীহরি সত্যই বলিয়াছে—সে কয়েকবারই অনুরোধ করিয়াছে—খুড়ো, চল তুমি, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, কানুনগোকে আমি নরম করে এনেছি; তুমি একবারটি গেলেই সব মিটে যাবে।

দেবু বলিয়াছে—না।

জগন বলিয়াছে—পণ্ডিত, তুমিও একটা দরখাস্ত কর, সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দাও সি. ও. কে.; ডি এস আর কে-ও একটা দরখাস্ত কর।

দেবু বলিয়াছে—না, থাক।

বিলু শঙ্কিত, উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করিয়াছে—হ্যাঁ গো, কি হবে?

দেবু হাসিয়াছে—যা হয় হবে।

যাহা হইবার হইয়া গেল।

* * * *

শ্রীহরি দেবুর কাছে আসিয়া বলিল—ছোট দারোগাকে রাজী করিয়েছি, খুড়ো। প্রথমে কানুনগোর ক্যাম্পে যাবে, সেখানে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়ে, কানুনগোর চিঠি নিয়ে যাবে সার্কেল ডেপুটির কাছে। কেস খারিজ হয়ে যাবে, আমরা বাড়ী চলে আসব।

দেবু বলিল—না।

—না কি গো?

—না সে আমি যাব না, ছিরু।

—ফল কি হবে, ভাবছ তা?

—যা হয় হবে। দেবু এবারও হাসিল।

শ্রীহরি গভীর দুঃখের সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াও বিরক্তি সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—কাজটা কিন্তু ভাল করছ না, খুড়ো।

দাশজী বলিল—তা হলে আমরা আর কি করব বল?

মজলিস-সুদ্ধ লোকই সমস্বরে বলিল—আমরা আর কি করব বল?

কেবল মজলিসের সঙ্গে সায় দিল না তিনজন—জগন ডাক্তার, অনিরুদ্ধ আর হরেন ঘোষাল। হরেন ঘোষালের অভ্যাস সকলের আগে কথা বলা, কিন্তু সে আজ কিছু না বলিয়াই দ্রুতপদে উঠিয়া চলিয়া গেল।

জগন বলিল—ভেবো না দেবু ভাই! কাল যদি কেস না করে হাজতী আসামী করে জেলে পাঠায়, তবে সদরে গিয়ে মোক্তার এনে মামলা লড়ব। আর যদি কালই বিচার করে জেল দেয়, তবে সদরে আপীল করব। জামিন সঙ্গে সঙ্গে হবে।

দেবু বলিল—শতখানেক টাকা আমার পোস্ট আপিসে আছে, বিলুর কাছে ফরম সই করে দিয়েছি। দরকারমতো টাকা বার করে নিয়ো। মামলা করে কিছু হবে না জানি, কিন্তু জেরা করে আমি সব একবার ফাঁস করে দিতে চাই।

অনিরুদ্ধ অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিল—দেবু ভাই, তার চেয়ে মামলা মিটিয়ে ফেল।

হাসিয়া দেবু বলিল—তুমি একটু সাবধানে থেকো, অনি ভাই। ডাক্তার ওকে তুমি একটু দেখো।

ছোট দারোগা বলিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল। কি ঠিক হল আপনাদের?

দেবু উঠিয়া দাঁড়াইল—চলুন, আমি তৈরী।

ছোট দারোগা ডাকিল—ভূপাল! রামকিষণ!

—একটুকুন দাঁড়ান, দারোগাবাবু! কোথা হইতে আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল দুর্গা। দেবুকে বলিল—আর একবার বিলুদিদির সঙ্গে দেখা করে যাও পণ্ডিত।

দারোগা বলিল—যান, দেখা করে আসুন।

মুখরা দুর্গা আজ নীরব হইয়া দেবুর আগে আগে পথ চলিতেছিল।

দেবু বলিল—দুর্গা, তুই কিন্তু ওদের একটু দেখিস, একটু খোঁজখবর নিস্।

অগ্রগামিনী শুধু নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

বিলু কাঁদিতেছিল। দেবু চোখ মুছাইয়া দিল। তারপর শুধু কয়টা কাজের কথাই বলিল—পোস্ট আপিসের টাকাগুলো তুলে এনে নিজের কাছে রেখো। ডাক্তার যা চাইবে দিয়ো মামলার জন্যে। সাবধানে থেকো। ধান-পান হিসেব করে নিয়ো। নিজেই তুমি হিসেব করে নিয়ো।

তুমি তো হিসেব জানো। মন খারাপ করো না। খোকার ভার তোমার ওপর রইল—ঘর-দোর সব। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি চঞ্চল হলে তো চলবে না; তোমায় থাকতে হবে অচলা হয়ে।

বিলু একটি কথাও বলিতে পারিল না।

দেবু হাসিয়া সব শেষে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রগাঢ় আবেগে একটি চুম্বন দিয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে ছিল পদ্ম ও দুর্গা। দেবু বলিল—মিতেনী, তুমি রইলে, দুর্গা রইল; বিলুকে তোমরা একটু দেখো।

সে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বলিল—চলুন।

—ওয়েট্! চণ্ডীমণ্ডপে নাটকীয় ভাবে প্রবেশ করিল হরেন ঘোষাল। তাহার হাতে একটি অতি সুন্দর গাঁদা ফুলের মালা। মালাখানি সে দেবুর গলায় পরাইয়া দিয়া উত্তেজিত আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয়, দেবু ঘোষের জয়!

মুহূর্তে ব্যাপারটার চেহারা পাল্টাইয়া গেল।

দারোগা যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ফুলের মালা ও জয়ধ্বনিতে দেবুর পা হইতে মাথা পর্যন্ত একটা অদ্ভুত শিহরণ বহিয়া গেল। বুকের মধ্যে যে ক্ষীণতম দুর্বলতার আবেগটুকু স্পন্দিত হইতেছিল—সেটুকুও আর রহিল না, তাহার পরিবর্তে ভাঁটার নদীর বুকে জোয়ারের মত একটা বিপরীতমুখী উচ্ছ্বসিত আবেগ আসিয়া তাহাকে স্ফীত প্রশস্ত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা দারোগা কনস্টেবলের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকিয়াও প্রতিধ্বনি তুলিল—জয়, দেবু ঘোষের জয়। দৃঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে দেবু সম্মুখে অগ্রসর হইল।

* * *

লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করিতে বিলুর হাত উঠিতেছিল না। এক-অন্ন, পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর পূজা। এই বেদনা বুকে লইয়া সে-আয়োজন কেমন করিয়া কি করিবে সে; কাহার জন্য লক্ষ্মী পাতিবে। পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই নারীর বাস, নারায়ণের পাশে লক্ষ্মীর আসন। দেবুই যখন আজ এই আয়োজনের মধ্যস্থলে উপস্থিত নাই, তখন—! বার বার তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

কিন্তু রাঙাদিদি আসিয়া বলিল—ভাবিস না ভাই, পণ্ডিত ভাই আজই ফিরে আসবে। আর আমার পানে তাকিয়ে দেখ, তিনকুলে কেউ নাই, তবু তো পুজো করছি। তোর কোলে সোনার চাঁদ, দেবু আমার ফিরে আসছে—তোর পূজা না করলে চলে? দে, আমি বরং তোর লক্ষ্মী পেতে দিয়ে যাই। ওই চারিদিকে শাঁখ বাজছে—লক্ষ্মী পাতা হয়ে গেল সব।

রাঙাদিদি কত বাহার করিয়া নিপুণ হাতে সাজাইয়া লক্ষ্মী পাতিয়া দিয়াছে। লাল রেশমী কাপড়ে এমন করিয়া ধান ও কড়িগুলি ঢাকিয়া দিয়াছে যে মনে হয় যেন ছোট্ট একটি বধূ সিংহাসনের উপর বসিয়া আছে।

পদ্ম দুই-তিনবার আসিয়াছিল। দুর্গা তো সকাল হইতে বসিয়াই আছে, নড়ে নাই, শ্রীহরির মা-বউও আসিয়াছিল।

মা মৌখিক তত্ত্ব করিয়া গিয়াছে; বউটি আনিয়াছিল একছড়া মর্তমান কলা, একটা থোড়, একটা মোচা—শ্রীহরির নূতন কাটানো পুকুরের পাড়ের ফসল। আর কতকগুলি মটরশুঁটি, একটা কপি,—বাড়ীতে লক্ষ্মী-পূজা উপলক্ষে শ্রীহরি শহর হইতে আনাইয়াছে। বউটি বলিয়া গিয়াছে—তুমি ভেবো না, শাশুড়ী! তোমার ভাশুর-পো সকালেই গিয়েছে হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে। খুড়শ্বশুরকে সঙ্গে নিয়ে সে আজই ফিরে আসবে।

প্রায় প্রতি ঘরের মেয়েরা আসিয়া বিলুর তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে। জগন ডাক্তারের স্ত্রী পাঁচবার আসিয়াছে। হরিজনেরা জনে-জনে আসিয়াছে। খেজুরগুড়ের মহলাদারটি খেজুর গুড় দিয়া গিয়াছে। সতীশ হইতে প্রত্যেকেই ছোট ছোট ঘটিতে কাঁচা-দুধ আনিয়া দিয়া গিয়াছে। আর প্রয়োজন নাই বলিলে শুনে নাই, বুঝে নাই; উত্তরে বিষণ্ণ মুখে বলিয়াছে—অপরাধ করলাম, মা?

দুর্গা বলিল—বিলু দিদি ক্ষীর করে রাখ।

বিলু বলিল—কি হবে বল দেখি? পচে যাবে তো।

—পচবে কেন? দেখ না, জামাই ঠিক ঘুরে আসছে।

কয়েকটি বাড়ীর গুটিকয়েক কুমারী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘড়া দাও, বউদিদি, জল এনে দি।

বিলুর ইহারা সম্পর্কে ননদ। বিলু মিষ্ট-হাসি হাসিয়া বলিল—জল আমি এনেছি ভাই।

বিলু বলিল—বস, জল খাও।

—না। আমরা কাজ করতে এসেছি।

ইহাদের এই অকপট আত্মীয়তা বিলুর বড় ভাল লাগিল। এত আপনার জন তাহার আছে! মানুষ এত ভাল!

চণ্ডীমণ্ডপে তিলকুট ভোগের ঢাক বাজিলে তবে মেয়ে কয়টি গেল। চণ্ডীমণ্ডপে আজ তিলকুট সন্দেশে বাবা-শিব ও মা-কালীর ভোগ হইবে। ওখানে ভোগ হইলে, তবে বাড়ীতে লক্ষ্মীর ভোগ হইবে। বাউড়ী-ডোম-মুচীদের ছেলেরা চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে এক টুকরা তিলকুটের জন্য। ইহার পর আবার বাড়ী বাড়ী পিঠা সাধিতে যাইবে।

বয়স্কেরা অনেকেই দেবুর জন্য সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে গিয়াছিল। ফিরিল প্রায় একটার সময়। সকলেই গম্ভীর, চিন্তান্বিত। বিচার এখনও হয় নাই। তবে সবই বুঝা গিয়াছে। কিন্তু কি করিবে তাহারা? সকলের চেয়ে গম্ভীর শ্রীহরি। আমিন শ্রীহরিকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিয়াছে—দেবুর পক্ষ লইয়া যে সাক্ষী দিবে, তাহার সহিত বুঝাপড়া হইবে পরে। কারণ দেবু কিছুতেই ক্ষমা চাহিতে রাজী হয় নাই।

মুরুব্বীরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়াছে—তাহার চেয়ে কোন পক্ষেই সাক্ষ্য তাহারা দিবে না।

বাড়ী আসে নাই কেবল জনকয়েক,—জগন ডাক্তার, অনিরুদ্ধ, হরেন ঘোষাল, দ্বারকা চৌধুরী, তারা নাপিত। তাহারা বাড়ী ফিরিল প্রায় সন্ধ্যার সময়—বিষণ্ণ মুখে, মন্থর-পদে। দুর্গা পথে দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রশ্ন করিল—কি হ'ল ডাক্তারবাবু, চৌধুরী মশায়?

জগন বলিল—সমস্ত দিন বসিয়ে রেখে, সন্ধ্যেবেলায় দিন ফেলে সদরে চালান দিলে! বদ্‌মায়েসী আর কি!

—চালান দিলে?

—হ্যাঁ। কালই যাব আমি সদরে, জামিনে পণ্ডিতকে খালাস করে আনব।

কথাটা মিথ্যা। দেবুর এক বৎসর তিন মাস—পনেরো মাসের মেয়াদে জেল হইয়াছে। কাল জগন সদরে যাইবে আপীল করিবার জন্য। দেবু কিন্তু আপীল করিতে বারণ করিয়াছে। সাক্ষীর অবস্থা দেখিয়া সে আপীলের ফলও আন্দাজ করিয়া লইয়াছে।

জগন গালিগালাজ করিয়াছিল গ্রামের লোককে। দ্বারকা চৌধুরী পর্যন্ত আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ দন্তহীন মুখে কম্পিত অধরে বলিয়াছিল—ভগবান এর বিচরা করবেন।

দেবু হাসিয়া বলিয়াছে—আপনি সেদিন যে গল্পটা বললেন—সেটা ভুলে গেলেন, চৌধুরী মশাই? মানুষের ভুল-চুক পদে পদে, আর একটা কথা চৌধুরী মশায়, এরা আমার পক্ষে সাক্ষী না দিক, বিপক্ষেও তো দেয় নাই!

অনিরুদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—দিলে মাথায় বজ্রাঘাত হ'ত না?

জেলের কথাটা তাহারা চাপিয়া গেল; দেবুর স্ত্রীর কথা বিবেচনা করিয়াই প্রকাশ করিল না।

দুর্গা আসিয়া বিলুকে সংবাদ দিয়া বলিল—তোমার কাছে আমার মা শোবে, বিলু-দিদি।

বিলু বলিল—তুই থাক্ না দুগগা; বেশ দুজনে গল্প করব। আমি ঘরে শোব, তুই বারান্দার দোরটিতে শুবি।

দুর্গা বলিল—না বিলু-দিদি!

—কেন দুর্গা?

—আমার ভাই, নিজের বিছানা নইলে ঘুম হয় না।

বিলু আর অনুরোধ করিল না। ব্যাপারটা সে বুঝিল; একটু কেবল হাসিল, কিন্তু রাগ করিল না। মরিলেও নাকি মানুষের স্বভাব যায় না।

সমস্ত দিনটা কাটিল, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে সময় আর কাটিতে চায় না। বিলু চুপ করিয়া বসিয়াছিল। 'সে' জেলে। সন্ধ্যায় গোটা গ্রামটায় শাঁখ বাজিয়া উঠিতে তাহার চমক ভাঙিল—ঘরে মা-লক্ষ্মী রহিয়াছেন, ধূপ-দীপ দিতে হইবে। মায়ের শীতল-ভোগের আয়োজন এখনো করা হয় নাই। দুর্গা যাইবার সময় বাড়ীর রাখালটাকে ডাকিয়া গিয়াছিল, ছোঁড়াটা প্রচুর পরিমাণে পিঠা খাইয়া কাপড় মুড়ি দিয়া একপাশে অঘোরে ঘুমাইতেছিল। বেচারীর

পেটটা ফুলিয়া বুকের চেয়েও উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—হাঁস-ফাঁস করিতেছে। ছোঁড়াটাও আশপাশের বাড়ীর শাঁখের শব্দে উঠিয়া বসিল, বলিল—সাঁজ লেগে গেইচে লাগছে! মনিব্যান, সাঁজ জাল গো, শাঁখ বাজাও, ধূপ-পিদীম দাও।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিলু উঠিল। ছোঁড়াটা বসিয়া বসিয়া আপন মনেই কথা বলিতেছিল—সবই মনিবের অর্থাৎ দেবুর কথা!

—মনিব এতক্ষণ বসে বসে আমাদের কথাই ভাবছে, লয় মনিব্যান্?

বিলু চোখ মুছিল।

—আচ্ছা, মনিব্যান্! জেহেলে কি লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে দেয়? মনিব তা' হ'লে কি ক'রে শোবে?

আর্তস্বরে বিলু বলিল—ওরে তুই আর বকিস্ না, থাম্।

ছোঁড়াটা অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

সন্ধ্যা-প্রদীপ, ধূপ, শীতল-ভোগ সাজাইয়া বিলু বলিল—আমার সঙ্গে আয় বাবা, খামারে গোয়ালে যাব—বলিতে বলিতেই মনে পড়িল—ঘুমন্ত শিশুর কথা; তাহার কাছে কে থাকিবে? অন্যদিন এই সময়টিতে থাকিত 'সে'। বিলু একাই খামারে গোয়ালে, মরাইয়ের তলে জল দিয়া সন্ধ্যা দেখাইয়া আসিত। আজ সে নাই বলিয়া অকারণে তাহার ভয় করিতেছে, তাহার আকস্মিক সকরুণ অসহায় অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ছোঁড়াটা উঠিয়া বলিল—চল।

—কিন্তু খোকার কাছে থাকবে কে?

—আমি থাকছি। বলিয়া সে শুইয়া পড়িয়া বলিল—এত ভয় কিসের গো, মনিব্যান্? যাও ক্যানে, 'কিরুষেণরা' রইছে সব খামারে।

—কিষাণরা রয়েছে?

—নাই? আমি যে হেথা রইছি, তারাই তো গরু ঢোকালে গোয়ালে। রেতে একজন থাকবে বাড়ীতে শুয়ে। পালা করে রোজ একজনা করে থাকবে। মনিব নাই, থাকবে না? আমিও থাকব মনিব্যান্, একটি করে কাহিনী কিন্তুক বলতে হবে।

বিলু সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিয়া আসিল—সঙ্গে সঙ্গে কৃষাণ দুইজন।

লক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে ধূপ-দীপ, শীতল-ভোগ রাখিয়া প্রণাম করিয়া বিলু কামনা করিল—ওঁকে মানে-মানে খালাস করে দাও, মা। ওঁর মঙ্গল কর। ঘরে আমার অচলা হয়ে বাস কর।

ছোঁড়াটা বলিল—মনিব্যান্, সেই ক্ষীরের পিঠে আর আছে নাকি?

বিলু মৃদু হাসিয়া বলিল—আছে।

—তবে তাই গণ্ডা দুয়েক দাও, আর কিছু খাব না রেতে।

—হ্যাঁ বাবা, তোমরা? বিলু প্রশ্ন করিল কৃষাণ দুইজনাকে।

—দেন অল্প করে চারডি।

দুপুরবেলায় এক-একজন ভীমের আহার করিয়াছে। ইহাদের খাওয়াইতে বিলুর এত ভাল লাগে! দেবু নিজে ইহাদের খাওয়াইত। বিলু যোগাইয়া দিত, পরিবেশন করিত সে নিজে।

আবার 'আঁউরি-বাঁউরি' দিয়া সব বাঁধিতে হইবে। মুঠ-লক্ষ্মীর ধানের খড়ের দড়িতে সমস্ত সামগ্রীতে বন্ধন দিতে হইবে।—আজিকার ধন থাক, কালিকার ধন আসুক, পুরানে-নূতনে সঞ্চয় বাড়ুক। লক্ষ্মীর প্রসাদে পুরাতন অন্নে নূতন বস্ত্রে জীবন কাটিয়া যাক নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। অচলা হইয়া থাক মা, অচলা হইয়া থাক।

শেষরাত্রে আর এক পর্ব। পৌষ-আগলানো পর্ব—এই পৌষ-সংক্রান্তির রাত্রির শেষ প্রহর। পৌষ মাস যখন বিদায় লইয়া অন্ধকারের আবরণে পশ্চিম দিগন্তের মুখে পা বাড়ায়, পূর্ব দিগন্তে আলোক আভাসের পশ্চাতে মকর রাশিস্থ সূর্যের রথের সঙ্গে উদয় হয় মাঘের প্রথম দিন—তখন কৃষক-বণিতারা পৌষকে বন্দনা করিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ করে—পৌষ, তুমি যাইও না। চিরদিন তুমি থাক।

চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় পৌষ-আগলানো হইয়া থাকে।

ভোররাত্রে ঘরে ঘরে লোক জাগিয়া উঠিয়াছে, গ্রামময় মানুষের সাড়া। শাঁখও বাজিতেছে।

বিলুও উঠিল। ছেলেটিও জাগিয়াছিল—তাহাকে কাপড় জড়াইয়া রাখাল-ছেলেটার কোলে দিয়া বিলু পূজার আয়োজন করিতে বসিল।

—ও ভাই, পণ্ডিত-বউ। সব হ'ল তোমার? এস!

ডাকিতেছিল পদ্ম।

বিলু দুয়ার খুলিয়া দিল।—এই হয়েছে। ধূপের আগুন হলেই হয়, চল যাই।

উনানের কাঠ জ্বলিতেছিল; পদ্ম দাঁড়াইয়া রহিল, ধূপদানীতে আগুন তুলিয়া লইয়া বিলু বলিল—চল।

রাখাল-ছেলেটা লইল হ্যারিকেন। বাড়িতে কৃষাণেরা রহিল। দুর্গার মা শুইয়াই রহিল—সে উঠে নাই। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই রাখালটা চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল—কে?

—কে রে? পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল।

ছোঁড়াটা আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দুগ্‌গা দিদি বটে!

লণ্ঠনের আলোটা দুর্গার উপর পড়িল পরিপূর্ণ ভাবে, পরনে পাটভাঙা খয়ের-রঙের তাঁতের শাড়ী, চুলের পারিপাট্যও চমৎকার; কপালে টিপ; কিন্তু সমস্তই বিশৃঙ্খল—বিপর্যস্ত। সে যেন হাঁপাইতেছিল—চোখের দৃষ্টি যেন উদ্‌ভ্রান্ত।

আলোর দিকে পরিপূর্ণ ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। একটুকু লজ্জা করিল না, সে বলিল—

মিছে কথা বিলু-দিদি, মিছে কথা। পণ্ডিত-জামাইয়ের পনেরো মাসের মেয়াদ হয়ে গিয়েছে! বলিতে বলিতে সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিলু হতবাক হইয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দুর্গা গিয়াছিল নৈশ অভিসারে। কঙ্কণায় সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে। আমিন, পিওন, এমন কি কানুনগোদের মধ্যেও দুই-একজন, স্থানীয় দুর্গা-শ্রেণীর নারীদের উপর গোপনে অনুগ্রহ করিয়া থাকে। পেস্কারটি আবার এ বিষয়ে সকলের সেরা, দুর্গার কাছে কয়েকদিনই সে অনুগ্রহের আহ্বান পাঠাইয়াছিল, কিন্তু দুর্গা যায় নাই। আজ সে গিয়াছিল নিজে। বলিয়াছিল—পণ্ডিতকে কিন্তু হাকিমকে বলে-কয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে!

পেস্কার বলিয়াছিল—আচ্ছা; কাল সকালে।

ভোরবেলায় আসিবার সময় দুর্গার ভুল ভাঙিয়া দিয়াছে—তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী পেস্কারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ একজন পিওন।

দুর্গা আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। সে মনে মনে বাছিতেছিল—আপনার সগোত্রাদের মধ্যে একটি বাহ্যশ্রীময়ী অথচ ব্যাধিযুক্তা সখী।

ওদিকে তখন চণ্ডীমণ্ডপে মেয়েদের সমস্বরে ধ্বনি উঠিতেছিল—পৌষ-বন্দনার, পৌষ-বন্ধনের।

পৌষ—পৌষ—সোনার পৌষ।
এস পৌষ যেয়ো না—জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—না যেয়ো ছাড়িয়ে,
স্বামী-পুত্র ভাত খাবে কটোরা ভরিয়ে।
পৌষ—পৌষ—সোনার পৌষ,
বড় ঘরের মেঝেয় বোস,
বড় ঘরের মেঝে ভরে—বাহান্ন হোস!
সোনার পৌষ।...

পদ্ম তাহার কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল—এস ভাই।

বিলু স্বপ্নোত্থিতের মত বলিল—চল।

কি করিবে? উপায় কি? যাইবার সময় সে বলিয়া গিয়াছে—খোকার ভার তোমার উপর রহিল, আরও রহিল ঘর-দুয়ার-মরাই-গরু-বাছুর-ধান-জমি—সবের ভার। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি চঞ্চল হলে চলবে না। সর্ব অবস্থায় অচলা হইয়া থাকিতে হইবে তোমাকে।

তাই থাকিবে সে, তাই থাকিবে। তাহার ঘরের সোনার পৌষ চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে পূজা করিয়া বাঁধিতে হইবে। 'না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—না যেয়ো ছাড়িয়ে!'—পনেরো মাস পরে তো সে ফিরিয়া আসিবে। তখন তাহাকে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া কটোরা ভরিয়া অন্ন সাজাইয়া দিতে হইবে!

আঠারো

দেখিতে দেখিতে এক বৎসরেরও বেশী সময় চলিয়া গেল। এক পৌষ-সংক্রান্তি হইতে আর এক পৌষ-সংক্রান্তিতে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া মাঘ-ফাল্গুন আরও দুইটি মাস কাটিয়া গেল। সেদিন চৈত্রের পাঁচ তারিখ। দেবু ঘোষ জংশন স্টেশনে নামিল। চৈত্র মাসের শীর্ণ ময়ূরাক্ষী পার হইয়া শিবকালীপুরের ঘাটে উঠিয়া সে একবার দাঁড়াইল। দীর্ঘ এক বৎসর তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ শেষ করিয়া সে আজ বাড়ী ফিরিতেছে। পনেরো মাসের মধ্যে কয়েকদিন সে মকুব পাইয়াছে। এতক্ষণে আপনার গ্রামখানির সীমানায় পদার্পণ করিয়া যেন পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ সে অনুভব করিল।

ওই তাহার গ্রাম শিবকালীপুর, তাহার পরই মহাগ্রাম। পশ্চিমে শেখপাড়া কুসুমপুর, তাহার পশ্চিমে ওই দালান-কোঠায় ভরা কঙ্কণা, একেবারে পূর্বে ওই দেখুড়িয়া। আর দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন। শেখপাড়া কুসুমপুরের মসজিদের উঁচু সাদা থামগুলি সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে। শিবকালীপুরের পূর্বে—ওই মহাগ্রামে—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ী। মহাগ্রামের পূর্বে ওই দেখুড়িয়া। দেখুড়িয়ার খানিকটা পূর্বে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ফিরিয়াছে। ওই বাঁকের উপর ঘন সবুজ গাছপালার মধ্যে বন্যায় নিশ্চিহ্ন ঘোষপাড়া মহিষডহর।

ঘাট হইতে সে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর উঠিল। চৈত্র মাসের বেলা দশটা পার হইয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে বেশ 'খরা' উঠিয়াছে। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র এখন প্রায় রিক্ত। গম, কলাই, যব, সরিষা, রবিফসল প্রায়ই ঘরে উঠিয়াছে। মাঠে এখন কেবল কিছু তিল, কিছু আলু এবং কিছু কিছু রবি-ফসলও রহিয়াছে। তিলই এ সময়ের মোটা ফসল ; গাঢ় সবুজ সতেজ গাছগুলি পরিপূর্ণরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইবার ফুল ধরিবে। চৈত্রলক্ষ্মীর কথা দেবুর মনে পড়িল —এই তিলফুল তুলিয়া কর্ণাভরণ করিয়া পরিয়াছিলেন। মা-লক্ষ্মী ; তাই চাষী ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। তিলফুলের ঋণ শোধ দিতে। বেগুনি রঙের তিলফুলগুলির অপূর্ব গঠন! মনে পড়িল 'তিলফুল জিনি নাসা'।

আজ এক বৎসরেরও অধিক কাল সে জেলখানায় ছিল—সেখানে ভাগ্যক্রমে জনকয়েক রাজবন্দীর সাহচর্য সে কিছুদিনের জন্য লাভ করিয়াছিল। ঐ লাভের সম্পদ-কল্যাণেই তাহার বন্দীজীবন পরম সুখে না হোক প্রচুর আনন্দের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। দেহ তাহার ক্ষীণ হইয়াছে, ওজনে সে প্রায় সাত সের কমিয়া গিয়াছে কিন্তু মন ভাঙে নাই। মুক্তি পাইয়া আপনার গ্রামের সম্মুখে আসিয়াও সাধারণ মানুষের মত অধীর-আনন্দে ছুটিয়া বা দ্রুতপদে চলিতেছিল না। সে একবার দাঁড়াইল। চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। শিবকালীপুর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আম, কাঁঠাল, জাম, তেঁতুল গাছগুলির উঁচু মাথা নীল আকাশ-পটে আঁকা ছবির মত মনে হইতেছে। দুলিতেছে কেবল বাঁশের ডগাগুলি। ওই মৃদু দোল-খাওয়া

বাঁশগুলির পিছনে তাদের ঘর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি ঘর দেখা যাইতেছে।

এদিক বাউড়ী-পাড়া বায়েন-পাড়া; ওই বড়গাছটি ধর্মরাজতলার বকুলগাছ। ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলির মধ্যে ওই বড় ঘরখানা দুর্গার কোঠা-ঘর। দুর্গা! আহা দুর্গা বড় ভাল মেয়ে। পূর্বে সে মেয়েটাকে ঘৃণা করিত, মেয়েটার গায়েপড়া ভাব দেখিয়া বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিত। অনেকবার রূঢ় কথাও বলিয়াছে সে দুর্গাকে। কিন্তু তাহার অসময়ে, বিপদের দিনে দুর্গা দেখা দিল এক নূতন রূপে। জেলে আসিবার দিন সে তাহার আভাসমাত্র পাইয়াছিল। তারপর বিলুর পত্রে জানিয়াছে অনেক কথা। অহরহ—উদয়াস্ত দুর্গা বিলুর কাছে থাকে, দাসীর মত সেবা করে, সাধ্যমত সে বিলুকে কাজ করিতে দেয় না, ছেলেটাকে বুকে করিয়া রাখে। স্বৈরিণী বিলাসিনীর মধ্যে এ রূপ কোথায় ছিল—কেমন করিয়া লুকাইয়া ছিল?

ওই যে বড় ঘরের মাথাটা দেখা যাইতেছে—ওটা হরিশ-খুড়ার ঘর; তারপরেই ভবেশ দাদার বাড়ী, সেটা দেখা যায় না। ওই যে ওধারের টিনের ঘরের মাথা রৌদ্রে ঝকমক করিতেছে—ওটা শ্রীহরির ঘর। শ্রীহরির ঘরের পরেই সর্বস্বান্ত তারিণীর ভাঙা ঘর। তারপর পথের একপাশে গ্রামের মধ্যস্থলে চণ্ডীমণ্ডপ। তারপর হরেন ঘোষালের বাড়ী; ঠিক বাড়ী নয়, হরেন ঘোষাল বলে—'ঘোষাল হাউস'। ঘোষাল বিচিত্রচরিত্র। তাহার বাহিরের ঘরের দরজায় লেখা আছে 'পার্লার', একটা ঘরে লেখা আছে 'স্টাডি'। দেবু ঘোষালের সেই গাঁদা মালার কথা জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। ঘোষালের সম্পূর্ণ পরিচয় সে জানে। ম্যাট্রিক পাস করিলেও মূর্খ ছাড়া সে কিছু নয়; ভীরু, কাপুরুষ সে; ব্রাহ্মণ হইয়াও সে পাতু বায়েনের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত। কিন্তু সেদিন ঘোষালকে তাহার মনে হইয়াছিল যেন সত্যকালের ব্রাহ্মণ। তাহার মালাকে সে পবিত্র আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, ওই আশীর্বাদই তাহাকে সেই যাবার মুহূর্তে অদ্ভুত বল দিয়াছিল। জেলের মধ্যেও বোধ হয় ওই আশীর্বাদের বলেই রাজবন্দী বন্ধুদিগকে পাইয়াছিল।

বন্ধু কে নয়? বিলুর পত্রে সে পরিচয় পাইয়াছে, তাহাদের গ্রামের মানুষগুলির প্রতিটি জনই যেন দেবতা। তাহার মনে পড়িল একটি প্রবাদ—গাঁয়ে মায়ে সমান কথা। হ্যাঁ—মা! এই পল্লীই তাহার মা! সে নত হইয়া পথের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।

আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া নজরে পড়িল—পলাশ গাছে ফুল ধরিয়াছে, লাল টকটকে ফুল! একটি বাড়ীর চালের মাথায় অজস্র সজিনার ডাঁটা ঝুলিয়া আছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে দীঘির পাড়ের রিক্তপত্র শিমুল গাছটিতেও লাল রঙের সমারোহ। তাহারই পাশে একটা উঁচু তালগাছের মাথায় বসিয়া আছে একটা শকুন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—জগন ডাক্তারের খিড়কির বাঁশঝাড়ের একটা নুইয়া-পড়া বাঁশের উপর সারবন্দী একদল হরিয়াল বসিয়া আছে; সবুজ ও হলুদের সংমিশ্রণে পাখীগুলির রংও যেন অপূর্ব, ডাকও তেমনি মধুর; —জলতরঙ্গ বাজনার ধ্বনির মত। বাতাসে এইবার গ্রামের নাবি আম গাছগুলির মুকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। চৈত্র মাসে সকল আম গাছেই আম ধরিয়া গিয়াছে; তবু

চৌধুরীদের পুরানো খাস আম বাগানের গাছে চৈত্র মাসে মুকুল ধরে ; এ গন্ধ চৌধুরীর বাগানের মুকুলের গন্ধ।

—পণ্ডিত মশায় !

কিশোর কণ্ঠের সবিস্ময় আনন্দ-ধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেবু দেখিল—অদূরবর্তী পাশের আলপথ ধরিয়া আসিতেছে কালীপুরের সুধীর, দ্বারকা চৌধুরীর নাতি; বড় ছেলের ছেলে। পাঠশালায় তাহার ছাত্র ছিল।

দেবু হাসিয়া সস্নেহে বলিল—সুধীর ? ভাল আছিস ?

সুধীর ছুটিয়া কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল।—আপনি ভাল ছিলেন স্যার ? এই আসছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ। এই আসছি। তুমি স্কুলে যাচ্ছ বুঝি কঙ্কণায় ?

—হ্যাঁ। আপনার বাড়ীর সকলে ভাল আছে, পণ্ডিতমশায়। খোকা খুব কথা বলে এখন। আমরা যাই কিনা প্রায়ই বিকেলে, খোকাকে নিয়ে খেলা করি।

দেবু গভীর আনন্দে যেন অভিভূত হইয়া গেল। ছেলেরা তাহাকে এত ভালবাসে !

—পাঠশালার নূতন বাড়ী হয়েছে স্যার।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ বেশ ঘর, তিনখানা কুঠরী ! নতুন পালিশ-করা চেয়ার-টেবিল হয়েছে স্যার।—ইহার পর সে ঈষৎ কুন্ঠিতভাবেই প্রশ্ন করিল—আর তো আপনি স্কুলে পড়াবেন না স্যার ?

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—না সুধীর, আমি আর পড়াব না। নতুন মাস্টার এখন কে হয়েছেন ?

—কঙ্কণার বাবুদের নায়েবের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস, গুরু-ট্রেনিংও পাস করেছেন। কিন্তু আপনি কেন—?

সুধীরের কথা শেষ হবার পূর্বেই ওদিক হইতে আগন্তুক একজন খুব অল্পবয়সী ভদ্রলোক সুধীরকে ডাকিয়া বলিল—খোকা বুঝি ইস্কুলে যাচ্ছ ? দেখি, তোমার খাতা আর পেন্সিলটা একবার দেখি।

সুধীর খাতা-পেন্সিল বাহির করিয়া দিল। এ ছেলেটি—হ্যাঁ—ভদ্রলোক অপেক্ষা ইহাকে ছেলে বলিলেই বেশী মানায়। কে এ ছেলেটি ? বয়স বোধ হয় আঠার-উনিশ বৎসর। চোখে চশমা—গায়ে একটা ফর্সা পাঞ্জাবি ; এখানকার লোক নিশ্চয়ই নয়। সুন্দর ধারাল চেহারা। সুধীর অবশ্য ভদ্রলোকটিকে চেনে। কিন্তু ভদ্রলোকের সামনে দেবু তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্য প্রসঙ্গই উত্থাপন করিল—চৌধুরী মশায়—তোমার ঠাকুরদা ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ। তিনি আপনার কত নাম করেন !

দেবু হাসিল। চৌধুরীকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করে ; চমৎকার মানুষ। তিনি তাহার নাম করেন ? দেবুর আনন্দ হইল। সে আবার প্রশ্ন করিল—বাড়ীর আর সকলে ?

—সবাই ভাল আছেন। কেবল আমার একটি ছোট বোন মারা গিয়েছে।

—মারা গিয়েছে ?

—হ্যাঁ। বেশী বড় নয়, এই এক মাসের হয়ে মারা গিয়েছে।

ভদ্রলোকটি এইবার খাতা ও পেন্সিল সুধীরকে ফেরত দিল, হাসিয়া বলিল—বল তো সংখ্যা কত ?

সুধীর সংখ্যাটার দিকে চাহিয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। দেবুও দেখিল—বিরাট একটা সংখ্যা। কয়েক লক্ষ বা হাজার কোটি।

ভদ্রলোকই হাসিয়া সুধীরকে বলিল—পারলে না ? বাইশ হাজার আট শো ছিয়ানব্বই কোটি, চৌষট্টি লক্ষ, উননব্বই হাজার।

সবিস্ময়ে সুধীর প্রশ্ন করিল—কি ?

—টাকা।

—টাকা !

—হ্যাঁ। ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকার খনি থেকে আর কলকারখানা থেকে এক বছরের উৎপন্ন জিনিসের দাম।

সুধীর হতবাক হইয়া গেল। বিমূঢ় হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবুও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, কে এই অদ্ভুত ছেলেটি !

ভদ্রলোকটি সুধীরের পিঠের উপর সস্নেহে কয়েক চাপড় মারিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে ! তারপর দেবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি বুঝি এদের বাড়ী যাবেন ? চৌধুরী মশায়ের বাড়ী ?

দেবু আরও বিস্মিত হইয়া গেল—ভদ্রলোক চৌধুরীকেও চেনেন দেখিতেছি ! বলিল—না। আমি যাব শিবপুর।

—কার বাড়ী যাবেন বলুন তো ?

—আপনি কি সকলকে চেনেন ? দেবু ঘোষকে জানেন ?

বেশ সম্ভ্রমের সহিত যুবকটি বলিল—তাঁর বাড়ী চিনি, তাঁর ছোট খোকাটিকেও চিনি, কিন্তু তাঁকে এখনও দেখি নি ! আমি আসবার আগেই তিনি জেলে গিয়েছেন। শীগ্‌গির তিনি আসবেন বেরিয়ে।

সুধীর বলিল—উনিই আমাদের পণ্ডিতশায়।

—আপনি ! ছেলেটির চোখদুটি আনন্দের উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; দুই হাত মেলিয়া সাগ্রহে দেবুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল—উঃ, আপনি দেবুবাবু ! আসুন আসুন—বাড়ী আসুন।

দেবু প্রশ্ন করিল—আপনি ? আপনার পরিচয় তো—

চোখ বড় করিয়া সম্ভ্রমের সহিত সুধীর বলিল—উনি এখানে নজরবন্দী হয়ে আছেন স্যার।

—এখানে রেখেছে আমাকে। অনিরুদ্ধ কর্মকার মশায়ের বাড়ীর বাইরের ঘরটায় থাকি। সুধীর, তুমি দৌড়ে যাও; ওঁর বাড়ীতে খবর দাও, গ্রামে খবর দাও। ওয়ান-টু-থি—। পু—ভস্-ভস্ ঝিক-ঝিক—! ধর মেল ট্রেন—তুফান মেলে চলেছ তুমি!

মুহূর্তে সুধীর তীরের মত ছুটিল।

হাসিয়া ভদ্রলোকটি বলিল—বুঝতে পারছেন বোধ হয়, এখানে ডেটিনিউ হয়ে আছি আমি।

গ্রামে ঢুকিবার মুখেই ক্ষুদ্র একটি জনতার সঙ্গে দেখা হইল। জগন, হরেন, অনিরুদ্ধ, তারিণী, গণেশ আরও কয়েকজন। চণ্ডীমণ্ডপে ছিল অনেকেই—শ্রীহরি, ভবেশ প্রমুখ প্রবীণগণ। সকলেই তাহাকে সাদরে সস্নেহে আহ্বান করিল—'এস, এস বাবা এস বস'! দেবু চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিল, সমস্ত গুরুজনদিগকে প্রণাম করিল; শ্রীহরি পর্যন্ত আজ তাহাকে খাতির করিল। দেবু সম্বন্ধে খুড়া হইলেও শ্রীহরি বয়সে অনেক বড়। তাহার উপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হিসাবে শ্রীহরি প্রণামের খাতির বড়-একটা কাহাকেও দেয় না। সেই শ্রীহরিও আজ তাহাকে প্রণাম করিল।

চণ্ডীমণ্ডপের খানিকটা দূরে ওই যে তাহার বাড়ী। দাওয়ার সম্মুখেই ওই যে শিউলি ফুলের গাছটি। ওই যে সব ভিড় করিয়া কাহারা দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল গ্রামের মেয়েরা। দুইটি কুমারী মেয়ের কাঁধে দুটি পূর্ণ-ঘট। দেবু অভিভূত হইয়া গেল। তাহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য গ্রামবাসীর এ কি গভীর আগ্রহ—এ কি পরমাদরের আয়োজন! সহসা শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া দেখিল, একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে শাঁখ বাজাইতেছে। দেবু তাহাকে চিনিল, সে পদ্ম।

বাড়ীতে ঢুকিতেই তাহার পায়ের কাছে খোকাকে নামাইয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল দুর্গা।

আবক্ষ ঘোমটা দুয়ারের বাজুতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল বিলু। খোকাকে কোলে লইয়া দেবু বিলুর দিকে চাহিল। বুড়ী রাঙাদিদি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ছোঁড়ার কোন আক্কেল নাই। পণ্ডিত না মুণ্ডু! আগে ই দিকে আয়। বদ-রসিক কোথাকার!

—ছাড়, রাঙাদিদি, পেণাম করি।

—পেণাম করতে হবে না রে ছোঁড়া। বৃদ্ধা তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। তারপর বিলুকে টানিয়া আনিয়া বলিল—এই লে।

তারপর সমবেত মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল—চল গো সব, এখন বাড়ী চল। চল চল। নইলে গাল দোব কিন্তু।

সকলে হাসিতে হাসিতেই চলিয়া গেল। বিলুর হাত ধরিয়া সস্নেহে সে ডাকিল—বিলু-রাণী!

বিলুর মুখে-চোখে জলের দাগ, চোখ দুটি ভারী। চোখ মুছিয়া সে হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, পেণাম করি।

—মনিবমশায়! আকর্ণ বিস্তার হাসি হাসিয়া সেই মুহূর্তে রাখাল-ছোড়াটা আসিয়া দাঁড়াইল। ছোড়াটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাঠে শোনলাম। এক দৌড়ে চলে আইচি।

সে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল।

—পণ্ডিতমশায় কই গো! এবারে আসিল সতীশ বাউড়ী, তাহার সঙ্গে তাহার পাড়ার লোকেরা সবাই।

আবার ডাক আসিল,—কোথা গো পণ্ডিতমশায়।

এ ডাক শুনিয়া দেবু ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর গলা।

দেবুর জীবনে এ দিনটি অভূতপূর্ব। এই দুঃখ-দারিদ্র-জীর্ণ নীচতায়-দীনতায়-ভরা-গ্রামখানির কোন্ অস্থিপঞ্জরের আবরণের অন্তরালে লুকানো ছিল এত মধুর, এত উদার স্নেহ-মমতা! বিলুকে সে বলিল—আসি বাইরে থেকে। চৌধুরী মশায় এসেছেন। সুখের মধ্যে মানুষকে চিনতে পারা যায় না, বিলু। দুঃখের দিনেই মানুষকে ঠিক বোঝা যায়। আগে মনে হ'ত এমন স্বার্থপর নীচ গ্রাম আর নাই!

বিলু হাসিয়া বলিল—কত বড়লোক তুমি, ভালবাসবে না লোকে? জান, তুমি জেলে যাওয়ার পর জরিপের আমিন, কানুনগো, হাকিম কেউ আর লোককে কড়া কথা বলে নাই, 'আপনি' ছাড়া কথা ছিল না। পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তোমার নাম করেছে। দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছে।

* * *

এক বৎসরের মধ্যে অনেক-কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রতি জনে আসিয়া একে একে একবেলার মধ্যেই সব জানাইয়া দিল। জগন খবর দিল, সঙ্গে সঙ্গে হরেন ঘোষাল সায় দিল—কিছু কিছু সংশোধনও করিয়া দিল।

গ্রামে প্রজা-সমিতি হইয়াছে, ঐ সঙ্গে একটি কংগ্রেস-কমিটিও স্থাপিত হইয়াছে। জগন প্রেসিডেন্ট, হরেন সেক্রেটারী।

হরেন বলিল—কথা আছে, তুমি এলেই তুমি হবে একটার প্রেসিডেন্ট, যেটার খুশী। আমি বলি, তুমি হও কংগ্রেস-কমিটির প্রেসিডেন্ট। ডেটিনিউ যতীনবাবু বলেন—না, দেবুবাবু হবেন প্রজা-সমিতির প্রেসিডেন্ট।

—ছিরে পাল এখন গণ্যমান্য লোক। একটা গুড়গুড়ি কিনেছে, চণ্ডীমণ্ডপে সতরঞ্চি পেতে একটা তাকিয়া নিয়ে বসে। বেটা আবার গোমস্তা হয়েছে, গাঁয়ের গোমস্তাগিরি নিয়েছে। একে মহাজন, তার পর হ'ল গোমস্তা, সর্বনাশ করে দিলে গাঁয়ের!

জমিদারের এখন অবস্থা খারাপ, শ্রীহরির টাকা আছে, আদায় হোক—না হোক, সমস্ত টাকা শ্রীহরি দিবে—এই শর্তে জমিদার শ্রীহরিকে গোমস্তাগিরি দিয়েছে। শ্রীহরি এখন এক ঢিলে দুই পাখী মারিতেছে। বাকী-খাজনার নালিশের সুযোগে লোকের জমি নীলামে তুলিয়া আপন প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতেছে সুদে-আসলে। সুদ-আসল আদায় হইয়াও

আরও একটা মোটা লাভ থাকে।

গণেশ পালের জোত নীলাম হইয়া গিয়াছে, কিনিয়াছে শ্রীহরি, এমন গণেশের অবশিষ্ট শুধু কয়েক বিঘা কোর্ফা জমি।

সর্বস্বান্ত তারিণীর ভিটাটুকুও শ্রীহরি কিনিয়াছে, এখন সেটা উহার গোয়ালবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত। তারিণীর স্ত্রীটা সেটেলমেন্টের একজন পিয়নের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছে। তারিণী মজুর খাটে, ছেলেটা থাকে জংশনে, স্টেশনে ভিক্ষা করে।

পাতু মুচীর দেবোত্তর চাকরান জমি উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নালিশ-দরবার করিতে হয় নাই, সেটেলমেন্টেই সে-জমি জমিদারের খাস খতিয়ানে উঠিয়া গিয়াছে। পাতু নিজেই স্বীকার করিয়াছিল, সে এখন আর বাজায় না, বাজাইতেও চায় না।

অনিরুদ্ধের জমি নীলামে চড়িয়াছে। অনিরুদ্ধ এখন মদ খাওয়া ভবঘুরের মত বেড়ায়—দুর্গার ঘরেও মধ্যে মধ্যে যায়। তাহার স্ত্রীও পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। এখন অনেকটা সুস্থ। দুর্গার যোগাযোগেই দারোগা ডেটিনিউ রাখিবার জন্য অনিরুদ্ধের ঘরখানা ভাড়া লইয়াছে। ওই ভাড়ার টাকা হইতেই এখন তাহাদের সংসার চলে।

দেবু বলিল—কামার-বউকে আজ দেখলাম শাঁখ বাজাচ্ছিল।

জগন বলিল—হ্যাঁ, এখন একটু ভাল আছে। একটু কেন, যতীনবাবু আসার পর থেকেই বেশ একটু ভাল আছে। ঠোঁট বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল।

হরেন চাপা গলায় বলিল—মেনি মেন সে—বুঝলে—কিনা—যতীনবাবু এ্যাণ্ড কামার-বউ—

দেবু বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে তিরস্কার করিয়া উঠিল—ছিঃ হরেন! কি যা-তা, বলছ!

—ইয়েস, আমিও তাই বলি, এ হতে পারে না। যতীনবাবু কামার-বউকে 'মা' বলে।

তারপর আবার সে বলিল—যতীনবাবু কিন্তু বড্ড চাপা লোক। বোমার ফরমুলা কিছুতেই আদায় করতে পারলাম না।

হরিশ এবং ভবেশ আসায় তাদের আলোচনা বন্ধ হইল, কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া গেল।

হরিশ বলিল—বাবা দেবু, সন্ধ্যেবেলায় একবার চণ্ডীমণ্ডপে যেয়ো। ওখানেই এখন আমরা আসি তো। শ্রীহরি বসে পাঁচজনকে নিয়ে। আলো, পান, তামাক সব ব্যবস্থাই আছে। শ্রীহরি এখন নতুন মানুষ। বুঝলে কিনা!

ভবেশ বলিল, হ্যাঁ। দুবেলা চায়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছে আমাদের শ্রীহরি। বুঝেছ কিনা?

দেবু তাদের নিকট হইতে আরো অনেক খবর শুনিল।

গ্রামের পাঁচজনকে লইয়া উঠিবার-বসিবার সুবিধার জন্যই শ্রীহরি পৃথক পাঠশালা-ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। জমিদার তরফ হইতে জায়গার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে সে-ই। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার সে, সে-ই দেওয়ালের খরচ মঞ্জুর করাইয়াছে; নিজে দিয়াছে নগদ

পঁচিশ টাকা। তা ছাড়া চালের কাঠ, খড়, দরজা-জানলার কাঠও সে দিয়াছে শ্রীহরি।

দুই বেলা এখন চণ্ডীমণ্ডপে মজলিস বসে দেখিয়া শ্রীহরির বিপক্ষ দলের লক্ষ্মীছাড়ারা হিংসায় পাটু-পাটু হইয়া গেল। তাহারা নানা নিন্দা রটনা করে। কিন্তু তাহাতে শ্রীহরির কিছু আসে যায় না। তাহার গোমস্তাগিরির অসুবিধা করিবার জন্যই তাহারা প্রজা-সমিতি গড়িয়াছে, কংগ্রেস-কমিটি খাড়া করিয়াছে। দেবু যেন ও-সবের মধ্যে না যায়।

তারা নাপিত আরও গূঢ় সংবাদ দিল। জমিদার এ গ্রামখানা পত্তনি বিলি করিবে কিনা ভাবিতেছে। শ্রীহরি গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে। পত্তনি কায়েম হইলে, শ্রীহরি বাবা বুড়োশিবের অর্ধসমাপ্ত মন্দিরটা পাকা করিয়া দিবে, চণ্ডীমণ্ডপের আটচালার উপর তুলিবে পাকা নাটমন্দির। শ্রীহরির বাড়ীতে এখন একজন রাঁধুনী, একজন ছেলে পালন করিবার লোক।

তারাচরণ পরিশেষে বলিল—এই যে হরিহরের দুই কন্যে—যারা কলকাতায় ঝি-গিরি করতে গিয়েছিল—তারাই। বুঝলেন তার মানে—রীতিমত বড়লোকের ব্যাপার, দুজনকেই এখন ছিরু রেখেছে। বুঝলেন, একেবারে আমীরী মেজাজ! হরিহরের ছোট মেয়েটা যখন এই—এ-ই রোগা, শনফুলের মত রঙ। ক্রমে শোনা গেল—কলকাতায়—বুঝলেন?

অর্থাৎ মাতৃত্ব-সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিয়াছিল মেয়েটি। তাই গ্রাম্য-সমাজ তাহাদিগকে পতিত করিল। কিন্তু শ্রীহরি দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে, তাহারই অনুরোধে সমাজ তাহাদের ত্রুটি মার্জনা করিয়াছে; তারা বলিল—দু'দুটো মেয়ের ভাত-কাপড়, শখ-সামগ্রী তো সোজা কথা নয়, দেবু-ভাই।

বৃদ্ধ চৌধুরী শুধু আপন সংসারের সংবাদ দিলেন, দেবুর জেলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইলেন। পরিশেষে আশীর্বাদ করিলেন—পণ্ডিত, তুমি দীর্ঘজীবী হও। দেখ, যদি পার বাবা—তবে শ্রীহরির সঙ্গে ডাক্তারের, আর বিশেষ করে কর্মকারের মিটমাট করিয়ে দাও। অনিরুদ্ধ লোকটা নষ্ট হয়ে গেল। এরপর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কথাটার অর্থ ব্যাপক।

রামনারায়ণ আসিয়া বলিল—ভাল আছ দেবু-ভাই? আমার মাটি মারা গিয়েছেন!

বৃন্দাবন দোকানী বলিল—চালের ব্যবসায় অনেক টাকা লোকসান দিলাম দেবু-ভাই। যারা চালের ব্যবসা করেছিল তারা সবাই দিয়েছে। জংশনের রামলাল ভকত তো লালবাতি জেলে দিল।

বৃদ্ধ মুকুন্দ একটি খোকাকে কোলে করিয়া দেখাইতে আসিয়াছিল, আমাদের সুরেন্দ্রের ছেলে, দেখ বাবা দেবু।

মুকুন্দের পুত্র গোবিন্দ, গোবিন্দের পুত্র সুরেন্দ্র সুতরাং সুরেন্দ্রের ছেলে তাহার প্রপৌত্র।

সন্ধ্যার মুখে নিজে আসিল শ্রীহরি। শ্রীহরি এখন সম্ভ্রান্ত লোক। লম্বা-চওড়া পেশী

সবর্ণ যে জোয়ান চাষী নগ্নদেহে কোদাল হাতে ঘুরিয়া বেড়াইত, দুর্দান্ত বিক্রমে দৈহিক শক্তির আস্ফালন করিয়া ফিরিত, সামান্য কথায় শক্তিপ্রয়োগ করিত, জোর করিয়া পরের সীমানা খানিকটা আত্মসাৎ করিয়া লইত, কর্কশ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত—সে-ই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, তাহার অপেক্ষা বড় কেহ নাই, সেই ছিরু পালের সঙ্গে এই শ্রীহরির কোন সাদৃশ্য নাই। শ্রীহরি সম্পূর্ণ সতন্ত্র মানুষ! তাহার পায়ে ভাল চটি, গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর, গম্ভীর সংযত মূর্তি, সে এখন গ্রামের গোমস্তা—মহাজন। বলিতে গেলে সে এখন গ্রামের অধিপতি।

—দেবু-খুড়ো রয়েছ নাকি হে? হাসিমুখে শ্রীহরি আসিয়া দাঁড়াইল।

—এসো ভাইপো এস। দেবুও তাহাকে সম্ভ্রম করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। দেবু বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। অনিরুদ্ধের ওখানে যাইবার ইচ্ছা ছিল। ডেটিনিউ যতীনবাবু সেই তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধও সেই চলিয়া গিয়াছে। সে নাকি এখন মাতাল, দুর্গার ঘরে রাত্রিযাপন করে, তাহার অন্নগ্রহণেও অরুচি নাই তাহার, জমি-জমা নীলামে উঠিয়াছে।

অনি-ভাইয়ের জন্য দুঃখ হয়। কি হইয়া গেল সে! তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, চৌধুরীই বলিয়াছেন—পণ্ডিত! মা-লক্ষ্মীর নাম শ্রী। শ্রী যার আছে—তারই শ্রী আছে; সে মনে বল, চেহারায় বল, প্রকৃতিতে বল। শ্রীহরির পরিবর্তন হবে বৈকি! আবার অভাবেই ওই দেখ, অনি-ভাইয়ের এমন দশা। তার ওপর কামার-বউএর অসুখ করে আরও এমনটি হয়ে গেল।

শ্রীহরি তাহাকে ডাকিয়া বলিল—তোমাকে ডাকতে এসেছি।—চল খুড়ো, চণ্ডীমণ্ডপে চল। ওখানেই এখন বসছি। চা হয়ে গিয়েছে, চল।

দেবু 'না' বলিতে পারিল না। চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া শ্রীহরি বলিয়া গেল অনেক কথা।

এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিবার জন্যই গ্রামে স্কুল-ঘর করা হইয়াছে। স্কুল-ঘরের মেঝে-বারান্দা সব পাকা করিয়া দিবার ইচ্ছা আছে। একজন ডাক্তারের সঙ্গেও তাহার কথা হইয়াছে। তাহাকে আনিয়া সে গ্রামে বসাইতে চায়। শ্রীহরিই তাহাকে থাকিবার ঘর দিবে, খাইতেও দিবে। জগনকে দিয়া আর চলে না। উহার ওষুধ নাই, সব জল, সব ফাঁকি।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

সেটেল্‌মেন্টের 'খানাপুরী' 'বুঝারত' দুইটা শেষ হইয়া গিয়াছে। আর কোন গণ্ডগোল হয় না। এই সমস্তই দেবুর জন্য, তাহা শ্রীহরি অস্বীকার করিল না। বলিল—বুঝলে খুড়ো, শেষটা আমিন, কানুনগো—'আপনি' ছাড়া কথা বলত না। আমরা তোমার নাম করতাম। এইবার হবে তিনধারা, তারপর পাঁচধারা।

শ্রীহরি আরো জানাইল দেবুর জমি-জমা সমস্তই সে নির্ভুল করিয়া সেটেল্‌মেন্টে রেকর্ড করাইয়াছে। এমন কি, কঙ্কণার বাবুদের কর্মচারী যে জমির টুকরাটি আত্মসাৎ করিয়াছিল—

সেটি পর্যন্ত উদ্ধার করিয়াছে।

—তাও উদ্ধার হইয়াছে? দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

—হবে না! জমিদারীর সেরেস্তার তামাম কাগজপত্র আমাদের হাতে, তার ওপর দাশজীর পাকা মাথা! আমি দাশজীকে বললাম—দেবু খুড়ো উপকার করলে দেশের লোকের, বাঘের দাঁত ভেঙে দিয়ে গেল; আর তার জমি কুকুরে খাবে তা হবে না। আমাদের এ উপকারটি না করলে চলবে না; আর তা ছাড়া—

—তা ছাড়া; শ্রীহরি আকাশের দিকে চাহিয়া জোড় হাতে প্রণাম করিল—ভগবান যখন জন্ম দিয়েছেন, তখন উপকার ছাড়া অপকার কারুর করব না, খুড়ো। এই দেখ না হরিহরের কন্যে দু'টিকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড! কলকাতায় তো খাতায় নাম লিখেছিল। শেষে বিশ্রী কাণ্ড করে দেশে এল। গাঁয়ের লোক পতিত করলে। আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্ষান্ত করে আমার বাড়ীতেই রেখেছি। লোকে বলে নানা কথা। তা আমি মিথ্যে বলব না খুড়ো, তুমি তো শুধু খুড়ো নও, বন্ধুলোক, একসঙ্গে পড়েছি! বাজারে-খাতাতেই যারা নাম লিখিয়েছিল, তাদের যদি আমি ঐজন্যে ঘরের একপাশে রেখে থাকি তো কি এমন দোষ করেছি, বল?

গড়গড়ার নলটা দেবুর হাতে দিয়া শ্রীহরি বলিল—খাও খুড়ো।

—না। জেলখানায় গিয়ে বিড়ি তামাক ছেড়ে দিয়েছি।

—বেশ করেছ।

শ্রীহরির কথা ফুরাইতেই চায় না; কাহার বিপদের সময় তাহার উপকারের জন্য কত টাকা সে ধার দিয়াছে, আর সে এখন দিবার নাম করিতেছে না—সেই ইতিহাস আরম্ভ করিল।

শ্রীহরিকে দোষ দেওয়া যায় না। টাকা থাকা পাপ নয়, বে-আইনী নয়। কাহারও বিপদে টাকা ধার দিলে, খাতক সে সময়ে উপকৃতই হয়। কিন্তু সুদে-আসলে আদায়ের সময় তাহার যে কদর্য রূপটা বাহির হইয়া পড়ে, তাহা দেখিয়া খাতক আতঙ্কিত হয়, মহাজন ক্ষেত্রবিশেষে সঙ্কুচিত হইলেও সর্বক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে তাহা বলা শক্ত। সুদের জন্য মহাজনকে ইন্‌কাম্ ট্যাক্স দিতে হয়; হক্ পাওনা আদায়ের জন্য আদালতে কোর্ট-ফি লাগে; ইউনিয়নকে দিতে হয় চৌকিদারী ট্যাক্স।

সুদ শ্রীহরি ছাড়ে কি করিয়া।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল; শ্রীহরির দিকটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল—বাল্যকালের স্মৃতি। ঋণের দায়ে কঙ্কণার বাবুদের দ্বারা তাহাদের অস্থাবর-ক্রোকের কথা। সে শিহরিয়া উঠিল। খাতকের দিকটা দেবুর চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। জমি-জমা যায়, পুকুর-বাগান যায়, ক্ষেত-খামার যায়, তাহার পর গরু-বাছুর যায়; তাহার পর থালা-কাঁসা যায়, তাহার পর যায় বাস্তু-ভিটা। মানুষ পথের উপর গিয়া দাঁড়ায়। তিন বছর অন্তর অন্তর হ্যাণ্ডনোট পাল্টাইয়া একশো টাকা কয়েক বছরে অনায়াসে হাজার টাকায়

গিয়া দাঁড়ায় ইহাও আইনসম্মত। যখন আইনসম্মত তখন ইহাই ন্যায়। ইহাই যদি ন্যায় তবে সংসারে অন্যায়টা কি?

তাহার চিন্তাকে বিস্মিত করিয়া শ্রীহরি বলিল—এই দেখ, সেটেল্‌মেণ্টের তিনধারা আসছে, পাঁচধারার কোর্ট আসছে! এদিকে প্রজা-সমিতি করে ডাক্তার ধুয়ো তুলেছে—এ গাঁয়ের সব জমি মোকররী জমা। এ মৌজায় নাকি কখনও বৃদ্ধি হয় না! তোমাকে আমি কাগজ দেখাব; বারো শো সত্তর সালের কাগজ; তামাম জমায় বৃদ্ধি করা আছে; একটি জমাও মোকররী দাঁড়াবে না। জমিদার বৃদ্ধি দাবি করবে। হয়তো হাঙ্গামা বাধাবে ওরা। মামলা হবে। আইনে জমিদারের প্রাপ্য—সে পাবেই। আর যখন আইনসম্মত তখন আর তার অপরাধটা কোথায় বল? পঞ্চাশ বছরে ফসলের দাম অন্তত তিনগুণ বেড়েছে! জমিদার পাবে না?

দেবু এ কথারও কোনও উত্তর দিতে পারিল না। ফসলের দাম সত্যই বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতে প্রজাদের আয় বাড়িয়াও বাড়ে নাই, বাজার দরে সব খাইয়া গেল। মানুষের অভাব বাড়িয়াছে, ইহার উপরে খাজনা-বৃদ্ধি!

শ্রীহরি বলিল—শোন খুড়ো, দৈবের বিপাকে অনেক কষ্ট পেলে। আর বাবা, আর ওসব পথে যেও না তুমি; খাও-দাও, কাজকর্ম কর, লোকের উপকার কর।—তোমার উপরে লোকেও আশা করে—আমরাও করি। সেই কথাই আজ দারোগা বললেন, পণ্ডিতকে বারণ করে দিও, ঘোষ, ওসব যেন না করে। তা একটা কথা লিখে দাও তুমি—ওরা তোমাকে নির্ঝঞ্ঝাট করে দেবে। স্কুলের চাকরি—ও তোমারই আছে, একটা বণ্ড লিখে দিলেই তুমি পাবে। আর—ওই নজরবন্দী ছোকরার সঙ্গে তুমি যেন মিশো-টিশো না বাপু। বুঝলে?

এবার দেবু হাসিয়া বলিল—বুঝলাম সব।

—তা হলে কালই চল আমার সঙ্গে।

—না, তা পারবো না, ছিরু। আমি তো অন্যায় কিছু করিনি।

—কাজ ভালো করছো না খুড়ো। আচ্ছা, দু'দিন ভেবে দেখ তুমি।

—আচ্ছা।

হাসিয়া দেবু উঠিয়া চলিয়া আসিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পথের উপর নামিতে নামিতেই কাহারাজন দু'য়েক তাহাকে হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

—কে, সতীশ?

—আজ্ঞে হঁ্যা।

—কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে, আমাদের পাড়ায় একবার পদার্পন করতে হবে আপনাকে।

—কেন? কি হ'ল? ও ঘেঁটু-গান? আজ থাক সতীশ—অন্য একদিন হবে।

—আজ্ঞে, আপনাকে শোনাবার জন্যে আসর পেতেছি আমরা। তারপর ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—নজরবন্দী বাবুও আইচেন; তিনি বসে রইচেন; ডাক্তারবাবু রইচেন।

—নজরবন্দী বাবুটি আছেন ? আচ্ছা, চল তবে।

* * * *

চৈত্র মাসে ঘণ্টাকর্ণের পূজা। ঘেঁটু পূজা,— পঞ্জিকার 'ঘণ্টাকর্ণ' নয়। পঞ্জিকার 'ঘণ্টাকর্ণ' —বসন্ত রোগ-নিবারক মহাবল ঘণ্টাকর্ণের পূজা। এই 'ঘণ্টাকর্ণ'—ঘেঁটু গাজনের অঙ্গ। বিষ্ণু-বিরোধী শিবভক্ত ঘণ্টাকর্ণ ছিল পিশাচ। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রুদ্র দেবতার এবং বিষ্ণু দেবতার উভয়েরই প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। এই একাধারে ভক্ত ও পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের পূজা করে বাংলার নিম্ন জাতীয়েরা। সমস্ত মাস ধরিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। চাল-ডাল সিধা মাগিয়া মাসান্তে গাজনের সময় উৎসব করে।

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা। ধর্মরাজের স্থানে বকুলগাছ-তলায় আসন পড়িয়াছে। বকুলের গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভুরভুর করিতেছে। আকাশে চাঁদ ছিল—শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর রাত্রি। একদিকে মেয়েরা অন্যদিকে পুরুষদের আসর। দুই আসরের মাঝখানে বসিল—নজরবন্দী বাবুটি, পণ্ডিতমশায়, ডাক্তারবাবু ও হরেন ঘোষাল। চারিটি মোড়াও তাহারা যোগাড় করিয়াছে। বাসন্তী সন্ধ্যার জ্যোৎস্না—আকাশ হইতে মাটির বুক পর্যন্ত যেন এক স্বপ্নকুহেলিকাময় আলোর জাল বিছাইয়া দিয়াছিল।

দেবুর মনে পড়িয়া গেল—বাল্যকালে তাহারা ঘেঁটু-গান শুনিতে এখানে আসিত। এমনই জ্যোৎস্নার আলোতে আসর বসিত। যাইবার সময় আঁচল ভরিয়া কুড়াইয়া লইয়া যাইত বকুল ফুল। তখন সতীশেরা সদ্য জোয়ান, উহারাই গাহিত গান—আর তাহাদের বয়সীরা ধুয়া গাহিত, নাচিত। তখন কিন্তু ঘেঁটুর আসর ছিল জমজমাট। সে কত লোক! সে তুলনায় এ আসর অনেক ছোট। বিশেষ করিয়া পুরুষের দলই যেন অল্প। দেবু বলিল—সে আমলের মত কিন্তু আসর নাই তোমাদের, সতীশ।

সতীশ বলিল—পাড়ার সিকি মরদই এখনো আসে নাই, পণ্ডিতমশাই।

—কেন ? কোথায় গিয়েছে ?

—অ্যাজ্ঞে, প্যাটের দায়ে। গাঁয়ে চাকরি মেলে না ; গেরস্তরা ফেরার হয়ে গেল, মুনিষ-জন রাখতে পারে না। আমাদেরও ছেলে-পিলে বেড়েছে। এখন ভিনগাঁয়ে চাকরি করতে হয়। চাকরি সেরে ফিরতে একপহর রাত হয়ে যায়। তা ঘেঁটু-গান করবে কখন—শুনবে কখন, বলেন ?

জগন বলিল—পেটেই তোদের আগুন লেগেছে রে, পেট আর কিছুতেই ভরছে না!

সতীশ হাত-জোড় করিয়া বলিল—তা আজ্ঞে আপুনি ঠিক বলেছেন ডাক্তোর বাবু ; প্যাটে আগুনই লেগেছে বটে। মেয়েরা পর্যন্ত 'রোজ' খাটতে যাচ্ছে। কি করব বলুন ? পঞ্চায়েত করে বারণ করলাম। তা কে শুনছে ? সব ছুটছে তো ছুটছে। আর অভাবও যা হয়েছে বুঝলেন!

বাধা দিয়া যতীন বলিল—নাও, গান আরম্ভ কর।

গায়ক ও বাদকের দল অপেক্ষা করিয়াই ছিল, তাহারা আরম্ভ করিয়া দিল। ঢোলকের

বাজনার সঙ্গে মন্দিরার ধ্বনি ; গায়কে দল আরম্ভ করিল—

শিব-শিব-রাম-রাম।

ছোট ছেলের দল নাচিতে নাচিতে হাতে তালি দিয়া ধুয়া ধরিল—

শিব-শিব-রাম-রাম।

গায়কেরা গান গাহিল—

'এক ঘেঁটু তার সাত বেটা।
সাত বেটা তার সাতাস্ত
এক বেটা তার মহাস্ত।
মহাস্ত ভাই রে,
ফুল তুলতে যাই রে,
যত ফুল পাই রে,
আমার ঘেঁটুকে সাজাই রে !

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক লাইনের পর ছেলেরা তালি দিয়া গান গাহিয়া গেল—শিব-শিব-রাম-রাম।

এই গান শেষ হইবার পর আরম্ভ হইল অন্য গান। স্থানীয় বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহাদের গান আছে—

হায় এ জল কোথায় ছিল।
জলে জলে বাংলা মুলুক ভে-সে গেল !

বহুদিন আগে যখন রেলওয়ে-লাইন পড়িয়াছিল, সে গান আজও ইহারা গায়—

সাহেব রাস্তা বাঁধালে।
ছ'মাসের পথ কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে।

অজন্মার বৎসরের গান—

ঈশাণ কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা করলে শুকো।
এক ছিলম তামুক দাও গো সঙ্গে আছে হুঁকো।

আজ তাহারা আরম্ভ করিল—

দেশে আসিল জরীপ্ !
রাজা-পেজা ছেলে-বুড়োর বুক টিপ টিপ।

ছেলেরা ধুয়া ধরিল—

হায় বাবা, কি করি উপায় ?
প্রাণ যায় তাকে পারি—মান রাখা দা-য়।

গায়কেরা গাহিয়া চলিল—

পিওন এল, আমিন এল, এল কানুনগো,
বুড়োশিবের দরবারে মানত মানুন্ গো।
বুঝি আর মান থাকে না॥

ছেলেরা গাহিল,

হায় বাবা, কি করি উপায় ?
হাকিম এল ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গেতে পেশকার,
আত্মারাম্ খাঁচা-ছাড়া হল দেশটায়।
বুঝি আর মান থাকে না ॥
তাঁবু এল, চেয়ার এল, কাগজ গাড়ী গাড়ী,
নোয়ারই ছেকল এল চল্লিশ মণ ভারী।
ক্ষেতে বুঝি ধান থাকে না ॥
তে-ঠেঙে টেবিল পেতে লাগিয়ে দুরবীন,
এখানে ওখানে পোঁতে চিনে মাটির পিন।
কুলীদের প্রাণ থাকে না ॥
কুঁচবরণ রাঙা চোখ তারার মতন ঘোরে,
দস্তকড়মড়ি হাঁকে—এই উল্লুক ওরে।
হায় কলিতে মাটি ফাটে না ॥
পণ্ডিতমশায় দেবু ঘোষ তেজিয়ান বিদ্বান্,
জ্ঞানের চেয়ে তার কাছে বেশী হল মান।
ও সে আর সইতে পারে না ॥
কানুনগো কহিল 'তুই', সে করে 'তুকারি'
আমার কাছে খাটবে না তোর কোন জুরি-জারি
দেবু কারুর ধার ধারে না ॥
দেবু ঘোষের পাকা ধানে ছেকল চল্লিশ মণ,
টেনে নিয়ে চলে আমিন ঝন্-ঝন্-ঝন্।
ও সে কারুর মানা মানে না ॥

দেবু হাসিল। বলিল—এ সব করেছ কি সতীশ ?

যতীন মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। গায়কেরা তাহার পরের ঘটনাও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিল। শেষে গাহিল—

দেবু ঘোষে বাঁধল এসে পুলিশ দারোগা,
বলে, কানুনগোর কাছে হাত জোড় করগা।
দেবু ঘোষ হেসে বলে 'না' ॥
থাকিল পিছনে পড়ে সোনার বরণ নারী,
ননীর পুতলী শিশু ধুলায় গড়াগড়ি।
তবু ঘোষের মন টলে না ॥

চোখ মুছিতে মুছিতে দুর্গা বলিল—তা তুমি পাষাণই বটে জামাই। মাগো, সে কি দিন !

শুধু দুর্গা নয়, সমবেত মেয়েগুলি সকলেই আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল। সেদিনের কথা তাহাদের মনে আছে।

গায়কেরা গাহিল—

ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোষ চলেন জেলে,
অধম সতীশ লুটায় এসে তাঁরই চরণ-তলে
দেবতা নইলে হায় এ কাজ কেউ পারে না॥

গান শেষ হইল। সতীশ আসিয়া দেবু ঘোষকে প্রণাম করিল। দেবুর বুকেও একটা আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না, সতীশকে সস্নেহে ধরিয়া তুলিল।

জগন বলিল—তোকে আমি একটা মেডেল দেব সতীশ!

হরেন বলিল—আচ্ছা সতীশ, মালাটা যে আমিই দিয়েছিলাম সে কথাটা বাদ গিয়েছে কেন? মালা আছে, গলা আছে, আমি নাই। বাঃ!

যতীন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত অনুষ্ঠানটাই তাহার কাছে অদ্ভুত ভাল লাগিয়াছে। সতীশকে মনে মনে নমস্কার করিল। বলিল—তোমাদের গানগুলো আমাদের লিখে দেবে সতীশ?

—আজ্ঞে! সতীশ অপ্রস্তুতের মত হাসিতে লাগিল।—আপনি নিকে নেবেন?

—হ্যাঁ।

—সত্যি বলছেন, বাবু!

—হ্যাঁ হে।

নিঃশব্দে আকর্ণবিস্তার হাসিতে সতীশের মুখ ভরিয়া গেল। সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

দেবু বলিল, আজ তো আপনার সঙ্গে আলাপ হল না, কাল—

যতীন বলিল—আলাপ তো হয়ে গেছে। আলোচনা বাকি আছে। কাল আমিই আপনার বাড়ী যাব।

উনিশ

এই একটি দিন। শুধু একটি দিনের জন্যই দেবু, কেবল দেবুই দেখিল—শিবকালীপুরের অদ্ভুত এক রূপ। শুধু রূপ নয়, তাহার স্পর্শ তাহার স্বাদ—সবই একটি দিনের জন্য দেবুর কাছে মধুময় হইয়া দেখা দিল। পরের দিন হইতে কিন্তু আবার সেই পুরানো শিবকালীপুর। সেই দীনতা-হীনতা, হিংসায় জর্জর মানুষ, দারিদ্র্য-দুঃখ-রোগপ্রপীড়িত গ্রাম। কালও গ্রামখানির গাছপালা-পাতা-ফল-ফুলের মধ্যে যে অভিনব মাধুর্য দেবুর চোখে পড়িয়াছিল, নাবি আমের মুকুলের গন্ধে সে যে তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল, আজ তাহার কিছুই সে অনুভব করিল না।

আপনার দাওয়ায় বসিয়া সে ভাবিতেছিল অনেক কথা—এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ধারায়।

প্রথমেই মনে হইল গ্রামখানার সর্বাঙ্গে যেন ধুলা লাগিয়াছে! পথ কয়টায় এক-পা গভীর হইয়া ধুলা জমিয়াছে। ডোবার পুকুরের জল মরিয়া আসিয়াছে, অল্প জলে পানাগুলা পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামে জলের অভাব দেখা দিল। গরু বাছুর গাছপালা লইয়া জলের জন্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আর কষ্টের সীমাপরিসীমা থাকিবে না। বাড়ীতে অনেকগুলি গাছ হইয়াছে, দৈনিক জলের প্রয়োজন হইবে।

আর গাছ লাগাইয়াই বা ফল কি? তাহার বাড়ীর যে কুমড়ার লতাটি প্রাচীর ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই গাছটায় কয়টা কুমড়া ধড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনটা কুমড়া কাল রাত্রে কে ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা গাছটা পুঁতিয়াছিল—সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া গালি দিতেছে অজ্ঞাতনামা চোরকে।

ছোঁড়া আবার মাহিনা-কাপড়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিলুরও কাপড় ছিঁড়িয়াছে। নিজেরও চাই। 'যেমন করে পর কাপড় চৈতে হবে কানি'—কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু কি করিবে? পোস্ট আপিসে সঞ্চয়ের টাকাগুলির আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

চিন্তাটা ছিন্ন হইয়া গেল। কোথায় যেন একঘেয়ে চীৎকার উঠিতেছে। কোথায় কাহারা উচ্চ-কর্কশকণ্ঠে যেন গালিগালাজ করিতেছে, কাহাদের ঝগড়া বাধিয়াছে; সম্ভবতঃ একটা কণ্ঠস্বর রাঙাদিদির! বুড়ীর আবার কাহার সঙ্গে কি হইল? বিলুকেই সে প্রশ্ন করিল, রাঙাদিদি কার সঙ্গে লাগল বল তো?

বিলু হাসিয়া বলিল—লাগেনি কারু সঙ্গে। বুড়ী গাল দিচ্ছে নিজের বাপকে আর দেবতাকে। আজকাল রোজ সকালে উঠে দেয়। বুড়ো হয়েছে, একা কাজ-কর্ম করতে কষ্ট হয়, সকালে উঠে তাই রোজ ওই গাল দেবে। বাপকে গাল দেয়—বাঁশ-বুকো রাক্কাস, জমি-জেরাত-গুলো সব নিজে পেটে পুরে গিয়েছে, আর দেবতাকে গাল দেয়—চোখ-খেগো, কানা হও তুমি।

দেবু হাসিল; তারপর বলিল—কিন্তু আরও একজন যে গাল দিচ্ছে। কাঁসার আওয়াজের মত অল্পবয়সী গলা!

—ও পদ্ম, কামার বউ!

—অনিরুদ্ধের বউ?

—হ্যাঁ। বোধ হয় আমাদের ভাসুরপো—মানে শ্রীহরিকে গাল দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে অমন দেয়। আজও দিচ্ছে বোধ হয়। মাঝখানে তো পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। এখন একটুকু ভাল। ওদিকে কর্মকার তো একরকম কাজের বার হয়ে গেল। এক-একদিন মদ খেয়ে যা করে! একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে করে বেড়ায়, আর চেঁচায়—খুন করেঙ্গা। যার-তার বাড়ীতে খায়।

—মানে দুর্গার বাড়ীতে তো?

—হ্যাঁ!

ছি! ছি! ছি! দুর্গার ওই দোষটা গেল না। ওই এক দোষেই ওর সব গুণ নষ্ট হয়েছে।

বিলু বলিল—মদ খেয়ে মাতাল হয়ে 'খেতে দে খেতে দে' করে হাঙ্গামা করলে দুর্গা আর কি করবে বল ? অবিশ্যি কিছুদিন দুর্গার ঘরে রাত কাটাত কর্মকার। কিন্তু আজকাল দুর্গা তো রাত্রে ঘরে ঢুকতে দেয় না। কামার তবু পড়ে থাকে ওদের উঠানে, কোনদিন বাগানে ; কোনদিন রাস্তায়। কোনদিন অন্য কোথাও।

—হ্যাঁ, আজকাল অনিরুদ্ধের তো পয়সা-কড়ি নাই। দুর্গা আর—

—না—না—না, তা বলো না। দুর্গা কোনদিনই পয়সা নেয় নাই কর্মকারের কাছে। ও-ই বরং দু-টাকা চার-টাকা করে দিয়েছে মধ্যে মধ্যে। আমার হাতে দিয়ে বলেছে—বিলু-দিদি, তুমি কামার-বউকে দিয়ো, আমি দিলে তো নেবে না !

—ছিঃ ! তুমি ওই সব জঘন্য ব্যাপারের মধ্যে গিয়েছিলে ?

বিলু কিছুক্ষণ নতমুখে থাকিয়া বলিল—কি করব বল, কামার-বউ তখন ক্ষ্যাপার মত—হাঁড়ি চড়ে না। খেতে পায় না। পদ্মও না, কর্মকারও না। আমার হাতেও কিছুই ছিল না যে দোব। একদিন দুর্গা এসে অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললে। কি করব বল !

—হুঁ। দেবুর একটা কথা মনে পড়িল। নজরবন্দীর জন্য অনিরুদ্ধের ঘর দুর্গাই তো দারোগাকে বলে ভাড়া করিয়ে দিয়েছে শুনলাম।

—তা সে অনেক পরের কথা। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হ্যাঁ। নজরবন্দী ছেলেটি বড় ভাল, বাপু। কামার-বউকে মা বলে। গাঁয়ের ছেলেরাও ওর কাছে ভিড় জমিয়ে বসে থাকে।

—বস তুমি। আমি আসি একবার যতীনবাবুর সঙ্গেই দেখা করে।

পথে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ডাকিল শ্রীহরি। সেখানেও চারপাশে একটি ছোটখাটো ভিড় জমিয়া রহিয়াছে। দেবু অনুমানে বুঝিল, খাজনা আদায়ের পর্ব চলিতেছে। চৈত্র মাসের বারোই-তেরোই, ইংরাজী আটাশে মার্চ সরকার-দপ্তরে রাজস্ব-দাখিলের শেষদিন। তা ছাড়া চৈত্র-কিস্তি, আখেরী।

দেবু বলিল—ওবেলা আসব ভাইপো।

শ্রীহরি বলিল—পাঁচ মিনিট। গ্রামের ব্যাপারটা দেখে যাও। যেন অরাজক হয়েছে।

দেবু উঠিয়া আসিল। দেখিল—বৈরাগীদের 'নেলো'—অর্থাৎ নলিন হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; ও-পাশে তাহার মা কাঁদিতেছে।

শ্রীহরি বলিল—ওই দেখ, ছোঁড়ার কাণ্ড দেখ। আঙুল দিয়া সে দেখাইয়া দিল চণ্ডীমণ্ডপের চুনকাম করা একটি থাম। সেই চুনকাম করা থামের সাদা জমির উপর কয়লা দিয়া আঁকা এক বিচিত্র ছবি। মা-কালীর এক মূর্তি।

দেবু নেলোকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ রে, তুই এঁকেছিস ?

নেলো ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—চুনকাম-করা চণ্ডীমণ্ডপের ওপর কি করেছে একবার দেখ দেখি ?

—পট এঁকেছেন।

ইহার পর নেলোকেই সে বলিল—চুনকামের খরচা দে, দিয়ে উঠে যা !

দেবু তখনও ছবিখানি দেখিতেছিল—বেশ আঁকিয়াছিল নেলো। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল —কার কাছে আঁকতে শিখলি তুই ?

নেলো রুদ্ধস্বরে কোনমতে উত্তর দিলে—আপুনি আপুনি, আজ্ঞে।

—নিজে নিজে শিখেছিস ?

শ্রীহরি এই প্রশ্নের উত্তর দিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছোঁড়ার ওই কাজ হয়েছে, বুঝলে কি না ! লোকের দেওয়ালে সিমেণ্টের উঠানে, এমন কি বড় বড় গাছের গায়ে পর্যন্ত কয়লা দিয়ে ছবি আঁকবে। তারপর ওই নজরবন্দী ছোকরা ওর মাথা খেল ! অনিরুদ্ধের বাইরের ঘরে ছোকরা থাকে, দেখো না একবার তার দেওয়ালটা—একেবারে চিত্রি-বিচিত্রে ভর্তি। এখন চণ্ডীমণ্ডপের ওপর লেগেছে। কাল দুপুরবেলায় কাজটি করেছে।

দেবু হাসিয়া বলিল—নেলো অন্যায় করেছে বটে, কিন্তু এঁকেছে ভাল, কালী-মূর্তিটি খাসা হয়েছে।

—নমস্কার, ঘোষ মশায় ! ওদিকের সিঁড়ি দিয়া পথ হইতে উঠিয়া আসিল ডেটিনিউ যতীন। দেবুকে দেখিয়া সে বলিল—এই যে আপনিও রয়েছেন দেখছি ! আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম !

—আমিও যাচ্ছিলাম আপনার কাছেই।

—দাঁড়ান, কাজটা সেরে নি। ঘোষ মশায়, ওই-মাথাটায় কলি ফেরাতে কত খরচ হবে ?

শ্রীহরি বলিল—খরচ সামান্য কিছু হবে বৈকি। কিন্তু কথা তো তা নয়, কথা হচ্ছে নেলোকে শাসন করা।

হাসিয়া যতীন বলিল—আমি দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা বললেন—চুন চার আনা, একটা রাজমিস্ত্রীর আধ রোজের মজুরি চার আনা, একটা মজুরের আধ রোজ দুআনা। মোট—এই দশ আনা, কেমন ?

—হ্যাঁ। তবে পাটও কিছু লাগবে পোঁচ্ড়ার জন্যে।

—বেশ, সেও ধরুন দুআনা। এই বারো আনা। একটি টাকা বাহির করিয়া যতীন শ্রীহরির সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বাকীটা আমায় পাঠিয়ে দেবেন।

সে উঠিয়া পড়িল। দেবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। যতীন হাসিয়া বলিল—আমার ওখানেই আসুন, দেবুবাবু। নলিনের আঁকা অনেক ছবি আছে, দেখবেন। এস নলিন—এস।

শ্রীহরি ডাকিল—খুড়ো, একটা কথা !

দেবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বল।

—একটু এধারে এস বাবা। সব কথা কি সবার সামনে বলা চলে !

শ্রীহরি হাসিল। ষষ্ঠীতলার কাছে নির্জনে আসিয়া শ্রীহরি বলিল—গতবার চোত কিস্তি থেকেই তোমার খাজনা বাকী হয়েছে, খুড়ো। এবার সম্বৎসর। কিস্তির আগেই একটা ব্যবস্থা করো বাবা।

দেবুর মুখ মুহূর্তে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল! গতকালের কথা তাহার মনে পড়িল! বোধ হইল, শ্রীহরি তাহাকে শাসাইতেছে। সে সংযত স্বরে বলিল—আচ্ছা দেবো। কিস্তির মধ্যেই দোব।

* * * *

উনিশ-শো চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ ক্ষমতাবলে ইংরেজ সরকারের প্রণয়ন করা আইন—আটক-আইন। নানা গণ্ডীবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বিশেষ থানার নিকটবর্তী পল্লীতে রাজনৈতিক অপরাধ-সন্দেহে বাঙালী তরুণদের আটক রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাংলা সরকারের সেই আটক-আইনের বন্দী যতীন। যতীনের বয়স বেশী নয়, সতেরো-আঠারো বৎসরের কিশোর, যৌবনে সবে পদার্পণ করিয়াছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ, রুক্ষ বড় বড় চুল, ছিপছিপে লম্বা, সর্বাঙ্গে একটি কমনীয় লাবণ্য; চোখ দুটি ঝকঝকে, চশমার আবরণের মধ্যে সে দুটিকে আরও আশ্চর্য দেখায়।

অনিরুদ্ধের বাহিরের ঘরের বারান্দায় একখানা তক্তপোষ পাতিয়া, সেইখানে যতীন আসর করিয়া বসে। গ্রামের ছেলের দল তো সেইখানেই পড়িয়া থাকে। বয়স্কেরাও সকলেই আসে—তারা নাপিত, গিরিশ ছুতার, গাঁজাখোর গদাই পাল, বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীও আসেন। সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করিয়া বৃন্দাবন দত্তও আসে; মজুর খাটিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছে তারিণী পাল—সেও আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোন-কোনদিন শ্রীহরিও পথে যাইতে আসিতে এক-আধবার বসে। বাউড়ী-পাড়া, বায়েন-পাড়ার লোকেরাও আসে। গ্রাম্য বধূ ও ঝিউড়ি মেয়েগুলি দূর হইতে তাহাকে দেখে। বুড়ী রাঙাদিদি মধ্যে মধ্যে যতীনের সঙ্গে কথা বলে, কোনদিন নাড়ু, কোনদিন কলা, কোনদিন অন্য কিছু দিয়া, সে যতীনকে দেখিয়া আপন মনেই পাঁচালীর একটি কলি আবৃত্তি করে—

> "অক্রুর পাষাণ হিয়া, সোনার গোপালে নিয়া
> শূন্য কৈল যশোদার কোল।"

যতীনও মধ্যে মধ্যে আপনার মনে গুন-গুন করিয়া আবৃত্তি করে—রবীন্দ্রনাথের কবিতা। দুইটা লাইন এই পল্লীর মধ্যে তাহার অন্তরীণ জীবনে অহরহ গুঞ্জন করিয়া ফেরে—

> 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে···
> ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়···'

সমগ্র বাংলা দেশ যেন এই পল্লীটির ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে রূপায়িত হইয়া ধরা দিয়াছে তাহার কাছে। এখানে পদার্পণমাত্র গ্রামখানি এক মুহূর্তে তাহার আপন ঘরে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রতিটি মানুষ তাহার ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জন, পরমাত্মীয়। কেমন করিয়া যে এমন হইল—এ সত্য তাহার কাছে এক পরমাশ্চর্য। শহরের ছেলে সে, কলিকাতায় তাহার বাড়ী। জীবনে পল্লীগ্রাম এমন করিয়া কখনও দেখে নাই। আটক-আইনে গ্রেপ্তার হইয়া প্রথমে কিছুদিন ছিল জেলে। তারপর কিছুদিন ছিল বিভিন্ন জেলার সদরে মহকুমা শহরে। এই মহকুমা শহরগুলি অদ্ভুত। সেখানে পল্লীর আভাস কিছু আছে,

কিছু কিছু মাঠ-ঘাট আছে, কৃষি এখনও সেখানকার জীবিকার একটা মুখ্য বা গৌণ অংশ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজও আছে। ঠিক সমাজ নয়—দল। সমাজ ভাঙিয়া শিক্ষা, সম্মান ও অর্থবলের পার্থক্য লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পরিণত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। সেখানে পল্লীর আভাস তৈলচিত্রের রঙের প্রলেপ অবলুপ্ত কাপড়ের আভাসের মতই—অস্পষ্ট ইঙ্গিতে আছে। স্পষ্ট প্রভাব নাই—প্রকাশ নাই।

তাই একেবারে খাঁটি পল্লীগ্রামে অন্তরীণ হইবার আদেশে সে অজানা আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভে সে আশ্বস্ত হইয়াছে। সর্বত্র একটি পরমাশ্চর্য স্নেহস্পর্শ অনুভব করিয়াছে। অবশ্য এখানকার দীনতা, হীনতা, কদর্যতাও তাহার চোখ এড়ায় নাই। অশিক্ষা তো প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত। কিন্তু তবু ভাল লাগিয়াছে। এখানে মানুষ অশিক্ষিত, অথচ শিক্ষার প্রভাবশূন্য অমানুষ নয়। অশিক্ষার দৈন্যে ইহারা সঙ্কুচিত, কুশিক্ষা বা অশিক্ষার ব্যর্থতার দম্ভে দাম্ভিক নয়। শিক্ষা এখানকার লোকেব না থাক, একটা প্রাচীন জীর্ণ সংস্কৃতি আজও আছে,—অবশ্য মুমূর্ষুর মতই কোন মতে টিকিয়া আছে। কিন্তু তাহারও একটা আন্তরিকতা আছে।

শহরকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ওইখানেই তো চলিয়াছে মানুষেব জয়যাত্রা। কিন্তু সে—মফস্বলের ওই উকিল-মোক্তার-আমলাসর্বস্ব, কতকগুলা পান-বিড়ি-মণিহারী দোকানদার, ক্ষুদ্র চালের কলওয়ালা, তামাকের আড়তওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাদের দলপ্রধান ছোট শহর নয়। সে শহরের ঊর্ধ্বলোকে শত শত কলকারখানাব চিমনি উদ্যত হইয়া আছে তপস্বীর ঊর্ধ্ববাহুর মত। অবিশ্বাস্য অপরিমেয় তাহাদের শক্তি। বন্দী দানবের মত যন্ত্রশক্তির মধ্য দিয়া সে শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। উৎপাদন করিতেছে বিপুল সম্পদ-সম্ভার। কিন্তু তবু মরণোন্মুখ পল্লীকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। বিগত যুগের মুমূর্ষু প্রাচীন, যাহার সঙ্গে নব যুগের পার্থক্য অনেক,—সেই মুমূর্ষু প্রাচীনের সকরুণ বিদায় সম্ভাষণ যেমন নবীনকে অভিভূত করে, তেমনি এই মরণোন্মুখ প্রাচীন সংস্কৃতির আপ্যায়নও তাহার কাছে বড় সকরুণ ও মধুর বলিয়া মনে হইতেছে।

অনিরুদ্ধের বারান্দায় পাতা তক্তপোষের উপর যতীন দেবুকে বসাইল—বসুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

দেবু হাসিয়া বলিল—কাল তো বললেন—আলাপ হয়ে গিয়েছে।

—তা সত্যি। এইবার আলোচনা হবে। দাঁড়ান, তার আগে একটু চা হোক। বলিয়া সে অনিরুদ্ধের বাড়ীর ভিতরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—মা-মণি!

মা-মণি তাহার পদ্ম। মা-মণিটি তাহার জীবনে বিষামৃতের সংমিশ্রণে গড়া এক অপূর্ব সম্পদ। তাহার বিষের জ্বালা—অমৃতের মাধুর্য এত তীব্র যে, তাহা সহ্য করিতে যতীন হাঁপাইয়া উঠে। তাহার সঙ্গে পদ্মের বয়সের পার্থক্যও বেশী নয়, বোধ হয় পাঁচ-সাত বাৎসরের তবু সে তার মা-মণি। এক এক সময়ে যতীনের মনে পড়ে তাহার ছেলেবেলায়

কথা। খেলাঘরে তাহার দিদি সাজিত মা, সে সাজিত ছেলে। প্রাপ্তবয়সে সেই খেলায় যেন পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সে যখন এখানে আসে তখন পদ্ম প্রায় অর্ধোন্মাদ। মধ্যে মধ্যে মূর্ছারোগে চেতনা হারাইয়া উঠানে, ধূলামাটিতে অসংবৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। অনিরুদ্ধ তাহার পূর্ব হইতেই বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, বাড়ীতে থাকিত না। যতীনকেই অধিকাংশ সময় চোখে-মুখে জল দিতে হইত। তখন হইতেই যতীন তাকে মা বলিয়া। মা ছাড়া আর কোন সম্বোধন সে খুঁজিয়া পায় নাই। সেই মা সম্বোধনের উত্তরেই পদ্ম একদিন প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে ডাকিল ছেলে বলিয়া। সেই হইতেই এই খেলাঘর পাতা হইয়াছে। পদ্ম এখন অনেকটা সুস্থ, অহরহ ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত। অনিরুদ্ধের ভাবনা সে যেন ভাবেই না। ক্বচিৎ কখনও আসিলে তাহাকে যত্নও বিশেষ করে না।

বাড়ির ভিতর তখন কলরব চলিতেছে। একপাল ছেলে হুটোপাটি ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। পদ্ম একজনের চোখ গামছায় বাঁধিয়া বলিতেছিল—ভাত করে কি ?

—টগ্-বগ্। ছেলেটি উত্তর দিল।

—মাছ করে কি ?

—ছ্যাঁক-ছোঁক।

—হাটে বিকোয় কি ?

—আদা।

—তবে ধরে আন্ তোর রাঙা রাঙা দাদা।

কানামাছি খেলা চলিতেছে। যতীনের কাছে ছেলের দল আসে। যতীন না থাকিলে তাহারা পদ্মকে লইয়া পড়ে। পদ্মও যতীনের অনুপস্থিতিতে ছেলেদের খেলার মধ্যে বুড়ী সাজিয়া বসে।

যতীন আবার ডাকিল—মা-মণি !

পদ্ম উঠিয়া পড়িল,—কি ? চাঁদ-চাওয়া ছেলের আমার আবার কি হুকুম শুনি ?

—চায়ের জল গরম আর একবার।

—হবে না। মানুষ কতবার চা খায় ?

—দেবু ঘোষ মশায় এসেছেন। চা খাওয়াতে হবে না ?

—পণ্ডিত।

—হ্যাঁ।

পদ্ম একহাতে ঘোমটা টানিয়া দিল—চাপা গলায় বলিল—দি।

যতীন হাসিয়া বলিল—পণ্ডিত বাইরে ! ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে ?

—ওই দেখ, তাই তো।

ঘোমটা সরাইয়া দিয়া পদ্ম অপ্রস্তুতের মত একটু হাসিল।

বাহিরে আসিয়া যতীন দেবুকে বলিল—আপনার নামে একটা ভি-পি আনতে দেব আমি।

দেবু একটু বিব্রত বোধ করিল।—বেনামীতে ভি-পি,—কিসের ভি-পি ?

—হ্যাঁ। খানকয়েক ছবির বই, একটা রঙ-তুলির বাক্স। আমাদের নলিনের জন্ত। পুলিশের মারফত আনানোর অনেক হাঙ্গামা। নলিন ছবি আঁকতে শিখুক। ওর হাত ভাল।

—তা বেশ। কিন্তু তার চেয়ে, নলিন, তুই পটুয়াদের কাছে শেখ না কেন? প্রতিমা গড়তে শেখ, রং করতে শেখ।

নলিন ছেলেটা অদ্ভুত লাজুক, দুই চারিটি অতি সংক্ষিপ্ত কথায় কথা শেষ করে সে। সে মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—পটুয়ারা শেখায় না। বলে পয়সা লাগবে।

যতীন বলিল—পয়সা আমি দেব, তুমি শেখো।

—দু টাকা ফি-মাসে লাগবে।

দেবু বলিল—আচ্ছা, সে আমি বলে দেব দ্বিজপদ পটুয়াকে। পরশু যাব আমি মহাগ্রামে। আমার সঙ্গে যাবি।

নলিন ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—বেশ।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পয়সা দেবেন বলেছিলেন!

যতীন একটি সিকি তাহার হাতে দিয়া বলিল—তা হলে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে যাবে তুমি, বুঝলে ?

নলিন আবার ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া নীরবেই উঠিয়া চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—এইবার আপনার সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করব। অনেককে জিজ্ঞেস করছি, কেউ উত্তর দিতে পারে নি। অন্ততঃ সন্তোষজনক মনে হয় নি আমার।

—কি বলুন ?

—আপনাদের ওই চণ্ডীমণ্ডপটি। ওটি কার ?

—সাধারণের।

—তবে যে বলে জমিদার মালিক ?

—মালিক নয়। জমিদার দেবোত্তরের সেবাইত বলে তিনিই চণ্ডীমণ্ডপের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

—রক্ষণাবেক্ষণও তো, আমি যতদূর শুনেছি, গ্রামের লোকেই করে।

—হ্যাঁ, তা করে। কিন্তু তবু ওই রকম হয়ে আসছে আর কি! ওটা জমিদারের সম্মান। তা ছাড়া শূদ্রের গ্রাম, জমিদার ব্রাহ্মণ, তিনিই সেবায়েত হয়ে আছেন। আর ধরুন, গ্রামের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়, দলাদলি হয়। এই কারণেই জমিদারকেই দেবোত্তরের মালিক স্বীকার করে আসা হয়েছে। কিন্তু অধিকার গ্রামের লোকেরই।

—তবে প্রজা-সমিতির মিটিং করতে বাধা দিলে কেন জমিদার-পক্ষ ?

—বাধা দিয়েছে !

—হ্যাঁ, মিটিং করতে দেয় নি।

দেবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—বোধ হয় 'প্রজা-সমিতি' জমিদারের বিরোধী বলে দেয় নাই। তা ছাড়া ওটা তো আর ধর্মকর্ম নয়!

—প্রজা-সমিতি—প্রজার মঙ্গলের জন্য। প্রজার মঙ্গল মানে জমিদারের সঙ্গে বিরোধ নয়। কোন কোন বিষয়ে বিরোধ আসে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নয়। আর চণ্ডীমণ্ডপ তো প্রজারাই করেছে, জমিদার করে দেয় নি। জায়গাটা শুধু জমিদারের। সে তো পথের জায়গাও জমিদারের। তা বলে প্রজা-সমিতির শোভাযাত্রা চলতে পারে না সে পথে? আর ধর্মকর্ম ছাড়া যদি অধিকার না থাকে, তবে জমিদারের খাজনা আদায়ই বা হয় কি করে ওখানে? দারোগা হাকিম এলেই বা মজলিশ হয় কেন?

দেবু আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহার মধ্যে ছেলেটি এত সংবাদ লইয়াছে!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটা সংশয় জাগিয়া উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপের স্বত্বাধিকার সত্যই সমস্যার বিষয়। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—আজ কথাটার উত্তর দিতে পারলাম না আপনাকে।

ভিতরে খুট খুট করিয়া কড়া-নাড়ার শব্দ হইল। যতীন বুঝিল—মা-মণি ডাকিতেছে। সে বলিল—আমি আর উঠতে পারছি না; তুমিই দিয়ে যাও মা-মণি।

পদ্মের বিরক্তির আর সীমা রহিল না। ছেলেটা যেন কি!

দেবু হাসিয়া কহিল—আমাকে লজ্জা করছে নাকি, মিতেনী?

ইহার পর আর বাহির না হইয়া উপায় রহিল না। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আপনাকে আবৃত করিয়া পদ্ম দুই কাপ চা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—তা ছাড়া লোকজন যাঁরাই ওখানে যান, গোমস্তা শ্রীহরিবাবু তাঁদেরই সাবধান করেন—এ করবে না, ও করবে না! লোকে মেনে নেয়। দুর্বল নিরীহ মানুষ তারা—বোঝে না। টাকা দিয়ে শ্রীহরি ঘোষ মেঝে বাঁধিয়ে দিয়েছেন বলে সাধারণের অধিকার নিশ্চয়ই বিক্রি হয়ে যায় নি!

দেবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—উপায় কি বলুন? শ্রীহরি ধনী। সে এখন সমস্ত গ্রামেরই শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমিদার পর্যন্ত তার হাতে গোমস্তাগিরি ছেড়ে দিয়েছেন—পত্তন-বিলির মত শর্ত! করবেন কি বলুন?

যতীন হাসিয়া বলিল—আমি তো কিছু করব না, আমার করবার কথাও নয়। করতে হবে আপনাকে, দেবুবাবু। নইলে উদগ্রীব হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম কেন?

দেবু স্থিরদৃষ্টিতে যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীনও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সম্মুখের দিকে চাহিয়া।

সহসা কে ডাকিল—বাবু!

—কে? যতীন ও দেবু দু'জনেই ফিরিয়া দেখিল—ভিতরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে দুর্গা।

দেবু হাসিয়া বলিল—দুর্গা!

—হ্যাঁ।

—কি খবর?

—কামার-বউ জিজ্ঞেস করছে, উনান ধরিয়ে দেবে কিনা? রান্নাবান্না—

যতীন বলিল—হ্যাঁ। তা উনান ধরাতে বল না কেন!

—কি রান্না করবেন?

—যা হয় করতে বল।

সবিস্ময়ে দুর্গা বলিল—করতে বলব কাকে?

—মা-মণিকে বল। না হয়—তুমিই দুটো চড়িয়ে দাও।

দুর্গা মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, আপনি একটুকুন ক্ষ্যাপা বটেন বাবু!

—কেন, দোষ কি? যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, সে যে জাতই হোক তার হাতে খেতে দোষ নাই। জিজ্ঞেস কর পণ্ডিতমশাইকে।

—হ্যাঁ, পণ্ডিতমশায়?

দেবু হাসিয়া বলিল—জেলখানায় আমাদের যে রান্না করত সে ছিল হাড়ী। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—নামটি ছিল বিচিত্র—গান্ধারী হাড়ী।

যতীন বলিল—দ্রৌপদী হলেই ভাল হত। চলুন, চান করতে যাব নদীতে। সে জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া গামছা টানিয়া লইল।

* * *

দেবু মনে মনে স্থির করিয়াছিল—আর সে পাঁচের হাঙ্গামায় যাইবে না। জেল হইতেই সেই সঙ্কল্প করিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু যতীন ছেলেটি তার সব সঙ্কল্প ওলোট-পালোট করিয়া দিতে বসিয়াছে।

বাড়ী হইতে তেল মাখিয়া গামছা লইয়া, যতীনের সহিত নীরবে সে পথ চলিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে আসিয়াই দেখা হইল বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর সঙ্গে। লাঠি হাতে ঠুক্-ঠুক্ করিয়া বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপ হইতেই নামিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—চানে চলেছেন বুঝি?

যতীন হাসিয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—আপনি তো তেল মাখেন না শুনি?

—আজ্ঞে না।

—তবে পেনাম। ঈষৎ হেঁট হইয়া বৃদ্ধ নমস্কার করিলেন।

যতীন একেবারে শশব্যস্ত হইয়া বলিল—না-না। ওকি? আপনাকে কতবার বারণ করেছি আমি। বয়সে আমি আপনার চেয়ে—

কথার মাঝখানেই চৌধুরী মিষ্টি হাসিয়া বলিলেন—শালগ্রামের ছোট বড় নাই বাবা! আপনি ব্রাহ্মণ।

—না-না। ওসব আপনাদের সেকালে চলত, সেকাল চলে গেছে।

হাসিটি চৌধুরীর ঠোঁটের ডগায় লাগিয়াই থাকে। হাসিয়া তিনি বলিলেন—এখনকার কাল নতুন বটে বাবা। সেকালের কিছু আর রইল না। কিন্তু আমরা জনকতক যে—সেকালের মানুষ, অকালের মতন পড়ে রয়েছি একালে ; বিপদ যে সেইখানে!

বৃদ্ধের কথা কয়টি যতীনের বড ভাল লাগিল, বলিল—সেকালের গল্প বলুন আপনাদের!

—গল্প? হ্যাঁ, তা সেকালের কথা একালে গল্প বৈকি। আবার ওপারে গিয়ে যখন কর্তাদের সঙ্গে দেখা হবে, তখন একালে যা দেখে যাচ্ছি বললে, সেও তাঁদের কাছে গল্পের মত মনে হবে। সেকালে আমরা গাই বিয়োলে দুধ বিলোতাম, মাছ ধরালে মাছ বিলোতাম, ফল পাডলে ফল বিলোতাম, ক্রিয়াকর্মে বাসন বিলোতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, সরোবর দীঘি কাটাতাম, গরু-ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতাম, দেবতা প্রতিষ্ঠে করতাম, মহাপুরুষেরা ঈশ্বর দর্শন করতেন—সে আজ আপনাদের কাছে গল্প গো। আর আজকে আকাশে উড়োজাহাজ, জলের তলায় ডুবোজাহাজ, বেতারের খবর আসা, টাকায় আট সের চাল, হরেক রকম নতুন ব্যামো, দেবকীর্তি লোপ,—এও সেকালের লোকের কাছে গল্প।

—আপনি দীঘি কাটিয়েছেন চৌধুরীমশায়?

—আমার কপাল, ভাঙা-ভাগ্যি বাবা। তবে আমার আমলে বাবা কাটিয়েছেন—তখন আমি ছোট, মনে আছে। এক এক ঝুড়ি মাটি—দশ গণ্ডা কড়ি। একজন লোক কড়ি নিয়ে বসে থাকত—ঝুড়ি গুনে গুনে কড়ি দিত ; বিকেলে সেই কড়ি নিয়ে পয়সা দিত।

—আধ পয়সা ঝুড়ি বলুন।

—হ্যাঁ।...হাসিয়া চৌধুরী বলিলেন—আমাদের কথা তো আপনারা তবু বুঝতে পারেন গো, আমরা যে আপনদের কথা বুঝতেই পারি না! আচ্ছা বাবা, এতো যে সব স্বদেশী হাঙ্গামা, বোমা-পিস্তল করছেন—এসব কেন করছেন? ইংরেজ রাজত্বকে তো আমরা চিরকাল রাম-রাজত্ব বলে এসেছি।

একমুহূর্তে যতীনের চোখ দুইটা টর্চের আলোকের মত জ্বলিয়া উঠিল এক প্রদীপ্ত দীপ্তিতে। পরমুহূর্তেই কিন্তু সে দীপ্তি নিভিয়া গেল। হাসিয়া বলিল—বোমা-পিস্তল আমি দেখি নি। তবে হাঙ্গামা হচ্ছে কেন জানেন? হাঙ্গামা হচ্ছে ওই দীঘি সরোবর কাটানো আপনাদের কালকে ওরা নষ্ট করেছে বলে।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—বুঝতে ঠিক পারলাম না। হ্যাঁ গো, পণ্ডিত, আপনি এমন চুপচাপ যে?

চিন্তাকুলভাবেই হাসিয়া দেবু বলিল—এমনি।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ দেবুকে বলিল—আপনার কাছে আসব একবার ওবেলায়?

—আমার কাছে!

—হ্যাঁ। কথা আছে। আপনি ছাড়া আর বলবই বা কাকে?

—অসুবিধে না হয় তো এখুনি বলুন না! আবার আসবেন কষ্ট করে? দেবু উৎকণ্ঠিত

হইয়াই প্রশ্ন করিল।

যতীন বলিল—আমি বরং একটু এগিয়ে চলি।

—না-না-না। বৃদ্ধ বলিলেন—বেলা হয়েছে বলেই বলছিলাম। বুড়ো বয়সে আমার আবার লুকোবার কথা আছে নাকি? চৌধুরী হাসিয়া উঠিলেন—আপনি বোধ হয় শুনেছেন, পণ্ডিত?

—কি বলুন তো?

—গাজনের কথা!

—না, কিছু শুনি নি তো!

—গাজনের ভক্তরা বলছে এবার তারা শিব তুলবে না।

—শিব তুলবে না কেন?

—ও, আপনি তো গতবার ছিলেন না! গতবার থেকেই সূত্রপাত। গেলবারে ঠিক এই গাজনের সময়েই সেটেল্‌মেন্টের খানাপুরীতে শিবের জমি হারিয়ে গেল।

—হারিয়ে গেল!

জমিদারের নায়েব-গোমস্তা বের করতে পারলে না। বের করবে কি, পুরোহিতের জমি নিজেরাই বন্দোবস্ত করেছে মাল বলে। তা ছাড়া শিবের পুজোর খরচা জিম্মা ছিল মুকুন্দ মণ্ডলের কাছে। শিবোত্তর জমি ভোগ করত ওরা। এখন মুকুন্দের বাবা সে জমি কখন বেচে দিয়ে গিয়েছে মাল বলে। জমিদারও খাজনাখারিজ ফি গুনে নিয়ে দেবোত্তর মাল স্বীকার করেছে। মুকুন্দ এত সব জানত না, সে বরাবর শিবের খরচ যুগিয়েই আসছিল। এখন গতবার জরীপের সময় যখন দেখলে শিবোত্তর জমিই নাই, তখন সে বললে—জমিই যখন নাই, তখন খরচও আমি দেব না। গতবার কোনও রকমে চাঁদা করে পুজো হয়েছে। এবার ভক্তরা বলছে, ও-রকম যেচেমেগে পুজোতে আমরা নাই। তাই একবার শ্রীহরির কাছে এসেছিলাম—পুজোর কি হবে তাই জানতে। এখনও বেঁচে আছি—বেঁচে থাকতেই গাজন বন্ধ হবে বাবা।

—শ্রীহরি কি বললে?

—জমিদারের পত্র দেখালেন, তিনি খরচ দেবেন না। পুজো বন্ধ হয় হোক।

—হুঁ।

চৌধুরী বলিলেন—গতবার থেকে পাতু ঢাক বাজায় নাই, পাতু জমি ছেড়ে দিয়েছে। বায়েন অবশ্য হবে। অনিরুদ্ধ বলি করে নাই। বলে, একটা পাঁঠার ঠ্যাং নিয়ে ও আমি করতে পারব না। শেষে ও-ই খোঁড়াঠাকুর বলি করলে। এবার সে বলেছে—বলি করতে হলে দক্ষিণে চাই। নানান রকমের গোল লেগেছে পণ্ডিত। এসবের মীমাংসা তো পথে হয় না। তাই বলছিলাম—ও-বেলায় আসব।

দেবু হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, সে বলিল—এর আর আমি কি করব চৌধুরীমশায়?

—এ কথা আপনার উপযুক্ত হল না, পণ্ডিত। আপনার মত লোক যদি না করে, তবে কে করবে?

দেবু স্তব্ধ হইয়া গেল।

চৌধুরী কালীপুরের পথে বিদায় লইল। দেবু ও যতীন মাঠ অতিক্রম করিয়া গিয়া নামিল ময়ূরাক্ষীর গর্ভে। দেবু নীরবেই স্নান করিল, নীরবেই গ্রাম পর্যন্ত ফিরিল। যতীন দুই-চারটা কথা বলিয়া উত্তর না পাইয়া গুন-গুন করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিল :

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে……

* * * *

বাসায় ফিরিয়া যতীনের সে এক বিপদ। পদ্ম মূর্ছিত হইয়া জলে-কাদায় উঠানের উপর পড়িয়া আছে। মাথার কাছে বসিয়া কেবল দুর্গা বাতাস করিতেছে। তাহারও সর্বাঙ্গে জল-কাদা লাগিয়াছে। ও-ঘরের দাওয়ার বসিয়া আছে মাতাল অনিরুদ্ধ। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, আপন মনেই বিড়্‌বিড় করিয়া সে বকিতেছে। রান্নাবান্নার কোন চিহ্নই নাই।

দুর্গা বলিল,—আপনারা চলে গেলেন, কামার-বউ একেবারে ক্ষ্যাপার মতন হয়ে আমাকে বললে—বেরো, বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে, বেরো। আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। আমি মশায়, বাড়ী যাব বলে যেই এখান থেকে বেরিয়েছি, আর শব্দ হ'ল দড়াম্ করে। পিছন ফিরে দেখি এই অবস্থা। ছুটে এসে জল দিয়ে বাতাস করে কিছুই হ'ল না। খানিক পরে হঠাৎ কম্মকার এল। এসে, ওই দেখুন না, খানিকটা চেঁচামেচি করে ওই বসেছে —এইবার মুখ গুঁজড়ে পড়বে।

দেবু অনিরুদ্ধকে ঠেলা দিয়া ডাকিল—অনিরুদ্ধ!

একটা গর্জন করিয়া অনিরুদ্ধ চোখ মেলিয়া চাহিল—এ্যাও!

কিন্তু দেবুকে চিনিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল—ও, পণ্ডিত!

—হ্যাঁ, শুনছ?

—আলবৎ, একশবার শুনব, হাজারবার শুনব।

পরক্ষণেই সে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমার অদেষ্ট দেখ পণ্ডিত! তুমি বন্ধুনোক, ভাল নোক; গাঁয়ের সেরা নোক, পাতঃস্মরণীয় নোক তুমি—দেখ আমার শাস্তি। পথের ফকির আমি। আর ওই দেখ পদ্মের অবস্থা।

—জগনকে ডেকে আন অনিরুদ্ধ। ডাক্তার ডাক।

অতি কাতর স্বরে অনিরুদ্ধ বলিল—ডাক্তার কি করবে, ভাই? এ ওই ছিরে শালার কাজ। আমার গুপ্তি কই? আমার গুপ্তি! খুন করব শালাকে। আর ওই দুগ্‌গাকে। ওই পদ্মকে। দুগ্‌গা আমাকে বাড়ী ঢুকতে দেয় না পণ্ডিত। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না।

তারপর সে আরম্ভ করিল অশ্লীল গালিগালাজ। দুর্গা নতশির হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

দেবু বলিল—যতীনবাবু আসুন, আমার ওখানেই দু'টো খাবেন। আমরা গিয়ে বরং জগনকে ডেকে দেব'খন।

দেবু ও যতীন চলিয়া যাইতেই অনিরুদ্ধ আবার আরম্ভ করিল—আর ওই নজরবন্দী ছোঁড়াকে কাটব। ওকেই আগে কাটব। ও ব্যাটাই আমার ঘরের—

দুর্গা এবার ফোঁস করিয়া উঠিল—দেখ কম্মকার, ভাল হবে না বলছি।

অনিরুদ্ধ চৌকাঠের উপর নিষ্ঠুরভাবে মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিল—ওই নে, ওই নে!

দুর্গা বারণ পর্যন্ত করিল না।

কুড়ি

'ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট
সেই তিল দায়ে কাট।'

ফাগুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তিল ফসল পাকিলে সেবার চূড়ান্ত ফসল হয়। সে-তিল ফসল দা' ভিন্ন কাস্তেতে কাটা যায় না। এবার তিল নাবি, সবে এই ফুল ধরিতেছে, পাকিতে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ। কাজেই ফসল ভাল হইবে না।

ভোরবেলায় মাঠ ঘুরিয়া চাষের জমির তদারক করিয়া দেবু ফিরিতেছিল। এ বৎসর মাঘ মাস হইতে আর বৃষ্টি হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে এখনও কেহ আখ লাগাইতে পারে নাই। ময়ূরাক্ষীর জল একেবারে শীর্ণধারায় ওপারে জংশন শহরের কোল ঘেঁষিয়া বহিতেছে; বাঁধ দিয়া জল এপারে আনিতে পারিলে সিচ্ করিয়া চাষের কাজ চলিত। কিন্তু এ বাঁধ বাঁধা বড় কষ্টসাধ্য। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত ময়ূরাক্ষীর গর্ভে বাঁধ দিতে হইবে; অন্তত চার-পাঁচ হাত উঁচু না করিলে চলিবে না। সে করিবে কে? চার-পাঁচখানা গ্রামের লোক একজোট হইয়া না লাগিলে তাহা সম্ভবপর নয়। এখন আখ লাগাইলে সে আখের বিনাশ থাকিত না; বর্ষা পড়িবার পূর্বেই হাত দু'য়েক না হোক অন্তত দেড় হাত উঁচু হইয়া উঠিত। পটোল লাগানোও হইল না। 'পটোল রুইলে ফাল্গুনে ফল বাড়ে দ্বিগুণে'। শ্রীহরি কিন্তু সব লাগাইয়া ফেলিয়াছে। আপনার জমিতে দুই-তিনটা কাঁচা কুয়া কাটাইয়া, 'ঢেড়া'য় জল তুলিয়া সিচনের ব্যবস্থা করিয়াছে। শ্রীহরির কুয়া হইতে জল লইয়া ভবেশ-হরিশও কাজ করিয়া লইয়াছে।

দেবু ভাবিতেছিল একটা কুয়া কাটাইবার কথা। পটোল যাক, কিন্তু আখ না লাগাইলে কি করিয়া চলিবে? বাড়ীতে গুড় না থাকিলে চলে? ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে অল্প খুঁড়িলেই জল অতি সহজেই পাওয়া যাইবে; আট-দশহাত গর্ত করিলেই চলিবে। টাকা-পনেরো খরচ। কিন্তু এদিকে যে বিলুর হাতে মজুত টাকা সব শেষ হইয়া আছে। শ্রীহরির স্ত্রী গোপনে ধার দিয়াছে। দুর্গার মারফতে দোকানেও কিছু ধার হইয়া আছে। ধান এবার

ভাল হয় নাই। মজুত যাহা আছে—বিক্রি করিতে ভরসা হয় না। সম্মুখে বর্ষা আছে, চাষের খরচ—সংসার খরচ—অনেক দায়িত্ব। গম যব—তাও ভাল হয় নাই। গম দেড় মণ, যব মাত্র তিরিশ সের। কলাই যাহা হইয়াছে সে সংসারেই লাগিবে। আর স্কুলের চাকরি নাই, মাস মাস নগদ আয়ের সংস্থান গিয়াছে। এখন সে কি করিবে? অথচ এই অবস্থায় গোটা গ্রামটাই যেন তাহাকে টানিতেছে সহস্র সমস্যা হইয়া। যতীনের কথা মনে হইল; দ্বারকা চৌধুরীর কথা মনে হইল।

গ্রামে ঢুকিতেই দেখা হইল ভূপালের সঙ্গে। চৌকিদারী পেটিটা কাঁধে ফেলিয়া সে সকালেই বাহির হইয়াছে। ভূপাল প্রণাম করিল—পেণাম।

প্রতি-নমস্কার করিয়া দেবু চলিয়া যাইতেছিল, ভূপাল সবিনয়ে বলিল—পণ্ডিতমশায়।

—আমাকে কিছু বলছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বাড়ীতে, ফিরে আসছি।

—কি? বল?

—আজ্ঞে, খাজনা আর ইউনান বোর্ডের ট্যাক্স।

—আচ্ছা, পাবে।

ভূপাল খুশী হইয়া বলিল—এই তো মশায় মানুষের মতন কথা। তা না ডাক্তারবাবু তো মারতে এলেন। ঘোষালমশাই বলে দিলে—নেহি দেঙ্গা। আর সবাই তো ঘরে লুকিয়ে বসে থাকছে। মেয়ে-ছেলেতে বলেছে—বাড়ীতে নাই। এদিকে আমি গাল খাচ্ছি।

হাসিয়া দেবু বলিল—না থাকলেই মানুষকে চোর সাজতে হয় ভূপাল।

—হুঁ আপনি ঠিক বলেছেন।

ভূপাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কার ঘরে কি আছে বলুন? গোটা মাঠটার ধানই তো ঘোষমশাইয়ের ঘরে এসে উঠল গো। বর্ষার ধান শোধ দিতেই তো সব ফাঁক হয়। সত্যি, লোকে দেয় কি করে? কিন্তু আমিই বা করি কি বলুন? আমারই এ হইছে মরণের চাকরি!

বাড়ীতে আসিয়া দেবু দেখিল—বিলু তাহার জন্য চা করিয়া বসিয়া আছে। সে আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কি!

বিলু লজ্জিত ভাবেই বলিল—দেখ দেখি হয়েছে কিনা! কামার-বউকে শুধিয়ে এলাম। নজরবন্দীর চা কামার-বউ করে কিনা!

—তা না হয় হল! কিন্তু করতে বললে কে?

—তুমি যে বললে—জেলে রোজ নজরবন্দীদের কাছে চা খেতে!

—হ্যাঁ, তা খেতাম। কিন্তু তাই বলে এখনও খেতে হবে তার মানে কি? না; আর খরচ বাড়িয়ো না, বিলু।

—বেশ। এক কৌটো চা আনিয়েছি, সেটা ফুরিয়ে যাক, তারপর আর খেয়ো না।

—এক কৌটো চা আনিয়েছ?

—দুর্গা এনে দিয়েছে কাল সন্ধ্যেবেলা।

দেবুর ইচ্ছা হইল চায়ের বাটিটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু বিলু ব্যথা পাইবে বলিয়া সে তাহা করিল না। বলিল—আজ করেছ কিন্তু কাল থেকে আর করো না। চায়ের কৌটোটা থাক, ভাল করে রেখে দাও। ভদ্রলোক-জন এলে, কি বর্ষায়-বাদলায় সর্দি-টর্দি করলে খাওয়া যাবে।

—না।

দেবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—মানে?

—তোমার কষ্ট হবে।

—হবে না।

—হবে, আমি জানি।

—কি আশ্চর্য!

বিরক্তিতে বিস্ময়ে দেবু বলিল—আমার কষ্ট হবে কিনা আমি জানব না, তুমি জানবে?

—বেশ। করব না চা।

মুহূর্তে বিলুর চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া সে চলিয়া গেল।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। এই বোধ হয় তাহাদের জীবনে প্রথম দ্বন্দ্ব। বিলুকে আঘাত দেওয়ার দুঃখ বড় মর্মান্তিক হইয়া দেবুর অন্তরে বাজিল।

—মুনিবমশায়! দেবুর কৃষাণ আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি রে?

—আজ্ঞে, এবার তো একখানা কোদাল না হলে চলবে না।

—নতুন চাই? লোহা চাপিয়ে হবে না?

—না, আজ্ঞে। গেলবারই লাগত, আপুনি ছিলেন না। লোহা দিয়ে কোন রকমে চালিয়েছি; ক্ষয়ে এই এতটুকুন হয়ে গিয়েছে। সার কেটে পালটানোই যাচ্ছে না।

—সার কাটছ নাকি? জল দিচ্ছ তো? চল দেখি।

চৈত্র মাসে 'সার' প্রস্তুতের গর্তে সঞ্চিত আবর্জনাগুলিকে কোদাল দিয়া উপরের নূতন না-পচা আবর্জনা নিচে ফেলিয়া, নিচের পচা আবর্জনা যাহা 'সারে' পরিণত হইয়াছে—সেগুলিকে উপরে দেওয়ার বিধি। সঙ্গে সঙ্গে ভারে ভারে জল। দেবুর বাড়ীর সার কোনমতে কাটিয়া পালটানো হইয়াছে। কৃষাণটি কোদালটা দেখাইল। সত্যই সেটা ক্ষয় পাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে, উহাতে চাষের কাজ চলিবে না। চাষের কাজে ভারী কোদাল চাই। সেকালে শক্তিমান চাষীরা যে কোদাল চালাইত, তাহার ওজন পাঁচ সেরের কম হইত না, সাত-আট সের ওজনের কোদাল চালাইবার মত সক্ষম চাষীও অনেক ছিল।

দেবু বলিল—বেশ কোদাল একখানা—কি করবে, বরাত দিয়ে করাবে, না কিনবে?

—কেনা জিনিস ভাল হয় না, তবে সস্তা বটে।

—কিন্তু কামার কোথা? অনিরুদ্ধ তো কাজের বার হয়েছে। অন্য কামার যাকেই দেবে

—কাল দোব বলে দু-মাসের আগে দেবে না।

—তবে তাই কিনেই দেন। আর শন্ চাই। হালের 'জুতি' চাই। রাখালটা বলছিল—গরুর দড়িও ছিঁড়েছে।

দেবু একটা কাজ পাইয়া খুশী হইল। শন্ পাকাইয়া দড়ি করার কাজ—পল্লীগ্রামে নিষ্কর্মার কর্ম—বুড়োর কাজ। সে তখনই ঢেঁড়া-শন্ লইয়া আসিল। দড়ি পাকাইতে পাকাইতে সে ভাবিতেছিল—কি করিবে সে?

কৃষাণ কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া দাঁড়াইল।

—আর একটা কথা বলছিলাম যে মুনিবমশায়!

—কি, বল?

—পাড়ার লোকে সবাই আসবে আপনাব কাছে। তা আমাকে বলেছে, তু বলে রাখিস্ পণ্ডিতমশায়কে।

—কি, ব্যাপার কি?

—আজ্ঞে চণ্ডীমণ্ডপে আটচালা ছাওয়াতে আমরা বেগার দি। তা এবার ডাক্তোরবাবু, ঘোষাল—সব কমিটি করেছেন, ওঁরা বলছেন—পয়সা নিবি তোরা। বেগার ক্যানে দিবি? চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের, জমিদারকে খরচ দিতে হবে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। আপনার গৃহকর্মে মন দিয়া দড়ি পাকাইতে বসিয়া সে ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছিল—ভাবিতেছিল একটা দোকান করিবে সে; এবং তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া চাষ। প্রয়োজন মত সে নিজে লাঙল ধরিবে। এখন কিছু না করিলে সংসার চলিবে কিসে?

কৃষাণটা আবার বলিল--আমরা তাই ভাবছি। ডাক্তোরবাবু কথাটি মন্দ বলেন নাই। চণ্ডীমণ্ডপে জমিদারের কাছারি হয়, ভদ্দোনোকের মজলিস হয়, তোদের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের 'সেপ্‌চ' (সংস্রব) কি? বিনি পয়সায় ক্যানে খাটবি? আবার ওদিকে ঘোষমশায় লোক পাঠাচ্ছেন—কবে ব্যাগার দিবি? ঘোষমশায় গাঁয়ের মাথার নোক; আবার গোমস্তা হয়েছেন। ওঁর কথাই বা ঠেলি কি করে? তার ওপর গ্রাম-দেবতাও বটে। তাই সব বলছে পণ্ডিতমশায়ের কাছে যাব। উনি যেমনটি বলবেন. তেমনটি শিরোধায্য আমাদের!

দেবুর মন-প্রাণ ঠিক গত কল্যকার মত হাঁপাইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কৃষাণটি ডাকিল—মুনিবমশায়?

—আমি এখন কিছু বলতে পারলাম না, নোটন!

—আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব। সে আমাদের ঠিক হয়ে রইচে।

সে উঠিয়া গেল। দেবুর হাতের শন্-ঢেঁড়া নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল—সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

চণ্ডীমণ্ডপে লোকজনের সাড়া উঠিতেছে। সেখানে খাজনা আদায় চলিতেছে; সঙ্গে

সঙ্গে খাতকদের কাছে শ্রীহরির পাওনার হিসাবও চলিতেছে। আখেরি কিস্তি, বৎসরের শেষ। তামাদি যাহাদের, তাহাদের উপর নালিশ হইবে। শ্রীহরির ধানের পাওনা হিসাব করিয়া উসুল বাদে যাহা থাকিবে, আগামী বৎসরে তাহার জের চলিবে; যাহার উসুল নাই, তাহার আসল-সুদ এক হইয়া আগামী বৎসরের জন্যে আসল হইবে।

শ্রীহরির গোয়ালঘরগুলি ছাওয়ানো হইতেছে। চালের উপর ঘরামীরা কাজ করিতেছে, চাষীদের ঘর-ছাওয়ানোর কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলে নিজেরাই বাড়ীর কৃষাণ-রাখাল লইয়া ঘর ছাওয়াইয়া লয়। দেবুরও অবশ্য ছাওয়ানোর কাজ না-জানা নয়। কিন্তু পণ্ডিতি গ্রহণ করিয়া আর সে এ কাজ করে না, এবার করিতে হইবে। তাহার ঘর এখনো ছাওয়ানো হয় নাই। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

—সালাম পণ্ডিতজী!

ইছু সেখ পাইকার আরও দুই-তিন জনের সঙ্গে পথ দিয়া যাইতেছিল; দেবুকে দেখিয়া সে সম্ভাষণ করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও সম্ভাষণ করিল—সালাম।

—সেলাম। ভাল আছ ইছু-ভাই? তোমরা ভাল আছ সব?

—হ্যাঁ। আপনি সরীফ ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তা আপনাকে আমরা হাজারবার সালাম করেছি। হ্যাঁ—মরদের বাচ্ছা মরদ বটে। মছজেদে আমাদের হামেশাই কথা হয় আপনকার। মনু মিঞা, খালেক সায়েব, গোলাম মেজ্জা আসবে একদিন আপনকার সাথে মোলাকাৎ করতে।

দেবু প্রসঙ্গটা পাল্টাইয়া দিল—কোথায় এসেছিলে?

—এই গাঁয়েই বটে। কিস্তির সময়—ছাগল, গরু দু'চারটে বেচবে তো। তা ধরেন—এ হ'ল আমার কেনাবেচার গাঁও—তাই টাকাকড়ি নিয়ে এসেছিলাম। আর কেনা তো উঠেই গিয়েছে। কিনুনেওয়ালা হয়ে গেল। আপনার তো একটা বলদ বুড়ো হয়েছে পণ্ডিতমশায়; আপনি ল্যান ক্যানে একটা বলদ!

—এবার আর হয় না, ইছু-ভাই।

—আপনি ল্যান, বুড়ো বলদটা স্যান আমাকে, বাকী যা থাকবে—দিবেন আমাকে ইহার পরে। না-হয় কিছু ধান ছেড়ে স্যান, ধানের পাইকার আমার সাথে।

দেবু হাসিল।—না ভাই, থাক্।

—আচ্ছা, তবে থাক্।

ইছুর দল সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পাকা ব্যবসাদার ইছু, মানুষের টাকার প্রয়োজনের সময় সে টাকা লইয়া উপস্থিত হইবেই। কাহার বাড়ীতে কোন্ জন্তুটি মূল্যবান সে তাহার নখাগ্রে। কিন্তু মনু মিঞা, খালেক সাহেব, গোলাম মির্জা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে কেন? সে মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিল। ইহারা সম্ভ্রান্ত লোক, বড় চাষী, ব্যবসায়ী।

রাখাল-ছোঁড়া আসিয়া দেবুর শিশুটিকে নামাইয়া দিয়া বলিল—আপনি একবার ল্যান, মুনিবশায়। আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না। গরু চরাইতে যাবে আমার সাথে।

ছোঁড়াটা হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে খোকাকে বলিল—নেকা-পড়া কর বাবার কাছে। গরু চরাতে যেতে নাই। ছি!

দেবু সাগ্রহে খোকাকে বুকে তুলিয়া লইল। ছেলেটাও তেমনি, বিলু তাহাকে বেশ তালিম দিয়াছে, সে গম্ভীরমুখে আরম্ভ করিল—ক—ল কলো, ক—ল কলো!

* * *

—কি হচ্ছে পণ্ডিত?

বলিয়া এই সময় অনিরুদ্ধ আসিয়া বসিল। এখন সে প্রকৃতিস্থ। মুখে মদের সামান্য গন্ধ উঠিতেছে, কিন্তু মাতাল নয়। হাতে একটা লোহার টাঙ্গি।

হাসিয়া দেবু বলিল—চেতন হয়েছে, অনি-ভাই?

কোন লজ্জা বোধ না করিয়া অনিরুদ্ধ হাসিয়া বলিল—কাল একটুকু বেশী হয়েছিল বটে।

দেবু বলিল—ছি, অনি-ভাই! ছি।

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর অকস্মাৎ খানিকটা হাসিয়া বলিল—ও তুমি জান না, দেবু-ভাই। রস তুমি পাও নাই—তুমি বুঝবে না।

তিরস্কার করিয়া দেবু বলিল—তোমার জমি নীলামে উঠেছে, কি নীলাম হয়েছে, ঘরে পরিবারের অসুখ, আর তুমি মদ খেয়ে বেড়াও—পয়সা নষ্ট কর।

—পয়সা আর বেশী খরচ আমি করি না, এখন পচাই মদ খাই। এখন জমি নীলামের কথাই তোমাকে বলতে এসেছি। আর পরিবারের অসুখ তো, আমি কত ভুগবো বল?

—তুমি তো এমন ছিলে না অনি-ভাই।

—কে জানে? মদ তো আমি বরাবরই একটু-আধটু খাই। আমি তো অন্যায় কিছু বুঝতে পারি না।

—বুঝতে পার না! পৈতৃক ব্যবসা তুলে দিলে! ছোটলোকের মত পচাই ধরেছ। যেখানে সেখানে খাও—শোও!

—কি করব? অনি কামারের দা, ক্ষুর, গুপ্তি—কিনবে কে? কোদাল-কুড়ুল-ফাল—তাও এখন বাজারে মেলে—সস্তা। গাঁয়ে কাজ করলে শালারা ধান দেয় না। কি করব? আর পচাই! পয়সায় কুলোয় না—কি করব?

—কি করবে—! তোমার বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে, অনি-ভাই?

—কে জানে?

—দুর্গার ঘরে খাও অনি-ভাই? তার ঘরে তুমি রাত কাটাও?

—দুর্গার নাম করো না পণ্ডিত। নেমকহারাম, পাজি, শয়তানের একশেষ। আমাকে আর ঘরে ঢুকতে দেয় না।

অনিরুদ্ধের এই নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিতে দেবু চুপ করিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ বলিয়া গেল—জানো পণ্ডিত, দুর্গার জন্তে আমি জান দিতে পারতাম; এখনও পারি। দুর্গাই আমাকে নিজে থেকে ডেকেছিল। তখন আমার পরিবার পাগল। মিছে কথা বলব না, সে-সময় দুর্গা আমার পরিবারের সেবা পর্যন্ত করেছে, টাকাও দিয়েছে। দারোগা ওর এককালের আশনাইয়ের লোক—দারোগাকে বলে নজরবন্দীর জন্তে আমার ঘরখানি ভাড়া করিয়ে দিয়েছে। মাসে দশ টাকা ভাড়া, কিন্তু ওর সব চোখের নেশা! যাকে যখন ভালবাসে। এখন ওই নজরবন্দীর উপর নজর পড়েছে।

—ছি, অনিরুদ্ধ! ছি!

—যতীনবাবুর দোষ আমি দিই না। ভাল লোক, উঁচুঘরের ছেলে। পদ্মকে 'মা' বলে। আমি পরখ করে দেখেছি। যাক গে ও-কথা। মরুক গে দুর্গা। এখন যা বলতে এসেছি, শোন। বাকী খাজনার ডিক্রি জারি হয়ে গিয়েছে, জমি এইবার নীলামে চড়বে। ও ঝঞ্ঝাট আমি রাখব না। এখন বিক্রি করে দিয়ে যা পাই! তোমাকে ভাই দেখেশুনে আমার জোতটি বেচে দিতে হবে।

—বেচে দেবে? দেবুর বিস্ময়ের আর অধিক রহিল না।

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—সে যা হয় করব। ছিরে গোমস্তাকে আমি খাজনা দেব না।

—পাগলামি করো না, অনি-ভাই।

—পাগলামি? তবে যাক, এমনি ন'কড়া-ছ'কড়ায় নিলেম হয়ে যাক। আমার দ্বারা কিছু হবে না।

—বাকী খাজনার টাকাটা যোগাড় কর। হয় খাজনার পরিমাণ দামের মত জমি বেচে দাও, নয় ধার পাও তো দেখ।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু-ভাই, বাপুতি সম্পত্তি ছেড়ে দোব মনে করলে বুক ফেটে যায়। জানো পণ্ডিত, ওই চার বিঘে বাকুড়ি, আগে ঠাকুরদাদার আমলে সাত-খানা টুকরো টুকরো জমি ছিল। কেটে-কুটে সাতখানাকে ঠাকুরদাদা করেছিল তিনখানা। বাবা তিনখানাকে কেটে করেছিল দুখানা। সাড়ে-তিন বিঘে বাকুড়ি—আর দশ কাঠা ফালি। দুখানাকে কেটে আমি করেছি একখানা চারবিঘে বাকুড়ি।

টপ্‌ টপ্‌ করিয়া বড় বড় কয় ফোঁটা জল তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

দেবু তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—কেঁদো না, অনি-ভাই। তুমি সক্ষম বেটা-ছেলে, তুমি মন দিয়ে কাজ করলে তোমার কিছুর অভাব হতে পারে না।

বিচিত্র হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—হাজার মন পাতিয়ে কাজ করলেও কামারের কাজ করে আর অভাব ঘুচবে না, পণ্ডিত। উপায় এক—কলে কাজ। তাই দেখব এবার। দুর্গা আমাকে বলেছিল একবার—আমি গা করি নাই। কেশব কামারের ছেলে, হিতু কামারের নাতি—আমি কলের কুলি হব? ওই সব কি-না-কি জাতের মিস্ত্রীদের

তাঁবেদার হয়ে থাকব ? জানো দেবু, এমন দা আমি গড়তে পারি যে এক কোপে শেলোর বাঘের গলা নেমে যাবে !

অনিরুদ্ধকে শান্ত করিবার জন্যই রহস্য করিয়া দেবু বলিল—সেই তো তোমার ভুল, অনি-ভাই, ও দা নিয়ে লোকে করবে কি বল ? বাঘ কাটতে যাবে কে ?

অনিরুদ্ধ এবার হাসিয়া ফেলিল।

দেবু বলিল—টাকা যদি ধার পাও তো দেখ, অনি-ভাই। জমি রাখতেই হবে। তারপর মন দিয়ে কাজ-কর্ম কর। কলে—কলেই কাজ কর আপাতত। ক্ষতি কি ?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তুমি বলছ। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তাই দেখি।

পথে বাহির হইয়া অনিরুদ্ধ বাড়া গেল না। বাড়ী তাহার ভাল লাগে না। পদ্ম তাহাকে চায় না, সেও পদ্মকে চায় না। নিক্তির ওজনে চরিত্রবান্ সে কোনদিনই নয় ; কিন্তু পদ্মের প্রতি ভালবাসার অভাব তাহার কোনদিন ছিল না। চরিত্রহীনতার ব্যভিচার ছিল তাহার খেয়াল পরিতৃপ্তির গোপন পন্থা , উন্মত্ত দেহলালসার দাহ নিবৃত্তির জন্য পঙ্কস্নান।

অকস্মাৎ কোথা হইতে জীবনে একটা দুর্যোগ আসিয়া সব বিপর্যস্ত করিয়া দিল। সেই দুর্যোগের মধ্যে দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল মোহিনীর বেশে , শুধু মোহিনীর রূপ লইয়াই নয়—অফুরন্ত ভালবাসাও দিয়াছিল দুর্গা। সেবা যত্ন—এমন কি নিজের পার্থিব সম্পদও সে তখন অনিরুদ্ধের জন্য ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিছু দিয়াছেও।

তা ছাড়া দুর্গার সঙ্গ তাহাকে যে তৃপ্তি দিয়াছে, পদ্ম তাহার সুস্থ সবল যৌবন-পরিপূর্ণ দেহ লইয়াও সেরূপ তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তাহার বুকে আছে এক বোঝা মাদুলি ; চিরদিন সে তাহাতে বেদনা অনুভব করিয়াছে। আচার-বিচার-ব্রত-বার পালনের আগ্রহে, শুচিতা-বোধের উগ্রতায় পদ্ম তাহাকে অস্পৃশ্যের মত দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার ভালবাসায় যত্নের আধিক্য, মমতার আতিশয্য অনিরুদ্ধকে পীড়া দিয়াছে। সঙ্কোচশূন্য অধীরতায় দুর্গার মত বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সে কোনদিনই পারে নাই। সমস্ত দিন আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া তাহারই সম্মুখে বসিয়া সর্বাঙ্গ ঝলসাইয়া, সে বাড়ী ফিরিয়া একটু করিয়া মদ খাইত। কিন্তু ওই দেহ-মন লইয়া পদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইলেই তাহার নেশার আগ্রহ সব যেন হিম হইয়া যাইত।

দুর্গার মধ্যে আগুন ও জল—দুই-ই আছে, একাধারে জ্বলিবার ও জুড়াইবার উপাদান। তাহার যৌবনে আছে আবেগময়ী মানবীয় ঈষদুষ্ণ স্বাদ ;—তাহা অনিরুদ্ধকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ভালবাসায় আছে সর্বস্ব ঢালিয়া দিবার আকূতি। কামারশালা অচল হইলে, কর্মহীন অনিরুদ্ধ বিশ্বগ্রাসী অবসাদ হইতে বাঁচিবার জন্য সস্তা মদ ধরিবার সময়টিতেই দুর্গা আক্রোশবশে ছিরুকে ছাড়িয়া তাহাকে সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সেই চরম আত্মসমর্পণের মধ্যে দুর্গার নিকট সেও আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু দুর্গা সহসা একদিন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—নূতনের মোহে। দুর্গা তুষানল ও

মরীচিকা—দুই-ই। সে পাষাণী, বিশ্বাসঘাতিনী, মায়াবিনী!

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। এ কি! এ যে অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে একেবারে বায়েন-পাড়াতেই দুর্গার ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দুর্গা উঠানে দুধ মাপিতেছে, রোজের দুধ দিতে যাইবে।

সে ফিরিল তাড়াতাড়ি। পাড়াটা পার হইয়া সে মাঠের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই-বা দুর্গার পিছনে ঘুরিবে কেন? সে-ও পরিত্যাগ করিবে। দেবু তাহাকে ঠিক কথাই বলিয়াছে। এখন সে বুঝিতে পারিতেছে—তাহার কত পরিবর্তন হইয়াছে! ছি ছি! কেশব কর্মকারের ছেলে—হিতু কর্মকারের নাতি—সে মুচির মেয়ের ঘরে পড়িয়া থাকে তাহার উচ্ছিষ্ট দেহখানার লোভে—তাহার দুই-চারটি টাকা-পয়সার প্রত্যাশায়, ছি! সে না সক্ষম বেটাছেলে—একজন নামকরা লোহার কারিগর।

পরক্ষণেই সে হাসিল। লোহার কারিগরের আর মান নাই—নাম নাই। চার আনার বিলাতি চাকু-ছুরিতেই নামের গলা দু-ফাঁক হইয়া গিয়াছে। সে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যাক—নাম যাক—মানও যাক, জানটাই থাকুক, চাল-কলে তেল-কলে নাটবল্টু কষিয়া, হাতুড়ি ঠুকিয়া মিস্ত্রী হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে সে। জোতটাকেও বাঁচাইতে হইবে। ঠাকুরদাদার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজের হাতে কাটা জমি, বাবার কাটা জমি, তাহার নিজের হাতে কাটা ওই বাকুড়ি—তাহার সোনার বাকুড়ি—'লক্ষ্মী-জোল', তাহার মা অন্নপূর্ণা!

আপনা হইতেই তাহার দৃষ্টি সম্মুখের শস্যশূন্য মাঠের উপর দিয়া প্রসারিত হইয়া নিবদ্ধ হইল চার বিঘার বাকুড়ির উপর। সে চলিতে আরম্ভ করিল; আসিয়া বাকুড়ির আইলের উপর বসিল। আইলের মাথায় একটা কয়েৎবেলের গাছ। গাছটা লাগাইয়াছিল তাহার পিতামহ। বাল্যকালে তাহার বাপ চাষ করিত—সে আসিত বাপের ও কৃষাণের খাবার লইয়া, আসিয়া ওই গাছতলায় বসিত। জ্বর-জ্বালার পর কতদিন এখানে আসিয়া নুন দিয়া কয়েৎবেল খাইয়াছে। লক্ষ্মী পুজোতে, পর্বে-পার্বণে এই ধানের চালে হইয়াছে অন্ন, ওই কয়েৎবেল গুড়-নুন দিয়া মাখিয়া হইয়াছে চাটনি।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অনিরুদ্ধ সঙ্কল্প লইয়া উঠিল—এ জোত তাহাকে রাখিতেই হইবে!

সে চলিল 'আকুলিয়া' গ্রামের কাবুলী চৌধুরীর কাছে। ফ্যালারাম চৌধুরী, কঙ্কণা ইস্কুলের মাস্টার, তাহার সুদি কারবার আছে। খুব চড়া সুদ ও ভয়ঙ্কর তাগাদার জন্যে অনেক লোকে বলে 'কাবুলী'। অনেকে বলে 'অজগর'—তাহার গ্রাসে পড়িলে নাকি আর বাহির হওয়া যায় না। অনেকে বলে 'খুনে'। একবার একটা চোর ধরিয়া চৌধুরী চোরটাকে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল।

চৌধুরীর জমির ক্ষুধা বড় প্রবল। ভাল সম্পত্তি হইলে চৌধুরী টাকা দিবেই। সে আকুলিয়া গ্রামের পথই ধরিল।

চৌধুরী লেখাপড়া-জানা লোক, বি-এ পাস, এদিকে আবার সংস্কৃতেও কি একটা পরীক্ষা

দিয়াছে, ইস্কুলে সে হেডপণ্ডিত। কিন্তু আসলে সে একজন প্রথম শ্রেণীর আঙ্কিক। সুদ কষিতে তাহার কাগজ-কলম দরকার হয় না। চক্রবৃদ্ধিহারে দশ-বিশ বৎসরের সুদ মুখে মুখে হিসাব করিয়া দেয়। তবে সুদকে আসলে পরিণত করিয়া সেটা উসুলের হিসাব আলোচনার সময় দুই-চারিটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া অঙ্কগুলাকে রসাপ্লিত অথবা পারমার্থিক তত্ত্বমণ্ডিত করিয়া দেয়।

অনিরুদ্ধ বলিল—আমি ঠিক সময়ের মধ্যে টাকা শোধ করব, চৌধুরীমশাই—আমি ফাঁকিবাজ নই। আর পালিয়ে বেড়িয়ে দেখা করব না, সে স্বভাবও আমার নয়।

চৌধুরী হাসিল—ফাঁকি দেবার উপায় নাই, বাবা। আর পালিয়েই বা যাবি কোথায়? বলিয়া সে একটা শ্লোক আওড়াইয়া দিল—'গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো, লক্ষান্তরেহর্ক সলিলে চ পদ্মম্'। বুঝলি অনিরুদ্ধ, মেঘ থাকে আকাশে আর ময়ূর থাকে পাহাড়ে, দূর অনেক। কিন্তু মেঘ উঠলেই ময়ূরকে বেরিয়ে এসে পেখম মেলতেই হবে। আর সূর্যি থাকে আকাশে, জলে পদ্মের কুঁড়ি। কিন্তু সূর্যি উঠিলেই পদ্মকে বাপ বাপ বলে পাপড়ি খুলতেই হবে। খাতক-মহাজন সম্বন্ধ হলে যেখানে থাকিস না কেন, হাজির তোকে হতেই হবে—পালাবি কোথা!

অনিরুদ্ধ কথাগুলো ভাল করিয়া বুঝিল না, দাঁত মেলিয়া শুধু নিঃশব্দে হাসিল। কথাগুলোয় রসের গন্ধ আছে।

চৌধুরী মুখে মুখেই হিসাব করিল—বিঘেতে চল্লিশ টাকা দিলে, তিন বছরে চল্লিশ তো ষাটে গিয়ে দাড়াবে। এতে নালিশের খরচা চাপলে মহাজনের থাকবে কি বল্? তার ওপর খাতক আবার যদি বাকী খাজনা ফেলে যায়, তবে তো আমাকে রঘু রাজার মত ভাঁড়ে জল খেতে হবে!

অনিরুদ্ধ তাহার পায়ে ধরিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, এক বছরের মধ্যেই সব টাকা শোধ করব আমি।

পা টানিয়া লইয়া চৌধুরী বলিল—পায়ে ধরিস না অনিরুদ্ধ, পায়ের ফাটে হাত-মুখ ছিঁড়ে যাবে তোর। ছাড়।

মিথ্যা বলে নাই, চৌধুরীর কালো কর্কশ চামড়ায়, কোন ব্যাধির জন্যই হউক বা শরীরে কোন উপাদানের অভাব হেতুই হউক, বারোমাস ফাট ধরিয়া থাকে। শীতকালে সাদা ফাটগুলো রক্তাভ হইয়া উঠে। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর, চৌধুরীর পায়ের তলাকার ফাট, শুষ্ক কঠিন চামড়া, ছুরির মত ধারালো।

পা'টা ছাড়াইয়া লইয়া চৌধুরী তারপর সান্ত্বনা দিয়া বলিল—এক বছরেই যখন শোধ করবি, তখন ছ'বিঘে কেন দশবিঘে বন্ধক দিতেই বা আপত্তি কিসের তোর? কাগজে লেখা থাকবে বই তো নয়?

অনিরুদ্ধ চুপ করিয়া রহিল; সে ভাবিতেছিল দেহের গতিকের কথা, দেবতার গতিকের অর্থাৎ বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কথা।

—কিছু ভয় করিস না।

চৌধুরী তার মনের ভাব ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এক বছরেই শোধ করিস আর পাঁচ বছরে করিস—তোকে মরতে আমি দোব না। সুদ আমি বাকী রাখি না, রাখবও না। বাকী থাকলে আসলই থাকবে; তাতে বেইমানি করিস, তাহলে ব্রাহ্মণের গণ্ডুষ। চৌধুরী হাসিতে লাগিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—সুদ আপনি মাসে মাসে পাবেন।

—ঠিক তো?

—তিন সত্য করছি আপনার চরণ ছুঁয়ে।

—তবে দিনতিনেক পরে আসিস্। আমি সব খোঁজখবর করে দেখি।

—খোঁজ করবেন। কি খোঁজ করবেন?

—আর কোথাও বন্ধক-টন্দক দিয়েছিস কিনা।

—আপনার চরণ ছুঁয়ে বলছি—

চৌধুরী বলিল—এইবার চরণ দু'টিকে আমাকে সিকেয় তুলতে হবে বাবা। তাতে তোরই খারাপ হবে। রেজেস্ট্রী অফিসে যাওয়া হবে না, তুইও টাকা পাবি না। খোঁজ না করে আমি টাকা কাউকে দিই না, দোবও না।

অনিরুদ্ধ তবু উঠিল না। শ্রান্ত ক্লান্ত দেশান্তরী উদাসীনের অকস্মাৎ প্রিয়জনকে মনে পড়িয়া যেমন বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে জাগে, অনিরুদ্ধের আজ তেমনি ব্যাকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছে আবার সেই পূর্বের সংযত সচ্ছল জীবনে ফিরিবার জন্য। সেই ফিরিবার পথের পাথেয় চাই তাহার। চার বছরের বাকী খাজনা সালিযানা পঁচিশ টাকা দশ আনা হিসাবে একশত আড়াই টাকা; সিকি সুদ পঁচিশ টাকা দশ আনা—একুনে একশো আটাশ টাকা দু'আনা, খরচা লইয়া একশো চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ, দেড়শো টাকাই ধরিয়া রাখা ভাল। আরও একশো চাই। সে বলদ এক জোড়া কিনিবে। জমি ভাগে না দিয়া, একটি কৃষাণ রাখিয়া সে বাপ-ঠাকুরদার মতই ঘরে চাষ করিবে। তাহার নিজের জমি তের বিঘা। তাহার সঙ্গে অন্য কাহারও বিঘাপাঁচেক জমি সে ভাগে লইতেও পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে জংশন শহরের ধান-কলে বা তেল-কলে একটা চাকরিও লইবে। রাত্রি থাকিতে সে উঠিবে, গরু দুটাকে আপন হাতে খাইতে দিবে। কৃষাণ হাল লইয়া যাইবে, সেই সঙ্গে সে-ও বাহির হইবে—একেবারে সারাদিনের মত সাজিয়া গুছাইয়া। জমিগুলি দেখিয়া-শুনিয়া ওই পথেই চলিয়া যাইবে সে জংশনে কলের কাজে। ফিরিবার পথে আবার একবার মাঠ ঘুরিয়া বাড়ী আসিবে। মদ খাইতে হয়—একটু না খাইলে সে বাঁচিবে না—বোতল কিনিয়া আনিয়া বাড়ীতে রাখিবে, পল্ম মাপিয়া ঢালিয়া দিবে—ব্যাস! কলের মাইনে দৈনিক আট আনা হিসাবে চারিটা রবিবার বাদ দিয়া তের টাকা—বৎসরে একশো ছাপান্ন টাকা নগদ আয়। ধান, কলাই, গুড়, গম, যব, তিসি, সরিষা হইবে চাষে। নজরবন্দীর বাড়ী ভাড়া আছে মাসিক দশ টাকা। ওটা অবশ্য স্থায়ী আয় নয়। এ ছাড়াও সে বাড়ীতে আবার কামারশালা খুলিবে। রাত্রে যাহা

পারে, যতটুকু পারে করিবে; দৈনিক দু'গণ্ডা পয়সা রোজগার হইলেও তাহাতেই তাহার দৈনিক নূন-তেলের খরচা তো চলিয়া যাইবে। ঋণ শোধ দিতে তাহার কয় দিন! ঋণ শোধ দিয়া সে আরম্ভ করিবে সঞ্চয়; সঞ্চয় হইতে সুদি কারবার। খৎ-তমসুকে নয়, জিনিস-বন্ধকী কারবার। ঘাটতি নাই পড়তি নাই, বৎসরে একটি টাকা দু'টাকায় পরিণত হইবে। ইহার উপর তাহার বাকুড়ির আরো আধ হাত মাটি তুলিয়া সে যদি গর্ত করিতে পারে—তবে বাকুড়িতে হাজাশুকা থাকিবে না। মাটি তুলিয়া গাড়ি-গাড়ি সার এবং মরা পুকুরের পাঁক ঢালিয়া দিবে। উনো ফসল দুনো হইবে।

চৌধুরী বলিল—বসে থাকলে তো টাকা মিলবে না, অনিরুদ্ধ! আমি খোঁজখবর করি, তারপর এদিকে বেলাও যে দশটা হ'ল। আমার আবার ইস্কুল আছে।

অনিরুদ্ধ বলিল, আজই চলুন কঙ্কণা, রেজেস্টারী আপিসে খোঁজ করুন।

হাসিয়া চৌধুরী বলিল—আজই? তোর অশ্বতর যে পক্ষীরাজের চেয়েও জিন্দে দেখছি থামতে চায় না! বেশ, বোস তুই। আমি চান করে দুটো খেয়ে নি। চল্ আমার সঙ্গে। টিফিনের সময় খোঁজ করব।

টিফিনেও খোঁজ শেষ হইল না। চৌধুরী বলিল—আবার সেই শেষ ঘণ্টা, তিনটে-দশের পর আবার অবসর। তুই তা হলে বোস্।

শেষ ঘণ্টায় হেডপণ্ডিত চৌধুরীর ধর্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতার ক্লাস। এ ক্লাসটার সময় চৌধুরী প্রায়ই ছেলেদের স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অবকাশ দিয়া রেজেস্ট্রী অফিসের কাজগুলি সারিয়া থাকে। দলিল-দস্তাবেজ বাহির করে, কে কোথায় কি নিল—কি বেচিল, কে কি বন্ধক দিল ইত্যাদি সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখে।

অনিরুদ্ধ সেই অপেক্ষা করিয়া রহিল। সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই। সে খানকয়েক বাতাসা কি দুই টুকরা পাটালির প্রত্যাশায় পরাণ ময়রার দোকানে বসিয়া পরাণের তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। পাটালি-বাতাসা মিলিল না, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা সে ভুলিয়া গেল; পরাণের বিধবা ভাগ্নী দোকান করে, তাহার সঙ্গে বেশ আলাপ জমাইয়া ফেলিল। একটা হইতে তিনটা—দুই ঘণ্টা সময় যেন মেয়েটার হাসির ফুঁয়ে উড়িয়া গেল!

চৌধুরী আসিয়া বলিল—দেখা আমার হয়ে গেল, অনিরুদ্ধ, বুঝিল?

—হয়ে গেল আজ্ঞে!

—হ্যাঁ। তোকে আর ডাকি নাই। দেখলাম গল্পেতে খুব জমে গিয়েছিস, রসভঙ্গ করা পাপ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ। বলিয়া চৌধুরী হাসিল।

অনিরুদ্ধ একটু লজ্জিত হইল।

—টাকা আমি দোব।

—দেবেন! উৎসাহে অনিরুদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—হ্যাঁ। কিন্তু তোর তো আজ সারাদিন খাওয়া হ'ল না রে!

—তা এই বাড়ী গিয়ে—এই তো কোশখানেক পথ আজ্ঞে।

আনন্দের আবেগে অনিরুদ্ধ কোন কথাই শেষ করিতে পারিল না।

—আচ্ছা পরশু আসিস্। তাহলে শীগ্‌গির বাড়ী যা। মেঘ উঠেছে। ঝড়-জল হবে বনে হচ্ছে। চৌধুরী চলিয়া গেল।

মেয়েটি বলিল—তুমি খাও নাই এখনো?

—তা হোক। এই কতক্ষণ! বোঁ বোঁ করে চলে যাব।

—এই বাতাসা কখানা ভিজিয়ে জল খাও। খাও নাই—বলতে হয়!

বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া অনিরুদ্ধ যেন বাঁচিল। টাঙিটা হাতে করিয়া সে পথে নামিয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ী চলিল। কিন্তু কঙ্কণার প্রান্তে আসিয়া পৌছিতে-না-পৌছিতে ঝড় উঠিয়া পড়িল। পৌষের পর হইতে বৃষ্টি হয় নাই। চারিদিক রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। চৈত্রমাসের মাঝামাঝিতেই যেন বৈশাখের চেহারা দেখা দিয়াছে। অকালেই উঠিয়া পড়িয়াছে কাল-বৈশাখীর ঝড়। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল, দুর্দান্ত ঝড়ের তাড়নায় পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত পিঙ্গল ধূলায় ধূসর হইয়া উঠিল, তাহার উপর ঘনাইয়া আসিল—দ্রুত আবর্তনে আবর্তিত পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের ঘন ছায়া দুয়ে মিলিয়া সে এক বিচিত্র পিঙ্গলাভ অন্ধকার। গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ঝড়ের সে কি দুর্দান্তপনা!

অনিরুদ্ধ আশ্রয় লইল একটা গাছতলায়। শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতও হইতে পারে? কিন্তু উপায় কি? আবার কে এখন এই দুর্যোগে গ্রামের মধ্যে ছুটিয়া যায়? আর মরণ তো একবার!

সোঁ-সোঁ শব্দে প্রবল ঝড়। ঝড়ে চালের খড় উড়িতেছে, গাছের ডাল ভাঙিতেছে। বিকট শব্দে ওই কার টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই নামিল ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি, দেখিতে দেখিতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বর্ষণ। আঃ, পৃথিবী যেন বাঁচিল! ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় ভিজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠিতে লাগিল।

বৈশাখের আগে এ অকাল-বৈশাখী ভাল নয়। 'চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড়-পাথর, জ্যৈষ্ঠে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে!' ভাগ্য ভাল, শিল পড়িল না। তবে একটা উপকার হইল, জমিতে চাষ চলিবে। এ সময়ে একটা চাষ পাঁচগাড়ি সারের সমান। কাটা ধানের গোড়াগুলি উল্টাইয়া দিবে, সেগুলি মাটির ভিতর পচিতে পাইবে। রোদে বাতাসে মাটি ফোঁপরা নরম হইবে। হাতে তুলিয়া ধরিলেই এলাইয়া পড়িবে আদরিণী মেয়ের মত!

* * *

ঝড়-জল থামিতে সন্ধ্যা ঘুরিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রি, ক্রোশখানেক দীর্ঘ মেঠো পথ, মাঠে কাদা হইয়া উঠিয়াছে, গর্তে জল জমিয়াছে। জায়গায় জায়গায় জলের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়া জমিয়াছে খড়কুটা-পাতা—নানা আবর্জনা। চারিদিকে ব্যাঙগুলা জলের সাড়ায় ও স্বাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিষধর সরীসৃপের সাড়া পাওয়া যাইতেছে—সুদীর্ঘ দেহ লইয়া সর্ সর্ শব্দে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু

অনিরুদ্ধের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। টাঙিটা হাতে করিয়া সে নির্ভয়ে চলিতে চলিতে গান ধরিল। সাপ! সাপের প্রাণের ভয় নাই? উচ্চকণ্ঠে গান শুধু তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি নয়, সরীসৃপদের প্রতি সরিয়া যাইবার নোটিশ! সে নোটিশ সত্ত্বেও যদি কাহারও দুর্মতি হয়—মাথা তুলিয়া গর্জন করে, তবে তাহার হাতে আছে এই টাঙি। সাপ—সে হাসিল। যেবার সে দুইখানা জমি কাটিয়া একখানা বাকুড়িতে পরিণত করে, সেবারে একটা পুরানো পগার কাটিবার সময় কালকেউটে মারিয়াছিল বারোটা। তাহার মধ্যে পাঁচটা ছিল চার হাত করিয়া লম্বা। সাপ কি অপর জানোয়ারকে সে ভয় করে না। ভয় তাহার মানুষকে। ছিরুকে আগে গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু শ্রীহরি এখন আসল কালকেউটে! চৌধুরীও ভীষণ জীব!

ঝড়ে গ্রামটা তছনছ করিয়া দিয়াছে।

গাছের ডাল ভাঙিয়াছে, পাতায়-খড়ে পথেঘাটে আর চলা যায় না। চণ্ডীমণ্ডপের ষষ্ঠীতলায় বকুলগাছটার বড় ডালটাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। চালের খড় সকলেরই কিছু-না-কিছু উড়িয়াছে। হরেন্দ্র ঘোষাল একখানা ঘর করিয়াছিল গম্বুজের মত, উঁচুতে প্রায় মাঝারি তালগাছের সমান। সেইখানার চালটাকে একেবারে উপড়াইয়া হরিশ মোড়লের পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছে। বায়েনপাড়া, বাউড়ীপাড়ার দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। তালপাতা এবং খড়ে ছাওয়ানো ঘরগুলির আচ্ছাদন বলিতে কিছু রাখে নাই। তাহার উপর বর্ষণে দেওয়াল গলিয়া মেঝে ভিজিয়া কাদা সপ-সপ করিতেছে।

যাক, দেবু-ভায়ের কিছু যায় নাই। আহা, বড় ভাল লোক দেবু-ভাই। জগনের ডাক্তারখানার কেবল বারান্দার চালটা আধখানা উল্টাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য, শ্রীহরি বেটার কোন ক্ষতি হয় নাই। টিনের ঘরে, বেটা লোহার দড়ির টানা দিয়াছে। এই রাত্রেই রাঙাদিদি ঘরের খড়কুটা পরিষ্কার করিতে করিতে দেবতাকে গাল পাড়িতেছে।

আপনার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অনিরুদ্ধ দাঁড়াইল।

দাওয়ায় বসিয়া ছিল যতীন! সে বই পড়িতেছিল; প্রশ্ন করিল—কে?

—আজ্ঞে, আমি। অনিরুদ্ধ।

—কোথায় ছিলেন সমস্ত দিন?

—কাজে গিয়েছিলাম বাবু।

কথাটা বলিয়া অনিরুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চালের দিকে চাহিয়া দেখিল।

যতীন একটু আশ্চর্য হইয়া গেল—অনিরুদ্ধ আজ স্বস্থ কথাবার্তা বলিতেছে। এ অবস্থাটা যেন অনিরুদ্ধের পক্ষে অস্বাভাবিক। সে আবার প্রশ্ন করিল—শরীর ভাল আছে তো? কি দেখছেন?

—দেখছি চালের অবস্থা। নাঃ, উড়ে নাই কিছু। কেবল কোঠা ঘরের পশ্চিম দিকের চালের খড়গুলা আতঙ্কিত সজারুর কাঁটার মত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

—আসছি বাবু। অনেক কথা আছে।

সে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। কিছু খাইতে হইবে। পেট হু-হু করিয়া জ্বলিতেছে।

পদ্ম বাড়ীর উঠান হইতে পথ-ঘাট পর্যন্ত সব ইহারই মধ্যে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। ওই যে ওপাশের দাওয়ায় বসিয়া রহিয়াছে, ওটা কে? একটা ছেলে! কে? ও—বাউণ্ডুলে তারিণীর সেই ছেলেটা! জংশনে ভিক্ষা করিতে করিতে এখানে আসিয়া জুটিল কি করিয়া? পদ্মের কাছে আসিয়া বলিল—ওটা কোথা থেকে এল?

অনিরুদ্ধকে সুস্থ দেখিয়া পদ্মও অবাক হইয়া গেল। অনিরুদ্ধ এবারে ছেলেটাকে বলিল—এখানে কোথা থেকে এসে জুটলি?

হাসিয়া পদ্ম বলিল—নজরবন্দী নিয়ে এসেছে আজ জংশন থেকে, বাবুর চাকর হবে।

—হুঁ, যত মড়া গাঙের ঘাটের জড়ো! দে, এখন খেতে দে দেখি। ঘরে কি আছে?

শুনিবামাত্র পদ্ম সঙ্গে সঙ্গেই উঠিল। যাইতে যাইতে বলিল—জংশন-ইষ্টিশানে কার কি চুরি করেছিল, লোকে ধরে মারছিল—নজরবন্দী ছেলে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

অনিরুদ্ধ বিরক্ত হইয়া উঠিল। কোন্ দিন আবার তাহার বাড়ীর কিছু কিংবা ওই নজরবন্দীর কিছু চুরি করিয়া না পালায় ছেলেটা! সে রূঢ়স্বরে বলিল—এই ছোঁড়া, কোথায় চুরি করেছিলি? কি চুরি করেছিলি?

ছোঁড়া ভীত অথচ ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত মাথা হেঁট করিয়া আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

পদ্ম বলিল—কি ধারার মানুষ গো তুমি! নিয়ে এসেছে অন্য একজনা, তোমার বাড়ীতে তো আসে নাই ও! তুমি বকছ কেনে বল তো? তা ছাড়া ছেলেমানুষ, অনাথ,—ওর দোষ কি? যা রে বাবা, তুই উঠে তোর মুনিবের ওই দিকে যা।

ছোঁড়াটা কিন্তু তেমনি ভঙ্গীতে সেইখানে বসিয়াই রহিল, নড়িল না।

একুশ

'চাষ আর বাস' পল্লীর জীবনে দুইটা ভাগ। মাঠ আর ঘর—এই দুইটি ক্ষেত্রেই এখানে জীবনের সকল আয়োজন—সকল সাধনা। আষাঢ় হইতে ভাদ্র—এই তিনমাস পল্লীবাসীর দিন কাটে মাঠে—কৃষির লালন-পালনে। আশ্বিন হইতে পৌষ সেই ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে—সঙ্গে সঙ্গে করে রবি ফসলের চাষ। এ সময়টাও পল্লীজীবনের বারো আনা অতিবাহিত হয় মাঠে। মাঘ হইতে চৈত্র পর্যন্ত তাহার ঘরের জীবন। ফসল ঝাড়িয়া, দেনা-পাওনা মিটাইয়া সঞ্চয় করে, আগামী চাষের আয়োজন করে; ঘরের ভিতর-বাহির গুছাইয়া লয়। প্রয়োজন থাকিলে নূতন ঘর তৈয়ারী করে, পুরানো ঘর ছাওয়ায়, মেরামত করে; সার কাটিয়া জল দেয়, শন্ পাকাইয়া দড়ি করে। গল্প-গান-মজলিস করে, চোখ বুজিয়া হরদম তামাক পোড়ায়, বর্ষার জন্য তামাক কাটিয়া গুড় মাখাইয়া হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া জলের ভিতর পুঁতিয়া পচাইতে দেয়। চাষীর পরিবারের যত বিবাহ সব এই সময়ে—মাঘ ও ফাল্গুনে। জের বড় জোর বৈশাখ

পর্যন্ত যায়। হরিজনদের চৈত্রমাসেও বাধা নাই, পৌষ হইতে চৈত্রের মধ্যেই বিবাহ তাহারা শেষ করিয়া ফেলে।

অকালে—চৈত্রমাসের মাঝামাঝি এই অকাল—কালবৈশাখীর ঝড়জলে সেই বাঁধাধরা জীবনে একটা ধাক্কা দিয়া গেল। ভোরবেলায় শনের দড়ি পাকানো ছাড়িয়া সবাই মাঠে গিয়া পড়িল। প্রবীণদের সকলের হাতেই হুঁকা। অল্পবয়সীদের কোঁচড়ে অথবা পকেটে বিড়ি-দেশলাই, কানে আধপোড়া বিড়ি। সকলে আপন আপন জমির চারিপাশের আইলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উঁচু ডাঙা জমিতে দুই-চারিজন আজই লাঙলের চাষ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিম্নভূমি—জোলান্ জমিগুলিতে এখনও জল জমিয়া আছে, দুই-চারিদিন গিয়া খানিকটা না শুকাইলে এসব জমিতে চাষ চলিবে না। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে তরি-তরকারির চারাগুলি মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুর মত এতদিন কোনমতে বাঁচিয়া ছিল। এইবার মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত দশ-দিনে দশ-মূর্তি হইয়া উঠিবে। তিলের ফুল সবে ধরিতেছে, জলটায় তিলের খানিকটা উপকার হইবে। তবে অপকারও কিছু হইয়া গেল,—যে ফুলগুলি সদ্য ফুটিয়াছিল, এই বর্ষণে তাহার মধু ধুইয়া যাওয়ায় তাহাতে আর ফল ধরিবে না। এইবার আখ লাগানো চলিবে। জলটায় উপকার হইয়াছে অনেক। তবে গ্রামে ঘর-বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর। তাহার আর কি করা যাইবে!

গ্রামের মেয়েরা ঝড়ে বিপর্যস্ত বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। কোমরে কাপড় বাঁধিয়া খড়-কুটা জড়ো করিতেছে,—সমস্ত সারে ফেলিতে হইবে। ছেলের দল আমবাগানে ছুটিয়া সেই ভোরবেলায়, কোঁচড় ভরিয়া আমের গুটি কুড়াইতেছে। হরিজনদের মেয়েরা ঝুড়ি কাঁখে পথে-ঘাটে-বাগানে—পাতা-খড়-কাঠি শুকনা ডাল-পাতা সংগ্রহ করিয়া প্রচণ্ড বোঝা বাঁধিয়া ঘরে আনিয়া ফেলিতেছে; জ্বালানি হইবে। তাহাদের নিজেদের ঘর-দুয়ার এখনও সাফ হয় নাই। পুরুষেরা যে-যার কাজে গিয়াছে। কেহ চাষী-গৃহস্থবাড়ীর বাঁধা কাজে, কেহ জংশনে কলের কাজে, কেহ ভিন গাঁয়ে দিনমজুরিতে।

দুর্গা আপনার ঘরে বসিয়াছিল। তাহার কাজ বাঁধা-ধরা। তাহার বাহিরে সে যায় না। সে এই সব পাতা-কুটা কুড়াইয়া কখনও জ্বালানি করে না। জ্বালানি সে কেনে। ভোরবেলায় একদফা দুধ দোহাইয়া সে নজরবন্দীবাবুকে দিয়া আসিয়াছে; পথে বিলুদিদিকেও খানিকটা দিয়া, সেইখানেই চা খাইয়া, বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে। আগে আগে কিছুদিন সে চা খাইত কামার বউয়ের বাড়ীতে; কামার-বউ নজরবন্দীবাবুর চা করিত, নজরবন্দীকে চা দিয়া বাকিটা পদ্ম এবং দুর্গা খাইত। কিন্তু সেদিন পদ্মের সেই রূঢ় কথার পর আর সে কামার বউয়ের বাড়ীর ভিতর যায় না। বাহিরে-বাহিরেই নজরবন্দীবাবুর দুধের যোগান দিয়া, দুই-চারটা কাজ-কর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া আসে। নজরবন্দীও আজ কয়েক দিন তাহাকে কোন কথা বলে নাই। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, কাল হইতে সে আর নিজে দুধ দিতে যাইবে না; মাকে দিয়া পাঠাইয়া দিবে। যে মানুষ কথা কয় না, তাহাকে যাচিয়া কথা বলা তাহার অভ্যাস নাই।

দুর্গার মা উঠান সাফ করিতেছিল; বউটা ডাল-পালা খড়-কুটা কুড়াইতে গিয়াছে। পাতু আপনার ছেলেটাকে লইয়া বসিয়া আছে দাওয়ার উপর। লোকে বলে ছেলেটা নাকি দেখিতে অনেকটা হরেন ঘোষালের মত হইয়াছে, কিন্তু তবু পাতু ছেলেটাকে বড ভালবাসে। বছর খানেকের মধ্যে পাতুর অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবস্থা এবং প্রকৃতি দুয়েরই। পূর্বে পাতু বায়েন বেশ মাতব্বর লোক ছিল। আচারে-ব্যবহারে বেশ একটু ভারিক্কী চাল দেখাইয়া চলিত। তখন পাতুর চালচল্তি দেখিয়া লোকে হিংসা করিত। ভাগাড়ের চামড়া হইতে তাহাদের ছিল মোটা আয়। চামড়া বেচিত, কতক চামড়া নিজে পরিষ্কার করিয়া ঢোল, তবলা, বাঁয়া, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছাইয়া দিত। পাতুর ছাওয়া খোল তবলার শব্দের মধ্যে কাঁসার আওয়াজের মিঠা বেশ বাজিত। এই ভাগাড় হইতেই আসিত তাহার আয়ের বারো আনা। বাকী সিকি আয় ছিল চাকরান-জমির চাষ এবং এখানে-ওখানে ঢাকের বাজনা হইতে। ভাগাড়টা এখন হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। জমিদার টাকা লইয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে। বন্দোবস্ত লইয়াছে আলেপুরের রহমৎ শেখ এবং কঙ্কণার রমেন্দ্র চাটুজ্জে।

চাকরান-জমিও পাতুর গিয়াছে, সে-জমি এখন জমিদারের খাসখতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। জমিটা পাতু নিজেই ছাড়িয়া দিয়াছে। না দিয়াই বা উপায় কি ছিল? তিন বিঘা জমি লইয়া বারোমাস পার্ব্বে-পার্বণে ঢাক বাজাইয়া কি হইবে? যেদিন বাজাইতে হইবে সেই দিনটাই মাটি। তার চেয়ে সে বরং নগদ মজুরিতে এখানে-ওখানে বাজনা বাজাইয়া আসে—সে ভাল। বায়না থাকিলে পরিষ্কার কাপড়ের উপর চাদর বাঁধিয়া ঢাক কাঁধে লইয়া পাতু বাহির হয়, ফিরিয়া আসে দুই-একটি টাকা লইয়া; উপরন্তু দুই-একটা পুরানো জামা-কাপড়ও লাভ হয়। প্রায় বারোটা মাসই সে এখন বেকার। জন-মজুর খাটিতেও পারে না! বাদ্যকর-বায়েন বলিয়া তাহার একটি সম্ভ্রম আছে, সে জন-মজুর খাটিবে কেমন করিয়া? বসিয়া বসিয়া সে ভাগাড় বন্দোবস্ত লওয়ার কথাটাই ভাবে। তাহার চেয়েও ভাল হয় যদি চামড়ার ব্যবসা করিতে পারে। তাহাদেরই স্বজাতি নীলু বায়েন—এখন অবশ্য নীলু দাস, চামড়ার ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি ধনী হইয়াছে। এখন সে কলিকাতায় থাকে, মস্ত বড় চামড়ার ব্যবসা। মস্ত বাড়ী করিয়াছে, বাড়ীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সে-সব দেখিবার জন্য এম-এ, বি-এল পাস করা একজন সরকারী হাকিম—সরকারী চাকরি ছাড়িয়া তাহার ম্যানেজারি করিতেছে। প্রকাণ্ড বসত বাড়ী, হাওয়া-গাড়ী, ঠাকুর-বাড়ী আছে। দেশে আপনার গ্রামে কঙ্কণার বাবুদের মত ইস্কুল ও হাসপাতাল করিয়া দিয়াছে। তাহার ছেলে নাকি লাটসাহেবের মেম্বার। পাতু চামড়া ব্যবসায় ও ভাগাড় বন্দোবস্ত লইবার কল্পনা করে, সঙ্গে সঙ্গে এমনি ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখে।

বারোমাস জীবনধারণের ব্যবস্থা করে তাহার স্ত্রী এবং দুর্গা। যে পাতু একদা দুর্গাকে কঠিন ক্রোধে লাঞ্ছিত করিয়া ছিল—ছিরু পালের প্রতি প্রীতির জন্য, সেই পাতু হরেন ঘোষালের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ছেলেটাকে ভালবাসে—দিনরাত আদর করে। মধ্যে

মধ্যে ঘোষালের কাছে যায়, আবদার করিয়া বলে—আজ চার আনা পয়সা কিন্তু দিতে হবে, ঘোষালমশায় !

দুর্গা নৈশ-অভিসারে যায় কঙ্কণায়, জংশনে। প্রতীক্ষমান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে—সঙ্গে কে ও ? অন্ধকারের অস্পষ্ট মূর্তিটি সরিয়া যায়, দুর্গা বলে—ও আমার সঙ্গে এসেছে।

—কে ?

—আমার দাদা।

অস্পষ্ট মূর্তি হেঁট হইয়া নীরবে নমস্কার করে।

দুর্গা বলে—একটা সিগারেট দেন, ও ততক্ষণে বসে বসে খাক্।

বাবুদের বাগান-বাড়ীর কোন গাছতলায় অথবা বারান্দায় সিগারেটের আগুনের আভায় পাতুকে তখন চেনা যায়। আসিবার সময় সে একটা মজুরি পায়—চার আনা হইতে আট আনা ; দুর্গা আদায় করিয়া দেয়।

সেদিন পাতু মনস্থির করিয়া বার বার দুর্গাকে বলিল—পঁচিশ টাকা বই তো লয় ! দে না দুগ্গা, ভাগাড়টা জমা নিয়ে লি।

দুর্গা বলিল—সে হবে। আজ এখুনই দুটো গাছের তালপাতা কেটে আন্গা দিকি, ঘরটা তো ঢাকতে হবে !

এই তাহাদের চিরকালের ব্যবস্থা। উড়িলে কি পুড়িলে ঘরের জন্য ইহারা ভাবে না। পুড়িলে কাঠ-বাঁশের জন্য তবু ভাবনা আছে ; উড়িলে সেটা ইহারা গ্রাহ্য করে না। মাঠে খাস-খামারের পুকুরের পাড়ের অথবা নদীর বাঁধের উপরে তালগাছ কাটিয়া আনিয়া ঘর ছাইয়া ফেলে। শুধু পুরুষদের ফিরিবার অপেক্ষা,—কাজ হইতে ফিরিয়া তাহারা গাছে উঠিয়া পাতা কাটিবে, মেয়েরা মাথায় তুলিয়া ঘরে আনিবে। দু-চারিজন মেয়েও গাছে চড়িয়া পাতা কাটে। দুর্গাও এককালে তালগাছে চড়িতে পারিত, কিন্তু এখন আর গাছে চড়ে না। প্রয়োজনও নাই, তাহার কোঠাঘরের চালে বেশ পুরু খড়ের ছাউনি—মজবুত বাঁধানে বাঁধা। তাহার চালের খড় কিছু বিপর্যস্ত হইয়াছে, বিশৃঙ্খল হইয়াছে এইমাত্র, উড়িয়া যায় নাই। ওগুলাকে আবার সমান করিয়া বসাইতে অবশ্য গোটা দুয়েক মজুর লাগিবে। এ কাজ পাতুকে দিয়াই হইবে, তাহাকেই বরং দুই দিনের মজুরি দিবে।

দুর্গার কথার উত্তরে পাতু বলিল—হুঁ।

—হুঁ তো ওঠ !

—বউটো আসুগ আগে।

—বউ এলে পাঠিয়ে দোব, বউকে—মাকে ; তুই এখন যা দিকি। পাতা কেটে ফেল গা যা।

দুর্গার মা উঠান পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল—মা লারবে বাছা। তুমি খেতে দিচ্ছ —তোমার 'কিলগুনো' খাটছি, উপায় নাই, আবার বেটার খাটুনি খাটতে লারব আমি। ক্যানে, কিসের লেগে ? কখনো মা বলে দু-গণ্ডা পয়সা দেয় না—একটুকরা ট্যানা দেয়

যে ওর লেগে আমি খাটব ?

পাতু হুঙ্কার দিয়া উঠিল—আমরা দিই না তোর কোন্ বাবা দেয় শুনি ?

—শুনলি দুগ্‌গা, বচন শুন্‌লি 'খাল্‌ভরার' ?

দুর্গা বাধা দিয়া বলিল—থাম্ বাপু তোরা। তোর গিয়েও কাজ নাই, চেঁচিয়েও কাজ নাই। বউ আসুক—আমরা দু-জনায় যাব। দাদা তু এগিয়ে চল।

কোমরে কাটারি গুঁজিয়া পাতু আসিয়া উঠিল নদীর ধারে। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধটা নদীর সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া পূর্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। বাঁধের গায়ে সারিবন্দী অসংখ্য তালগাছ এবং শরগাছ। পাতু বাছিয়া বাছিয়া ঢলকো পাতা দেখিয়া একটা গাছে চড়িয়া বসিল।

ওই খানিক দূরে গাছের উপর 'আথনা' অর্থাৎ রাখহরি বাউড়ি পাতা কাটিতেছে। তার ওধারের গাছটায়—ও কে ? পুরুষ নয়, মেয়ে ! আথনার বউ পরী ? এপাশে ওই গাছটায়ও ওটা কে ? পাতু ঠাহর করিতে না পারিয়া ডাকিল—কে রে উখানে ?

—আমি গণা। অর্থাৎ গণপতি।

—আর কে বটে ?

—আমার পাশে বাঁকা, হুই রয়েছে ছিদাম। হুই মতিলাল।

গাছে চড়িয়াই সবার আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। সহসা এদিকে আথনা চীৎকার করিয়া উঠিল—হুই ! হুস হুই ধা ! উঃ ! হুস ধা, উঃ ! বাবা রে, মেরে ফেলাবে লাগটে ! হিশ, ঠোঁটের ঢাড় কি রে বাবা !

আথনার জিহ্বায় একটু জড়তা আছে, স্পষ্ট কথা বাহির হয় না।

আথনাকে দুইটা কাক আক্রমণ করিয়াছে। মাথার উপর কা-কা করিয়া উড়িতেছে, আর ঠোঁট দিয়া ঠোকর মারিতেছে। গাছটায় কাকের বাসা আছে। ওপাশে পরী, স্বামীকে গাল পাড়িতেছে—ড্যাকরা বাঁশবুকোকে দশবার যে মানা করলাম, কাগের বাসা আছে, উঠিস্ না ! কেমন হইছে—বলিতে বলিতে আথনার বিব্রত অবস্থা দেখিয়া সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

দূরে দুম্-করিয়া একটা শব্দ উঠিল। সর্বনাশ ! কে পড়িয়া গেল ? ওঃ, ভাদ্র মাসের পাকা তালের মত পড়িয়াছে ! ফাটিয়া গেল না তো ? না, মরে নাই, নড়িতেছে। যাক—উঠিয়া বসিয়াছে। বাপ রে ! আচ্ছা শক্ত জান্ ! নদীর ধারের ভিজা মাটি—তাই রক্ষা ! কিন্তু লোকটা কে ?

—কে বটিস রে ?

লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল—সাপ !

—সাপ ?

—খরিশ। যেমন ইদিকের পাতায় উঠতে যাব—অমনি শালা—ফোঁস্ করে ফণা নিয়ে

উঠছে উদ্দিকের পাতায়। কি করব, লাফিয়ে পড়লাম।

ফড়িং বাউড়ী! ছোঁড়া খুব শক্ত! খুব বাঁচিয়াছে আজ!. সাপটা পাখীর ডিমের সন্ধানে খেজো বাহিয়া গাছে উঠিয়াছে।

ও রে বাবা! পাতুরও জ্বালা কম নয়; একটা পাতা কাটিতেই অসংখ্য পিঁপড়ে বাহির হইয়া তাহার সর্বাঙ্গে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। পাতু গামছাটা খুলিয়া গামছার আছাড়ে সেগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। দূর শালা, দূর! ধ্যেৎ! ধ্যেৎ! ধ্যেৎ!

* * *

দুর্গা আয়না দেখিয়া নরুণ দিয়া দাঁত চাঁচিতেছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দুর্গার একটা বাতিক। তাহার দাঁতগুলি শাঁখের মত ঝক-ঝক করা চাই, মধ্যে মধ্যে দাঁতে একটু আধটু পানের ছোপ পড়ে, খুব ভাল করিয়া দাঁত মাজিলেও যায় না। তখন সে নরুণ দিয়া সেই ছোপের দাগ চাঁপিয়া তুলিয়া ফেলে। বউ ফিরিলেই সে বউকে লইয়া পাতা বহিয়া আনিতে যাইবে। হাঙ্গামা অনেক; মাথায় চুলে ময়লা লাগিবে, সর্বাঙ্গ ধুলায় ভরিয়া যাইবে, কাপড়খানা আর পরা চলিবে না। কিন্তু তবু উপায় কি? মায়ের পেটের ভাই।

মা বলিল—বউ রোজগার করছে, কখুনো একটা পয়সা দেয় আমাকে—শাশুড়ী বলে ছেদ্দা করে?

দুর্গা হাসিয়া বলিল—থাক মা, আর বলিস না; ওই পয়সা ছুঁতে হয়?

মা এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ওলো সীতের বেটি সাবিত্তিরি আমার! তারপর সে আরম্ভ করিল তিন কালের কথা, তাহার নিজের মা শাশুড়ীর আমলের শ্রুতিকথা, নিজেদের কালের স্মৃতি-কথা, বর্তমান যুগের প্রত্যক্ষ বধূ-কন্যার বিবরণ কাহিনী। অবশেষে বলিল—বউ হারামজাদী সাবিত্তির তখন ফণা কত? কত বলেছিলাম, তা নাক ঘুরিয়ে তখন বলত—ছি! এখন তো সেই 'ছি' তপ্তভাতে ঘি হইছে। সেই রোজগারে প্যাট চলছে, পরন চলছে!

পাড়ার ভিতর হইতে কে গালি দিতে দিতে আসিতেছিল। দুর্গা বলিল—থাম মা, থাম, আর কেলেঙ্কারি করিস না। নোক আসছে।

চীৎকার করিয়া গালি দিতেছিল রাঙাদিদি।

—হবে না, দুগ্‌গতি হবে না, আরও হবে। এর পর বিনি ঝড়ে উড়ে যাবে, বিনি আগুনে পুড়ে যাবে। ধানের ভেতর চাল থাকবে না, শুধু 'আগরা' হবে।

দুর্গা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি হ'ল রাঙাদিদি?

রাঙাদিদি সেই সুরের ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ধম্মকে সব পুড়িয়ে খেলে মা। পিরথিমিতে ধম্ম বলে আর রইল না কিছু।

চীৎকার করিয়া দুর্গা বলিল—কি হ'ল কি? কে কি করলে?

—ওই গাঁদা মিনসে গোবিন্দে! এতকাল দিয়ে এসে আজ বলছে—না।

—কি?

—কি? ক্যানে, তুই আবার বেলাত থেকে এলি নাকি? পাড়ার নোক জানে, গাঁয়ের

লোক জানে, তুই জানিস না? বলি তুই কে লা ছুঁড়ি? একে তো চোখে দেখতে পাই না, তার ওপর মুখপোড়া সুয্যির রোদের ছটা দেখ ক্যানে? চিনতে লারছি তুই কে?

—আমি—দুগ্‌গা গো!

—দুগ্‌গা? মরণ! আপন ঠেকারেই আছিস। পরের কথা মনে থাকে না—ক্যানে? গোবিন্দের বাবা আমার কাছে দু-টাকা ধার নিয়েছিল—জানিস না? বুড়ো ফি মাসে দু-আনা সুদ আমাকে দিয়ে আসতো। তা ছাড়া—যখন ডেকেছি, তখনি এসেছে। ঘরে গোঁজা দিয়েছে, বর্ষায় নালা ছাড়িয়ে দিয়েছে। সে ম'ল, তারপর গোবিন্দ দশ-বারো বছর মাসে মাসে সুদ দিয়েছে, ডাকলে এসেছে! আজ ডাকতে এলাম, তা বলে কিনা—মোল্লান, অনেক দিয়েছি, আর সুদও দোব না, আসলও দোব না, বেগারও দোব না।—আমি চললাম দেবুর কাছে! চার পো কলি, মা! এখন যদি সবাই এই বলে তো—আমার কি দুগ্‌গতি হবে!

এমন খাতক বৃদ্ধার অনেকগুলি আছে, অন্ততঃ দশ-বারো জন, দুই কুড়ির উপর টাকা পড়িয়া আছে। পুরুষানুক্রমে তাহারা সুদ গনিয়া যাইতেছে, বৃদ্ধা মরিলে আর আসল লাগিবে না। তবে এমন মহাজন গ্রামে আরও কয়েকজন আছে। সকলেই প্রায় স্ত্রীলোক এবং তাহাদের ওয়ারিশ আছে। আসলে ইহাদের ঋণ-আইনের ধারাই এমনি।

বৃদ্ধা যাইতে যাইতে আবার দাঁড়াইল—বলি দুগ্‌গা শোন!

—কি বল?

—এক জোড়া 'মাকুড়ি' আছে, লিবি? সোনার মাকুড়ি!

—মাকুড়ি? কার মাকুড়ী? কার জিনিস বটে?

—আয় আমার সঙ্গে। খুব ভাল জিনিস। জিনিস একজনার বটে, কিন্তু সে লেবে না। তা মাকুড়ি কি করব আমি? তু লিস তো দেখ!

—না দিদি, আজ হবে না। আজ এখন তালপাতা আনতে যাব।

—মরণ! তুই আবার তালপাতা নিয়ে কি করবি?

—আমার নয়, দাদার লেগে।

—ও-রে দাদা-সোহাগী আমার! দাদার লেগে ভেবে ভেবে তো মরে গেলি!

বুড়ী আপন মনেই বক বক করিতে করিতে পথ ধরিল। কিছু দূর গিয়া একটা গর্তের কাদায় পড়িয়া বৃদ্ধা মেঘকে গাল দিল, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স-আদায়কারীকে গাল দিল, কয়েকটা ছেলে কাদা লইয়া খেলিতেছিল—তাহাদের চতুর্দশ পিতৃপুরুষকে গাল দিল। তারপর জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানার সম্মুখে ওষুধের গন্ধে নাকে কাপড় দিয়া ওষুধকে গাল দিল, ডাক্তারকে গাল দিল, রোগকে গাল দিল, রোগীকে গাল দিল। টাকা মারা যাইবার আশঙ্কায় বৃদ্ধা আজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর বাড়ীর কাছে আসিয়া ডাকিল—দেবু পণ্ডিত!

কেহ সাড়া দিল না। বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধা বাড়ী ঢুকিল—বলি কানের মাথা খেয়েছিস

নাকি তোরা! অ দেবু?

বিলু বাহির হইয়া আসিল—কে, রাঙাদিদি!

—আমার মতন কানের মাথা খেয়েছিস; চোখের মাথা খেয়েছিস? শুনতে পাস না? দেখতে পাস না?

বিলু ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসিল; এ কথার কোন উত্তর দিল না। বুঝিল রাঙাদিদি বেজায় চটিয়াছে।

—সেই ছোঁড়া কই? দেবা?

—বাড়ীতে নেই, রাঙাদিদি।

—কি বল্‌লি—চেঁচিয়ে বল। গাড়ী কোথা গেল আবার?

—গাড়ীতে নয়। বাড়ীতে নেই। চণ্ডীমণ্ডপে গেল।

—চণ্ডীমণ্ডপে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা। সেখানে যাচ্ছি আমি। বিচার হয় কিনা দেখি। ভালই হ'ল, দেবুও আছে—ছিরুও আছে। কান ধরে নিয়ে আসুক হারামজাদাকে। এত বড় বাড় হয়েছে! ধম্ম নাই, বিচার নাই?

বুড়ী বকিতে বকিতে চলিল চণ্ডীমণ্ডপের দিকে।

চণ্ডীমণ্ডপে তখন জমজমাট মজলিস।

ভূপাল বাগ্দী লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। ষষ্ঠীতলায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে—পাতু, রাখহরি, পরী, বাঁকা, ছিদাম, ফড়িং আরও জনকয়েক। পাশে পড়িয়া আছে কয়েক আঁটি তালপাতার বোঝা। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ জমিদারের সম্পত্তি; সেখানকার তালগাছও জমিদারের। সেই গাছ হইতে পাতা কাটার অপরাধে ভূপাল সকলকে ধরিয়া আনিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীর মুখে গড়গড়া টানিতেছে। দেবু একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে পাতুদের দল। হরেন ঘোষাল নিজেই আসিয়াছে; সে প্রজা-সমিতির সেক্রেটারি। চীৎকার করিতেছে সে-ই।

—ওরা চিরকাল পাতা কেটে আসছে, বাপ-পিতামহের আমল থেকে। ওদের স্বত্ব জন্মিয়ে গেছে।

ঘোষালের কথায় শ্রীহরি জবাবই দিল না। পাতু—সে বহুদিন হইতেই শ্রীহরির সঙ্গে মনে মনে একটি বিরোধ পোষণ করিয়া আসিতেছে—সে একটু উষ্ণভাবেই বলিল—পাতা তো চিরকাল কেটে আসা যায়, মাশায়। এ তো আজ লতুন নয়!

—চিরকাল অন্যায় করে আসছিলি বলে, আজও অন্যায় করবি গায়ের জোরে? কাটিস, সেটা চুরি করে কাটিস!

দেবু এতক্ষণে বলিল—চুরি একে বলা চলে না শ্রীহরি! আগে জমিদার আপত্তি করত না, ওরা কাটত। এখন তুমি গোমস্তা হিসাবে আপত্তি করছ—বেশ আর কাটবে না। এর

পর যদি না বলে কাটে, তখন চুরি বলতে পারবে।

ঘোষাল বলিল—নো, নেভার! ও তুমি ভুল বলছ দেবু। গাছের পাতা কাটাবার স্বত্ব ওদের আছে। তিন পুরুষ ধরে কেটে আসছে। তিন বছর ঘাট সরলে, পারে কেউ সে ঘাট বন্ধ করতে—না পথ বন্ধ করতে?

হাসিয়া শ্রীহরি বলিল—গাছ ওটা, পুকুর নয় ঘোষাল, পথও নয়।

—ইয়েস, গাছ ইজ্ গাছ য়্যাণ্ড্ পথ ইজ্ পথ; বাট্ ম্যান্ ইজ্ ম্যান্ আফটার অল্।

—কাল যদি জমিদার গাছগুলি বেচে দেয় ঘোষাল, কি কেটে নেয়, তখন পাতার অধিকার থাকবে কোথা? বাজে বকো না, শুধু খাসখামারের গাছ নয়, মাল জমির ওপর গাছ পর্যন্ত জমিদারের; প্রজা ফল ভোগ করতে পারে, কিন্তু কাটতে পারে না।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার বুকের মধ্যে মুহূর্তে জাগিয়া উঠিল একটা বিস্মৃত ক্ষোভ। তাহাদের খিড়কির ঘাটে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল, কাঁঠাল অবশ্য পাকিত না, কিন্তু ইঁচড় হইত প্রচুর। তাহার আবছা মনে পড়ে। আসবাব তৈয়ারী করিবার জন্য জমিদার ঐ গাছটি কাটিয়াছিল। কিছু দাম নাকি দিয়াছিল, কিন্তু প্রথমে তাহার বাপ আপত্তি করায় ওই আইন-বলে জোর করিয়া কাটিয়াছিল। কতদিন তাহার বাবা আক্ষেপ করিত—আঃ, ইঁচড় হ'ল গাছ পাঁঠা! আর স্বাদ কি ইঁচড়ের!

দেবু বলিল—তা হলে তাই কর, শ্রীহরি, গাছগুলো সব কেটে নাও! প্রজারা ফল খাবে না।

শ্রীহরি হাসিল—তুমি মিছে রাগ করছ, দেবু খুড়ো। ওটা আমি, আইনের কথা, কথায় বললাম। জমিদার তা করবেন কেন? তবে প্রজা যদি রাজার সঙ্গে বিরোধ করে, তখন আইনমত চলতে রাজারই বা দোষ কি? বে-আইনী বা অন্যায় তো হবে না!

—কিন্তু এ গরীব প্রজারা কি বিরোধ করলে শুনি? হঠাৎ এদের এরকম ধরে আনার মানে?

—ওদের জিজ্ঞেস কর। ওই প্রজা-সমিতির সেক্রেটারি বাবুকে জিজ্ঞেস কর।

তারপর হরিজনদের দিকে চাহিয়া শ্রীহরি বলিল—কি রে? চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়াতে পয়সা নিবি না তোরা?

কথাটা এতক্ষণে স্পষ্ট হইল। সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সকলেই অন্তরে অন্তরে একটা জ্বালা অনুভব করিল। সর্বাপেক্ষা সেটা বেশী অনুভব করিল দেবু। তালপাতার মূল্য এবং চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়ানোর মজুরির অসঙ্গতি তাহার হেতু নয়; তাহার হেতু সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে শ্রীহরির ভঙ্গি।

রাঙাদিদি খানিকক্ষণ আগে এখানে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কানে ভাল শুনিতে পায় না, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা সে বুঝিল। তারপর বলিল—হ্যাঁ ড্যাক্‌রা, তোরা চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়াবি না! আস্পদ্দা দেখ, মাগো কোথা যাব!

হরেন ঘোষাল সুযোগ পাইয়া রাঙাদিদিকে ধমক দিল—যা বুঝ না তা নিয়ে কথা বলো না রাঙাদিদি। চণ্ডীমণ্ডপ এখন কার? চণ্ডীমণ্ডপ থাকল না থাকল তা ওদের কি? ওদের তো ওদের—গাঁয়ের লোকেরই বা কি অধিকার আছে? চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের। চণ্ডীমণ্ডপ নয়, এটা এখন জমিদারের কাছারি।

—তা রাজারও যা পেজারও তাই। রাজার হলেই পেজার।

দেবু হাসিয়া বেশ জোর গলাতেই বলিল—সে তো ওই তালপাতাতেই দেখছ, রাঙাদিদি!

—কে? দেবু?

—হ্যাঁ।

—তা বটে ভাই। তা হ্যাঁ ছিহরি, তালপাতা বই তো নয়—তা যদি ওরা রাজার না লেবে তো পাবে কোথা?

শ্রীহরি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ধমক দিল—যাও, যাও, তুমি বাড়ী যাও। এসব কথায় তোমায় কথা বলতে কেউ ডাকে নাই। বাড়ী যাও।

রাঙাদিদি আব সাহস করিল না। গ্রামের কাহাকেও সে ভয় করে না, কিন্তু শ্রীহরিকে সে সম্প্রতি ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধা ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ডাকিল,—দেবু, বাড়ী আয়। ছেলেটা কাঁদছে তোর।

মিথ্যা বলিয়া সে দেবুকে ডাকিল। যে মানুষ দেবু! আবার কোথায় শ্রীহরির সঙ্গে কি হাঙ্গামা করিয়া বসিবে। আর ছেলেটা যত হাঙ্গামা করিতেছে তত সে যেন তাহাকে দিন দিন বেশী করিয়া ভালবাসিতেছে।

দেবু কিন্তু রাঙাদিদির ডাক শুনিল না। সে শ্রীহরিকে বলিল—ভাল শ্রীহরি, তুমি এখন কি করতে চাও শুনি?

—মানে?

—মানে, এদের যদি চুরি করেছে বলে চালান দিতে চাও, দাও। আর যদি তালপাতার দাম নিতে চাও নাও। দশখানা তালপাতায় ডোমেরা একখানা তালপাতার চ্যাটাই দেয়। দাম তার দু-পয়সা। সেই এক আনা কুড়ি হিসাবে দাম দেবে ওরা!

—তা হলে ঝগড়াই করতে চাস তোরা? কি রে? শ্রীহরি প্রশ্ন করিল হরিজনদের।

—আজ্ঞে?

দেবু বলিল, গুনে ফেল, কার কত তালপাতা আছে, গুনে ফেল।

সকলে তালপাতা গুনিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে শ্রীহরি ভীষণ হইয়া উঠিল। হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জনে সে এক হাঁক মারিয়া উঠিল—রোস্! রাখ্ তালপাতা!

তাহার আকস্মিক দুর্দান্ত ক্রোধের এই সশব্দ প্রকাশের প্রচণ্ডতায় সকলে চমকিয়া উঠিল। হরিজনেরা তালপাতা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কেবল পাতু তালপাতা ছাড়িয়াও সেইখানেই

দাঁড়াইয়া রহিল। ভবেশ, হরিশ শ্রীহরির পাশেই বসিয়াছিল—তাহারা চমকিয়া উঠিল। হরেন ঘোষাল প্রায় আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল। সে কয়েক পা সরিয়া গিয়া বিস্ফারিত চোখে শ্রীহরির দিকে চাহিয়া রহিল। দেবু চমকিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাউড়ী ও বায়েনদের কাছে আগাইয়া আসিয়া সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—থাক্ তালপাতা পড়ে, উঠে আয় তোরা ওখান থেকে। আমি বলছি, ওঠ!

সকলে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল—তাহার শীর্ণ মুখখানির সে এক অদ্ভুত তেজোদ্দীপ্ত রূপ। সে দীপ্তির মধ্যে বোধ করি তাহারা অভয় খুঁজিয়া পাইল। তাহারা সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইল।

শ্রীহরি ডাকিল—ভূপাল! আটক কর্ বেটাদের।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিল, তারপর পাতুদের বলিল—যে যার এখান থেকে চলে যা। আমার গায়ে হাত না দিয়ে কেউ তোদের ছুঁতে পারবে না।

হরেন ঘোষাল দ্রুতপদে সকলের অগ্রগামী হইয়া পথ ধরিয়া বলিল—চলে আয়।

সকলের শেষে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল দেবু।

শ্রীহরির পিঙ্গল চোখ দুইটি ক্রূর শনিগ্রহের মত হিংস্র হইয়া উঠিল।

ঠিক ওই মুহূর্তেই রাস্তার উপর হইতে কে উচ্চকণ্ঠে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বলিয়া উঠিল—হরি হরি বল ভাই, হরি হরি বল! বলিয়াই হো হো করিয়া এক প্রচণ্ড উচ্চহাস্যে সব যেন ভাসাইয়া দিল।

সে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ হাততালি দিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া যেন নাচিতে লাগিল। শ্রীহরির এই অপমানে তাহার আনন্দের সীমা ছিল না।

শ্রীহরি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ভবেশ, হরিশ প্রভৃতি প্রবীণ মাতব্বর—যাহারা তাহার অনুগত তাহারাও এ ব্যাপারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ভবেশই প্রথম কথা বলিল—ঘোর কলি, বুঝলে হরিশখুড়ো!

শ্রীহরি এবার বলিল—আমাকে কিন্তু আর আপনারা দোষ দেবেন না।

হরিশ বলিল—দোষ আর কি করে দিই ভাই; স্বচক্ষে তো সব দেখলাম।

—ভূপাল! শ্রীহরি ভূপালকে ডাকিল।

—আজ্ঞে?

—তোমার দ্বারা কাজ চলবে না, বাবা।

—আজ্ঞে! ভূপাল মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

ভবেশ বলিল—এতগুলো লোকের কাছে ভূপাল কি করত, বাবা ছিহরি! ও বেচারার দোষ কি?

—আজ্ঞে তার ওপর আমি চৌকিদার, ফৌজদারি আমি কি করে করি? আপনি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। আপনিই বলুন হুজুর।

শ্রীহরি বলিল—তুই একবার কঙ্কণায় যা। বাঁড়ুয্যে বাবুদের বুড়ো চাপরাসী নাদের শেখের

কাছে যাবি। তাকে বলবি—তোমার ছেলে কালু শেখকে ঘোষমশায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও, ঘোষমহাশয় রাখবেন।

—কালু শেখ? সভয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল ভবেশ।

—হ্যাঁ, কালু শেখ!

নাদের শেখ এককালের বিখ্যাত লাঠিয়াল, কালু তাহার উপযুক্ত পুত্র। তরুণ জোয়ান, শক্তিশালী, দুর্দান্ত সাহসী। দাঙ্গা করিয়া সে একবার কিছুকাল জেল খাটিয়াছে, তারপর ডাকাতি অপরাধের সন্দেহে চালান গিয়াছিল, কিন্তু প্রমাণ অভাবে খালাস পাইয়াছে। কালু শেখ ভয়ঙ্কর জীব।

শ্রীহরি বলিল—অন্যায় আমি করব না, হরিশ-দাদা। কারু অনিষ্টও আমি করতে চাই না। কিন্তু আমার মাথায় যে পা দেবে, তাকে আমি শেষ করব—সে অন্যায়ই হোক আর অধর্মই হোক।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—এই ছোটলোকের দল—বর্ষায় আমি ধান দিই তবে খায়—আজ আমাকে অমান্য করে উঠে গেল! ওই দেবু ঘোষ, সেটেলমেণ্টের সময় আমি ওর জমি-জমা সমস্ত নির্ভুল করে লিখিয়েছি। দু-বেলা খোঁজ করেছি ওর ছেলের, পরিবারের। জান, হরিশ-দাদা—ফের যাতে ওর ইস্কুলের কাজটি হয়—তার জন্যেও চেষ্টা করেছিলাম। প্রেসিডেণ্টকেও বলেছি।

ভবেশ বলিল— কলিতে কারু ভাল করতে নাই বাবা!

—কাল হয়েছে ওই নজরবন্দী ছোঁড়া। ও-ই এই সব করছে। কামার-বউটাকে নিয়ে ঢলাঢলি করছে। আর ওই শালা কর্মকার—। কথা বলিতে বলিতে শ্রীহরি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। —নেমকহারামের গ্রাম! এক এক সময় মনে হয়—এ গাঁয়ের সর্বনাশ করে দিই!

হরিশ বলিল—তা বললে চলবে ক্যানে ভাই? ভগবান তোমাকে বড় করেছেন, ভাণ্ডার দিয়েছেন, তোমাকে করতে হবে বৈকি! একথা তোমাকে সাজে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীহরি সহজ স্বরেই বলিল—হরিশ-দাদা, ষষ্ঠীকাকাকে বলুন এইবার কাজ আরম্ভ করে দিক। ইট তো তোমার পড়ে রয়েছে। ইস্কুলের মেজে না হয় দশদিন পরে হবে, জল পড়ুক ভাল করে—নইলে ফেটে যাবে মেঝে। কিন্তু সাঁকোটা এখন না করালে কখন করবে? তার ওপর ওটা আমার কাজ নয়, আমি অবিশ্যি দশ টাকা দিয়েছি। কিন্তু সে ইউনিয়ন বোর্ডকে দিয়েছি সাঁকো করবার জন্যে। ইউনিয়ন বোর্ডকে আমি বলব কি?

হরিশের ছেলে ষষ্ঠী শ্রীহরির পৃষ্ঠপোষকতায় আজকাল ঠিকাদারির কাজ করিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে শিবকালীপুরের রাস্তায় একটা সাঁকো হইবে, শ্রীহরি নিজে ইস্কুলের মেঝে বাঁধাইয়া দিবে। এসবেরই ঠিকাদার ষষ্ঠীচরণ।

হরিশ বলিল—তোমার কাজেই সে এখন ব্যস্ত, ভাই। খাতাপত্র নিয়ে সকালে বসে, ওঠে সেই রাত্রে। তামাদির হিসেব, হিসেব তো কম নয়!

ষষ্ঠীচরণ শ্রীহরির গোমস্তাগিরির কাগজপত্র সারিয়া দেয়। চৈত্র মাসে বাকি-বকেয়ার হিসাব হইতেছে; যাহাদের চার বৎসরের বাকি, তাহাদের নামে নালিশ হইবে। শ্রীহরির নিজের ধানের টাকার হিসাব আছে, তাহার তামাদি তিন বৎসরে। সে-সবের হিসাবও হইতেছে।

ভূপাল চলিয়া গিয়াছিল; বরাত খাটিবার উপযুক্ত অন্য কেহ ছিল না। নিরুপায়ে ভবেশ নিজেই তামাক সাজিতে বসিয়াছিল। ষষ্ঠীতলার ধারে কাঠের ধুনি জ্বলে,—সেখানে বসিয়া কল্কেতে আগুন তুলিতে তুলিতে ভবেশ কাহাকে ডাকিল—কে রে? ও ছেলে-!

একটি ছেলে একগুচ্ছ লালফুল হাতে করিয়া যাইতেছিল, ডাকিতে সে দাঁড়াইল।

—কে রে? কি ফুল হাতে? অশোক নাকি?

ছেলেটি বৈরাগীদের নলিন, সে গিয়াছিল মহাগ্রামে পটুয়াদের বাড়ী। ঠাকুরদের বাগানে অশোক ফুল ফুটিয়াছিল, সেখান হইতে অশোক ফুলের একটি তোড়া বাঁধিয়া আনিয়াছে—নজরবন্দীকে দিবে। আরও কতকগুলি কলি সে আনিয়াছে, পণ্ডিতের বাড়ীতে—প্রতিবেশীদের বাড়িতে বিলাইবে। দুই দিন পরেই অশোকষষ্ঠী। অশোকের কলি চাই। নলিন অভ্যাসমত কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, অশোকের কলি।

—দিয়ে যা তো, বাবা! একটা ডাল দিয়ে যা তো!

নলিন অশোকের কয়েকটি ফুল নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীহরি বলিল—আমার পুকুরপাড়ের বাগানেও অশোকের চারা লাগিয়েছি।

সে একটা পুকুর কাটাইয়াছে। তাহার পাড়ে শখ করিয়া নানাজাতীয় গাছ লাগাইয়াছে। সবই প্রায় ভাল ভাল কলমের চারা।

বাইশ

অশোক ষষ্ঠীর দিন। এই ষষ্ঠী যাহারা করে, তাহাদের সংসারে নাকি কখনও শোক প্রবেশ করে না। "হারালে পায়, মলে জীয়োয়"। অর্থাৎ কোন কিছু হারাইয়াও হারায় না, হারাইলে ফিরিয়া পায়—মরিলেও মরে না, পুনরায় জীবিত হয়, অশোক ষষ্ঠীর কল্যাণে। মেয়েরা সকাল হইতে উপবাস করিয়া আছে। ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া ব্রতকথা শুনিবে, অশোক ফুলের আটটি কলি খাইবে। প্রসাদী দই-হলুদ মিশাইয়া—তাহারই ফোঁটা দিবে ছেলেদের কপালে। তারপর খাওয়া-নাওয়া; সে সামান্যই। অন্নগ্রহণ নিষেধ।

বারো মাসে তেরো ষষ্ঠী। মাসে মাসে স্বর্গ হইতে আসে ষষ্ঠীদেবীর নৌকা, বারো মাসে তেরো রূপে তিনি মর্ত্যলোকে আসেন—পৃথিবীর সন্তানদের কল্যাণের জন্য। সিঁথিতে ডগ্-মগ্ করে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, সর্বাঙ্গে হলুদের প্রসাধন, ডাগর চোখে কাজল। পরের সাত পুতকে কোলে রাখেন, নিজের সাত পুত থাকে পিঠে। বৈশাখ মাসে চন্দন-ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য-ষষ্ঠী, আষাঢ়ে বাঁশ-ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন বা লোটন-ষষ্ঠী, ভাদ্রে চর্পটা বা চাপড়-ষষ্ঠী,

আশ্বিনে দুর্গা-ষষ্ঠী, কার্তিকে কালী-ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে অখণ্ড-ষষ্ঠী—সংসারকে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যান। পৌষে মূলা-ষষ্ঠী, মাঘে শীতল-ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোবিন্দ-ষষ্ঠী, চৈত্রে অশোক তরু যখন ফুলভারে ভরিয়া উঠে, তখন শোক দুঃখ মুছিতে আসেন মা অশোক-ষষ্ঠী। তাঁরই কল্যাণ-স্পর্শে আনন্দে সুখে ওই ফুলভরা অশোক গাছের মতই সংসার হাসিয়া উঠে। অশোকের পর আছে নীল-ষষ্ঠী। গাজন-সংক্রান্তির পূর্বদিন। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও—ওই দিন হয় নীল-ষষ্ঠী!

পদ্ম সকালবেলা হইতে গৃহকর্ম সারিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত। কাজ সারিয়া স্নান করিবে, ষষ্ঠীর পূজা আছে ব্রতকথা শুনিতে যাইবে বিলুর বাড়ী। তারপর অশোকের কলি খাইতে হইবে। তাহার আবার মন্ত্র আছে। এহেন দিনে আবার অনিরুদ্ধ কাজের ঝঞ্ঝাট বাড়াইয়া দিয়াছে। কামারশালা মেরামতে লাগিয়াছে। হাপর, নেয়াই হাতুড়ি, সাঁড়াশী ইত্যাদি লইয়া টানাটানি শুরু করিয়াছে। কামারশালার বহুকালের পুরানো ঝুল-কালি-কয়লা সাফ করা একদণ্ডের কাজ নয়। ইহার উপর কয়লার সঙ্গে মিশিয়া আছে লোহার টুকরা—ছুতারের রেঁদায় চাঁচিয়াতোলা কাঠের অাঁশের মত পাতলা কোঁকড়ানো লোহাগুলি সাংঘাতিক জিনিস, বিঁধিলে বঁড়শির মত বিঁধিয়া যাইবে। ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া আবার গোবর-মাটি প্রলেপে নিকাইতে হইবে।

পদ্মের সঙ্গে তারিণীর সেই ছেলেটাও কাজ করিতেছিল। ছেলেটিকে যতীন খাইতে দেয়। দুই-একটা কাজ-কর্ম অবশ্য ছেলেটা করে, কিন্তু অহরহই পদ্মের কাছে থাকে। অনিরুদ্ধ দুই-একটা ধমক দিলেও ছেলেটা আর বিশেষ কিছু বলে না। বিপদ হয় ছোঁড়াটা বাহিরে গেলেই। বাহিরে গেলে আর সহজে ফেরে না। যতীন উহাকে দিয়া দেবুকে কোন খবর পাঠাইলে, দেবু আসে, কথাবার্তা কহিয়া চলিয়া যায়—কিন্তু ছেলেটার পাত্তা আর পাওয়া যায় না। অবশেষে একবেলা পার করিয়া খাইবার সময় ফেরে। কোন-কোনদিন হরিজান-পাড়া, কি কোন বনজঙ্গল খোঁজ করিয়া ধরিয়া আনিতে হয়। সে পদ্মই আনে।

অনিরুদ্ধ নূতন করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ করিতে চায়।

কাবুলী চৌধুরীর কাছে টাকা সে পাইয়াছে। আড়াইশো টাকার জন্য চৌধুরী গোটা জোতটাই বন্ধক না লইয়া ছাড়ে নাই। অনিরুদ্ধ তাহাই দিয়াছে। তাহার মন খানিকটা খুঁৎখুঁৎ করিয়াছিল,—কিন্তু টাকা পাইয়া সে সব আফসোস ছাড়িয়া, মহা উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বাকি খাজনার টাকাটা আদালতে দাখিল করিতে হইবে, আপোসে দিয়া বিশ্বাস নাই। আর আপোসেই বা সে দিবে কেন? পাচুন্দীর গরু-মহিষের হাট হইতে একজোড়া গরু কিনিবে। ইহার মধ্যে সে কৃষাণ বাহাল করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গার ভাই পাতুকেই তাহার পছন্দ। তাহাকে সে কামারশালে চাকরও রাখিয়াছে। পাতুকে সে ভালও বাসে। দুর্গার কাছে পাতু অনেক ওকালতি করিয়াছিল অনিরুদ্ধের জন্য।

সেদিন অনিরুদ্ধের সঙ্গে কামারশালায়ও পাতু কাজ করিতেছিল। মোটা মোটা

লোহার জিনিসগুলি তাহারা দু'জনে বহিয়া বাহির করিয়া আনিয়া রাখিতেছিল। ফাঁকে ফাঁকে চাষের সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছিল। হইতেছিল গরুর কথা। কেমন গরু কেনা হইবে—তাই লইয়া আলোচনা।

পাতুর মতে দুর্গার নিকট হইতে বলদ-বাছুরটা কেনা হউক এবং হাট হইতে দেখিয়া-শুনিয়া তাহার একটা জোড়া কিনিয়া আনিলে—বড চমৎকার হাল হইবে!

অনিরুদ্ধ হাসিয়া বলিল—দুর্গার বাছুরটা দাম যে বেজায়।

—পাইকেররা একশো টাকা পর্যন্ত বলেছে। দুর্গা ধরে রয়েছে,—আরও পঁচিশ টাকা। তা তোমাকে সস্তা করে দেবে। আমি সুদ্ধ যখন আছি।

হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—মোটে একশো টাকা আমাব পুঁজি। ও হবে না পাতু। ছোট-খাটো গিঁঠ-গিঁঠ বাছুর কিনিব। জমিও বেশী নয়—বেশ চলে যাবে।

—কিন্তু দধি-মুখো গরু কিনো বাপু। দধি-মুখো গরু ভারী ভাল—লক্ষণ-মান।

—চল না, হাটে তো দু'জনেই যাব।

পদ্ম বলিল তারিণীর ছেলেটাকে—হ্যাঁ রে, আবার লোহার টুকরো কুড়োতে লাগলি? এই বুঝি তোর কাজ করা হচ্ছে?

ছোঁড়াটা উত্তর দিল না।

পাতু বলিল—এ্যাই এ্যাই, ই তো আচ্ছা ছেলে রে বাপু! এই ছেলে!

ছেলেটা দাঁত বাহির করিয়া পাতুকে একটা ভেঙচি কাটিয়া দিল।

—ও বাবা, ই যে ভেঙচি কাটে লাগছে। বলিহারির ছেলে রে বাবা।

অনিরুদ্ধ বলিল—ধরে আন। কান ধরে নিয়ে আয় তো, পাতু।

পদ্ম হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল,—ধরো না, কামড়ে দেবে কামড়ে দেবে।

ছোঁড়াটার ওই এক বদ অভ্যাস। কেহ ধরিলেই সঙ্গে সঙ্গে কামড় বসাইয়া দেয়। আর দাঁতগুলিতেও যেন ক্ষুরের ধার। অতর্কিত কামড়ে আক্রমণকারীকে বিব্রত করিয়া মুহূর্তে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। ওই তাহার রণ-কৌশল। আজ কিন্তু পাতু ধরিবার আগেই ছোঁড়াটা উঠিয়া ভোঁ-দৌড় দিল।

পদ্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—উচ্চিংড়ে, উচ্চিংড়ে, ওরে অ উচ্চিংড়ে। যাস্ না কোথাও যেন, শুনছিস্?

ছেলেটার ডাকনাম 'উচ্চিংড়ে'; ভাল নাম মা-বাপে শখ করিয়া একটা রাখিয়াছিল। কিন্তু সে তার বাপ-মাই জানে, ছেলেটা নিজেও জানে না। উচ্চিংড়ে কিন্তু পদ্মের ডাক কানেই তুলিল না। তবে বাড়ীর দিকেই গেল—এই ভরসা। পদ্মও বাড়ীর দিকে চলিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—চল্‌লি কোথায়?

—দেখি, কোথায় গেল?

—যাক্ গে, মরুক গে। তোর কি? আপনার কাজ কর তুই!

—ষাট! আজ ষষ্ঠীর দিন। তোমার মুখের আগল নাই? বড় বড় চোখে প্রদীপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া পদ্ম অনিরুদ্ধকে নীরবে তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

দাঁতে দাঁত টিপিয়া অনিরুদ্ধও ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে পদ্মের দিকে চাহিয়া রহিল। পদ্ম কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না; বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। কথায় আছে—'না বিয়াইয়া কানুর মা', এ দেখিতেছি তাই! অনিরুদ্ধেরই মরণ।

যাক, উচ্চিংড়ে অন্য কোথাও পালায় নাই। যতীনের মজলিসে গিয়া বসিয়াছে। যতীনের কথার সাড়া হইতেই দূর হইতে পদ্ম উচ্চিংড়ের অস্তিত্ব অনুমান করিল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিতেছিল—মা-মণি কোথায় রে?

—হুই কামারশালায়!

এই যে তাহারই খোঁজ হইতেছে। পদ্ম হাসিল।—কেন? মা-মণির খোঁজ কেন? ওই এক চাঁদ-চাওয়া ছেলে! এখন কি হুকুম হইবে কে জানে? সে ভিতরের দরজার শেকল নাড়িয়া সঙ্কেত জানাইল—মা-মণি মরে নাই, বাঁচিয়া আছে। ওপাশে যতীনের ঘরের বাহিরের বারান্দায় ভরপুর মজলিস চলিতেছে। দেবু, জগন, হরেন, গিরিশ, গদাই অনেকে আসিয়া জমিয়াছে। শিকল নাড়ার শব্দ পাইয়া, হাসিয়া যতীন বারান্দা হইতে ঘরে আসিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজায় দাঁড়াইল। কালি-ঝুলি-মাখা আপনার সর্বাঙ্গ এবং কালো ছেঁড়া কাপড়খানার দিকে চাহিয়া পদ্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল—না না, ভেতরে এস না।

—আসব না?

—না, আমি ভূত সেজে দাঁড়িয়ে আছি।

হাসিয়া যতীন বলিল—ভূত সেজে!

—হ্যাঁ। এই দেখ। দরজার ফাঁক দিয়া সে আপনার কালি-মাখা হাত দুখানা বাড়াইয়া দেখাইল। এস না, জুজুবুড়ী! ভয় খাবে! সে একটি নূতন পুলকে অধীর হইয়া খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

যতীনও হাসিয়া বলিল—কিন্তু জুজু-মা, এখুনি যে চায়ের জল চাই! হাতটা কিন্তু ধুয়ে ফেলো!

পদ্ম এবার গজগজ করিতে আরম্ভ করিল।—চা দিনের মধ্যে লোকে কতবার খায়? তাহার যেমন কপাল! অনিরুদ্ধ মাতাল—যতীন চাতাল, ওই উচ্চিংড়েটা জুটিল তো সেটা হইল দাঁতাল।

যতীন ফিরিয়া গিয়া মজলিসে বসিল। চা তাহার মজলিসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। হরেন ইহারই মধ্যে বারদুয়েক তাগাদা দিয়েছে।

—চা কই মশাই? এ যে জমছে না!

মজলিসে আজ জগন বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বক্তৃতা দিতেছে। উপস্থিত আলোচনা চলিতেছে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন সম্ভাবনা সম্বন্ধে। বাংলা প্রদেশের আইন

সভায় প্রজাস্বত্ব আইন লইয়া জোর আলোচনা চলিতেছে। কথাটা উঠিয়াছে শ্রীহরি পালের সেদিনের সেই শাসন-বাক্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে। মাল জমি অর্থাৎ প্রজাস্বত্ববিশিষ্ট জমির উপর মূল্যবান বৃক্ষে প্রজার শুধু ফল ভোগের অধিকার ছাড়া আর কোন স্বত্ব নাই। গাছ জমিদারের।

জগন বলিতেছে—প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনে সে স্বত্ব হবে প্রজার। জমিদারের বিষ-দাঁত এইবার ভাঙিল। সেদিন কাগজে সব বেরিয়েছিল—কি রকম সংশোধন হবে! আমি কেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ও আইন পাস হবেই। ওঃ, স্বরাজ্য পার্টির কী সব বক্তৃতা! একেবারে আগুন ছুটিয়ে দিয়েছে!

গদাই জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম কি সব হবে, ডাক্তার?

হরেন খবরের কাগজের কেবল হেডলাইনগুলি পড়ে আর পড়ে আইন-আদালতের কথা। বিস্তৃত বিবরণ পড়িবার মত ধৈর্য তাহার নাই। তবুও সে বলিল—অনেক। সে অনেক ব্যাপার। এই এত বড় একখানা বই হবে। বলিয়া দুই হাত দিয়া বইয়ের আকারটা দেখাইল। তারপর বলিল, বোকার মত মুখে মুখেই জিজ্ঞাসা করছি, কি রকম হবে ডাক্তার!

জগনেরও সব মনে নাই—সব সে বুঝিতেও পারে নাই, তবুও সে কিছু কিছু বলিল।

প্রথমেই বলিল—গাছের উপর প্রজার স্বত্ব কায়েম হইবে।

হস্তান্তর আইনে জমিদারের উচ্ছেদ ক্ষমতা উঠিয়া যাইবে।

খারিজ-ফিস্ নির্দিষ্ট হইবে, এবং সে ফিস্ প্রজা রেজিস্ট্রী আপিসে দাখিল করিবে।

মাল জমির উপরেও পাকা ঘর করিতে পাইবে।

মোট কথা, জমি প্রজার।

গদাই বলিল—কোর্ফার নাকি স্বত্ব হবে? ঠিকে ভাগেরও নাকি—

জগন বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। কোর্ফার স্বত্ব সাব্যস্ত হলে মানুষের আর থাকবে কি? নাকে তেল দিয়ে ঘুমো গিয়ে। ভাগে ঠিকের জমি সব তোর হয়ে যাবে।

দেবু আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কয়েক দিন হইতেই তাহার মনে অশান্তির শেষ নাই। সে ভাবিতেছে, সেদিনের সেই পাতু প্রমুখ বাউড়ী-বায়েনগুলির কথা। তাহার কথা শুনিয়া তাহারা শ্রীহরিকে অমান্য করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। অচিরে শ্রীহরির শাসনদণ্ড কোন-না-কোন একটা দিক হইতে আকস্মিক ভাবে আঘাতে তাহাদের মাথার উপর আসিয়া পড়িবেই। তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে; এবং তাহাকেই বাঁচাইতে হইবে। বাঁচাইতে সে ন্যায়ধর্ম-অনুসারে বাধ্য। কিন্তু—সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বিলু, খোকা, সংসার, জমাজমি সম্বন্ধে তাহার চিন্তা করিবার অবসর নাই। মধ্যে মধ্যে এমনি ভাবে ক্ষণিক দুশ্চিন্তার মত সাময়িকভাবে তাহাদিগকে মনে পড়িয়া যায়।

জগন বক্তৃতা দিয়াই চলিয়াছিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা হলে আর দেখতে হ'ত না।

ওই নামটিতে আসরের সমস্ত লোকগুলির শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেশবন্ধুর

নাম, তাঁহার পরিচয় সকলেই জানে, তাঁহার ছবিও তাহারা দেখিয়াছে।

দেবুর চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল তাঁহার মূর্তি। দেশবন্ধুর শেষ শয্যার একখানা ছবি বাঁধাইয়া ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ছবির তলায় লিখিয়া দিয়াছেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ।।"

যতীন বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিল—উচ্চিংড়ে!

সে চায়ের খোঁজে বাড়ীর ভিতরে গিয়াছিল।

মজলিসের মধ্যে বসিয়া উচ্চিংড়ের খেয়াল-খুশীমত চাঞ্চল্য প্রকাশের সুবিধা হইতেছিল না। কিছুক্ষণ ধরিয়া পথের ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে একটা গিরগিটির শিকার দেখিতেছিল; দেখিতে দেখিতে যেই একটু সুস্থির-শান্ত হইয়াছে, অমনি সেইখানেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বেচারা!

হরেন তাহাকে ধমক দিয়া ডাকিল— এই ছোঁড়া, এই?

দেবু বলিল—ডেকো না। ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে।

বলিয়াই সে নিজেই ভিতরে উঠিয়া গিয়া যতীনকে বলিল—কি করতে হবে বলুন!

যতীন বলিল—চায়ের বাটিগুলো নিয়ে সকলকে দিয়ে দিন।

দেবুই সকলকে চা পরিবেশন করিয়া দিল। চা খাইতে খাইতে জগন আরম্ভ করিল—মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, জহরলাল নেহরু, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্রের কথা।

চা খাইয়া সকলে চলিয়া গেল। সকলের শেষে গেল দেবু। যাইবার জন্য উঠিয়াছিল সর্বাগ্রে সে-ই। কিন্তু যতীন বলিল—গোটাকয়েক কথা ছিল যে দেবুবাবু!

দেবু বসিল। সকলে চলিয়া গেলে যতীন বলিল—আর দেরি করবেন না দেবুবাবু। সমিতির কাজটা নিয়ে ফেলুন।

সমিতি—প্রজা-সমিতি। যতীন বলিতেছে, দেবুকে সমিতির ভার লইতে হইবে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

—আপনি না হলে হবে না, চলবে না। সকলেই আপনাকে চায়। হয়তো ডাক্তার মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হবে। তা হোক সে ক্ষুণ্ণ, কিন্তু একটা জিনিস গড়ে উঠেছে—সেটাকে ভাঙতে দেওয়া উচিত হবে না।

দেবু বলিল, আচ্ছা কাল বলব আপনাকে।

যতীন হাসিল, বলিল—বলবার কিছু নাই। ভার আপনাকে নিতেই হবে।

দেবু চলিয়া গেল; যতীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বাংলার পল্লীর দুর্দশার কথা সে ছাত্র-জীবনে অনেক পড়িয়াছে, অনেক শুনিয়াছে। অনেক সরকারী স্ট্যাটিস্টিক্স এবং নানা পত্র-পত্রিকায় এর বর্ণনাও পড়িয়াছে, কিন্তু এমন বাস্তবরূপে সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সবে এই তো চৈত্র মাস, কৃষিজাত শস্যসম্পদ এখনও সম্পূর্ণ শেষ

হইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসে নাই, ইহারই মধ্যে মানুষের ভাণ্ডার রিক্ত হইয়া গিয়াছে। ধান শ্রীহরির ঘরে গিয়াছে, জংশনের কলে গিয়াছে। গম, যব, কলাই, আলু—তাহাও লোকে বেচিয়াছে। তিল এখনও মাঠে; কিন্তু তাহার উপরেও পাইকার দাদন দিয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে একদিন শ্রীহরির খামারে একটি জনতা জমিয়াছিল, শ্রীহরি ধান-ঋণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই গ্রামের মাঠে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় সব জমিই নাকি মহাজনের কাছে আবদ্ধ। মহাজনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় মহাজন শ্রীহরি।

পল্লীর প্রতিটি ঘর জীর্ণ, শ্রীহীন; মানুষগুলি দুর্বল। চারিপাশে কেবল জঙ্গল, খানায়-খন্দে পল্লীপথ দুর্গম। সেদিনের বৃষ্টিতে সমস্ত পথটাই কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। স্নানের ও পানের জলের পুকুর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। প্রকাণ্ড বড় দীঘি, কিন্তু জল আছে সামান্য খানিকটা স্থানে, গভীরতা মাত্র হাত-খানেক কি হাত-দেড়েক। সেদিন একটা লোককে সে পলুই চাপিয়া ও-দীঘিতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছিল। পাঁকে-জলে ভাল করিয়া লোকটার কোমরও ডোবে নাই।

আশ্চর্য! ইহার মধ্যেই মানুষ বাঁচিয়া আছে!

বিশেষজ্ঞরা বলেন—এ বাঁচা প্রেতের বাঁচা। অথবা ক্ষয়রোগাক্রান্ত রোগীর দিন গণনা করিয়া বাঁচা। তিল তিল করিয়া ইহারা চলিয়াছে মৃত্যুর দিকে—একান্ত নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

এখানে প্রজা-সমিতি কি বাঁচিবে? সঞ্চয়-সম্বলহীন চাষী গৃহস্থের সম্মুখে চাষের সময় কঠিন গ্রীষ্ম, দুর্যোগ-ভরা বর্ষা। চোখের উপর শ্রীহরির খামারে রাশি রাশি ধান্য-সম্পদ। সেখানে প্রজা-সমিতি কি বাঁচিবে—না কাহাকেও বাঁচাইতে পারিবে? সমিতির প্রত্যক্ষ এবং প্রথম সংঘর্ষ হইবে যে শ্রীহরির সঙ্গে! হইবে কেন, আরম্ভ তো হইয়াই গিয়াছে।

সম্মুখের দাওয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে উচ্চিংড়ে।

ওই পল্লীর ভাবী পুরুষ। নিঃস্ব, রিক্ত, গৃহহীন, স্বজনহীন, আত্মসর্বস্ব। যে নীড়ের মমতায় মানুষ শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর তপস্যা করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে চায়—সে নীড় তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে!

অকস্মাৎ পদ্মের উচ্চ কণ্ঠ তাহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম তাহাকে শাসন করিতেছে। সেই শাসন-বাক্যের ঝঙ্কারে তাহার চিন্তার একাগ্রতা ভাঙিয়া গেল। ষষ্ঠী পুজোর থালা হাতে পদ্ম ঝঙ্কার দিতে দিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার স্নান হইয়া গিয়াছে; পরনে পুরানো একখানি শুদ্ধ কাপড়। সে বলিল—কি ছেলে বাবা তুমি! পঞ্চাশবার শেকল নেড়ে ডাকছি, তা শুনতে পাও না? যাক, ভাগ্যি আমার, সাঙ্গপাঙ্গের দল সব গিয়াছে! নাও—ফোঁটা নাও। উঠে দাঁড়াও।

যতীন হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শুচিস্মিতা পদ্ম কপালে তাহার দই-হলুদের ফোঁটা দিয়া বলিল—তোমার মা আজ দরজার বাজুতে তোমাকে ফোঁটা দেবে।

যতীনকে ফোঁটা দিয়া এবার সে ডাকিল—উচ্চিংড়ে! অ উচ্চিংড়ে! ওরে দেখ তো—

ছেলের ঘুম দেখ তো অসময়ে! এই উচ্চিঙ্গে—!

ইতিমধ্যেই উচ্চিংড়ের বেশ একদফা ঘুম হইয়াছিল, ক্ষুধার বেলাও হইয়াছিল, সুতরাং তিনবার ডাকিতেই সে উঠিয়া বসিল।

—ওঠ, উঠে দাঁড়া, ফোঁটা দি! ওঠ বাবা ওঠ!

উচ্চিংড়ে দাঁড়াইয়া প্রথমেই হাত পাতিল—পেসাদ! পেসাদ দাও!

পদ্ম হাসিয়া ফেলিল, দাঁড়া আগে ফোঁটা দি!

উচ্চিংড়ে খুব ভাল ছেলেটির মত কপাল পাতিয়া দাঁড়াইল, পদ্ম ফোঁটা পরাইয়া দিল।

যতীন বলিল—প্রণাম কর, উচ্চিংড়ে, প্রণাম করতে হয়। দাঁড়াও মা-মণি, আমিও একটা—।

—বাবা রে বাবা রে! আমাকে তুমি নরকে না পাঠিয়ে ছাড়বে না!

পদ্ম মুহূর্তে উচ্চিংড়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া একপ্রকার ছুটিয়াই ভিতরে চলিয়া গেল।

* * *

চৈত্রের দ্বিপ্রহর। অলস বিশ্রামে যতীন দাওয়ার তক্তপোশখানির উপর শুইয়াছিল। চারিদিক বেশ রৌদ্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তপ্ত বাতাস এলোমেলো গতিতে বেশ জোরেই বহিতেছে। বড় বড় বট, অশ্বত্থ, শিরীষ গাছগুলি কচি পাতায় ভরা; উত্তাপে কচি পাতাগুলি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সেদিনের বৃষ্টির পর মাঠে এখনও হাল চলিতেছে, চাষীরা এতক্ষণে হাল-গরু লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, ঘর্মসিক্ত কালো চামড়া রৌদ্রের আভায় চক্-চক্ করিতেছে তৈলাক্ত লোহার পাতের মত; বাউড়ী-বায়েনদের মেয়েরা গোবর, কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। সম্মুখেই রাস্তার ওপাশেই একটা শিরীষ গাছের সর্বাঙ্গ ভরিয়া কি একটা লতা—লতাটির সর্বাঙ্গ ভরিয়া ফুল। চারিধারে মৌমাছি ও ভ্রমরের গুন্‌গুনানিতে যেন এক মৃদুতম ঐকতান-সঙ্গীতের একটা সূক্ষ্ম জাল বিছাইয়া দিয়াছে। গোটাকয়েক বুলবুলি পাখী নাচিয়া নাচিয়া এ-ডাল ও-ডাল করিয়া ফিরিতেছে। দূরে কোথায় পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে দুইটা কোকিল। 'চোখ গেল' পাখীটার আজ সাড়া নাই। কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—কে জানে! আকাশে উড়িতেছে কয়েকটা ছোট ঝাঁকে—একদল বন-টিয়া; মাঠের তিল-ফসলে তাহাদের প্রত্যাশা। অসংখ্য বিচিত্র রঙিন প্রজাপতি ফড়িং, ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরিতেছে দেবলোকের বায়ুতাড়িত পুষ্পের মত।

গন্ধে, গানে, বর্ণচ্ছটায় পল্লীর এই এক অনিন্দ্য রূপ। কবির কাব্যের মতই এই গন্ধে গানে বর্ণচ্ছটার যেন একটা মাদকতা আছে, কেমন একটা হাতছানির ইশারা আছে।

হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সেই ইশারার ডাকেই যেন মোহগ্রস্তের মত যতীন বাহির হইয়া পড়িল। কাছেই কোন গাছের মধ্যে ডাকিতেছে একটা পাখী। অতি সুন্দর ডাক। শুধু স্বরই সুন্দর নয়, ডাকের মধ্যে সঙ্গীতের একটা সমগ্রতা আছে। পাখীটি যেন কোন গানের গোটা একটি কলি গাহিতেছে। ওই পাখীটার খোঁজেই যতীন সন্তর্পণে জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। খানিকটা ভিতরে গিয়া পাইল সে গাঢ় মদির গন্ধ। ধ্বনি এবং গন্ধের

উৎসমূল আবিষ্কার করিবার জন্য সে অগ্রসর হইয়া চলিল। আশ্চর্য! পাখীটা এবং ফুলগুলি তাহার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলিতেছে? শব্দ এবং গন্ধ অনুসরণ করিয়া যত সে আগাইয়া আসিতেছে তাহারাও যেন তত সরিয়া চলিতেছে। মনে হয় ঠিক ওই গাছটা। কিন্তু সেখানে আসিলেই পাখী চুপ করে—ফুল লুকাইয়া পড়ে। আবার আরও দূরে পাখী ডাকিয়া উঠে। গন্ধ মনে হয় ক্ষীণ; উৎসস্থান মনে হয় আরও দূরে। মোহগ্রস্তের মত যতীন আবার চলিল।

—বাবু!

কে ডাকিল? নারী-কণ্ঠ যেন!

যতীন পাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—একটা গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া রহিয়াছে দুর্গা। সে কি করিতেছে।

—দুর্গা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আঁট-সাঁট করিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া দুর্গা বসিয়া কি যেন কুড়াইতেছে।

—ওগুলো কি? কি কুড়োচ্ছ?

এক অঞ্জলি ভরিয়া দুর্গা বাড়াইয়া তাহার সামনে ধরিল। টোপা-টোপা স্ফটিকের মত সাদা এগুলি কি? এই তো সে মদির গন্ধ! ইহারই একছড়া মালা গাঁথিয়া দুর্গা গলায় পরিয়াছে। বিলাসিনী মেয়েটির দিকে যতীন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গঠন-ভঙ্গিতে, চোখ-মুখের লাবণ্যে, রুক্ষ চুলে মেয়েটার সর্বাঙ্গ-ভরা একটা অদ্ভুত রূপ—নূতন করিয়া আজ তাহার চোখে পড়িল।

দুর্গা মৃদু হাসিয়া বলিল—মউ-ফুল!

—মউ-ফুল?

—মহুয়া ফুল, বাবু; আমরা বলি মউ-ফুল।

যতীন ফুলগুলি তুলিয়া নাকের কাছে ধরিল। সে এক উগ্র মদির গন্ধ—মাথার ভিতরটা যেন কেমন হইয়া যায়; সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

—কুড়িয়ে রাখছি বাবু গরুতে খাবে,—দুধ বাড়বে। আবার দুর্গা হাসিল।

—আর কি করবে?

—আর সে—আপনাকে শুনতে হবে না!

—কেন, আপত্তি কি?

—আর আমরা মদ তৈরী করি।

—মদ?

—হ্যাঁ।—পিছন ফিরিয়া দুর্গা হাসিতে লাগিল; তারপর বলিল—কাঁচাও চাই, ভারী মিষ্টি।

যতীনও টপ করিয়া একটা মুখে ফেলিয়া দিল। সত্যই চমৎকার মিষ্টি, কিন্তু সে

মিষ্টতার মধ্যেও ওই মাদকতা। আবার একটা সে খাইল। আবার একটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার কানের ভিতরটা যেন গরম হইয়া উঠিল; নাকের ভিতর নিঃশ্বাস—উগ্র উত্তপ্ত! কিন্তু অপূর্ব এই মধু-রস।

দুর্গা সহসা চকিত হইয়া বলিল—পাড়ার ভেতরে গোল উঠেছে লাগছে!

—হঁ্যা, তাই তো!

সে তাড়াতাড়ি ঝুড়িটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া বলিল—আমি চললাম, বাবু। পাড়াতে কি হ'ল দেখি গিয়ে।

যাইতে যাইতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—মউ আর খাবেন না বাবু, মাদকে যাবেন।

—কি হবে?

—মাদকে! নেশা—নেশা! দুর্গা চলিয়া গেল।

নেশা! তাই তো, তাহার মাথার ভিতরটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। সর্বশরীরে একটা দাহ, দেহের উত্তাপও যেন বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

—বাবু! বাবু!

আবার কে ডাকিতেছে?—কে?

জঙ্গলের ভিতর আসিয়া ঢুকিল উচ্চিংড়ে।

—গাঁয়ে খুব গোল লেগে যেয়েছে বাবু। কালু খাঁখ বাউড়ী-মুচিদের গরু সব ধরে নিয়ে গ্যালো।

—গরু ধরে নিয়ে গেল! কালু শেখ কে? নিল কেন?

—কালু খাঁখ—ছিরু ঘোষের প্যায়দা! দেখ না এসে—তোমাকে সব ডাকছে!

যতীন দ্রুতপদে ফিরিল। উচ্চিংড়ে চড়িয়া বসিল মহুয়া গাছে। একেবারে মগডালে উঠিয়া পাকা ফুল পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

* * *

শ্রীহরি অপমানের কথা ভুলিয়া যায় নাই, অপমান ভুলিবার তাহার কথাও নয়। এ গ্রামের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য লোকত ধর্মত সে-ই দায়ী। প্রতিটি মুহূর্তে সে দায়িত্ব শ্রীহরি অনুভব করে, উপলব্ধি করে; বিপদে-বিপর্যয়ে সে তাহাদের রক্ষা করিবে, আর শৃঙ্খলা ভাঙিলে সে তাহাদের শাস্তি দিবে—বিদ্রোহকে কঠিন হস্তে দমন করিবে। এ তাহার অধিকার। এ তাহার দায়িত্ব। যখন সে অত্যাচারী ছিল, তখন তাহার অধিকার ছিল না—একথা সে স্বীকার করে। কিন্তু আজ সে কোন অন্যায় করে না। আজ সমস্ত গ্রামখানাতেই তাহার কর্তব্যপরায়ণতার, ধর্মপরায়ণতার পরিচয় শ্রীহরির মহিমার উজ্জ্বল হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ, ষষ্ঠীতলা, কুয়া, স্কুল-ঘর—সর্বত্র তাহার নাম ঝলমল করিতেছে। রাস্তার ঐ নালাটা আবহমানকাল হইতে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন; সে নিজে হইতেই সে বিঘ্ন দূর করিবার আয়োজন করিতেছে। শিবকালীপুরের সকল ব্যবস্থাকে সে-ই পরম যত্নে সুষ্ঠু করিয়া

তুলিয়াছে। সেই সুব্যবস্থাকে অব্যবস্থায় পরিণত করিতে যে বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ দমন করা কেবল তাহার অধিকার নয় কর্তব্য। তবে প্রথমেই সে কঠিন শাস্তি দিতে চায় না। চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়ানোর জন্য যাহারা মজুরি চায়, বলে—জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপ—তাহারা বিনা মজুরিতে খাটিবে কেন, তাহাদের সে বুঝাইয়া দিতে চায়—বিনা বিনিময়ে জমিদারের কতখানি তাহারা ভোগ করে। মাত্র ওই কয়খানা তালপাতাই লয় না। জমিদারের খাস-পতিত ভূমি তাহাদের গরু-বাছুরের একমাত্র চারণভূমি। জমিদারের খাস-পতিত পুকুরের ঘাটে তাহারা নামে, স্নান করে, জল খায়; জমিদারের খাস-পতিত জমির উপর দিয়াই তাহাদের যাতায়াতের পথ। চণ্ডী-মণ্ডপ সেই জমিদারের অধিকার বলিয়া বিনা পয়সায় ছাওয়াইবে না!

তাই সে নবনিযুক্ত কালু শেখ চাপরাসীকে হুকুম দিয়াছে—জমিদার-সরকারের বাঁধে কিংবা পতিত-জমিতে বাউড়ী-বায়েনদের গরু অনধিকার প্রবেশ করিলেই গরুগুলিকে আগল করিয়া কঙ্কণার ইউনিয়ন বোর্ডের খোঁয়াড়ে দিয়া আসিবে। নবনিযুক্ত কালু মনিবকে কাজ দেখাইতে উদগ্রীব, তাহার উপর এ কাজটা লাভের কাজ। খোঁয়াড়ওয়ালা এক্ষেত্রে গরু-পিছু কিছু কিছু প্রকাশ্য চলিত ঘুষ দিয়া থাকে। সে আভূমি-নত এক সেলাম ঠুকিয়া তৎক্ষণাৎ মনিবের হুকুম প্রতিপালন করিতে চলিল। ভূপাল তাহাকে দেখাইয়া দিল।—কোন্‌গুলি শ্রীহরির অনুগত লোকের গরু। সেগুলি বাদ দিয়া বাকি গরুগুলি সে ধরিয়া লইয়া গেল খোঁয়াড়ে।

শ্রীহরির গ্রাম-শাসনের এই দ্বিতীয় পর্যায়। ইহাতেও যদি লোকে না বুঝে, তবে আরও আছে। একেবারেই সে কঠিনতম দণ্ড দিবে না। অধর্ম সে করিবে না। লক্ষ্মী তাহাকে কৃপা করিয়াছেন, সে তাহার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল, সে উহার অপব্যবহার করিবে না। দানের তুল্য পুণ্য নাই—দয়ার তুল্য ধর্ম নাই—শাস্তিবিধানের সময়েও সেকথা সে বিস্মৃত হইবে না। তাহার ইচ্ছা ছিল, গরুগুলোকে আটক করিয়া তাহার বাড়ীতেই রাখিবে, বাউড়ী-বায়েনদের দল আসিয়া কান্নাকাটি করিলে তাহাদের অন্যায়টা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। তাহা হইলে গরীবদের আর খোঁয়াড়ের মাসুলটা লাগিত না। মাসুল বড় কম নয়, গরু-পিছু চারি আনা হিসাবে চল্লিশ-পঞ্চাশটা গরুতে দশ-বারো টাকা লাগিবে। আবার সামান্য বিলম্ব হইলেই খোঁয়াড় ভেণ্ডার এক আনা হিসাবে খোরাকি দাবী করিবে। অথচ খোরাকি এক কুটা খড়ও দেয় না—গরুগুলোকে অনাহারেই রাখে। খোরাকি হিসাবেও টাকা আড়াই-তিন লাগিবে। কিন্তু সে কি করিবে? আইন তাই। বেআইনী করিতে গেলেই—দেবু জগন হয়তো তাহাকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য মামলা বা দরখাস্ত করিয়া বসিবে।

চণ্ডীমণ্ডপে অর্ধশায়িত অবস্থায় গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সে অলস দৃষ্টিতে গ্রামহিতৈষীদের ব্যর্থ বিক্রম লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু এত শীঘ্র খবরটা আনিল কে?

খবরটা আনিয়াছিল তারাচরণ নাপিত। কালু শেখ গরুগুলোকে আটক করিলে, রাখাল ছেলেরা মিনতি করিয়া কাঁদিয়া কালু শেখের পায়ে গড়াইয়া পড়িল।—ওগো খাঁজী

গো! তোমার পায়ে পড়ি, মশাই ছেড়ে ত্যান আজকের মতন ছেড়ে ত্যান!

শেখের ক্রোধ হয় নাই, ক্রোধ হইবার হেতুও ছিল না, তবু ছোঁড়াগুলার ওই হাতে-পায়ে ধরা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কৃত্রিম ক্রোধে একটা ভয়ঙ্কর রকমের হাঁক মারিয়া উঠিল —ভাগো হিঁয়াসে!

ঠিক সেই সময়ই ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর দিয়া আসিতেছিল তারাচরণ ভাণ্ডারী। সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। ছেলেগুলা শেখজীর হাঁকে ভয় পাইয়া খানিকটা পিছাইয়া গেলেও গরুগুলির সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছিল না। জনদুয়েক রাখাল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল,—ভাষাহীন হাউ হাউ করিয়া কান্না।

কালু বলিল—ওরে উল্লুক, বেকুব, ছুঁচোরা সব, বাড়ীতে বুল্ গা যা। হাউমাউ করে চিল্লাস না।

ছেলেগুলা সে কথা বুঝিল না, তাহারা ওই গরুগুলির মমতার আকর্ষণেই গরুর পালের পিছনে পিছনে চলিল। কান্নার বিরাম নাই।—ওগো, কি করব গো? কি হবে গো?

শেখ আবার পিছনে তাড়া করিল—ভাগ্, বুল্ছি!

ছেলেগুলা খানিকটা পিছাইয়া আসিল; কিন্তু শেখ ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারাও আবার ফিরিল।

তারাচরণ ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। কাল সে শ্রীহরির পায়ের নখের কোণ তুলিতে তুলিতে ইহার খানিকটা আভাসও পাইয়াছিল। তারাচরণ দ্রুতপদে গ্রামে ফিরিয়া দেবুর খিড়কির দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাকে সন্তর্পণে ডাকিয়া সংবাদটা দিয়া চলিয়া গেল। বলিল—শীগ্গির ব্যবস্থা কর ভাই, নইলে এক আনা করে ফাজিল লেগে যাবে। সে-ও আড়াই টাকা, তিন টাকা। ছ'টা বাজলে আজ আর গরু দেবেই না। কাল দু-আনা করে বেশী লাগবে গরুতে।

খিড়কির দরজা দিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। শ্রীহরি ঘোষ যে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। পণ্ডিতের বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিলেই ঘোষ ঠিক তাহাকে সন্দেহ করিয়া বসিবে। জঙ্গলের আড়াল হইতে তারাচরণ এক ফাঁক দিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার অনুমান অভ্রান্ত। এক ঝিলিক সকৌতুক হাসি তারাচরণের মুখে খেলিয়া গেল।

* * *

দেবু কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ কয়েক দিন হইতেই যে আঘাত সে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিল সে আঘাতটা আজ আসিয়াছে। ইহার দায়িত্ব সমস্তটাই তো প্রায় তাহার। এ কথা সে কোনো দিন মুহূর্তের জন্য আপনার কাছে অস্বীকার করে নাই। আঘাতটা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আপন মাথা পাতিয়া দিয়া নির্দোষ গরীবদের রক্ষা করিবার জন্য অহরহ সচেতন হইয়াই সে প্রতীক্ষা করিতেছে।

গরীবেরা পয়সাই বা পাইবে কোথা? তারাচরণ বলিয়া গেল, এক আনা হিসাবে বেশী

লাগিয়ে আড়াই টাকা, তিনটাকা বেশী লাগিবে। তাহা হইলে গরু অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশটি। মনে মনে সে হিসাব করিয়া দেখিল—দশ টাকা হইতে পনের টাকা দণ্ড লাগিবে। এ দণ্ড উহারা কোথা হইতে দিবে? জমি নাই, জেরাত নাই,—সম্বলের মধ্যে ভাঙা বাড়ী আর ওই গরু-ছাগল। গাই-গরুর দুধ বিক্রি করে, গোবর হইতে ঘুঁটে বিক্রি করে, গরু-বাছুর-ছাগল বিক্রি করে, ওই পশুগুলিই তাহাদের একমাত্র সম্পদ। ইছু শেখ এ সময়ে টাকা দিতে পারে, কিন্তু তাহার এক টাকার মূল্য হিসাবে অন্তত সে দুই টাকা আদায় করিয়া লইবে। তা'ছাড়া উহাদের এই বিপদের জন্য দায়ী একমাত্র সে-ই। সে বেশ জানে, সেদিন ওই তালপাতা উপলক্ষ করিয়াই একটা মিটমাট হইয়া যাইত, উহারা শ্রীহরির বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া বাঁচিত। কিন্তু সে-ই তাহাদিগকে উঠিয়া আসিতে বলিয়াছিল। অন্যায়কে অস্বীকার করিতে সে-ই প্রেরণা দিয়াছিল। আজ নিজের বেলায় ন্যায়কে ধর্মকে মাথায় তুলিয়া না লইলে চলিবে কেন?

আরও কয়েক মুহূর্তে চিন্তা করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—বিলু!

তারাচরণ ডাকিতেই বিলুও আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। সংবাদটা দিয়া তারাচরণ চলিয়া গেলেও বিলু দেবুর সম্মুখে না আসিয়া নীরবে সেই আড়ালেই দাঁড়াইয়াছিল। সেও ওই গরীবদের কথাই ভাবিতেছিল; আহা, গরীব! উহাদের উপর নাকি এই অত্যাচার করে! এই স্তব্ধ দুপুরে বাউড়ী-বায়েন পাড়ায় মেয়েদের সকরুণ কান্না শোনা যাইতেছে। শুনিয়া বিলুরও কান্না পাইল, সে কাঁদিতেছিল। দেবুর ডাক শুনিয়া, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দেবু বিলুর সর্বাঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। কোথাও একটুকরা সোনা নাই। চাষীর ঘরে সোনার অলঙ্কারের বড় প্রচলন নাই। খুব জোর নাকে নাকছবি, কানে ফুল, গলায় বিছাহার, হাতে শাখাবাঁধা; বিলুর সে-সব গিয়াছে।

বিলু বলিল—কি বলছ?

—কিছুই নাই আর?

—কি?

—বাঁধা দিয়ে গোটা-পনেরো টাকা পাওয়া যায়—এমন কিছু?

বিলু কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বোধ করি তাহার সকল ভাণ্ডার মনে মনে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। তারপর সে ঘরের ভিতর গিয়া দুই গাছি ছোট বালা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

দেবু দুই-পা পিছাইয়া গেল—খোকার বালা?

—হ্যাঁ।

এই বালা দুইগাছি দিয়াছিল বিলুর বাপ। দেবুর অনুপস্থিতিতে শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বিলু এ দু'টিকে হস্তান্তর করিতে পারে নাই।

বিলু বলিল—নাও।

—খোকার বালা নেব ?

—হ্যাঁ নেবে। আবার যখন হবে তোমার, তুমি গড়িয়ে দেবে।

—যদি খালাস না হয়, আর গড়াতে না পারি !

—পরবে না খোকা।

দেবু আর দ্বিধা করিল না। বালা দুইগাছা লইয়া জামাটা গায়ে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

গরুগুলিকে খালাস করিয়া ফিরিল সে সন্ধ্যার সময়। অর্ধেক দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া জামাকাপড় ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার উপর একপাল গরুর পায়ের ধুলায় সর্বাঙ্গ কাদায় আচ্ছন্ন। যতীনের দুয়ারে তখন বেশ একটি মজলিস বসিয়া গিয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া সকলে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—কি হ'ল দেবু ?

—ছাড়ানো হয়েছে গরু।

দেবু তৃপ্তির হাসি হাসিল।

—কত লাগল ?

সে কথার উত্তর না দিয়া দেবু বলিল—যতীনবাবু !

—বলুন ?

—একটা কথা বলব আপনাকে।

—দাঁড়ান ; আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগে একটু চা করি আপনার জন্য।

—না। এখনি বাড়ী যাব আমি। কথাটা বলে যাই।

যতীন দেবুকে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

দেবু মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল—প্রজা সমিতির ভার আমিই নেব।

—দাঁড়ান, চা খেয়ে তবে যেতে পাবেন।

সে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকিল—মা-মণি ! মা-মণি !

কেহ সাড়া দিল না।

পদ্ম বাড়ীতে নাই, সে গিয়াছে উচিংড়ের সন্ধানে। উচ্চিংড়ে এখনও ফিরে নাই, তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

যতীন নিজেই চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

তেইশ

হরেন ঘোষালের উত্তেজনা—সে এক ভীষণ ব্যাপার ! সে গোটা গ্রামটার পথে পথে ঘোষণা করিয়া দিল—প্রজা সমিতির মিটিং ! প্রজা সমিতির মিটিং ! স্থানটার উল্লেখ করিতে সে ভুলিয়াই গেল। ঠিক ছিল মিটিং হইবে ওই বাউড়ীপাড়ার ধর্মরাজতলায়। কিন্তু

—খোকার বালা নেব?

—হ্যাঁ নেবে। আবার যখন হবে তোমার, তুমি গড়িয়ে দেবে।

—যদি খালাস না হয়, আর গড়াতে না পারি!

—পরবে না খোকা।

দেবু আর দ্বিধা করিল না। বালা দুইগাছা লইয়া জামাটা গায়ে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

গরুগুলিকে খালাস করিয়া ফিরিল সে সন্ধ্যার সময়। অর্ধেক দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া জামাকাপড় ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার উপর একপাল গরুর পায়ের ধুলায় সর্বাঙ্গ কাদায় আচ্ছন্ন। যতীনের দুয়ারে তখন বেশ একটি মজলিস বসিয়া গিয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া সকলে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—কি হ'ল দেবু?

—ছাড়ানো হয়েছে গরু।

দেবু তৃপ্তির হাসি হাসিল।

—কত লাগল?

সে কথার উত্তর না দিয়া দেবু বলিল—যতীনবাবু!

—বলুন?

—একটা কথা বলব আপনাকে।

—দাঁড়ান; আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগে একটু চা করি আপনার জন্য।

—না। এখনি বাড়ী যাব আমি। কথাটা বলে যাই।

যতীন দেবুকে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

দেবু মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল—প্রজা সমিতির ভার আমিই নেব।

—দাঁড়ান, চা খেয়ে তবে যেতে পাবেন।

সে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকিল—মা-মণি! মা-মণি!

কেহ সাড়া দিল না।

পদ্ম বাড়ীতে নাই, সে গিয়াছে উচিংড়ের সন্ধানে। উচ্চিংড়ে এখনও ফিরে নাই, তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

যতীন নিজেই চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

তেইশ

হরেন ঘোষালের উত্তেজনা—সে এক ভীষণ ব্যাপার! সে গোটা গ্রামটার পথে পথে ঘোষণা করিয়া দিল—প্রজা সমিতির মিটিং! প্রজা সমিতির মিটিং! স্থানটার উল্লেখ করিতে সে ভুলিয়াই গেল। ঠিক ছিল মিটিং হইবে ওই বাউড়ীপাড়ার ধর্মরাজতলায়। কিন্তু

ঘোষাল সেকথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাওয়ায় লোকজন আসিয়া জমিল—নজরবন্দীবাবুর বাসার সম্মুখে। কারণ প্রজা সমিতির সকল উৎসই যে ওখানেই।

হরেন বলিল—তবে এইখানেই হোক। আবার এখান থেকে ওখানে! তা ছাড়া এখানে চা করা যাবে দরকার হলে। চেয়ার-টেবিল রয়েছে এখানে। এখানেই হোক।

সঙ্গে সঙ্গে সে যতীনের টেবিল-চেয়ার টানিয়া বাহিরে আনিয়া রীতিমত সভার আসর সাজাইয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে দুই গাছা মালাও সে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। ওটাতে তাহার ভুল হয় না।

লোকজন অনেক জমিয়াছে। বাউড়ী-বায়েনরা প্রায় সকলেই আসিয়াছে। গ্রামের চাষীরাও আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া আজিকার গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার জন্য সকলেই বেশ একটু উত্তেজিতও হইয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ জমিদারের খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ওই বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে তো প্রজারাই। সেখানে চিরকাল লোক গরু চরাইয়া থাকে। গ্রামের পতিত জমিও আবহমানকাল গোচারণ-ভূমি হিসাবে লোক ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। সেখানে গোচারণ করিবার অধিকার নাই—এই কথায় সকলকেই উত্তেজিত করিয়াছে। আজ ওই অন্যায় আইন বাউড়ী-বায়েনদের পক্ষে প্রযুক্ত হইল—কাল যে সকলের পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য হইবে না তাহা কে বলিল? বাউড়ীরা অবশ্য এত বুঝে নাই। তাহারা শুনিয়াছে—পণ্ডিত মশায় কমিটির কর্তা হইবেন। তাই শুনিয়াই তাহারা সকৃতজ্ঞ চিত্তে আসিয়াছে। নির্ভয়ে আসিয়াছে।

তাহাদের পাড়ায় আজ ঘরে ঘরে পণ্ডিতের কথা। দুর্গার মা পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিতেছে। মাথার চুলের মত পেরমাই হবে, সোনার দোতকলম হবে, বেটার কোলে বেটা হবে, লক্ষ্মী উথলে উঠবে। সোনার মানুষ, পণ্ডিত-জামাই আমার সোনার মানুষ!—

সন্ধ্যার সময় আপনার ঘরে বালিশে বুক রাখিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিয়া দুর্গাও ওই কথা ভাবিতেছিল—সোনার মানুষ, পণ্ডিত সোনার মানুষ, বিলু-দিদি তাহার ভাগ্যবতী! আজ ওই সুকুমার নজরবন্দী বাবুটিও পণ্ডিতের তুলনায় হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা—একবার মজলিসে যায়, দশের মধ্যে পণ্ডিত উঁচু করিয়া বসিয়া আছে, সেই দৃশ্যটি আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একবার দেখিয়া আসে। আবার ভাবিল—না, মজলিস ভাঙুক, সে বিলু-দিদির বাড়ী যাইবে, গিয়া পণ্ডিত-জামাইয়ের সঙ্গে দুইটা রসিকতা করিয়া উত্তরে কয়েকটা ধমক খাইয়া আসিবে। সে ভাবিতেছিল—কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে!

আবার ওদিকে নজরবন্দীকে বলিবার মত অনেক কথা তাহার মনে ঘুরিতেছে।

—মউ ফুলের মধু কেমন লাগল বাবু?

আপন মনে দুর্গা হাসিল। বাবুর চোখের কোণে লালচে আমেজ সে স্পষ্ট দেখিয়াছে।—কিন্তু পণ্ডিতকে সে কি বলিবে?

দুর্গার কোঠার সম্মুখে অমরকুণ্ডার মাঠ, তারপর নদীর বাঁধ। বাঁধের উপর দিয়া একটা আলো আসিতেছে। আলোটা মাঠে নামিল।

পণ্ডিত বড় গম্ভীর লোক। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর সহসা সে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কথা সে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

—জামাই-পণ্ডিত, তুমি ভাই আবার পাঠশালা খোল।

—কে পড়বে?

—কেউ না পড়ে আমি পড়ব। নেকাপড়া শিখব আমি—

ওঃ, আলোটা তাহাদের গ্রামেই আসিতেছে। হাতে ঝুলানো লণ্ঠনের আলোয় চলন্ত মানুষের গতিশীল পা-দুখানা বেশ দেখা যাইতেছে। কে? কাহারা? একজন লণ্ঠন-হাতে আসিতেছে, পিছনে একজন—একজন নয়, দুইজন; বায়েনপাড়ার প্রান্ত দিয়াই ঢুকিবার সোজা পথ। সেই পথে আগন্তুকেরা কাছে আসিয়া পড়িল।

দুর্গা চমকিয়া উঠিল। এ কি! এ যে আলো হাতে ভূপাল থানাদার, তাহার পিছনে ও যে জমাদারবাবু! জমাদারের পিছনে সেই হিন্দুস্থানী সিপাহীটা! ছিরু পালের বাড়ীতে চলিয়াছে নিশ্চয়।

ছিরু পালের নিমন্ত্রণে রাত্রে জমাদারের আগমন এমন কিছু নূতন কথা নয়। পূর্বে এমন আসরে দুর্গারও নিয়মিত নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু পালের নিমন্ত্রণে জমাদারের সঙ্গে তো সিপাহী থাকার কথা নয়! জমাদারবাবুর আজ এমন পোশাকই বা কেন? সে যে একেবারে খাঁটি জমাদারের পোশাক আঁটিয়া আসরে আসিতেছে! সিপাহীর মাথায় পাগড়ী, তা ছাড়া শ্রীহরির নিমন্ত্রণের আসর তো প্রথম রাত্রে বসে না! সে আসর বসে মধ্যরাত্রে বারোটা নাগাত।

দুর্গা হঠাৎ একটু চকিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল নজরবন্দীকে, জামাই-পণ্ডিতকে। কেন—সে তাহা জানে না! কিন্তু তাহাদের দু-জনকেই মনে হইল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। শুক্ল-ষষ্ঠীর চাঁদ তখন অস্ত গিয়াছে। অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া পথের পাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়া সে তাহাদের অনুসরণ করিল।

চণ্ডীমণ্ডপ আজ অন্ধকার। ছিরু পাল আজ চণ্ডীমণ্ডপে বসে নাই। পালের—পাল নয়, আজকাল ঘোষ মশায়! ঘোষ মশায়ের খামার-বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ভুপালের আলো গিয়া ওইখানেই প্রবেশ করিল। নিমন্ত্রণই বটে। চণ্ডীমণ্ডপ দেবস্থল, সেখানে এ আসর চলে না। কিন্তু শ্রীহরি আজকাল নাকি—। কথাটা মনে পড়িতেই দুর্গা না হাসিয়া পারিল না।

এক-একটা গরু রাত্রে দড়ি ছিঁড়িয়া মাঠে যাইয়া ফসল খাইয়া ফিরে। যে গরু এ আস্বাদ একবার পাইয়াছে সে আর ভুলিতে পারে না। শিকল দিয়া বাঁধিলেও সে খুঁটা উপড়াইয়া রাত্রে মাঠে যায়। ছিরু পাল নাকি সাধু হইয়াছে। তাই সে হাসিল। কিন্তু নূতন নারীটি

কে? একজন কেহ আছেই। কিন্তু সে কে? দুর্গা কৌতুক সম্বরণ করিতে পারিল না, শ্রীহরির বাড়ীর গোপনতম পথের সন্ধান পর্যন্ত তাহার সুবিদিত, কত রাত্রে সে আসিয়াছে। চুড়িগুলি হাতের উপরে তুলিয়া নিঃশব্দে আসিয়া সে শ্রীহরির ঘরের পিছনে দাঁড়াইল। ঘরের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।

সে কান পাতিল।

জমাদার বলিতেছিল—নির্ঘাত দু-বছর ঠুকে দোব।

শ্রীহরি বলিল—চলুন তা হলে—জোর কমিটি বসেছে। জগন ডাক্তার, শালা হরেন ঘোষাল, গিরশে ছুতোর—অনে কামার তো আছেই। দেবু আর নজরবন্দীকে সব ঘিরে বসেছে। উঠুন তা হলে।

জমাদার বলিল—চা-টা নিয়ে এস জলদি! চা খাওয়া হয় নি আমার।

শ্রীহরি খবর পাঠাইয়া ছিল। নজরবন্দীর বাড়ীতে প্রজা সমিতির কমিটি বসিয়াছে। জমাদার সাহেবের কাছে সেলাম পাঠানো হইয়াছিল, সেলামীর ইঙ্গিতও ছিল। জমাদারের নিজেরও একটা প্রত্যাশা আছে। ডেটিনিউটিকে হাতে-নাতে ধরিয়া ষড়যন্ত্র বা আইনভঙ্গ—যে কোন মামলায় ফেলিতে পারিলে চাকরিতে পদোন্নতি বা পুরস্কার—নিদেনপক্ষে বিভাগীয় একটা সদয়-মন্তব্য লাভ অনিবার্য। সেলামীটা ফাউ। সেলামীটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

দুর্গা শিহরিয়া উঠিল। নিঃশব্দে দ্রুতপদে সে ঘরের পিছন হইতে চলিয়া আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লইল। তাহার পর বেশ করিয়া চুড়ি বাজাইয়া ঝঙ্কার তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক পরমুহূর্তে প্রশ্ন ভাসিয়া আসিল—কে? কে যায়?

—আমি।

—কে আমি?

—আমি বায়েনদের দুর্গা দাসী।

—দুর্গা! আরে আরে—শোন্ শোন্।

—না।

ভূপাল আসিয়া এবার বলিল—জমাদারবাবু ডাকছে!

একমুখ হাসি লইয়া দুর্গা ভিতরে আসিয়া বলিল—আ মরণ আমার! তাই বলি চেনা চেনা গলা মনে হচ্ছে—তবু চিনতে লারছি। জমাদারবাবু! কি ভাগ্যি আমার? কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আমি?

জমাদার হাসিয়া বলিল—ব্যাপার কি বল্ দেখি? আজকাল নাকি পিরীতে পড়েছিস? প্রথম অনে কামার, তারপর শুনছি নজরবন্দীবাবু!

দুর্গা হাসিয়া বলিল—বলছে তো আপনার মিতে, পাল মশাই!

পরক্ষণেই সে বলিল—আজকাল আবার গোমস্তা মশাই বলতে হবে বুঝি? ও গোমস্তা মশাই মিছে বলেছে, মনের রাগে বলেছে।

বাবা দিয়া জমাদার বলিল—মনের রাগে? তা রাগ তো হতেই পারে! পুরানো বন্ধু-লোককে ছাড়লি কেন তুই?

দুর্গা বলিল—মুচিপাড়াকে-পাড়া আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলে আপনার মিতে! ঘরে টিন দেবার জন্য টাকা চাইলাম, তা আমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিলে আপনার বন্ধুলোক। সত্যি-মিথ্যে শুধোন আপনি! বলুক ও ঘরে আগুন দিয়েছে কিনা?

শ্রীহরির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। জমাদার তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দুর্গা কি বলছে, পাল মশাই! জমাদারের কণ্ঠস্বর মুহূর্তে পাল্টাইয়া গিয়াছে।

দুর্গা লক্ষ্য করিয়া বুঝিল—একটা বুঝাপড়ার সময় আসিয়াছে। সে বলিল—ঘাট থেকে আসি জমাদারবাবু!

জমাদার দুর্গার কথার কোন জবাব দিল না। সে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল শ্রীহরির দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ দুর্গা খুব ভাল করিয়া জানে। জরিমানা আদায়ের পূর্বরাগ। এ পর্বটা শেষ হইতে বেশ কিছুক্ষণ লাগিবে। ঘাটে যাইবার জন্য বাহির হইয়া, তখনি ফিরিয়া দুর্গা লীলায়িত ভঙ্গিতে দেহে হিল্লোল তুলিয়া বলিল—আজ কিন্তু মাল খাওয়াতে হবে দারোগাবাবু! পাকি মাল!—বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল ঘাটের দিকে।

শ্রীহরির খিড়কীর পুকুরের পাড় ঘন-জঙ্গলে ভরা। বাঁশের ঝাড়, তেঁতুল, শিরীষ প্রভৃতি গাছ এমন ভাবে জন্মিয়াছে যে, দিনেও কখনো রৌদ্র প্রবেশ করে না। নিচেটায় জন্মিয়াছে ঘন কাঁটা-বন। চারিদিকে উই-ঢিবি। ওই উইগুলির ভিতর নাকি বড় বড় সাপ বাসা বাঁধিয়াছে। শ্রীহরির খিড়কীর পুকুর সাপের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ চন্দ্রবোড়া সাপের জন্য। সন্ধ্যার পর হইতেই চন্দ্রবোড়ার শিশ্ শোনা যায়। পুকুরঘাটে আসিয়া দুর্গা জলে নামিল না, সে প্রবেশ করিল ওই জঙ্গলে। নিশাচরীর মত নিঃশব্দে নির্ভর পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে সে জঙ্গলটা অতিক্রম করিয়া আসিল নামিল এপাশের পথে। এখান হইতে অনিরুদ্ধের বাড়ী কাছেই। ওই মজলিসের আলো দেখা যাইতেছে। ছুটিয়া আসিয়া দুর্গা চকিতে ছায়াছবির মত অনিরুদ্ধের খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

প্রজা সমিতির সভাপতি পরিবর্তনের কাজ তখন শেষ হইয়াছে। অনিরুদ্ধ চা পরিবেশন করিতেছিল, জগন ডাক্তার ভাবিতেছিল—বিদায়ী সভাপতি হিসাবে সে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিবে। দেবু ভাবিতেছিল—নূতন কর্মভারের কথা। সহসা একটি মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে চকিতে অনিরুদ্ধের খিড়কীর দরজার দিকে চলিয়া যাইতে সকলে চমকিয়া উঠিল। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা, দ্রুত পদধ্বনির সঙ্গে আভরণের ঠুনঠান শব্দ।—কে? কে?—কে গেল?

অনিরুদ্ধ দ্রুত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পদ্ম! এমন করিয়া সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল? কোথায় গিয়াছিল সে?

—কর্মকার!

—কে ?

—দুর্গা !

দুর্গার কণ্ঠস্বর। ক্রোধে বিরক্তিতে অধীর হইয়া অনিরুদ্ধ দুর্গার সম্মুখীন হইল—কি ?

দুর্গা সংক্ষেপে শ্রীহরির বাড়ীতে জমাদারের আগমন সংবাদটা দিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতপদে আভরণের মৃদু সাড়া তুলিয়া বিলীয়মান রহস্যের মত চকিতে মিলাইয়া গেল। ছুটিয়া সে আবার সেই পুকুরপাড়ের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘাটে হাত-পা ধুইয়া যখন শ্রীহরির ঘরে প্রবেশ করিল—তখন বোধ হয় ঘরে-আগুন-দেওয়ার মামলা মিটিয়া গিয়াছে। জমাদারের চোখে প্রসন্ন দৃষ্টি। জমাদার দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল —হাঁপাচ্ছিস কেন ?

আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করিয়া দুর্গা বলিল—সাপ !

—সাপ ! কোথায় ?

—খিড়কির ঘাটে। এই প্রকাণ্ড বড়। চন্দ্রবোড়া। এই দেখুন জমাদারবাবু ! বলিয়া সে ডান পাখানি আলোর সম্মুখে ধরিল। একটা ক্ষতস্থান হইতে কাঁচা রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

জমাদার এবং শ্রীহরি উভয়েই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। কি সর্বনাশ ! জমাদার বলিল—বাঁধ—বাঁধ। দড়ি, দড়ি ! পাল, দড়ি নিয়ে এস !

শ্রীহরি দড়ির জন্য ভিতরে যাইতে যাইতে বিরক্তিভরে বলিল—কি বিপদ ! কোথা থেকে বাধা এসে জুটল দেখ দেখি ? দড়ি আনিয়া ভূপালের হাতে দিয়া শ্রীহরি বলিল—বাঁধ ! জমাদার-বাবু, আসুন চট করে ওদিকের কাজটা সেরে আসি।

দুর্গা বিবর্ণমুখে করুণদৃষ্টিতে জমাদারের দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে জমাদারবাবু ! চোখ তাহার জলে ছল ছল করিয়া উঠিল।

জমাদার আশ্বাস দিয়া বলিল—কোন ভয় নাই। ভূপালের হাত হইতে দড়ি লইয়া সে নিজেই বাঁধিতে বসিল ; ভূপালকে বলিল—একদৌড়ে থানায় গিয়ে লেস্কিন নিয়ে আয়। আর ওঝা কে আছে ডাক্—এক্ষুনি।

দুর্গা বলিল—আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও, জমাদারবাবু। ওগো আমি মায়ের কোলে মরবো গো।

শ্রীহরি বলিল—সেই ভাল। ভূপাল ওকে বাড়ীতে দিয়ে আসুক। দীনু ওঝা আর মিতে গড়াঞীকে ডাক। ছুটে যাবি আর আসবি। চলুন জমাদারবাবু।

অনিরুদ্ধের দাওয়ায় তক্তপোশের উপর যতীন একা বসিয়াছিল।

জমাদারকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিল—ছোট দারোগাবাবু ! এত রাত্রে ?

জমাদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—গিয়েছিলাম অন্য গ্রামে। পথে ভাবলাম আপনার মজলিসটা দেখে যাই। কিন্তু কেউ কোথাও নেই যে!

যতীন হাসিয়া বলিল—আপনি এসেছেন—ঘোষ মশায় এসেছেন, আবার বসুক মজলিস! ওরে উচ্চিংড়ে, চায়ের জল চড়িয়ে দে তো!

* * *

ভূপাল দুর্গাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া ঔষধ ও ওঝার জন্য চলিয়া গেল। দুর্গার মা হাউ-মাউ আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার চিৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া জুটিয়া গেল। পাতুর বৌ সকরুণ মমতায় বার বার প্রশ্ন করিল—কি সাপ ঠাকুরঝি? সাপ দেখেছ?

দুর্গা অত্যন্ত কাতর-স্বরে বলিল—ওগো তোমরা ভিড় ছাড় গো। সে ছট্‌ফট করিতে আরম্ভ করিল। এ-পাড়ার মাতব্বর সতীশ, সে সত্যই মাতব্বর লোক। সে অনেক ঔষধ-পাতির খবর রাখে। সাপের ঔষধও সে দুই-চারিটা জানে। সতীশ একরূপ ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল—ঔষধের সন্ধানে। কিছুকাল পর ফিরিয়া আসিয়া একটা শিকড় দিয়া বলিল—চিবিয়ে দেখ দেখি—তেতো লাগছে না মিষ্টি লাগছে?

দুর্গা সেটাকে মুখে দিয়া পরক্ষণেই ফেলিয়া দিল—থু-থু-থু।

সতীশ আশ্বস্ত হইয়া বলিল—তেতো যখন লেগেছে তখন ভয় নাই!

দুর্গা ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া বলিল—মিষ্টিতে গা বমি-বমি করছে গো! বাবা গো—ওই কে আসছে—ওঝা নাকি গো!

ওঝা নয়। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, অনিরুদ্ধ এবং আর কয়েকজন।

হরেন ঘোষাল চীৎকার উঠিল—হঠ যাও, হঠ যাও। সব হঠ যাও।

জগন তাড়াতাড়ি বসিয়া দুর্গার পা-খানা টানিয়া লইল।—হুঁ! স্পষ্ট দাঁতের দাগ!

পাতুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল; সে বলিল—কি হবে, ডাক্তারবাবু?

পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া ডাক্তার বলিল—ওষুধ দিচ্ছি, দাঁড়া। অনিরুদ্ধ, এই পারমাঙ্গানেটের দানাগুলো ধর দেখি। আমি চিরে দি—তুই দিয়ে দে।

দুর্গা পা-খানা টানিয়া লইল—না, না গো।

—না কি!

—না না না। মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিয়ো না, বাপু।

—ঘোষাল, ধর তো পা-খানা।

ঘোষাল চমকিয়া উঠিল। সে এই অবসরে পাতুর বউয়ের সঙ্গে কটাক্ষ বিনিময় করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

দুর্গা আবার দৃঢ়স্বরে বলিল—না না না।

জগন বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল—তবে মর!

দুর্গা উল্টাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া বোধ করি নীরব কান্নায় সারা হইয়া গেল। তাহার সমস্ত দেহটাই কান্নার আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অনিরুদ্ধের চোখেও জল আসিতেছিল—কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—দুর্গা! দুগ্‌গা! ডাক্তার যা বলছে শোন।

দুর্গার কম্পমান দেহখানি অস্বীকারের ভঙ্গিতে নড়িয়া উঠিল।

জগন এবার রাগ করিয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধ চলিয়া গেল ওঝার সন্ধানে। কুসুমপুরে একজন ভাল মুসলমান ওঝা আছে। হরেন একটা বিড়ি ধরাইল।

অনতিদূরে একটা আলো আসিয়া দাঁড়াইল। আলোর পিছনে জমাদার ও শ্রীহরি। ঘোষালও এইবার সরিয়া পড়িল।

দারোগা সতীশকে প্রশ্ন করিল—কেমন আছে?

—আজ্ঞে ভালো নয়। একেবারে ছট্‌ফট করছে।

—গড়াঞ্চী আসে নাই?

—আজ্ঞে না।

—ঘোষ, আপনি আর একটা লোক পাঠিয়ে দিন। আমি থানা থেকে লেস্কিন পাঠিয়ে দিচ্ছি। আসুন।

দারোগা ও শ্রীহরি চলিয়া গেল।

দুর্গা আরও কিছুক্ষণ ছট্‌ফট করিয়া খানিকটা সুস্থ হইল; বলিল—সতীশ-দাদা, তোমার ওষুধ ভাল। ভাল লাগছে আমার। আরও কিছুক্ষণ পর সে উঠিয়া বসিল।

সতীশ বলিল—ওষুধ আমার অব্যর্থ।

দুর্গা বলিল—আমাকে নিয়ে ওপরে চল, বউ।

উপরে বিছানায় বসিয়া দুর্গা মাথার খোঁপার একটা বেলকুঁড়ির কাঁটা খুলিয়া আলোর সম্মুখে তাহার অগ্রভাগটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল।

পাতুর বউ বলিল—সাপ তুমি দেখেছ, ঠাকুরঝি? কি সাপ?

দুর্গা বলিল—কালসাপ!

অতি প্রচ্ছন্ন একটি হাসির রেখা তাহার ঠোঁটের কোণে কোণে খেলিয়া গেল। সাপে তাহাকে কামড়ায় নাই। কর্মকারের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথেই সে মনে মনে স্থির করিয়া ঘাটে আসিয়া বেলকুঁড়ির কাঁটাটা পায়ে ফুটাইয়া রক্তমুখী দংশনচিহ্নের সৃষ্টি করিয়াছিল। নহিলে কি সকলে পালাইবার অবকাশ পাইত, না জমাদার তাহাকে নিষ্কৃতি দিত? মদ খাইয়া জমাদারের যে মূর্তি হয় মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। একটা ভয় ছিল, লোকে তাহার অনিরুদ্ধের বাড়ী যাওয়ার কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। ভাগ্যক্রমে সে কথাটা কাহারও মনেই হয় নাই।

কিন্তু নজরবন্দী, জামাই-পণ্ডিত তাহার এ অবস্থার কথা শুনিয়া একবার তাহাকে দেখিতেও আসিল না!

কেহই তো সত্য কথা জানে না, তবু আসিল না? নজরবন্দীর না হয় রাত্রে বাহির হইবার হুকুম নাই। জমাদার হাজির ছিল গ্রামে, ছিক পাল রহিয়াছে, তাই নজরবন্দীর না আসার কারণ আছে। কিন্তু জামাই-পণ্ডিত? জামাই-পণ্ডিত একবার আসিল না কেন?

অভিমানে তাহার চোখে জল আসিল। জগন ডাক্তার আসিয়াছিল, অনিরুদ্ধ আসিয়াছিল,

জামাই-পণ্ডিত একবার আসিল না!

পাতুর বউ প্রশ্ন করিল—ঠাকুরঝি, আবার জলছে?

—যা বউ, যা তুই! আবার একটুকুন শুই।

—না। ঘুমুতে তুমি পাবে না আজ।

দুর্গা এবার রাগে অধীর হইয়া বলিল—ঘুমোবো না, ঘুমোবো না। আমার মরণ হবে না, আমি মরব না। তুই যা, তুই যা এখান থেকে।

পাতুর বউ এবার রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। দুর্গা বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

—কে? নিচে কে ডাকিতেছে?

—পাতু, দুর্গা কেমন আছে রে?

—হ্যাঁ, জামাই-পণ্ডিতের গলা! ওই যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ!

—কেমন আছিস দুর্গা? পাতুর সঙ্গে দেবু ঘরে ঢুকিল।

দুর্গা উত্তর দিল না।

—দুর্গা!

দুর্গা এবার মুখ তুলিল, বলিল—যদি এতক্ষণে মরে যেতাম জামাই-পণ্ডিত!

দেবু বলিল—আমি খবর নিয়েছি, তুই ভাল আছিস। রাখাল-ছোঁড়া দেখে গিয়ে আমাকে বলেছে।

দুর্গা আবার বালিশে মুখ লুকাইল; রাখাল-ছোঁড়া খবর করিয়া গিয়াছে! মরণ তাহার!

দেবু বলিল—বাড়ী গিয়ে বসেছি আর মহাগ্রামের ঠাকুর মশায় হঠাৎ এলেন। কি করি? এই তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

—মউগাঁয়ের ঠাকুর মশায়!

দুর্গার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

মহাগ্রামের ঠাকুর মশায়! মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন! সাক্ষাৎ দেবতার মত মানুষ! রাজার বাড়ীতেও যিনি পদার্পণ করেন না, তিনি?

* * *

ন্যায়রত্ন দেবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে দেবুর নিজেরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। নিতান্ত অতর্কিত ভাবে যেন তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এই—

যতীনের ওখান হইতে আসিয়া সে ঘরে বসিয়া দুর্গার কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, দুর্গা বিচিত্র, দুর্গা অদ্ভুত, দুর্গা অতুলনীয়! বিলু সমস্ত শুনিয়া দুর্গার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া দুর্গার কথাই বলিতেছিল। বলিতেছিল—গল্পের সেই লক্ষহীরে বেশ্যার মত—দেখো তুমি,—আসছে জন্মে ওর ভাল ঘরে জন্ম হবে, যাকে কামনা করে মরবে সে-ই ওর স্বামী হবে।

ঠিক সেই সময়েই বাহির দরজায় কে ডাকিল—মণ্ডল মশায় বাড়ী আছেন ?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া দেবু ঠাহর করিতে পারিল না—কে ? কিন্তু সে কণ্ঠস্বর আশ্চর্য সম্ভ্রমপূর্ণ। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে ?

বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিল।

—আমি। আলো হাতে একটি লোকের পিছন হইতে বক্তা উত্তর দিলেন—আমি বিশ্বনাথের পিতামহ।

দেবু সবিস্ময়ে সম্ভ্রমে হতবাক হইয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। বিশ্বনাথের পিতামহ—পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন! তাহার শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করিয়া সেই পথের ধুলোর উপরেই সে ন্যায়রত্নের পায়ে প্রণত হইল।

—তোমাকে আশীর্বাদ করতেই এসেছি। কল্যাণ হোক, ধর্ম যেন তোমাকে কোনকালে পরিত্যাগ না করেন। জয়স্তু! তোমার জয় হোক!

বলিয়া তাহার মাথার উপর হাত রাখিলেন। বলিলেন—ঘরটা খোল তোমার, একটু বসব।

দেবুর এতক্ষণে খেয়াল হইল। সে তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া দিল; দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বিলু সব দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল। সে ভিতরের দিক হইতে বাহিরের ঘরে আসিয়া পাতিয়া দিল তাহার ঘরের সর্বোত্তম আসনখানি। তারপর একটি ঘটি হাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—পা ধুইয়ে দেবে মা? প্রয়োজন ছিল না।

বিলু দাঁড়াইয়া রহিল। ন্যায়রত্ন এবার পা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—দাও।

বিলু পা ধুইয়া দিয়া সযত্নে একখানি পুরাতন রেশমী কাপড় দিয়া পা মুছিয়া দিল।

আসন গ্রহণ করিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমার ছেলেকে আন মণ্ডল। তাকে আমি আশীর্বাদ করব।

বিস্ময়ে যেন দেবুর চারিপাশে এক মোহজাল বিস্তার করিয়াছিল; কোন্ অজ্ঞাত পরমভাগ্যে তাহার কুটিরে এই রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়াছেন স্বর্গের দেবতা; পরম কল্যাণের আশীর্বাদ-সম্ভার লইয়া আসিয়াছেন তাহার ঘর ভরিয়া দিতে!

বিলু ঘুমন্ত শিশুকে আনিয়া ন্যায়রত্নের পায়ের তলায় নামাইয়া দিল।

ন্যায়রত্ন শিশুটির দিকে চাহিয়া দেখিয়া সস্নেহে বলিলেন—বিশ্বনাথের খোকা এর চেয়ে ছোট। এই তো সবে অন্নপ্রাশন হ'ল, তার বয়স আট মাস।

তারপর ঘুমন্ত শিশুর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—দীর্ঘায়ু হোক, ভাগ্য প্রসন্ন হোক।

কথা শেষ করিয়া গায়ের চাদরের ভিতরের খুঁট খুলিয়া বাহির করিলেন—দুইগাছি বালা। হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—ধর।

দেবু ও বিলু অবাক হইয়া গেল—এ বালা যে খোকারই বালা! আজই বন্ধক দেওয়া হইয়াছে!

—ধর। আমার কথা অমান্য করতে নেই। ধর মা, তুমি ধর।

বিলু হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল—হাত তাহার কাঁপিতেছিল।

—ছেলেকে পরিয়ে দাও মা। আজ অশোক-ষষ্ঠীর দিন, অশোক আনন্দে সংসার তোমাদের পরিপূর্ণ হোক।

তারপর হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বনাথের স্ত্রী, আমার রাজ্ঞী শকুন্তলা। তিনি এসে আমায় সংবাদটা দিলেন। বাউড়ী-বায়েনদের গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার সংবাদ আমি পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম—কাউকে পাঠিয়ে দি—গরুগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে আসুক। গো-মাতা ভগবতী অনাহারে থাকবেন! আর ওই গরীবদের হয়তো যথাসর্বস্ব যাবে গরুর মাশুল দিতে। এমন সময় সংবাদ পেলাম—দেবু মণ্ডল গরুগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। আশ্বস্ত হলাম। মনে মনে তোমাকে আশীর্বাদ করলাম। মনে হ'ল—বাঁচব, আমরা বাঁচব। মনে হ'ল সেই গল্পের কথা। সঙ্কল্প করলাম—একদিন তোমাকে ডাকব, আশীর্বাদ করব। সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথের স্ত্রী এসে বললে—দাদু, শিবকালীপুরের পণ্ডিতের কাজ দেখুন তো! ষষ্ঠীর দিন—আজ সে ছেলের হাতের বালা বন্ধক দিয়েছে আমাদের চাটুজ্যেদের গিন্নীর কাছে। গিন্নী আমায় দেখিয়ে বললে—দেখ তো নাত-বৌ, পনের টাকায় ভাল হয় নাই? আমার মনটা আবার ভরে উঠল, মণ্ডল মশায়, অপার আনন্দে। মনে মনে বার বার তোমাকে আশীর্বাদ করলাম। তবু মন খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। ষষ্ঠীর দিন, শিশুর অলঙ্কার, অলঙ্কারের জন্য শিশু হয়তো কেঁদেছে। আমি তৎক্ষণাৎ নিয়ে এলাম ছাড়িয়ে। কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে প্রবৃত্তি হ'ল না। নিজেই এলাম। তোমাকে আশীর্বাদ করতে এলাম। তুমি দীর্ঘজীবী হও; তোমার কল্যাণ হোক। ধর্মকে তুমি বন্দী করে বাধ কর্মের বন্ধনে। তোমার জয় হোক। দাও মা, বালা পরিয়ে দাও ছেলেকে। মণ্ডল, টাকা যখন তোমার হবে, আমায় দিয়ে এস; তোমার পুণ্য, তোমার ধর্মকে আমি ক্ষুণ্ন করতে চাই না।

টপ টপ করিয়া দেবুর চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িল।

বিলুর চোখ হইতে ধারা বহিতেছিল। সে বালা দুইগাছি ছেলেকে পরাইয়া দিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—কেঁদো না, একটা গল্প বলি, শোন।

এমন সময় যতীন আসিয়া ডাকিল—দেবুবাবু!

—যতীনবাবু আসুন—আসুন!

ন্যায়রত্ন হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—ইনি?

দেবু যতীনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল।

যতীন কয়েক মুহূর্ত ন্যায়রত্নকে দেখিল; তারপর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনার নাতি বিশ্বনাথবাবুকে আমি চিনি।

ন্যায়রত্ন প্রথমে নমস্কার করিয়া, পরে যতীনকে আশীর্বাদ করিলেন। তারপর প্রশ্ন করিলেন—চেনেন তাকে? আপনাদের সঙ্গে সে বুঝি সমগোত্রীয়?

এ প্রশ্নে যতীন প্রথমে একটু বিস্মিত হইল; তারপর অর্থটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—গোত্র এক, গোষ্ঠী ভিন্ন।

ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

যতীন বলিল—তারা নাপিত আমায় সংবাদ দিলে, আমি ছুটে এলাম। আপনাকে দেখতে এলাম।

—দেখবার বস্তু আর কিছু নাই—দেশেও নাই—মানুষেও নাই। প্রকাণ্ড সৌধ, বটবৃক্ষ জন্মে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। চোখেই তো দেখছেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন—তাই মধ্যে মধ্যে যখন দুর্যোগে বজ্রাঘাতের আঘাতকে প্রতিহত করতে দেখি সেই সৌধের কোন অংশকে, তখন আনন্দ হয়। আজ মণ্ডল আমাকে সেই আনন্দ দিয়েছে।

দেবু কথাটা পরিবর্তন করিবার জন্য বলিল —আপনি একটা গল্প বলবেন বলছিলেন।

—গল্প? হ্যাঁ বলি শোন—"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, মহাকর্মী, মহাপুণ্যবান। জ্যোতির্ময় ললাট, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী স্বয়ং ললাট মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্ম ছিল মহৎ এবং প্রতি কর্মেই ছিল সাফল্য; কারণ যশোলক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর কর্মশক্তিতে। তাঁর কুল ছিল অকলঙ্ক, পত্নী-পুত্র কন্যা-বধূর গৌরবে অকলঙ্ক কুল উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল—কারণ, কুললক্ষ্মী তাঁর কুলকে আশ্রয় করেছিলেন। পাপ অহোরহ ঈর্ষ্যাতুর অন্তরে ব্রাহ্মণের বাসভূমির চারিদিকে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সহ্য হয় না। বহু চিন্তা করে সে একদিন সঙ্গে করে আনল অলক্ষ্মীকে। বাড়ীর বাইরে থেকে ব্রাহ্মণকে ডাকলে।

ব্রাহ্মণ বললেন—কি চাও বল?

পাপ বলিল—আমি বড় দুর্ভাগা। দুঃখ-কষ্টের সীমা নাই। আমার সঙ্গিনীটিকে আপনি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিন—এই আমার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি গৃহস্থ; আশ্রয়প্রার্থী দুঃস্থকে আশ্রয় দেওয়া আমার ধর্ম! বেশ, থাকুন উনি। বধূ-কন্যার মতই যত্ন করব। ইচ্ছা হলে যতদিন দুর্ভাগ্যের শেষ না হয়, ততদিন তুমিও থাকতে পার। এস, তুমি এস।

আহ্বান সত্ত্বেও পাপ কিন্তু পুরপ্রবেশ করতে সাহস করল না। কারণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে রয়েছেন ধর্ম।

যাক অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় ঘটল। ফলবান বৃক্ষগুলির ফল যেন নীরস হয়ে গেল, ফুল ম্লান হল।

রাত্রে ব্রাহ্মণ জপ করছেন—এমন সময় শুনতে পেলেন এক করুণ কান্না। কেউ যেন করুণ স্বরে কাঁদছে। বিস্মিত হয়ে জপ শেষ করে উঠতেই তিনি দেখলেন—তাঁরই ললাট থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতি, সেই জ্যোতি ক্রমে এক নারীমূর্তি ধারণ করল। তিনিই এতক্ষণ কাঁদছিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন—কে মা তুমি?

রমণী-মূর্তি বললে—আমি তোমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী। এতদিন তোমার ললাটে আশ্রয় করেছিলাম, তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তাই কাঁদছি।

২১। ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—একটা প্রশ্ন করব, মা? আমার অপরাধ কি হল?

—তুমি আজ অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ। ওই মেয়েটি অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মী এবং আমি তো একসঙ্গে বাস করতে পারি না।

ব্রাহ্মণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে প্রণাম করলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। তিনি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে দেখলেন বৃক্ষের ফল খসে গেছে, ফুল শুকিয়ে গেছে। সরোবর হয়েছে ছিদ্রময়ী, জল ছিদ্রপথে অদৃশ্য হয়েছে। ভূমি হয়েছে শস্যহীনা, গাভী হয়েছে দুগ্ধহীনা। গৃহ হয়েছে শ্রীহীন।

রাত্রে আবার সেই রকম কান্না। আবার দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন এক দিব্যাঙ্গনা। তিনি বললেন—আমি তোমার যশোলক্ষ্মী। অলক্ষ্মীকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, ভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ নীরবে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনিও চলে গেলেন।

পরদিন তিনি শুনলেন—লোকে তাঁর অপযশ ঘোষণা করছে—ব্রাহ্মণ লম্পট, ওই যে মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে—তার দিকে তার কু-দৃষ্টি পড়েছে। তিনি প্রতিবাদ করলেন না।

সেদিন রাত্রে আর এক নারী-মূর্তি তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁর কুল-লক্ষ্মী। বললেন—অলক্ষ্মী এসেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী চলে গেছেন, যশোলক্ষ্মী চলে গেছেন, লোকে তোমার কলঙ্ক রটনা করছে; আমি কুললক্ষ্মী, আর কেমন করে থাকি তোমাকে আশ্রয় করে? তিনিও চলে গেলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণের দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন আর এক মূর্তি। নারী নয়—পুরুষ-মূর্তি। দিব্য ভীমকান্তি, জ্যোতির্ময় পুরুষ।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে?

দিব্যকান্তি পুরুষ বললেন—আমি ধর্ম!

—ধর্ম? আপনি আমাকে পরিত্যাগ করছেন কোন্ অপরাধে?

—অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি।

—সে কি আমি অধর্ম করেছি?

ধর্ম চিন্তা করে বললেন—না।

—তবে?

—ভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ত্যাগ করেছেন।

—আশ্রয়প্রার্থী বিপদগ্রস্তকে আশ্রয় দেওয়া যখন অধর্ম নয়, তখন আমার অধর্মের জন্য তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নি। পরিত্যাগ করেছেন অলক্ষ্মীর সংস্পর্শ সইতে না পেরে।

—হাঁ।

—ভাগ্যলক্ষ্মীকে অনুসরণ করেছেন যশোলক্ষ্মী, তাঁর পেছনে গেছেন কুললক্ষ্মী, আমি প্রতিবাদ করি নি। কারণ ওই তাঁদের পন্থা। একের পিছনে এক আসেন, আবার যাবার

সময় একের পিছনে অন্যে যান। কিন্তু আপনি আমাকে পরিত্যাগ করছেন কোন্ অপরাধে?

ধর্ম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না; কারণ আপনাকে অবলম্বন করেই আমি বেঁচে রয়েছি। আপনাকে আমি যেতে না বললে—আপনার যাবার অধিকার নাই। আমিই আপনার অস্তিত্ব।

ধর্ম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, নিজের ভ্রম বুঝলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে বললেন—তথাস্তু। তোমার জয় হোক।

—বলে তিনি আবার ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হলেন।"

ন্যায়রত্নের গল্প বলার ভঙ্গি অতি চমৎকার। প্রথম জীবনে তিনি নিয়মিত ভাগবত কথকতা করিতেন। তাঁহার বর্ণনায়, স্বর-মাধুর্যে, ভঙ্গিতে একটি মোহজালের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি স্তব্ধ হইলেন।

কিছুক্ষণ পর যতীন বলিল—তারপর?

—তারপর? ন্যায়রত্ন হাসিলেন, বলিলেন—

—তারপর সংক্ষিপ্ত কথা। ধর্মের প্রভাবে সেইদিন রাত্রে উঠিল আবার এক ক্রন্দনধ্বনি। ব্রাহ্মণ দেখলেন সেই অলক্ষ্মী মেয়েটি এসে বলছে—আমি যাচ্ছি। আমি চললাম।

ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি স্বেচ্ছায় বিদায় চাও?

—স্বেচ্ছায়। স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। সে মিলিয়ে গেল।

সেইদিন রাত্রেই ফিরলেন—ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরলেন। তারপর যশোলক্ষ্মী, তারপর কুললক্ষ্মী।

যতীন বলিল—চমৎকার কথা। লক্ষ্মীই দেয় যশ—সেই পবিত্র করে কুল। তাই তাকে নিয়ে এত কাড়াকাড়ি। লক্ষ্মীই সব।

—না, ন্যায়রত্ন বলিলেন—না, ধর্ম। মণ্ডল, সেই ধর্মকে তুমি অবলম্বন করেছ বলেই আজ আশা হচ্ছে। সেই আনন্দেই আমি ছুটে এসেছি। আচ্ছা, আমি চলি আজ, মণ্ডল।

ঠিক এই সময়ে সংবাদ আসিল—দুর্গাকে সাপে কামড়াইয়াছে। রাখাল-ছোঁড়াটা বলিল। ভাল আছে। উঠে বসেছে।

দেবু ন্যায়রত্নকে আগাইয়া দিতে বাহির হইল। পথে যতীন বিদায় লইয়া আপন দাওয়ায় উঠিয়া তক্তপোশের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিল।

চব্বিশ

যতীনের মনের অবস্থা বিচিত্র। পল্লীগ্রামের কোন্ নিভৃত কোণে বাস করে ওই বৃদ্ধ—তার চারিপাশে এই ধ্বংসোন্মুখ পারিপার্শ্বিক—অজ্ঞান-অশিক্ষা-দারিদ্র্য, হীনতায় জীর্ণ। কঠিন জীবন-সংগ্রাম এখানে নিপুণ সরীসৃপের সুকঠিন বেষ্টনীর মত শ্বাসরোধ করিয়া ক্রমশঃ চাপিয়া

ধ্বনিতেছে। ইহারই মধ্যে কেমন করিয়া প্রশান্ত অবিচলিতচিত্ত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ স্বচ্ছ উর্ধ্বগ দৃষ্টি মেলিয়া পরমানন্দে বসিয়া আছেন। অসীম জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছেন লবণাক্ত সমুদ্রতলে মুক্তাগর্ভ শুক্তির মত।

এই মুহূর্তে ইহা এক পরমাশ্চর্যের মত মনে হইল।

দণ্ডে দণ্ডে প্রহরের পর প্রহর অতিক্রম করিয়া রাত্রি ঘন গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয় প্রহরের শেয়াল, পেঁচা ডাকিয়া গিয়াছে। কোন একটা গাছে বসিয়া একটা পেঁচা এখনও মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। এ ডাক অন্য রকমের ডাক—প্রহর ঘোষণার ডাকের সহিত কোন মিল নাই। প্রহরের ডাকের মধ্যে স্পষ্ট একটি ঘোষণার সুর আছে। গাছের কোটরের মধ্যে থাকিয়া অপরিণত কণ্ঠে চাপা শিশের শব্দের মত করিয়া অবিরাম একঘেয়ে ডাকিয়া চলিয়াছে উহাদের শাবকের দল। বনেজঙ্গলে পথেঘাটে ঘরে, চারিদিকে, আশেপাশে অবিরাম ধ্বনি উঠিতেছে—অসংখ্য কোটি পতঙ্গের সাড়ার। অন্ধকার শূন্যপথে কালো ডানা সশব্দে আস্ফালন করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে বাদুড়ের দল—একটার পর একটা, তারপর একসঙ্গে তিনটা, আবার একটা।

সেদিন বৃষ্টির পর আকাশ এখনও স্বচ্ছ, উজ্জ্বল নীল। তারাগুলি পূর্ণদীপ্তিতে দীপ্যমান। চৈত্র মাসের বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে; সে বাতাসের সর্বাঙ্গ ভরিয়া ফুলের গন্ধের অদৃশ্য অরূপ সম্ভার। শেষ প্রহরে বাতাস হিমের আমেজে ক্রমশঃ ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিতেছে।

বৃদ্ধকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। গল্পটি তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। ঐ বৃদ্ধ এবং ঐ গল্পের মধ্যে সে আজ পল্লীর জীবন মন্ত্রের আভাস পাইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া ওই বৃদ্ধেরাই তাহাদের ঐ গল্প শুনাইয়া আসিতেছে। গল্পটি সত্যই ভাল—ভাল শুধু নয়—সত্য বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছে। শুধু এক জায়গায় খটকা লাগিয়াছে। অলক্ষ্মীর আগমনে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অন্তর্ধান—কথাটি মৌলিক সত্য কথা। ভাগ্যলক্ষ্মীর অভাবে কর্মশক্তি পঙ্গু হয়, যশোলক্ষ্মী চলিয়া যান। লক্ষ্মীহীন হৃতকর্মশক্তি মানুষের কুলগৌরব ক্ষুণ্ণ করে। উচ্চিংড়ের মা চলিয়া গিয়াছে সেটেল্‌মেণ্ট ক্যাম্পের পিওনের সঙ্গে! কিন্তু ধর্ম বলিতে বৃদ্ধ কি বুঝাইতেছেন, ঐ প্রশ্নটা তাঁহাকে করা হয় নাই। অনেক চিন্তা করিয়াও সে এমন কোন উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না—যাহার সহিত পৃথিবীর নব-উপলব্ধ সত্যের একটি সমন্বয় হয়। সে ক্লান্ত হইয়া শূন্য-মস্তিষ্কে রাত্রির পল্লীর দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রগাঢ় দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে পল্লীটা যেন হারাইয়া গিয়াছে। অনুমানে নির্দেশ করা যায় সামনেই পথের ওপারে সেই ডোবাটা। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সন্ধ্যের সময় ঘাটটিতে একবার কেরোসিন ডিবি দেখা যায়, দু'টি মেয়ে ডিবি হাতে বাসন ধুইয়া লইয়া যায়। ডিবির আলোয় তাহাদের মুখ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পায় যতীন। ঘাট হইতে উঠিয়াই তাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়া কপাট দেয়। পল্লীটার অধিকাংশ ঘরেই সেই সন্ধ্যাতেই খিল পড়ে। শ্রীহরি ঘোষ এবং জগন ডাক্তার বা তাহার নিজের এখানে ছোটখাটো একটা করিয়া দু'টি বিরোধী মজলিস এসবের পরেও জাগিয়া থাকে। কিন্তু সেই বা কতক্ষণ? দশটা বাজিতে না বাজিতে পল্লীটা

নিস্তব্ধ হইয়া যায়।

যতীন একবার ভাল করিয়া গ্রামখানার দিকে চাহিয়া দেখিল। প্রগাঢ় অন্ধকারে সুষুপ্ত নিথর পল্লীটার ভঙ্গির মধ্যে নিতান্ত অসহায় শিশুর আত্মসমর্পণের ভঙ্গি যেন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—তাহার জন্মস্থান—মহানগরী কলিকাতাকে। কলিকাতাকে সে বড় ভালবাসে। মহানগরী কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী সমূহের অন্যতমা। দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকারের প্রভাব সেখানে কতটুকু? দিনেও সেখানে আলো জ্বলে। রাত্রে পথের পাশে-পাশে আলোয় আলোয় আলোময়। মানুষের তপস্যার দীপ্তচক্ষুর সম্মুখে রাত্রির অন্ধকার, মহানগরীর দ্বারদেশে অবশ তনুর মত অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মোড়ে মোড়ে বিটের প্রহরী জাগ্রত চক্ষে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করে—সে জাগিয়া আছে। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহার গবেষণার বস্তুর দিকে। গতিশীল দণ্ড স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে যন্ত্রী; যন্ত্র চলিতেছে—উৎপাদন চলিতেছে অবিরাম। জল আলোড়িত করিয়া জাহাজ চলিয়াছে, পোর্ট কমিশনারের লাইনের উপর ট্রেন চলিয়াছে; সাইডিংয়ে শান্টিং হইতেছে। পথে গর্জন করিয়া মোটর চলিয়াছে; মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চক আবেশ জাগাইয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে অশ্বক্ষুরধ্বনি। মহানগরী চলিয়াছেই —চলিয়াছেই—দিনে রাতে, গতির তাহার বিরাম নাই। আসা-যাওয়ায়, ভাঙা-গড়ায়, হাসি-কান্নায় নিত্য তাহার নব নব রূপের অভিনব অভিব্যক্তি। তারও একটা অন্ধকার দিক আছে। কিন্তু সে থাক।

পল্লীর কিন্তু সেই একই রূপ। অদ্ভুত পল্লীগ্রাম। বিশেষ এদেশের পল্লীগ্রাম। সমাজগঠনের আদিকাল হইতে ঠিক একই স্থানে অনন্ত-পরমায়ু পুরুষের মত বসিয়া আছে। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স-এর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, Sir Charles Metcalfe বলিয়া গিয়াছেন—

"They seem to last where nothing else lasts'...অদ্ভুত! Dynasty after dynasty tumbles down, revolution suceeds revolution! Hindu, Pathan, Mogul, Mahratta, Sikh, English are masters in turn, but the village community remains the same.'

সে কি কোনদিন নড়িবে না? বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন শুরু হইয়াছে। সর্বত্র নববিধানের সাড়া উঠিয়াছে। এ দেশের পল্লীতে কি জীর্ণ স্থবির পুরাতনের পরিবর্তন হইবে না!

বিপ্লবী তরুণ, তাহার কল্পনার চোখে অনাগত কালের নূতনত্বের স্বপ্ন। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বৃদ্ধ বলিয়া গেলেন—প্রকাণ্ড সৌধ বটবৃক্ষের শিকড়ের চাপে ফাটিয়া গিয়াছে!

সে সেই ভাঙনের মুখে আঘাত করিতে বদ্ধপরিকর। সেই ধর্মে সে যেখানে ক্ষুদ্রতম দ্বন্দ্ব দেখে, সেইখানেই সে দ্বন্দ্বকে উৎসাহিত করিয়া তোলে!

বাড়ীর ভিতর হইতে দরজায় আঘাতের শব্দ হইল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—মা-মণি?

—হ্যাঁ। পদ্ম তিরস্কার করিয়া বলিল—তুমি কি আজ শোবে না? অসুখ-বিসুখ একটা না করে ছাড়বে না দেখছি!

—যাচ্ছি। যতীন হাসিল।

—যাচ্ছি নয়, এখুনি শোবে এস। আমি বরং বাতাস করে ঘুম পাড়িয়ে দি। এস! এস বলছি।

—তুমি গিয়ে শোও। আমি এক্ষুনি শোব।

—না! তুমি এক্ষুনি এস। এস। মাথা খুঁড়ব বলে দিচ্ছি।

যতীন ঘরের ভিতর না গিয়া পারিল না। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই, পদ্ম বলিল—এদিকের দরজা খুলে দাও। বাতাস করি।

—দরকার নেই।

—না, দরকার আছে।

যতীন দরজা খুলিয়া দিল। পদ্ম যতীনের শিয়রে পাখা লইয়া বসিল। বলিল—একজন বেরিয়েছে দুগ্‌গাকে সাপে কামড়েছে বলে—এখনও ফিরল না। তুমি—

—অনিরুদ্ধবাবু এখনও ফেরেন নাই?

—না। দাঁড়াও; দুগ্‌গা মরুক আগে তারপর ফিরবে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। দুনিয়ায় এত লোকে মরে—ওই হারামজাদী মরে না!

যতীন শিহরিয়া উঠিল। পদ্মের কণ্ঠস্বরে ভাষায় সে কী কঠিন আক্রোশ! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ বন্ধ করিল। কিছুক্ষণ পরই তাহার কানে একটা দূরাগত বিপুল শব্দ যেন জাগিয়া উঠিল। দ্রুততম গতিতে শব্দটা আগাইয়া আসিতেছে। ঘরে-দুয়ারে একটা কম্পন জাগিয়া উঠিতেছে। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল—ভূমিকম্প!

হাসিয়া পদ্ম বলিল—কি ছেলে মা! যেন দেয়ালা করছে! ও ভূমিকম্প নয়, ডাকগাড়ী যাচ্ছে। শোও দেখি এখন।

—ডাকগাড়ী? মেল ট্রেন?

—হ্যাঁ, ঘুমোও।

সেই মুহূর্তেই তীব্র হুইসিলের শব্দ করিয়া ট্রেন উঠিল ময়ূরাক্ষীর পুলে,—ঝমঝম শব্দে চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঘর-দুয়ার থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। জংশন-স্টেশনে আলো জ্বলিতেছে। সেখানকার কলে রাত্রেও কাজ চলে। ময়ূরাক্ষীর ওপারেই জংশন! যতীন অকস্মাৎ যেন আশার আলোক দেখিতে পাইল। পল্লী কাঁপিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে পাখা রাখিয়া পদ্ম সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাক, ঘুমাইয়াছে। উপরে মশারী ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া আসা হয় নাই, উচ্চিংড়েটাকে হয়তো মশায় ছিঁড়িয়া ফেলিল!

যতীনের ঘর হইতে বাহির হইয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল। উপর হইতে কখন নামিয়া আসিয়াছে উচ্চিংড়ে। আপন মনেই এই তিন প্রহর রাত্রে উঠানে বসিয়া একা-একাই কড়ি খেলিতেছে।

শেষরাত্রে ঘুমাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিতে দেরি হইয়াছিল। তাহাকে তুলিল পদ্ম।—ওঠ ছেলে! ওঠ!

উঠিয়া বসিয়া যতীন বলিল—অনেক বেলা হয়ে গেছে, না?

—ওদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল।

—সর্বনাশ হয়ে গেল?

—ছিরু পাল লেঠেল নিয়ে এসে গাছ কাটছে। সব ছুটে গেল, দাঙ্গা হবে হয়তো।

—কে ছুটে গেল, অনিরুদ্ধবাবু?

—সব—সব। পণ্ডিত, জগন ডাক্তার, ঘোষাল—বিস্তর লোক।

যতীন খুশী হইয়া উঠিল। বলিল—বেশ কড়া করে চা কর দেখি মা-মণি।

—তুমি কিন্তু নাচতে নাচতে যেয়ো না যেন।

—তবে আমায় ডাকলে কেন?

পদ্ম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—জানি না—

সত্যই সে খুঁজিয়া পাইল না কেন সে যতীনকে ডাকিল!

—মুখ হাত ধোও। আমি চা করছি।

—উচ্চিংড়ে কই?

—সে 'বানের আগে কুটো'—সে ছুটে গিয়েছে দেখতে।

গত কল্যকার অপমানের শোধ লইয়াছে শ্রীহরি। বাউড়ী-বায়েনের কাছে মাথা হেঁট হইয়াছে। শুধু অপমান নয়—তাহার মতে, এটা গ্রামের শৃঙ্খলা ভাঙিবার একটা অপচেষ্টা। তাহার উপর দুর্গা তাহাদিগকে যেভাবে ঠকাইল সে-সত্যটা ঘণ্টা দুয়েক পরেই মনে মনে বুঝিয়া ও জানিতে পারিয়া সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং যাহারা ইহার সঙ্গে জড়াইয়া আছে তাহাদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা সে কাল সেই গভীর রাত্রেই করিয়া রাখিয়াছে।

কালু শেখ মারফৎ লাঠিয়ালের ব্যবস্থা করিয়া আজ সকালে সে জমিদারের গোমস্তা হিসাবে দেবু, জগন, হরেন ও অনিরুদ্ধের গাছ কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। গাছগুলি জমিদারের পতিত ভূমির উপর আছে। পূর্বকালে চাষী প্রজারা এমনই ভাবে গাছ লাগাইত, ভোগ-দখল করিত, জমিদার আপত্তি করিত না। প্রয়োজন হইলে, প্রজাকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া জমিদার ফলও পাড়িত, ডালও কাটিত। কিন্তু এমনভাবে সমূলে উচ্ছেদ কখনও করিত না। করিলে বহু পূর্বকালে—একশো বছর পূর্বে জমিদার-প্রজার দাঙ্গা বাধিত। পঞ্চাশ বৎসর পরে সে-যুগ পাল্টাইয়াছিল। তখন প্রজা জমিদারের হাতে-পায়ে ধরিত, ঘরে বসিয়া গাছের মমতায় কাঁদিত। অকস্মাৎ আজ দেখা গেল, আবার তাহারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে।

যতীন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল—সংবাদের জন্ম। শেষ পর্যন্ত খুনখারাপি হইয়া গেলে যে একটা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হইবে। উদ্বিগ্নভাবে সে ভাবিতেছিল—তাহার যাওয়া কি উচিত হইবে? তাহাকে এই ব্যাপারে কোনমতে জড়াইতে পারিলে—সমগ্র ঘটনারই রঙ পাল্টাইয়া যাইবে।

পদ্ম ইহারই মধ্যে তিনবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গিয়াছে—সে ঘরে আছে কিনা।

যতীন শেষবারে বলিল—আমি যাই নি মা-মণি। আছি।

—তোমাকে বিশ্বাস নাই। সাংঘাতিক ছেলে তুমি।

যতীন হাসিল।

—হেসো না তুমি, হ্যাঁ। কথা বলিতে বলিতে পদ্ম পথের দিকে চাহিয়া বলিল—ওই! ওই পাও, নেলো আসছে। দাও পয়সা দাও।

সেই চিত্রকর ছেলেটি—বৈরাগীদের নেলো আসিতেছে। পয়সার প্রয়োজন হইলেই নেলো আসে। অন্যথায় সে আসে না। নিঃশব্দে আসে—চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, প্রশ্ন না থাকিলে প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পারে না; কিন্তু উঠিয়া যায় না; বসিয়াই থাকে। প্রশ্ন করিলে সংক্ষেপে বলে—পয়সা। দাবিও বেশী নয়, চার পয়সা হইতে চার আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজ কিন্তু নেলো একটু উত্তেজিত, মুখের গৌরবর্ণ রং রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে, চোখের তারা দুটি অস্থির; সে আসিয়া আজ বসিল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

—কি নলিন? পয়সা চাই?

—পণ্ডিতের মাথা ফেটে গিয়েছে।

—কার? দেবুবাবুর?

—হ্যাঁ। আর কালীপুরের চৌধুরী মশায়ের।

—দ্বারকা চৌধুরী মশায়ের?

—হ্যাঁ। পণ্ডিতের আমগাছ কাটছিল, পণ্ডিত একেবারে কুড়ুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—তারপর?

—লেঠেলদের সঙ্গে পণ্ডিতের ঠেলাঠেলি লেগে গেল। চৌধুরী মশায় গেল ছাড়াতে। তা লেঠেলরা দু-জনকেই ঠেলে ফেলে দিল।

—ফেলে দিলে?

—হ্যাঁ। গাছ কাটছিল, সেই কাটা শেকড়ে লেগে দু-জনকারই মাথা কেটে গেল।

—তারপর?

—খুব রক্ত পড়ছে। ধরাধরি করে ধরে নিয়ে আসছে।

—অন্য লোকেরা কি করছিল?

—সব দাঁড়িয়েছিল, কেউ এগোয় নাই। কর্মকার কেবল একজন লেঠেলকে এক লাঠি মেরে পালিয়েছে।

—জগন ডাক্তার কোথায় ?

—সে জংশনে গিয়েছে—পুলিসের কাছে।

যতীন ঘরে ঢুকিয়া লিখিতে বসিল ; টেলিগ্রাম। একখানা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে—একখানা এস-ডি-ওর কাছে। আর একখানা চিঠি—এ জেলার জেলা-কংগ্রেস কমিটির কাছে। চিঠিখানা গোপনে পাঠাইতে হইবে।

টেলিগ্রাম করিতে ডাক্তারকে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এ পত্রখানা জগনের হাতে দেওয়া হইবে না। দেবু ভাল থাকিলেই তাহাকে সদরে পাঠানো সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত হইত। সে একটু ভাবিয়া নেলোকে ডাকিয়া বলিল—একটা কাজ করতে পারবে ?

নলিন ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—হ্যাঁ।

—একখানা চিঠি জংশনের ডাকঘরে ফেলতে হবে। একটা চার পয়সার টিকিট কিনে বসিয়ে দেবে। কেমন ?

নলিন আবার সেই ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

—কাউকে দেখিয়ো না যেন।

নলিনের আবার সেই নীরব স্বীকৃতি।

—এই চার পয়সার টিকিট কিনবে। আর এই চার পয়সায় তুমি জল খাবে।

নলিন চিঠিখানি কোমরে রাখিয়া—তাহার উপর সযত্নে ভাঁজ করিয়া কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল। আনি দুইটি বাঁধিল খুঁটে। তারপর ঘাড় হেঁট করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

সমস্ত গ্রামখানা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানায় দেবু ও চৌধুরীকে আনা হইয়াছিল ; দেবু নিজে হাঁটিয়াই আসিয়াছে। তাহার আঘাত তেমন বেশী নহে, তাছাড়া তাহার জোয়ান বয়স—উত্তেজনাও যথেষ্ট হইয়াছিল, রক্তপাত বেশ খানিকটা হইলেও সে ভীত বা অবসন্ন হয় নাই। কিন্তু বৃদ্ধ চৌধুরী কাতর হইয়া পড়িয়াছে, আঘাতও তাহারই বেশী। প্রথমে চৌধুরী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল ; চেতনা হইলেও ধরাধরি করিয়া বহিয়া আনিতে হইয়াছে। চৌধুরী চোখ বুজিয়া শুইয়াই আছে। দেবু নীরবে বসিয়া আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়া। ধুইয়া দেওয়ার পর রক্তাভ জলের ধারা কপাল বাহিয়া এখনও ঝরিতেছে। প্রায় সমস্ত গ্রামের লোকই জগনের ডাক্তারখানার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

টিঞ্চার আয়োডিন, তুলা, গরম জল—ব্যাণ্ডেজ লইয়া জগন ব্যস্ত। হরেন তাহাকে সাহায্য করিতেছে। মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে—হট যাও! ভিড় ছাড়ো।

রাঙাদিদি একটা গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছে। দুর্গা দাঁতে দাঁত টিপিয়া নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় ডাক্তারখানায় যতীন আসিয়া উঠিল।

জগন বলিল—গাছ সব আটকে দিয়েছি—পুলিস এসে নোটিশ জারি করে দিয়েছে।

কোন পক্ষই গাছের কাছে যেতে পাবে না। আমি বারণ করে গেলাম, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু করো না। কাটুক গাছ। ফিরে এসে দেখি—দেবু এই কাণ্ড করে বসে আছে। অনিরুদ্ধ একজনের পিঠে এক লাঠি কষে পালিয়েছে।

ভিড়ের ভিতর হইতে অনিরুদ্ধ আগাইয়া আসিয়া বলিল—অনিরুদ্ধ ঠিক আছে! সে মেয়ে নয়—মরদ। অনিরুদ্ধের হাতে তাহার টাঙি। সে বলিল—টাঙিটা তখন যে হাতের কাছে পেলাম না! নইলে হয়েই যেত এক কাণ্ড!

যতীন বলিল—সে-সব পরে যা হয় করবেন—এখন এঁদের তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করে ফেলুন।

বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী এতক্ষণে চোখ মেলিয়া মৃদু হাস্যের সহিত হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রণাম।

যতীন প্রতি-নমস্কার করিল—নমস্কার। কেমন বোধ করছেন?

—ভাল। মৃদু হাসিয়া বৃদ্ধ আবার বলিল—মনে করলাম মাঝে পড়ে মিটিয়ে দোব। দেবু গিয়ে কুড়ুলের সামনে দাঁড়াল। থাকতে পারলাম না চুপ করে।

সকলে চুপ করিয়া রহিল। এ-কথার কোন উত্তর দিবার ছিল না।

বৃদ্ধ বলিল—পণ্ডিত নমস্য ব্যক্তি। শুধু পণ্ডিতই নয়, বীরপুরুষ। বয়স হলেও চশমা আমার এখনও লাগে না, দেবতা। কুড়ুলের সামনে পণ্ডিত যখন গিয়ে দাঁড়াল—তখনকার সে মূর্তি পণ্ডিত নিজেও বোধ হয় কখনও আয়নায় দেখে নাই। বীরপুরুষ!

জগন বলিল—ওগুলো হল গোঁয়াতুর্মি। কি ফল হল? রাগ করো না ভাই দেবু।

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল—সবার গাছই কেটেছে। গাছ এখনও দেবুরই দাঁড়িয়ে আছে, ডাক্তার!

জগন হরেন ঘোষালকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠিল—কোন্ দিকে চেয়ে কাজ করছ ঘোষাল?

হরেন চমকিয়া উঠিল।

দেবু হাসিল। ডাক্তার বৃদ্ধের উপর চটিয়াছে। ঝালটা পড়িল হরেনের উপর।

* * *

পুলিসের একটা তদন্ত হইল।

শ্রীহরি কোন কথাই অস্বীকার করিল না। শ্রীহরির পক্ষে কথাবার্তা যাহা বলিবার বলিল—দাশজী। দাশজী এখন জমিদারের সদর-কর্মচারী, এখানকার ভূতপূর্ব গোমস্তা। অভিজ্ঞ, সুচতুর, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রজাস্বত্ব আইনে, ফৌজদারি আইনে—সে সাধারণ উকীল-মোক্তার অপেক্ষাও বিজ্ঞ। শ্রীহরি সংবাদ পাইয়া তাহাকে আনিয়াছে। ব্যাপারটা এখন আর গ্রামের লোক এবং ব্যক্তিগতভাবে শ্রীহরির মধ্যে আবদ্ধ নয়। জমিদারের গোমস্তা হিসাবে সে ব্যাপারটা করিয়াছে, সুতরাং দায়িত্ব জমিদারের উপরও পড়িয়াছে।

জমিদার বয়সে নবীন। একালের বাংলাদেশের জমিদারের ছেলে। ইংরাজী লেখা-

পড়া জানে, জমিদারি খুব পছন্দ করে না। বারকয়েক ব্যবসা করিবার চেষ্টা করিয়া লোকসান দিয়া অগত্যা জমিদারিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। জমিদারির মধ্যে আইন অনুযায়ী চলিবার প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা তাহার আছে, সেকালের জমিদারের মত জোর-জবরদস্তির ধারা সে মোটেই পছন্দ করে না। সেকালের জমিদারের মত ব্যক্তিত্বও তাহার নাই। কাজেই তাহার সাধু চেষ্টা ফলবতীও হয় নাই। কলিকাতা যাইবার টাকার অভাব ঘটিলেই নায়েব-গোমস্তার মতে মত দিতে বাধ্য হয় কলিকাতায় সিনেমা দেখে, থিয়েটার দেখে. একটু-আধটু মদও খায়, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে দর্শক হিসাবে যায়। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার; লোকাল বোর্ডে দাঁড়াইয়া এবার পরাজিত হইয়াছে। আগামী বারে কংগ্রেস-নমিনেশন পাইবার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিতেছে। এবার অর্থাৎ উনিশশো আটাশ সালে কলিকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হইবে—তাহার ডেলিগেট হইবার চেষ্টাও সে এখন হইতেই করিতেছে।

জমিদার কিন্তু এই সংবাদটা শুনিয়া পছন্দ করে নাই; বলিয়াছিল—এমন হুকুম যখন আমরা দিই নি, তখন আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করবেন! শ্রীহরি নিজে বুঝুক।

দাশজী হাসিয়া বলিয়াছিল--শ্রীহরির মত গোমস্তা পাচ্ছেন কোথায়? সেটা ভাবুন! গ্রামের লোকের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে। সে গোমস্তা হিসেবে কাজটা অন্যায়ই করেছে। কিন্তু সে-লোকটা আদায় হোক-না-হোক মহলের প্রাপ্য পাই-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, এই এক বছর হ্যাণ্ডনোটেও সে টাকা দিয়েছে—হাজার তুয়েক। তারপর সেটেল্‌মেণ্টের খরচা আদায়ের সময় আসছে। এক শিবকালীপুরেই আপনার লাগবে হাজার টাকার ওপর। তাছাড়া অন্য মহলেরও মোটা টাকা আছে। এসময় ওকে যদি ছাড়িয়ে দেন—তবে কি সেটা ভাল হবে?

জমিদারটি মিটিংয়ে তু'দশ কথা বলিতে পারে, সমকক্ষ স্বজনবন্ধুর মধ্যে বেশ স্পষ্টবক্তা বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু এই দাশজীটি যখন এমনই ধারায় চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কয়, তখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাঁপাইয়া উঠিয়া অসহায় ভাবে তুই হাত বাড়াইয়া সে আত্মসমর্পণ করে।

দাশজী বলিল—আচ্ছা, এক কাজ করুন না কেন? শিবকালীপুর শ্রীহরিকে পত্তনি দিয়ে দেন না?

—পত্তনি!

—হ্যাঁ, ধরুন শ্রীহরি পাবে তু-হাজারের উপর। তা ছাড়া—আবার এই সেটেলমেণ্টের খরচা লাগবে আর শ্রীহরিকে গোমস্তা রাখতে গেলে—এমনি বিরোধ হবেই। শ্রীহরি নেবেও গরজ করে।

—ও পত্তনি-টত্তনি নয়। যদি কিনে নিতে চায় তো দেখুন।

সম্পত্তি হস্তান্তরে জমিদারের আপত্তি নাই। সে নিজেই বলে—জমিদারি নয়, ও হল জমাদারি।

* * *

তদন্তে দাশজী সবিনয়ে সব স্বীকার করিল। আজ্ঞে হঁ্যা, গাছ কাটতে আমরা জমিদার তরফ থেকে হুকুম দিয়েছি। শ্রীহরি ঘোষ আমাদের গোমস্তা হিসাবেই গাছ কাটাতে লোক নিযুক্ত করেছিলেন। বৈশাখ মাসে গাছ আমরা হিন্দুরা কাটি না, কাজেই চৈত্র মাসে কাটবার ব্যবস্থা। এই সময়েই আমাদের সমস্ত বছরের কাঠ কেটে রাখা হয়।

জগন বলিল—কাটুন না! নিজের গাছ কাটুন, জমিদার কেন—

বাধা দিয়া দাশজী বলিল—নিজের গাছই তো। ওসব গাছই তো জমিদারের।

—জমিদারের ?

—আপনারাই বলুন জমিদারের কি না ?

—না। আমাদের গাছ।

-আপনাদের ? ভাল, কখনও আপনারা গাছের ডাল কেটেছেন ?

—ডাল কাটিনি। কিন্তু আমরাই চিরকাল দখল করে আসছি।

—হঁ্যা, আপনারাই ফল ভোগ করেন। কিন্তু সে তো জমিদারের তালগাছের তাল কাটেন—পাতা কাটেন আপনারা, শিমূল গাছের 'পাবড়া' পাড়েন আপনারা। সরকারী পুকুরে লোকে পলুই চেপে মাছ ধরে। পুকুর পর্যন্ত গ্রামের লোকে একটা ভাগ করে রেখেছে, এ পুকুরের মাছ ধরবে—রাম, শ্যাম, যদু, ও পুকুরে ধরবে—ঝালি, কানাই, হরি, অন্য পুকুরে ধরবে—ভবেশ, দেবেশ, যোগেশ! এখন, এই তালগাছ—এই পুকুর, এসবেই কি আপনাদের মালিকানি ?

দেবু এতক্ষণে বলিল—ভাল কথা, দাশ মশায়। কিন্তু এসব গাছ যদি আপনাদের, তবে আপনারা এত লাঠিয়াল পাঠিয়েছিলেন কেন ? জবর দখল দরকার হয় কোথায় ? যেখানে দখল নাই সেইখানে—কিম্বা যেখানে বে-দখলের সম্ভাবনা আছে সেইখানে। মানে সেখানেও দখল সন্দেহজনক।

দাশ হাসিয়া বলিল—না। না। লাঠিয়াল আমরা পাঠাই নি। আমরা পাঠিয়েছিলাম পাইক। লাঠি তাদের হাতে থাকে। ওদের ছোটের সামিল ওটা। এখন ধরুন, যার যেমন বিয়ে, তার তেমন বাদ্যি। আপনার আমার বাড়ীতে বিয়ে হয়, একটা ঢোল বাজে একটা কাঁসী বাজে। তার সঙ্গে বড় জোর সানাই। জমিদার বাড়ীর বিয়েতে বাজনা হয় হরেক রকমের। জমিদার-তরফ থেকে গাছ কাটতে এসেছে—পাঁচ-সাতটা গাছ কাটবে, মজুর আছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন—তার সঙ্গে আট-দশটা পাইক এসেছে—কি এমন বেশী এসেছে ? আপনারা এমন বে-আইনী দাঙ্গা করবেন জানলে—আমরা অন্তত পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল পাঠাতাম। তার আগে অবশ্য শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা জানিয়ে খবর দিয়ে রাখতাম। তা ছাড়া আইন তো আপনি বেশ জানেন গো দেবুবাবু; গাছ কার বলুন না আপনি!

আজ এ তদন্তের ভার পাইয়াছিল এখানকার থানার দারোগাবাবু। দারোগাবাবু লোকটি ভাল। ক্ষমতার অপব্যবহার করে না, ব্যবহারও ভদ্র। দারোগা বলিল—যাই বলুন, দাশজী, কাজটি ভাল হয় নি। মানুষের মনে আঘাত দিতে নেই। যাক—আমাদের এতে করবার

কিছু নাই। স্বত্বের মামলার বিষয়। আমরা নোটিশ দিয়েছি—মুখেও উভয় পক্ষকে বারণ করছি—আদালতে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেউ গাছের কাছ দিয়ে যাবেন না। গেলে ফৌজদারী হলে—আমরা তখন চালান দেব। পুলিস বাদী হয়ে মামলা করবে।

তারপর উঠিবার সময় দারোগা আবার বলিল—প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন হচ্ছে জানেন তো, দাশজী ?

—আজ্ঞে জানি বৈকি। দাশজী হাসিল। তারপর বলিল—হলে আমরা বাঁচি, দারোগা-বাবু, আমরা বাঁচি।

দারোগাবাবুকে বিদায় করিয়া শ্রীহরি দাশজীকে লইয়া আপনার বৈঠকখানায় উঠিল। ইতিমধ্যে শ্রীহরি একটা নূতন বৈঠকখানা করিয়াছে। খড়ের ঘর হইলেও পাকা সিঁড়ি পাকা বারান্দা পাকা মেঝে।

দাশ তারিফ করিয়া বলিল—বা—বা—বা! এ যে পাকা আসর করে ফেললে, ঘোষ। কিন্তু আমাদের নীলকণ্ঠের গান জানো তো ?—যদি করবে পাকা বাড়ী—আগে কর জমিদারি !

শ্রীহরি তক্তপোশের উপরের সতরঞ্চিটা ঝারিয়া দিয়া বলিল—বসুন।

বসিয়া দাশজী বলিল—জমিদারি কিনবে ঘোষ ?

—জমিদারি ? শ্রীহরি চমকিয়া উঠিল। জমিদারির কল্পনা সে স্পষ্টভাবে কখনও করে নাই।

সে প্রশ্ন করিল—কোন্ মৌজা ? কাছে-পিঠে বটে তো ?

—খোদ শিবকালীপুর। কিনবে ?

শ্রীহরি বিচিত্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দাশজীর দিকে চাহিয়া রহিল। শিবকালীপুরের জমিদারি ? গ্রামের প্রতিটি লোক তাহার প্রজা হইবে ? ঘোষ হইবে সকলের মনিব, বাবু মহাশয়, হুজুর ! চকিতে তাহার অধীর মন নানা কল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রামে সে হাট বসাইবে। স্নানের মজা দীঘিটা কাটাইয়া দিবে। চণ্ডীমণ্ডপে পাকা দেউল তুলিবে, আটচালা ভাঙিয়া নাটমন্দির গড়িবে। এল-পি পাঠশালার বদলে এম-ই স্কুল করিবে; নাম হইবে 'শ্রীহরি এম-ই স্কুল'। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে লোকাল বোর্ডে দাঁড়াইবে।

দাশজী বলিল—কিনে ফেল ঘোষ। তোমার পয়সা আছে। জমিদারি হল অক্ষয় সম্পত্তি। তা ছাড়া—এই গাঁয়ের যারা তোমার শত্রু—একদিন তোমার পায়ে গড়িয়ে পড়বে। সেটেলমেণ্ট ফাইনাল পাবলিকেশনের আগেই কেনো। দরখাস্ত করে নাম সংশোধন করিয়ে নাও। ফাইনাল পাবলিকেশনের পর পাঁচধারার কোর্ট পাবে। টাকায় চার আনা বৃদ্ধি তো হবেই। আট আনার নজীর হাইকোর্ট থেকে নিয়ে রেখেছি। শোন, আমি সুবিধা দরে করে দেব। হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ করে দাও দেখি।

শ্রীহরি দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দীর্ঘকাল পরামর্শ করিয়া হাসিতে হাসিতেই দুজনে বাহির হইল। দাশজী বলিল—ও

নোটিশ তোমার বাজে, একদম বাজে নোটিশ দিয়েছে। তুমি যদি যাও—তার ফলে শান্তি-ভঙ্গ ঘটে—তবে হেনো হবে তেনো হবে, এই তো ?

তারপর মুখের কাছে মুখ আনিয়া ভঙ্গি করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল—কিন্তু শান্তিভঙ্গ যদি না হয় তা হলে ?—দাশজী ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরি বলিল—তবে আমি নিশ্চিন্দি হয়ে করতে পারি ?

—নিশ্চয় ; তবে সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে। কোন হাঙ্গামা যেন না হয়।

—আর গাজনের কি করব ?

—যা হয় কর।

—চণ্ডীমণ্ডপ তাহলে যেমন আছে তেমনি থাক।

—ওই কাজটি করো না ঘোষ। আমি বারণ করছি। চণ্ডীমণ্ডপের সেবাইত জমিদার বটে, কিন্তু অধিকার গাঁয়ের লোকের। পাকা নাটমন্দির, দেবমন্দির নিজের বাড়ীতে কর। সম্পত্তি থাকতেও আছে—যেতেও আছে। যদি কোনদিন সম্পত্তি চলেও যায়—তখন আর কোন অধিকার থাকবে না তোমার।

দাশজী শ্রীহরিকে চণ্ডীমণ্ডপের উপর টাকা খরচ করিতে নিষেধ করিতেছে। যে দিনকাল পড়িয়াছে ! সাধারণের জিনিসে নিজের টাকা খরচ করা মূর্খতা মাত্র।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালেই গ্রামে আর একটা হৈ-চৈ উঠিল।

দেবু ঘোষের আধ-কাটা আমগাছটা গতরাত্রেই কাটিয়া কেহ তুলিয়া লইয়াছে। কেহ আর কে ? শ্রীহরি লইয়াছে। শান্তিভঙ্গ হয় নাই, সুতরাং আইনভঙ্গও সে করে নাই ! সদ্যকাটা গাছটার শিকড়ের উপর আঙুল চারেক কাণ্ডটা কেবল জাগিয়া আছে। কাটা গাছটার অবশিষ্ট কোথাও বিশেষ পড়িয়া নাই। কেবল কতকগুলো ঝরা কাঁচা পাতা, কতকগুলো কাঁচা আম, আঙুলের মত সরু দুই-চারটা ডাল, শিকড়-কাটা কতক কুচা পড়িয়া আছে। জমিটার জলসিক্ত নরম মাটিতে গাড়ীর চাকার দাগে, গরুর ক্ষুরের চিহ্নে, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত রহিয়াছে গত রাত্রের কাহিনী।

ঘোষাল আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছিল—রেগুলার থেফ্‌ট কেস ! হি ইজ এ থীফ্ ! হি ইজ এ থীফ্ ! হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে চালান দেবো।

দেবু বারণ করিল—না। ওসব বল না, ঘোষাল।

জগন বলিল—দুপুরের ট্রেনেই চল মামলা রুজু করে আসি।

তাহাতেও দেবু বলিল—না। ...

ধীর পদক্ষেপে দেবু আসিয়া বসিল যতীনের কাছে।

যতীন বলিল—শুনলাম গাছটা রাতারাতি কেটে নিয়েছে।

দেবু একটু ম্লানহাসি হাসিল। জগন বলিল—মামলা করতে বলছি, দেবু রাজী হচ্ছে না।

—কি হবে মামলা করে ? গাছ আইন অনুসারে জমিদারের। মিছে টাকা খরচ করে

কি লাভ ?

—এরই মধ্যে যে অবসন্ন হয়ে পড়লেন দেবুবাবু ?

—হ্যাঁ। অবসন্ন হয়েছি যতীনবাবু। আর পারছি না।

—দাঁড়ান, একটু চা করি—উচ্চিংড়ে ? উচ্চিংড়ে ?

একা উচ্চিংড়ে নয়, সঙ্গে আরও একটা বাচ্চা আসিয়া হাজির হইল।

—চা করতে বল মা-মণিকে।

হরেন বলিল—এটা আবার কোত্থেকে এসে জুটল ? একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর !

হাসিয়া যতীন বলিল—উচ্চিংড়ের জংশনের বন্ধু। কাল পিছনে পিছনে এসেছিল গাছ কাটার হাঙ্গামা দেখতে। সেখানে বনের পাখী আর খাঁচার পাখীতে মিলন হয়েছে। উচ্চিংড়ে ওকে নিয়ে এসেছে।

—বেশ আছেন মশায়, নন্দী-ভৃঙ্গী নিয়ে ! আপনার কাছেই এসে জোটে সব।

—আমার কাছে নয়। উচ্চিংড়ে ওকে নিয়ে এসেছে—মা-মণির কাছে।

—মানে কামার-বউয়ের কাছে ?

হাসিয়া যতীন বলিল—হ্যাঁ।

—অনিরুদ্ধ ওকে মেরে তাড়াবে।

—কাল সে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। অনিরুদ্ধবাবু তাড়াতে চেয়েছিলেন। মা-মণি বলেছেন ও গরু চরাবে—খাবে থাকবে। অনিরুদ্ধবাবু গরু কিনেছেন কিনা। আর কামার-শালার হাপর টানবে।

উচ্চিংড়ে আসিয়া দাঁড়াইল—চা লাও গো বাবু।

ওদিক ঢাক বাজিয়া উঠিল। উচ্চিংড়ে তাড়াতাড়িতে অর্ধেক চা উপচাইয়া ফেলিয়া, চায়ের বাটিগুলি নামাইয়া দিয়াই—দাওয়া হইতে এক লাফ দিয়া পড়িল ; ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ন্যাটাং ড্যাটাং ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ন্যাটাং ড্যাটাং ! আয় রে গোবরা, শিব উঠছে দেখতে যাই।

গাজনের ঢাক বাজিতেছে। পূর্ণ এক বৎসর পরে গাজনের বুড়াশিব পুকুরের জল হইতে উঠিবেন। ভক্তেরা দোলায় করিয়া লইয়া আসিবে।

জগন বলিল—ভক্ত কে কে হল জান, ঘোষাল ?

হরেন বলিল—ওন্‌লি ফাইব্। একটা হাতের আঙুলি প্রসারিত করিয়া সে দেখাইয়া দিল।

—চল, ব্যাপারটা দেখে আসি।

—চল !

জগন, হরেন চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—দেবুবাবু !

—বলুন ?

—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি—দেবু হাসিল। তারপর বলিল—দেখবেন ?

—কি ?

—আসুন আমার সঙ্গে।

অল্প খানিকটা আসিয়াই শ্রীহরির বাড়ী, বাড়ীর পর খামার। পথ হইতেই খামারটা দেখা যায়। প্রকাণ্ড একটা জনতা সেখানে জমিয়া আছে। খামারের উঠানের মাঝখানে সোনার বর্ণ ধানের একটি স্তূপ। পাশেই তিনটি বাঁশের তেপায়াতে বড় বড় ওজনের কাঁটা-পাল্লা টাঙানো হইয়াছে। একটা গাছের তলায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছে শ্রীহরি। জনকয়েক লোক দেবু ও যতীনকে দেখিয়া আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইল। ওদিকে ওজনের পাল্লায় অবিরাম ধান ওজন চলিতেছে—দশ দশ—দশ রামে—ইগার ইগার। ইগার ইগার—ইগার রামে—বারো বারো।

দেবু বলিল—দেখলেন !

যতীন হাসিয়া বলিল—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে' !

—কি ভাবছি আমি বুঝলেন ? আমি একা পড়ে গিয়েছি।

কিছুক্ষণ পর যতীন বলিল—আপনি তা হলে বিবাদ মিটিয়ে ফেলুন দেবুবাবু। সত্যিই বড় কষ্টে পড়বেন আপনি।

দেবু হাসিল, বলিল—নাঃ, ও ভাবনা আর ভাবি নে। ভাবছি—এতদিনের গাজন, আমাদের গ্রামে গাজনে কত ধুম ছিল, সমস্ত গ্রামের লোক প্রাণ দিয়ে খাটত। অন্য গাঁয়ের সঙ্গে আমাদের গাজনের ধুমের পাল্লা চলত। সে-সব উঠে যাবে। নয়তো শ্রীহরির একলার হাতে গিয়ে পড়বে। দেবতাতে সুদ্ধ আমাদের অধিকার থাকবে না। ভগবানে আমাদের অধিকার থাকবে না। আমাদের ভগবান পর্যন্ত কেড়ে নেবে !

নেলো আসিয়া দাঁড়াইল।

যতীন বলিল—কি সংবাদ নলিন ?

—আট আনা পয়সা। গাজনে এবার মেলা বসাবে ঘোষ মশায়। পুতুল তৈরী করে বিক্রী করব। রং কিনব।

—মেলা বসাবে শ্রীহরি ? দেবু উঠিয়া বসিল।

নলিনকে বিদায় করিয়া যতীন বলিল—নলিনের হাতটি চমৎকার।

দেবু বলিল—ওর মাতামহ যে ছিল নামকরা কুমোর।

—কুমোর ! নলিন তো বৈরাগী !

—হ্যাঁ, কাঁচের পুতুলের চল হল, শেষ বয়সে অভাবে পড়ে বুড়ো ভিক্ষে ধরে বোষ্টম হয়েছিল। তা ছাড়া বিধবা মেয়েটার বিয়ের জন্যও বোষ্টম হওয়া বটে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া দেবু আবার বলিল—শ্রীহরি এবার তা হলে ধুম করে গাজন করবে দেখছি !

পঁচিশ

ঢাকের গাজনার শব্দে ভোরবেলাতেই—ভোরবেলা কেন—তখনও খানিকটা রাত্রি ছিল, যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গাজনের ঢাক। পূর্বে চৈত্রের প্রথম দিন হইতেই গাজনের ঢাক বাজিত। গতবার হইতে পাতু দেবোত্তর চাকরান জমি ছাড়িয়া দেওয়ার পর, চৈত্রের বিশ তারিখ হইতে ঢাক বাজিতেছে। ভিন্ন গ্রামের একজন বায়েনের সঙ্গে নগদ বেতনে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। শেষ রাত্রিতে ঢাকের বাজনা—যতীনের বেশ লাগিল। ঢাকের বাজনার মধ্যে আছে একটা গুরু-গম্ভীর প্রচণ্ডতা। রাত্রির নিস্তব্ধ শেষ প্রহরে প্রচণ্ড গম্ভীর শব্দের মধ্যেও একটি পবিত্রতার রেশ সে অনুভব করিল। দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া বসিল।

সে আশ্চর্য হইয়া গেল ;—গ্রামখানায় এই শেষরাত্রেই জাগরণের সাড়া উঠিয়াছে! ঢেকিতে পাড় পড়িতেছে ; মেয়েরা ইহারই মধ্যে পথে বাহির হইয়াছে। হাতে জলের ঘটি। চণ্ডীমণ্ডপে জল দিতে চলিয়াছে। রাঙাদিদি বড় বড় করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম করিতেছে—এখান হইতে শোনা যাইতেছে। জনকয়েক গাজনের ভক্ত স্নান শেষ করিয়া ফিরিতেছে—তাহারা ধ্বনি দিতেছে—বলো শি-বো-শি-বো-শিবো-হে! হর-হর বোম্—হর-হর বোম্!

যতীন সকালেই ওঠে, কিন্তু এই শেষরাত্রে সে কোনদিন ওঠে নাই। পল্লীর এ ছবি তাহার কাছে নূতন। সে যখন ওঠে, তখন রাঙাদিদি ভগবানকে এবং পিতৃপুরুষকে গালিগালাজ আরম্ভ করে। মেয়েদের ঘরের পাট-কাম দেবার্চনা শেষ হইয়া গৃহকর্ম আরম্ভ হইয়া যায়।

অনিরুদ্ধের বাড়ীর খিড়কীর দরজা খুলিয়া গেল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তির মত উচ্চিংড়ে ও গোবরা বাহির হইয়া গেল। তাহাদের পিছনে বাহির হইয়া আসিল পদ্ম, তাহার হাতেও জলের ঘটি।

একটানা ক্যাঁ-কোঁ শব্দে একখানা সার-বোঝাই গরুর গাড়ী চলিয়া গেল। শেষ রাত্রি হইতেই মাঠের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। সার ফেলার কাজ চলিতেছে। সারের গাড়ীতেই আছে—জোয়াল লাঙল। সার ফেলিয়া জমিতে লাঙল চষিবে। সেদিনের জলের রস এখনও জমিতে আছে। মাটির বতর এখন চমৎকার, অর্থাৎ রোদ পাইয়া কাদার আঠা মরিয়া মাটি চমৎকার চাষের যোগ্য হইয়াছে। লাঙলের ফাল কোমল মাটির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া চিরিয়া চলিবে নিঃশব্দে, নির্বিঘ্নে, স্বচ্ছন্দ গতিতে—ছানার তালের মধ্যে ধারালো ছুরির মতন। বড় বড় চাঁই দুইপাশে উল্টাইয়া পড়িবে ; অথচ লাঙলের ফালে এতটুকু মাটি লাগিবে না, সামান্য আঘাতেই চাঁইগুলো গুঁড়া হইয়া যাইবে। গরু মহিষগুলি চরিবে অবহেলায় ধীর অনায়াস গতিতে। এই কর্ষণের মধ্যে চাষীর বড় আনন্দ। অন্তরে অন্তরে যেন আনন্দের রস ক্ষরণ হয়।

একসঙ্গে সারিবন্দী শোভাযাত্রার মত হাল গেল ছয়খানা ; পিছনে চারখানা সার-বোঝাই গাড়ী। বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় হেলে-বলদগুলি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। এগুলি সবই শ্রীহরি ঘোষের। ঘোষের ঘরে দশখানা হাল, কুড়িজন কৃষাণ। ঘোষের সুপ্রসন্ন ভাগ্যচ্ছটার প্রতিফলন তাহার সর্বসম্পদে সুপরিস্ফুট।

যতীন জামা গায়ে দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অতিক্রম করিয়া আসিয়া পড়িল মাঠে। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠে। মাঠের প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ, বাঁধের গায়ে কচি সবুজ শরবনের চাপ। তাহারই ভিতর হইতে উঠিয়াছে—তালগাছের সারি। মধ্যে মধ্যে পলাশ-পালতে-শিমুল-শিরীষ-তেঁতুলের গাছ। গাছগুলির মাথার উপরে অস্পষ্ট আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের গায়ে জংশন-শহরের কলের চিমনী। কলে ভোঁ বাজিতেছে—একসঙ্গে চার-পাঁচটা কলে বাজিতেছে। বোধ হয় চারিটা বাজিল।

মাঠ পার হইয়া সে বাঁধে উঠিল। বাঁধ হইতে নামিল ময়ূরাক্ষীর চর-ভূমিতে। জল পাইয়া চরে বেনাঘাসগুলি সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে সযত্নকর্ষিত তার ফসলের জমিগুলির গিরিরঙের মাটি বড় চমৎকার দেখাইতেছে। জমির মধ্যে তরকারির চারাগুলি সাপের ফনার মত ডগা বাড়াইয়া লতাইতে শুরু করিয়াছে। ভোরবেলায় তিতির পাখীর দল বাহির হইয়াছে খাদ্যান্বেষণে। উইয়ের ঢিবি, পিঁপড়ের গর্ত ঠোকরাইয়া উই ও পিঁপড়ে খাইয়া ফিরিতেছে। যতীনের পাড়ার কয়টা তিতির ফর-ফর শব্দে উড়িয়া দূরে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে লুকাইল।

আকাশ লাল হইয়া উঠিতেছে। যতীন নদীর বালির উপর গিয়া দাঁড়াইল। পূর্বদিগন্তে চৈত্রের বালুকাগর্ভময়ী ময়ূরাক্ষী ও আকাশের মিলন-রেখায় সূর্য উঠিতেছে। কয়েকদিন পরেই মহাবিষুব-সংক্রান্তি। ময়ূরাক্ষী এখানে ঠিক পূর্ববাহিনী।

ময়ূরাক্ষী পার হইয়া সে জংশনের ঘাটে উঠিল। সপ্তাহে দুই দিন তাহাকে থানায় গিয়া হাজিরা দিতে হয়। অন্যান্য দিন সে চা খাইয়া থানায় যায়। আজ ভোরবেলার নেশায় সে বাহির হইয়া এতটা যখন আসিয়াছে; তখন জংশনে হাজিরার কাজটা সারিয়া যাওয়াই ঠিক করিল।

গ্রামের পথে পা দিয়াই যতীন আবার এক হাঙ্গামার সংবাদ পাইল। হাঙ্গামায় হাঙ্গামায় কয়েকদিন হইতেই গ্রামখানার মন্থর জীবন-যাত্রা অকস্মাৎ যেন তালভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আজ শ্রীহরির বাগানে কে বা কাহারা গাছ কাটিয়া তছনছ করিয়া দিয়াছে। গুজবে, জটলায়, উত্তেজনায় গ্রামখানা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে আটচালায় শ্রীহরি ঘোষ রাগে-দুঃখে অধীর হইয়া প্রায় মাথার চুল ছিঁড়িয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ তাহার মধ্য হইতে আজ বাহির হইয়া আসিয়াছে পূর্বের সেই বর্বর ছিরু পাল।

গ্রাম হইতে অল্প দূরে—উত্তর মাঠে অর্থাৎ যেদিকে ময়ূরাক্ষী নদী—তাহার বিপরীত দিকে, বন্যাভয়-নিরাপদ মাঠের মধ্যে—একটা মজা পুকুরে পঙ্কোদ্ধার করিয়া সেই পুকুরের

চারিপাশে শ্রীহরি শখ করিয়া বাগান তৈয়ারী করিয়াছিল। অতীত দিনের চাষী ছিরুর সৃষ্টির নেশার সঙ্গে—বর্তমানের আভিজাত্যকামী শ্রীহরির কল্পনা মিশাইয়া বাগানখানি রচিত হইয়াছিল। বহু দামী কলমের বহু চারা আনিয়া পুঁতিয়াছিল শ্রীহরি; মালদহ মুর্শিদাবাদ হইতে আমের কলম, কলিকাতা হইতে লিচু-জামরুলের কলম ও নানা স্থান হইতে কানাইবাঁশী, অমৃতসাগর, কাবুলী প্রভৃতি কলার চারা সংগ্রহ করিয়া আনাইয়াছিল। শুধু ফলের কামনাই নয়, ফুলের নেশাও তার ছিল—অশোক, চাঁপা, গোলাপ, গন্ধরাজ, বকুলের গাছও অনেকগুলি লাগাইয়াছিল।

শ্রীহরির কল্পনা ছিল আরও অনেক। বাগানের মধ্যে শৌখীন দুই-কামরা একখানি ঘর, ঘরের সামনে পুকুরের দিকে খানিকটা বাঁধানো চত্বর হইতে নামিয়া যাইবে একটি বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি। সেই কল্পনায় কাঁচা ঘাটের দুই পাশে দুইটি কনক-চাঁপার গাছ পুঁতিয়াছিল। অশোক ফুলের চারা বসাইয়াছিল—বাগানে ঢুকিবার পথের পাশেই। গাছগুলি বেশ একটু বড় হইলেই গোড়া বাঁধাইয়া বসিবার স্থান তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা ছিল। সন্ধ্যায় সে বন্ধুবান্ধব লইয়া বাগানে আসিয়া বসিবে, ইচ্ছা হইলে রাত্রে আনন্দ করিবে। গান-বাজনা-পান-ভোজন—কঙ্কণার বাবুদের মত।

গতরাত্রে কে বা কাহারা শ্রীহরি ঘোষের সেই বাগানটিকে কাটিয়া তছনছ করিয়া দিয়াছে শ্রীহরি বলিতেছে—চীৎকার করিয়া বলিতেছে—তাদেরও মাথায় কোপ মারব আমি!

তাহার ধারণা—যাহাদের গাছ সে কাটিয়াছে, এ কাজ তাহাদেরই। পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি আক্রোশে অশ্বত্থামা যেমন নিষ্ঠুর আক্রমণে অন্ধকারের আবরণে পাণ্ডবশিশুগুলিকে হত্যা করিয়াছিল তেমনি আক্রোশেই কাপুরুষ শত্রু তাহাদের শখের চারা-গাছগুলিকে নষ্ট করিয়াছে। শ্রীহরি ছাড়িবে না, অশ্বত্থামার শিরোমণি কাটিয়া সে প্রতিশোধ লইবে। থানায় খবর পাঠানো হইয়াছে। পথে ভূপালের সঙ্গে যতীনের দেখা হইয়াছে।

হরেন ঘোষাল দস্তুরমত ভড়কাইয়া গিয়াছে। শ্রীহরির এই মূর্তিকে তাহার দারুণ ভয়। সে আমলে ছিরু পাল তাহাকে একদিন জলে ডুবাইয়া ধরিয়াছিল।—ঘাড়ে ধরিয়া মুখ মাটিতে রগড়াইয়া দিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভয় করে না, ভদ্রলোক বলিয়া খাতির করে না। যতীন ফিরিতেই সে শুষ্কমুখে আসিয়া কাছে বসিল, বলিল—যতীনবাবু, কেস ইজ সিরিয়াস! ভেরি সিরিয়াস্! ছিরু পাল ইজ্‌ ফিউরিয়াস্! হি ইজ্‌ এ ডেঞ্জারাস ম্যান!

জগন ঘোষ খুব খুশী হইয়াছে। সে ইহাকে সর্বোত্তম সূক্ষ্ম বিচারক বিধাতার দণ্ড-বিচারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়া বিদ্যায় সে আজ দেবভাষায় ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দিল—ষণ্ডস্য শত্রু ব্যাঘ্রেন নিপাতিতঃ। অর্থাৎ ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে।

দেবু বলিল—না ডাক্তার, কাজটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। ছিঃ!

—তোমার কথা বাদ দাও ভাই, তুমি হলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

দেবু কোন উত্তর দিল না; রাগও করিল না। সে সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছে। ওই গাছগুলি শ্রীহরি যত্নে পুঁতিয়াছিল—ফলও সে ভোগ করিত। শ্রীহরি তাহার গাছ কাটিয়াছে,

তবু দুঃখ সে পাইয়াছিল। কাজটা অন্যায়। গাছপালার উপর তাহারা বড় মমতা। ওই সব গাছ বড় হইত, ফুলে-ফলে ভরিয়া উঠিত প্রতিটি বৎসর; পুরুষানুক্রমে তাহারা বাড়িয়া চলিত। মানুষের চেয়ে গাছের পরমায়ু বেশী। শ্রীহরি, শ্রীহরির সন্তান-সন্ততি তাহার উত্তরাধিকারী। তাহারও পরের পুরুষ ওই গাছের ফলে-ফুলে পরিতৃপ্ত হইত। দেবতার ভোগ দিত, গ্রামে বিলাইত, লোক তৃপ্ত হইত। সে গাছ কি এমনভাবে নষ্ট করিতে আছে?

ভোঁ শব্দে দৌড়াইয়া আসিয়া উচ্চিংড়ে বলিল—দারোগা এসেছে।

হরেন চমকাইয়া উঠিল—কোথায়?

উচ্চিংড়ে তখন বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। জবাব দিল গোবরা, সে উচ্চিংড়ের পিছনে ছিল, বলিল—সেই পুকুর দেখে গাঁয়ে আসছে।

এবার জগনও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল—যতীনবাবু, বেটা নিশ্চয় আমাদের সবাইকেই সন্দেহ করে এজাহার দেবে। পুলিসও বোধ হয় আমাদেরই চালান দেবে। জামিন-টামিনের ব্যবস্থা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে। আপনি কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে চিঠি লিখে রাখুন।

—দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল।—জামাই-পণ্ডিত!

—দুর্গা? দেবু যতীনের তক্তপোশে শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল।

—হ্যাঁ। বাড়ী এস।

—কেন রে?

—পুলিস এসেছে, ঘর দেখবে। ডাক্তার, আপনার ঘরের সামনেও সিপাই দাঁড়িয়েছে।

হরেন সর্বাগ্রে উঠিয়া বলিল—মাই গড! মায়ের গীতাটা নিয়ে হয়েছে আমার মরণ।

একজন পুলিসের কনেস্টবল জনতিনেক চৌকিদার লইয়া আসিয়া অনিরুদ্ধের তিন দরজায় পাহারা দিয়া বসিল।

পথে যাইতে যাইতে দুর্গা বলিল—জামাই-পণ্ডিত!

—কি রে?

—ঘরে কিছু থাকে তো আমাকে দেবে। আমি ঠিক পেট-আঁচলে নিয়ে বাইরে চলে যাব।

—কি থাকবে আমার ঘরে? কিছু নাই!

বাড়ীর দুয়ারে সাব-ইন্সপেকটার নিজে ছিল; সে বলিল—পণ্ডিত, আপনার ঘর আমরা সার্চ করব। দুগ্‌গা, তুই ভেতরে যাস নে!

দুর্গা বলিল—ওরে বাবা, দুধের ঘটি রয়েছে যে দারোগাবাবু। আবার আমাকে নিয়ে পড়লেন ক্যানে?

হাসিয়া দারোগা বলিল—তুই ভারী বজ্জাত। কোথায় ঘটি আছে বল—চৌকিদার এনে দেবে।

দেবু বলিল—আসুন দারোগাবাবু। দুর্গা তুই বস, ঘটি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দারোগা বলিল—ঝরঝরে জায়গায় বস, দুর্গা দেখিস—সাপে কি বিছেয় কামড়ায় না যেন !

দেবু একটা জিনিসের কথা ভাবে নাই।

পুলিস বাড়ী-ঘর অনুসন্ধান করিয়া, দা-কুড়ুল-কাটারী বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে গত রাত্রের কচি গাছ কাটার কোন চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু সে-সব কিছু পাওয়া গেল না। কাচা কাপড়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহাতে কলাগাছের কষের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু তাও ছিল না। পুলিস লইল নূতন প্রজা সমিতির খাতাপত্রগুলি। এই খাতাপত্রগুলির কথাই দেবুর মনে ছিল না। অন্য সকলের বাড়ী হইতে পুলিস শুধু হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শ্রীহরি যতীনের নামেও এজাহার দিয়াছিল—তাহাকে তাহার সন্দেহ হয়। শ্রীহরির বন্ধু জমাদার-সাহেব হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সাব-ইন্সপেকটার শ্রীহরির এ কথা গ্রাহ্যই করিল না। বলিল—ঘোষ মশায়, সবেরই মাত্রা আছে, মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না।

এ সংসারে যাহারা আপন সত্যের বিধান লঙ্ঘন করিতে চায়—বিধাতাকে সব চেয়ে বেশী মানে তাহারাই। বিধাতার তুষ্টিলাভ করিলে সর্বপ্রকার বিধান-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধের দণ্ড লঘু হইয়া যায়—এই বিশ্বাসই তাহাদের জীবনে পরম আশ্বাস। শ্রীহরি তাড়াতাড়ি বলিল—না—না—না। ওটা আমারই ভুল। ও আপনি ঠিক বলেছেন।

যাহা হউক, দেবুর ঘর তল্লাস করার পর দারোগো বলিল—পণ্ডিত, আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করছি। আপনি প্রজা সমিতির প্রেসিডেণ্ট, এ কাজটা প্রজা সমিতির দ্বারাই হয়েছে বলেই সন্দেহ হচ্ছে আমাদের। অবশ্য এনকোয়ারী আমাদের এখনও শেষ হয় নি ; উপস্থিত আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম। চার্জটা অবশ্যি থেফ্‌ট্‌!

দেবু বলিল—থেফ্‌ট্‌ চার্জ—চুরি ? আমার বিরুদ্ধে ?

হাসিয়া দারোগা বলিল—গাছ কাটা তো আছেই, সেটার সমন করবেন এস-ডি-ও। ঘোষের দুটো লোহার তারের জাফরি চুরি গেছে।

—আমাকে চুরির চার্জে চালান দেবেন দারোগাবাবু ?—দেবু মর্মান্তিক আক্ষেপের সহিত প্রশ্ন করিল।

—অর্জুনের মত বীরকে সময়-দোষে নপুংসক সাজতে হয়েছিল, জানেন তো পণ্ডিত ! ও নিয়ে দুঃখু করবেন না। বেলা তো অনেক হয়ে গেল, খাওয়া-দাওয়া সেরেই নিন !

দারোগার কথায় দেবু আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনা পাইল। সে হাসিয়া বলিল—আপনি একটু জল-টল খাবেন ?

—চাকরি পেটের দায়ে পণ্ডিত। খাব নিশ্চয়। তবে আপনার ঘরেও না, ঘোষের ঘরেও নয়। আমাদের যতীনবাবু আছেন। ওখানেই যা হয় হবে।

দারোগা আসিয়া যতীনের ওখানে বসিল।

গ্রামের লোকেরা অবনত মস্তকে চারিপাশে বসিয়া ছিল। সকলেই সবিস্ময়ে ভাবিতেছিল

—কে এ কাজ করিল!

মেয়েরা আসিয়া জড় হইয়াছে—দেবুর বাড়ী। অনেকে উঠানের উপর ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়াছে। বিলু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। দুর্গার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে অনর্গল ধারায়। রাঙাদিদির আর বিলাপের শেষ নাই। পদ্ম বসিয়া আছে বিলুর পাশে। বিলুর দুঃখে সেও অপরিসীম দুঃখ অনুভব করিতেছে। মনে হইতেছে—আহা, এ দুঃখের ভার যদি সে নিজে লইয়া বিলুর দুঃখ মুছিয়া দিতে পারিত! অবগুণ্ঠনের মধ্যে তাহার চোখ হইতেও টপ টপ করিয়া জল মাটির উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।

অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিল উচ্চিংড়ে। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে সুকৌশলে মাথা গলাইয়া একেবারে পদ্মের কাছে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—শীগ্‌গির বাড়ী এস মা-মণি!

যতীনের দেখাদেখি সে-ও পদ্মকে মা-মণি বলে।

পদ্ম বিরক্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল—কেন?—সে অবশ্য বুঝিয়াছে, যতীনের তলব পড়িয়াছে, চা করিতে হইবে।

—কর্মকারকে যে দারোগাবাবু ধরে নিয়ে যাচ্ছে গো!

পদ্মের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। অনিরুদ্ধকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে! সে আবার কি কথা! একা পদ্ম নয়, কথাটায় সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।

দেবু প্রশ্ন করিল—তার আবার কি হ'ল?

কর্মকার সে সাউখুড়ি করে বললে—আমাকে ধর হে। আমি গাছ কেটেছি। দারোগা অমনি ধরলে। বলতে বলতেই উচ্চিংড়ে যেমন ভিড়ের ভিতর দিয়া সুকৌশলে মাথা গলাইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি সুকৌশলেই বাহির হইয়া গেল।

কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া পদ্মও মেয়েদের ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

—কামার-বউ!

পদ্ম পিছন ফিরিয়া দেখিল, ডাকিতেছে দুর্গা।

—দাঁড়াও, আমিও যাব।

উচ্চিংড়ে কথাটা গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বলিয়াছে। স্তব্ধ জনতার মধ্য হইতে নিতান্ত অকস্মাৎ অনিরুদ্ধ চোখ-মুখ দৃপ্ত করিয়া দারোগার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া আসিয়া বলিয়াছিল—দেবু পণ্ডিতের বদলে আমাকে ধর। ও গাছ কাটে নাই, গাছ কেটেছি আমি।

ডেটিনিউ যতীনের ঘরে দাওয়ায় বসিয়াছিল দারোগা। তাহার সম্মুখে জমিয়া দাঁড়াইয়াছিল একটি জনতা। সেই দারোগা হইতে সমবেত জনতা আকস্মিক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

অনিরুদ্ধ বলিয়াছিল—কাল রেতে টাঙি দিয়ে আমি বেবাক গাছ কেটেছি, জাফরি ছুটো

তুলে ফেলে দিয়েছি 'চরখাই' পুকুরের জলে।

মিথ্যা কথা নয়। ধারালো টাঙি দিয়া অনিরুদ্ধ তাহাদের গাছ-কাটার প্রতিশোধ তুলিয়াছে ছিরু পালের উপর। উন্মত্ত প্রতিশোধের আনন্দে গাছ কাটিতে কাটিতে সে সেই অন্ধকার রাত্রে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে, আর ছোট ছেলেদের মত মুখে বলিদানের বাজনার বোল আওড়াইয়াছে—খা-জিজং-জিজং-জিনাক্-জিং-জিং ; না-জিং-জিং জিনাক্। একথা কেহ জানে না, সে কাহাকেও বলে নাই, এমন কি পদ্মকে পর্যন্ত না। ওই ছেলে দুটাকে লইয়া পদ্ম আজকাল পৃথক শুইয়া থাকে ; রাত্রে নিঃশব্দে অনিরুদ্ধ উঠিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়াছেও নিঃশব্দে। সকালবেলা হইতে সে ছিরুর আস্ফালন শুনিয়া মনে মনে কৌতুক বোধ করিয়াছে, পুলিস আসিলেও সে একবিন্দু ভয় পায় নাই। ভোরবেলাতেই টাঙিখানাকে সে আগুনে পোড়াইয়া সকল অপরাধের চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। কাপড়খানাতে অবশ্য কলার কষ লাগিয়াছে—সেখানাকে অনিরুদ্ধ খিড়কির ঘাটে জলের তলায় পুঁতিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যখন দেবু পণ্ডিতকে দারোগা গ্রেপ্তার করিল—তখন সে চমকিয়া উঠিল।

তাহার মনে একটা প্রবল ধাক্কা আসিয়া লাগিল। এ কি হইল? পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করিল? দেবুকে? এইমাত্র কিছুদিন হইল সে জেল হইতে ফিরিয়াছে। বিনাদোষে আবার তাহাকে ধরিল? এ গ্রামের সকলের চেয়ে ভালমানুষ, দশের উপকারী, তাহার পাঠশালার বন্ধু—বিপদের মিত্র—দেবুকে ধরিল! জগনকে ধরিল না, হরেনকে ধরিল না, তাহাকে ধরিল না? ধরিল পণ্ডিতকে! জনতার মধ্যে চুপ করিয়া মাটির দিকে সে ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ মুখে ভাবিতেছিল। তাহার অপরাধের দণ্ড ভোগ করিতে দেবু-ভাই জেলে যাইবে? সমস্ত লোকগুলিই নীরবে হায়-হায় করিতেছে। আক্ষেপে সে অধীর হইয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। একটা অদ্ভুত ধরনের আবেগের প্রাবল্যে দৃপ্ত ভঙ্গিতে সে দারোগার নিকট আসিয়া নিজের হাত বাড়াইয়া বলিল—দেবু পণ্ডিতের বদলে আমাকে ধর। ও গাছ কাটে নাই, গাছ কেটেছি আমি।

মুহূর্তে সমস্ত জনতা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। একটা স্তব্ধতা থম থম করিতে লাগিল। দারোগা পর্যন্ত অনিরুদ্ধের দিকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই স্তব্ধ এবং বিস্মিত পরিমণ্ডলের মধ্যে অনিরুদ্ধ সোচ্চারে নিজের দোষ কবুল করিয়া ফেলিল।

* * * *

এ স্তব্ধতা প্রথম ভঙ্গ করিল দেবু। উচ্চিংড়ের কাছ হইতে খবর পাইয়া বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থর থর কম্পিত কণ্ঠে বলিল—অনি-ভাই, অনি ভাই, কিছু ভেবো না অনি-ভাই! আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে ছাড়াতে চেষ্টা করব।

অনিরুদ্ধ উত্তর দিতে পারিল না—গভীর আনন্দে বোকার মত আকর্ণবিস্তার হাসিয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ হইতে দর দর ধারে জল গড়াইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দেবুও কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গে আরও অনেকে—এমন কি যতীন এবং দারোগা পর্যন্ত চোখ মুছিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের প্রত্যেকেই

অনিরুদ্ধকে সাধুবাদ দিল।—মানুষের মত কাজ করলে অনিরুদ্ধ এবার! এ একশো বার! সাবাস অনিরুদ্ধ, সাবাস!

ইহারই মধ্যে একটি উচ্চ কণ্ঠ জনতার পিছন হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—সাবাস ভাই সাবাস! একশো বার সাবাস!

বিচিত্র ব্যাপার, এ কণ্ঠস্বর সর্বস্বান্ত ভিক্ষুক তারিণী পালের। উচ্চিংড়ের বাবার। লোকটা কালো, লম্বা, দাঁত-উঁচু, খানিকটা খ্যাপা-খ্যাপা। অনিরুদ্ধের এই কাজটির মধ্যে সে কি করিয়া এক মহোল্লাসের সন্ধান পাইয়াছে।

বাড়ীর ভিতরে পদ্ম নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, চোখ দিয়া তাহার শুধু জলই ঝরিতেছিল। তাহার বাক্য হারাইয়া গিয়াছে, চোখের জল গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। দুর্গা দাঁড়াইয়া ছিল অল্প দূরে। উচ্চিংড়ে ও গোবরা কাছেই ছিল; অনিরুদ্ধ ভিতরে আসিতেই তাহারা সরিয়া গেল। অনিরুদ্ধ এতক্ষণে সপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—চললাম তা হলে।

পদ্মের তখনও ভাত হয় নাই, যতীনেরও অল্প দেরি আছে। দেবু বলিল—আমার জন্য ভাতে-ভাত হয়েছে অনি-ভাই, তাই দুটো খেয়ে নেবে, চল।

দেবুর ঘরেই খাইয়া অনিরুদ্ধ থানায় চলিয়া গেল।

যাইবার সময় দারোগা দুর্গাকে একটা তলব দিয়া গেল—থানাতে যাবি একবার। তোর নামেও একটা রিপোর্ট হয়েছে।

আজ যতীন নিজে রান্না করিল। উদ্যোগ করিয়া দিল উচ্চিংড়ে এবং গোবরা। দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত বলিয়া দিল দুর্গা।

পদ্ম কিছুক্ষণ ঘরে বসিয়াছিল, তাহার পর গিয়া বসিল খিড়কির ঘাটে। সেখানে বসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে নামহীন কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া তীব্র নিষ্ঠুরতম অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিল।

—শরীরে ঘুন ধরবে, আকাট রোগ হবে! শরীর যদি পাথর হয় তো ফেটে যাবে, লোহার হয়তো গলে যাবে! অলক্ষ্মী ঘরে ঢুকবে—লক্ষ্মী বনবাস যাবে! ঘরে আগুন লাগবে, ধানের মরাই ছাইয়ের গাদা হবে!

মনের ভিতর রূঢ়তর অভিসম্পাতের আরও চোখা-চোখা বাণী ঘুরিতেছিল—বউ বেটা মরবে, পিণ্ডি লোপ হবে, জোড়া বেটা এক বিছানায় শুয়ে ধড়ফড় করে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল—বিশীর্ণ গৌরবর্ণা এক সীমন্তিনী নারীর অতি কাতর করুণা-ভিক্ষু মুখ। অল্পে অল্পে সে চুপ করিয়া গেল।

দুর্গা আসিয়া ডাকিল—কামার-বউ এস ভাই, নজরবন্দীবাবু রান্না নিয়ে বসে আছেন। পদ্ম উত্তর দিল না।

—থালভরি, উঠে আয় কেনে! পিণ্ডি খাবি না? তোর লেগে আমরাও খাব না নাকি?

এবার আসিয়া এমন মধুর সম্ভাষণে ডাকিল উচ্চিংড়ে।

পদ্ম উত্তর দিল—তোরা খা না গিয়ে হতভাগারা, আমি খাব না, যা।

—খেতে দিছে না যি লজরবন্দীবাবু। তুমি না খেলে আমাদিকে দেবে না। নিজেও খায় নাই। কম্মকার তো মরে নাই—তবে তার লেগে এত কাঁদছিল ক্যানে?

—তবে রে মুখপোড়া!—পদ্ম ক্রোধভরে তাহাকে তাড়া করিয়া আসিয়া সেই টানে একেবারে বাড়ী ঢুকিয়া পড়িল।

* * *

উনত্রিশে চৈত্র অনিরুদ্ধের মামলার দিন পড়িয়াছে। বিচার করিবার কিছু নাই; সে নিজেই স্বীকারোক্তি করিয়াছে।—পুলিসের কাছে করিয়াছিল। হাকিমের কাছেও করিয়াছে। উকিল মোক্তার কাহারও পরামর্শেই সে তাহা প্রত্যাহার করে নাই। সে যেন অকস্মাৎ বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিনের সর্বজনের বাহবা তাহাকে যেন একটা নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। সাজা তাহার হইবেই। দেবু কয়েক দিনই সদর শহরে গিয়াছিল, উকিল-মোক্তারও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সকল উকীল-মোক্তারে এক কথাই বলিয়াছে। সাজা দুই মাস হইতে ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু সাজা হইবে।

ইহার মধ্যে ইন্সপেকটার আসিয়া একবার তদন্ত করিয়া গিয়াছে। প্রজা সমিতির সহিত কোন সংস্রব আছে কিনা—ইহাই ছিল তদন্তের বিষয়। ইন্সপেকটার তাহার ধারণা স্পষ্টই গ্রামের লোকের কাছে বলিয়া গিয়াছে—প্রজা সমিতি এ কাজ করতে বলে নাই এটা ঠিক কিন্তু প্রজা সমিতি যদি না থাকত গ্রামে, তবে এ কাণ্ড হত না। এতে আমি নিঃসন্দেহ।

দুর্গাকে ডাকা হইয়াছিল—তাহার বিরুদ্ধে নাকি রিপোর্ট হইয়াছে। কে রিপোর্ট করিয়াছে না বলিলেও দুর্গা বুঝিয়াছে। ইন্সপেকটার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—শুনছি তোর যত দাগী বদমায়েশ লোকের সঙ্গে আলাপ, তাদের সঙ্গে তুই—। ব্যাপার কি বল তো?

দুর্গা হাত জোড় করিয়া বলিল -আজ্ঞে হুজুর, আমি নষ্ট-দুষ্ট—একথা সত্যি, তবে মশায় আমাদের গাঁয়ের ছিরু পাল—। জিভ কাটিয়া সে বলিল—না, মানে ঘোষ মহাশয়, শ্রীহরি ঘোষ, থানার জমাদারবাবু, ইউনান বোর্ডের পেসিডেনবাবু—এঁরা সব যে দাগী বদমাশ লোক—এ কি করে জানব বলুন! মেলামেশা আলাপ তো আমার এঁদের সঙ্গে!

ইন্সপেকটার ধমক দিল। দুর্গা কিন্তু অকুতোভয়। বলিল—আপনি ডাকুন সবাইকে - আমি মুখে মুখে বলছি। এই সেদিন রেতে জমাদার ঘোষ মশায়ের বৈঠকখানায় এসে আমোদ করতে আমাকে ডেকেছিলেন -আমি গেছিলাম। সেদিন ঘোষ মশায়ের খিড়কীর পুকুরে আমাকে সাপে কামড়েছিল—পেরমাই ছিল তাই বেঁচেছি। রামকিষণ সিপাইজী ছিল, ভূপাল থানাদার ছিল। শুধান সকলকে। আমার কথা তো কারু কাছে ছাপি নাই।

ইন্সপেকটার আর কোন কথা না বাড়াইয়া কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—আচ্ছা

আচ্ছা, যাও তুমি, সাবধানে থাকবে।

পরম ভক্তি সহকারে একটি প্রণাম করিয়া দুর্গা চলিয়া আসিয়াছিল

ছাব্বিশ

ইহার পর বিপদ হইল পদ্মকে লইয়া। তাহার মেজাজের অন্ত পাওয়া ভার। এই এখনই সে একরকম, আবার মুহূর্ত পরেই সে আর এক রকমের মানুষ। উচ্চিংড়ে গোবরা পর্যন্ত প্রায় হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহারা বাড়ীতে বড় একটা থাকে না। বিশ তারিখ হইতে গাজনের ঢাক বাজিয়াছে, মাঠের চেঁচুড়ে দীঘি হইতে বুড়াশিব চণ্ডীমণ্ডপ জাঁকাইয়া বসিয়াছেন; তাহারা দুইজনে নন্দী-ভৃঙ্গীর মত অহরহ চণ্ডীমণ্ডপে হাজির আছে। গাজনের ভক্তের দল বাণ-গোঁসাই লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা সাধিতে যায়—ছোঁড়া দুইটাও সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

গ্রামে গাজনে এবার প্রচুর সমারোহ। শ্রীহরি চণ্ডীমণ্ডপে দেউল ও নাটমন্দির তৈয়ারীর সঙ্কল্প মুলতুবী রাখিলেও হঠাৎ এই কাণ্ডের পর গাজনের আয়োজনে সে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। লোকে ভক্ত হইতে চাহিতেছে না কেন তাহার কারণ সে বোঝে। দেবু ঘোষ, জগন ডাক্তার আর দুগ্ধপোষ্য একটা আগন্তুক বালক ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে অপমান করিবার জন্যই গাজন ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা শ্রীহরি বুঝে। তাই হঠাৎ সে এবার গাজনে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। ছোট ধরনের একটি মেলার আয়োজনও করিয়া ফেলিল। দুই দল ভাল 'বোলান' গান—এক দল ঝুমুর, এক দল কবি-গানের পাল্লার ব্যবস্থা করিয়া সে গ্যাঁট হইয়া বসিল। যাহারা বলিয়াছে চণ্ডীমণ্ডপ ছাইব না, তাহারাই যেন চব্বিশ ঘণ্টা আনন্দ আয়োজনের দ্বারপ্রান্তে পথের কুকুরের মত দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারই জন্য এত আয়োজন। ভাত ছড়াইলে কাক ও কুকুর আপনি আসিয়া জুটে। সেই যেদিন ধান দাদন করে, সেদিন গ্রামের লোক তাহার বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই মধ্যে ভবেশ খুড়া বহুজনের দরবার লইয়া আসিয়াছে। কথাবার্তা চলিতেছে, তাহারা ঘাট মানিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত ; প্রজা সমিতিও তাহারা ছাড়িয়া দিবে বলিয়া কথা দিয়াছে।

গড়গড়া টানিতে টানিতে শ্রীহরি আপন মনেই হাসিল। তবে ওই হরিজনের দলকে সে ক্ষমা করিবে না। কুকুর হইয়া উহারা ঠাকুরের মাথার উপর উঠিতে চায়!

কাল আবার অনিরুদ্ধের মামলার দিন। সদরে যাইতে হইবে। শ্রীহরি চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধ জেলে গেলে পদ্ম একা থাকিবে। অন্নের অভাব হইবে—বস্ত্রের অভাব হইবে। দীর্ঘ-তনু, আয়ত নয়না, উদ্ধতা, মুখরা কামারণী। এবার সে কি করে দেখিতে হইবে। তারপর অনিরুদ্ধের চার বিঘা বাকুড়ি। কামারের গোটা জোতটাই নীলামে উঠিয়াছে। হয়তো নীলাম এতদিন হইয়া গেল। যাক!

কালু শেখ আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—হুজুরের মা ডাকিতেছে।

—মা? ও, আজ যে আবার নীল-ষষ্ঠী!—শ্রীহরি উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল।

চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন নীল-ষষ্ঠী। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও মেয়েদের যাহাদের নীলের মানত আছে, তাহারা ষষ্ঠীর উপবাস করিবে, পূজা করিবে, সন্তানের কপালে ফোঁটা দিবে। নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ এই দিনে নাকি লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লীলাবতীর কোল আলো করিয়া নীলমণির শোভা। নীল-ষষ্ঠী করিলে নীলমণির মত সন্তান হয়।

পদ্ম সকল ষষ্ঠীই পালন করে; সে-ও উপবাস করিয়া আছে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে উচ্চিংড়ে ও গোবরাকে লইয়া। আজ সকালবেলা হইতেই তাহাদের দেখা নাই। চড়ক-পাটা বাহির হইয়াছে। ঢাক বাজাইয়া ভক্তরা গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছে। একটা লোহার কাঁটায় কণ্টকিত তক্তার উপর একজন ভক্ত শুইয়া থাকিবে। সে কি সোজা কথা! সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের পিছনে পিছনে তাহারা ফিরিতেছে। আগে এখানে বাণ ফোঁড়া হইত, এখন আর হয় না।

পদ্ম অপেক্ষা করিয়া অবশেষে নিজেই চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ডীমণ্ডপে ঢাক বাজিতেছে। বোধ হয় এ বেলার মত চড়ক ফিরিয়া আসিল।

চণ্ডীমণ্ডপ ঘিরিয়া মেলা বসিয়াছে। খানবিশেক দোকান। তেলেভাজা মিষ্টির দোকানই বেশী। বেগুনি, ফুলুরী, পাঁপড়-ভাজা হইতেছে। ছেলেরা দলে দলে আসিয়া কিনিয়া খাইতেছে। খানচারেক মণিহারী দোকান। সেখানে তরুণী মেয়েদেরই ভিড় বেশী—ফিতা, টিপ, আলতা, গন্ধ কিনিতেছে। গাছতলায় ছোট আসর পাতিয়া বসিয়াছে তিনজন চুড়িওয়ালী। একটা গাছতলায় বৈরাগীদের নেলোও বসিয়াছে কতকগুলা মাটির পুতুল লইয়া। ওমা! বুড়ো পুতুলগুলো তো বেশ গড়িয়াছে! হুঁকা হাতে তামাক খাইতেছে—আবার ঘাড় নাড়িতেছে! বয়স্কেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অলস পদক্ষেপে। আজকাল দুইদিন কোন চাষের কাজ নাই। হাল চষিতে নাই, গরু জুতিতে নাই। এই দুই দিন সর্বকর্মের বিশ্রাম।

উচ্চিংড়ে ও গোবরার সন্ধান মিলিল না। তাহা হইলে চড়ক হইতে এখনও ফেরে নাই। ও ঢাক শ্রীহরি ঘোষের ষষ্ঠী-পূজার ঢাক। পদ্ম বোধ হয় জানে না—ঘোষ এবার দশখানা ঢাকের বন্দোবস্ত করিয়াছে।

পাতু নিজের গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে বাজাইতে গিয়াছে। সর্বত্রই এক অবস্থা। বাদ্যকরের চাকরান জমি প্রায় সর্বত্রই উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এ গ্রামের ঢাকী ও গ্রামে যায়, সে গ্রামের ঢাকী আসিয়াছে এ গ্রামে। সতীশ বাউড়ীও তাহার বোলানের দল লইয়া অন্য গ্রামে গিয়াছে।

অগত্যা পদ্ম বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাটিতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। পরের সন্তান লইয়া এ কি বিড়ম্বনা তাহার! কিছুক্ষণ পর আবার সে বাহির হইল। এবার শুষ্ক মুখ, ধূলি-ধূসর দেহ ছেলে দুইটাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া যতীনের সম্মুখে আনিয়া বলিল

—এই দেখ, একবার ছেলে ছুটোর দশা দেখ। তুমি শাসন কর।

যতীন কিছু বলিল না, মৃদু হাসিল।

পদ্ম বলিল—হেসো না তুমি। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় তোমার হাসি দেখলে। ভেতরে এস একবার, ফোঁটা দেব!

ফোঁটা দিয়া পদ্ম বলিল—হাসি নয়, উচ্চিংড়েকে তুমি বল্, এমনি করে বাইরে বাইরে ফিরলে তুমি ওকে রাখবেই না এখানে, জবাব দেবে। খেতে দেবে না। গোবরাটা ভাল—ওকে নিয়ে যায় উচ্চিংড়েই। কাল ওরা যেন না বেরোয় ঘর থেকে।

যতীন এবার মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টানিয়া আনিয়া বলিল তথাস্তু মা-মণি। তারপর সে উচ্চিংড়েকে কড়া রকমের ও গোবরাকে মৃদু রকমের শাসন করিয়া দিল। অর্থাৎ দুইজনকে দুই রকমের কান মলিয়া দিল।

কিন্তু তাহাই কি হয়? উচ্চিংড়ে আর গোবরা হোম-সংক্রান্তি, অর্থাৎ গাজনের দিন কি ঘরে থাকিবে? সেই ভোররাত্রেই ঢাক বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চিংড়ে গোবরাকে লইয়া বাহির হইল, আর বাড়ীমুখো হইল না,—পাছে পদ্ম তাহাদের আটক করে।

আজ বুড়ো-শিবের পূজা। পূজা হইবে, বলিদান হইবে, হোম হইবে। আজ ভক্ত শুইয়া থাকিবে সমস্ত দিন। লোহার কাঁটাওয়ালা তক্তাখানা এমনভাবে বসানো আছে যে ঘুরাইলে বন্-বন্ করিয়া ঘোরে।

উচ্চিংড়ে গোবরাকে বলিল—আজ ভাই আমরা শিবের উপোস করব।

—উপোস? গোবরার ক্ষুধাটা কিছু বেশী।

—হ্যাঁ। বাবা বুড়ো শিবের উপোস। সবাই করে, না করলে পাপ হয়। উপোস করলে মেলা টাকা হয়।

সবাই গাজনের উপবাস করে, এ কথাটা গোবরা অস্বীকার করিতে পারিল না। গাজনের উপবাস প্রায় সর্বজনীন। বাউড়ী-বায়েন হইতে উচ্চতম বর্ণ ব্রাহ্মণ আজ প্রায় সকলেরই উপবাস। অনিরুদ্ধের মামলার তদ্বিরে দেবু উপবাস করিয়াই সদরে গিয়াছে। শ্রীহরিরও উপবাস। কিন্তু উপবাস করিলেই টাকা হয়—এ কথাটা গোবরা স্বীকার করিতে পারিল না। তাহা হইলে পণ্ডিত গরীব কেন?

গোবরার অন্তরের একান্ত অনিচ্ছা উচ্চিংড়ে বুঝিল; বলিল—বেশী ক্ষিদে লাগে তো, দুই চৌধুরীদের বাগানে গিয়ে আম পেড়ে খাব! বেশ বড় বড় হয়েছে—বুঝলি? আম পাড়লে চৌধুরীরা কিছু বলবে না, আর ওতে পাপও হবে না।

এবার গোবরার তেমন আপত্তি রহিল না।

—শেষকালে না-হয় কারু বাড়ীতে মেগে খাব দুটো।

—উঁহু। মা-মণি তা হলে মারবে। বলবে—ভিখিরি কোথাকার, বেরো হতভাগারা!

—তবে চল, আমরা মহাগেরাম যাই। সেখানে এখানকার চেয়ে বেশী ধুম। আর সেখানে মেগে খেলে, মা-মণি কি করে জানবে? তাই চল।

গোবরা এ প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

গ্রামের প্রান্তে একটা জলশূন্য পুকুরের পাড়ে খোঁড়া পুরোহিতের তেঠেঙে ঘোড়াটা ঘাস খাইতেছিল। উচ্চিংড়ে দাঁড়াইল। বলিল—এই ঘোড়াটা ধর দিকি!

—চাঁট ছুঁড়বে।

—তোর মাথা! পেছনকার একটা ঠ্যাং খোঁড়া। চাঁট ছুঁড়তে গেলে নিজেই ধপাস করে পড়ে যাবে। ধর ওইটার ওপর চেপে দুজনা চলে যাব। তোর কাপড়টা খোল, নাগাম করব।

সত্যই ঘোড়াটা চাঁট ছুড়িতে পারে না; কিন্তু কামড়ায় খেঁকী কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া মাথা উঁচাইয়া কামড়াইতে আসে। এটা উচ্চিংড়ে জানিত না। সম্ভবত এটা ঘোড়াটার আত্মরক্ষার আধুনিকতম অস্ত্র আবিষ্কার। অশ্বারোহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল।

* * * *

সন্ধ্যায় গাজনের পূজা শেষ। চড়ক শেষ হইয়াছে। ভক্তদের আগুন লইয়া ফুল-খেলাও হইয়া গিয়াছে। বলি-হোমও হইয়া গিয়াছে। কপালে তিলক পরিয়া ভবেশ ও হরিশ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে। শ্রীহরি এখনও সদর হইতে ফেরে নাই। ঢাকীর দল প্রচণ্ড উৎসাহে ঢাকের বাজনার কেরামতি দেখাইতেছে। বড় বড় ঢাক, ঢাকের মাথায় দেড় হাত লম্বা পালকের ফুল। এ ঢাকের আওয়াজ প্রচণ্ড, ভদ্রলোকেরা বলে, ঢাকের বাদ্য থামিলেই মিষ্ট লাগে। কিন্তু ঢাকের গুরুগম্ভীর আওয়াজ নিপুণ বাদ্যকরের হাতে রাগিণীর উপযুক্ত বোলে যখন বাজে, তখন আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া যায়—গুরুগম্ভীর ধ্বনির আঘাতে মানুষের বুকের ভিতরেও গুরুগম্ভীর ঝঙ্কার উঠে। নাচিয়া নাচিয়া নানা ভঙ্গি করিয়া মুখে বোল আওড়াইয়া—এক-একজন ঢাকী পর্যায়ক্রমে ঢাক বাজাইতেছে, তাহাদের নাচের সঙ্গে নাচিতেছে—কাকের পাখার কালো পালকের তৈয়ারী ফুল; একেবারে মাথার কাছে বকের সাদা পালকের গুচ্ছ।

হরিশ আক্ষেপ করিতেছিল—এবার চৌধুরী আসতে পারলেন না! ঠাঁইটি একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

চৌধুরী প্রতি বৎসর উপস্থিত থাকে। ঢাকের বাজনার সে একজন সমঝদার শ্রোতা। বসিয়া বসিয়া তালে তালে ঘাড় নাড়ে। পাশে থাকে একটি পোঁটলা। বাজনার শেষে চৌধুরী পোঁটলা খুলিয়া পুরস্কার দেয়—কাহাকেও পুরানো জামা, কাহাকেও পুরানো চাদর, কাহাকেও বা পুরানো কাপড়। এবার চৌধুরী শয্যাশায়ী হইয়া আছে। সেই মাথায় আঘাত পাইয়া বিছানায় শুইয়াছে, আর উঠে নাই। ঘা শুকাইতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প জ্বরও হইতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের চারিপাশে মেলার মধ্যে পথে ভিড় এখন প্রচুর। মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী, পুরুষ দলে দলে ঘুরিতেছে। সন্ধ্যার পর কবিগান হইবে। কলরবের অন্ত নাই। অকস্মাৎ সেই

কলরব ছাপাইয়া কালু শেখের গলা শোনা গেল—হঠ হঠ, হঠ সব !

ভিড় ঠেলিয়া পথ করিয়া কালু শেখ বাহির হইয়া আসিল—তাহার পিছনে শ্রীহরি। ঘোষ ফিরিয়াছে। ভবেশ ও হরিশ অগ্রসর হইয়া গেল।

শ্রীহরি ফোকলা দাঁতে একগাল হাসিয়া বলিল—সুখবর। দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

*　　*　　*

পথের ভিড় ঠেলিয়া দেবু ঘোষও যাইতেছিল। বিমর্ষমুখে সে গেল যতীনের ওখানে।

যতীন, দেবু, জগন ও হরেন—আজ সান্ধ্য মজলিসে লোক কেবল চারজন। সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আজিকার সমস্যা—পদ্মকে এ সংবাদটা কে দিবে, কেমন করিয়া দিবে ?

ভিতরের দরজায় শিকল নড়িয়া উঠিল। পদ্ম ডাকিতেছে। যতীন উঠিয়া গেল। অনিরুদ্ধের দণ্ডের কথা শুনিয়া যতীন খুব বিষণ্ণ হয় নাই। দুই মাস জেল—যতীনের মতে লঘুদণ্ডই হইয়াছে। যে মন লইয়া অনিরুদ্ধ দেবুকে মিথ্যা দণ্ড হইতে বাঁচাইতে গিয়া সত্য স্বীকারোক্তি করিয়াছে, সে মন যদি তাহার টিকে—তবে সে নূতন মানুষ হইয়া ফিরিবে। আর যদি সে মন বুদ্‌বুদের মত ক্ষণস্থায়ীই হয়—তবুও বা দুঃখ কিসের! দারিদ্র্য-ব্যাধিতে জীর্ণ মনুষ্যত্বের মৃত্যু তো ধ্রুবই ছিল। কিন্তু বিপদ হইয়াছে পদ্মকে লইয়া। কি মায়ায় যে এই অশিক্ষিতা আবেগসর্বস্বা পল্লী-বধূটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি দিয়া বিশ্লেষণ করিয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। বৃহত্তর জীবন, মহত্তর স্বার্থের মানদণ্ডে ওজন করিয়াও সে কিছুতেই তাহার মূল্যকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলিতে পারে না। মাটির মূর্তির মধ্যে সে দেবীরূপ কল্পনা করিতে পারে না। জলে বিসর্জন দিলে সে মূর্তি গলিয়া কাদা হইয়া যায়, জলতলে সে রূপ পঙ্ক-সমাধিলাভ করে, এ সত্য মনে করিয়া সে হাসে। কিন্তু ঐ ভঙ্গুর মাটির মূর্তি অক্ষয় দেবীরূপ লাভ করিল কেমন করিয়া ? কালের নদী-জলে তাহাকে বিসর্জন দিলেও যে সে গলিবে না বলিয়া মনে হইতেছে। শিক্ষা নাই সংস্কৃতি নাই—অভিমান ও কুসংস্কার-সর্বস্ব পদ্ম মাটির মূর্তি ছাড়া আর কি ? সে এমন সজীব দেবীমূর্তি হইয়া উঠিল কি করিয়া ? কোন্ মন্ত্রে ?

ইতিমধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পদ্মের চোখ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখের জল মুছিতে মুছিতে ম্লান হাসিয়া সে বলিল—দু' মাস জেল হয়েছে ?

যতীন আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহার মধ্যে কথাটা তাহাকে কে বলিল ? মাথা নিচু করিয়া সে বলিল—হ্যাঁ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল পদ্ম, বলিল—তা হোক। ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক সে। কিন্তু পণ্ডিতকে যে তার পাপের দণ্ডভোগ করতে হয় নাই, সে যে সত্যি কথা বলেছে—সেই আমার ভাগ্যি। তা না হলে তার অনন্ত নরক হ'ত, সাত পুরুষ নরকস্থ হ'ত।

যতীন অবাক হইয়া গেল।

পদ্ম বলিল—জল গরম হয়েছে। চা তুমি করে নাও। আমি একবার দেখি সেই

মুখপোড়া ছেলে দুটোকে। এখনও ফেরে নাই। সারাদিন খায় নাই।

—তুমিও তো খাওনি মা-মণি ? খেয়ে নাও ! যতীনের মনে পড়িল—কাল পদ্মের নীল-ষষ্ঠীর উপবাস গিয়াছে। আজ আবার সে সারাদিন গাজনের উপবাস করিয়াছে।

—খাব। সে দুটোকে আগে ধরে আনি !

যতীন আর কিছু বলিবার পূর্বেই পদ্ম বাহির হইয়া গেল।

শ্রীহরির খিড়কীর ঘাটে শ্রীহরির মা উচ্চকণ্ঠে সবিস্তারে অনিরুদ্ধের শাস্তির কথা দম্ভ-সহকারে ঘোষণা করিতেছে। এ সে বহুক্ষণ পূর্বেই আরম্ভ করিয়াছে; এখনও শেষ হয় নাই। পুত্রগর্বিতা বৃদ্ধা শুধু অপেক্ষা করিতেছে—অদূরে উচ্চকণ্ঠের একটি সবিলাপ রোদন-ধ্বনির।

কথাবার্তা কহিবার অবসর আজ খুব কমই হইতেছিল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া যতীন বলিল—চৌধুরী কেমন আছেন ডাক্তারবাবু ?

দেবু চমকাইয়া উঠিল, অনিরুদ্ধের হাঙ্গামায় আজ দু-দিন চৌধুরীর সংবাদ লওয়াই হয় নাই।

জগন বলিল—একটু ভাল আছেন। তবে এই একটুকু ঘা আর কিছুতেই সারছে না। ঘায়ের মুখ থেকে অল্প অল্প পুঁজ পড়ছে, আর প্রায়ই সামান্য সামান্য জ্বর হচ্ছে।

যতীন বলিল—যাব একদিন দেখতে।

দেবু বলিল—কালই চলুন না সকালে। আমি যাব।

—আমাকে ডেকো দেবু। তোমাদেরই সঙ্গে যাব। আমাকে তো যেতেই হবে। একসঙ্গেই যাব। হরেন যাবে নাকি ?

—টু-মরো তো হবে না ব্রাদার ! পয়লা বোশেখ, খাতা ফেরার হাঙ্গামা আছে। আমাকে ছুটতে হবে আলেপুর, ইছু শেখের কাছে—গোটা-চারেক টাকা আনতে হবে। নইলে বেটা বৃন্দাবনকে তো জান ? একটি পয়সা আর ধার দেবে না।

পয়লা বৈশাখ হালখাতা। কথাটা যেন ঝনাৎ করিয়া পড়িল। কথাটা দেবুরও মনে হইল। ধার সে বড় করে না। তবে এবার তাহার অনুপস্থিতিতে দুর্গার মারফৎ জংশনের একটা দোকানে বাকী পড়িয়াছে—এগারো টাকা দশ আনা। অনিরুদ্ধের হাঙ্গামায় কথাটা তাহার মনেই হয় নাই। দুর্গাও কোন তাগাদা দেয় নাই। টাকাটা বা কোথা হইতে আসিবে ? আসিয়া অবধি নিজের ভাবনা যে ভাবাই হয় নাই ! কিন্তু না ভাবিলে ভবিষ্যৎ কি হইবে ?

সে যদি হঠাৎ মারা যায়, তবে কি বিলু এই পদ্মের মত—কিংবা অবশেষে তারিণীর স্ত্রীর মত—ভাবিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। বার বার সে নিজেকে ধিক্কার দিয়া উঠিল—ছি, ছি, ছি !

তবুও চিন্তা গেল না।. বিলুর বদলে মনে হইল খোকার কথা।

তাহার খোকাও কি ওই উচ্চিংড়ের মত—না—না—না। সে মনে মনেই বলিল—

কিছুতেই না। কাল নববর্ষের প্রথম দিন হইতে সে নিজের ভাবনা ভাবিবে, আর নয়—আর নয়। স্ত্রী-পুত্র লইয়া—দারিদ্র্য লইয়া দশের ভাবনা ভাবিবার অধিকার তাহার নাই, সে অধিকার ভগবান তাহাকে দেন নাই। সে ভার—সে অধিকার শ্রীহরির। গোটা গাজনের খরচটা সে-ই দিয়াছে। গোটা দেশের লোককে ধান দাদন সে-ই দিয়াছে। সে ভার তাহার।

সে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে উঠিয়া পড়িল।

জগন জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যাপার হে? হঠাৎ উঠলে?

—একটা জরুরী কাজ ভুলেছি।

সে চলিয়া আসিল। পথে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া শিবকে প্রণাম করিল—হে দেবাদিদেব মহাদেব, ভালয়-ভালয় এ বৎসর পার করে দিলে। আশীর্বাদ কর—আগামী বৎসরটি যেন ভালয়-ভালয় যায়।

খোঁড়া পুরোহিত তাহাকে আশীর্বাদী নির্মাল্য দিল।

* * * *

পথে নামিয়া সে বাড়ী গেল না। সে গেল দুর্গার বাড়ী। দুর্গাই দোকান হইতে ধার আনিয়া দিয়াছিল। তাহারই মারফতে একটা টাকা কাল সে পাঠাইয়া দিবে এবং মাসখানেক সময় চাহিয়া লইবে। সময় একটু বেশী লওয়াই ভাল। বৈশাখের প্রথমেই সে তিসি, মসিনা, গম, যব—যে কয়টা ঘরে আছে—বিক্রি করিয়া দিবে। সর্বাগ্রে সে ঋণ পরিশোধ করিবে।

বাড়ীতে দুর্গার মা বসিয়াছিল; একা অন্ধকারে দাওয়ার উপর বসিয়া কাহাকে গালি দিতেছিল—রাক্ষস, প্যাটে আগুন নাগুক—আগুন নাগুক—আগুন নাগুক! মরুক, মরুক, মরুক! আর হারামজাদী নচ্ছারী, বানের আগে কুটো—সব্বাগ্যে তোর যাওয়ার কি দরকার শুনি?

দেবু জিজ্ঞাসা করিল—ও পিসেস্, দুর্গা কই!

বিলু দুর্গার মাকে বাপের বাড়ীর গ্রামবাসিনী হিসাবে পিসী বলে, তাই দেবু বলে—পিসেস্ অর্থাৎ পিস্-শাশুড়ী।

দুর্গার মা মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। জামাইয়ের সামনে মাথায় কাপড় না থাকিলে এবং জামাই মাথার চুল দেখিলে, চিতায় নাকি মাথার চুল পোড়ে না। ঘোমটা দিয়া দুর্গার মা বলিল—সে নচ্ছারীর কথা আর বলো না বাবা! বানের আগে কুটো। 'রূপেন' বায়েনের কিনা কি ব্যামো হয়েছে, তাই সব্বাগ্যে গিয়েছেন তিনি।

'রূপেন' অর্থাৎ উপেন। আত্মীয়স্বজনহীন বৃদ্ধ উপেন, আহা-হা বেচারী! কেউ নাই সংসারে। কিন্তু সে তো এখানে থাকে না। সে তো কঙ্কণায় ভিক্ষা করিত!

দেবু প্রশ্ন করিল—উপেন আজকাল গাঁয়ে ফিরেছে নাকি?

—মরতে ফিরেছে বাবা। গাঁয়ে আগুন নাগাতে ফিরেছে। কাল থেকে গাঁয়ে গাজনের

মেলা দেখতে এসেছে। আজ সকালে ফুলুরীর দোকানদার কতকগুলো তে-বাসী ফুলুরী ফেলে দিয়েছিল—সেনেটারী বাবু আসবে শুনে। রূপেন তাই কুড়িয়ে গবাগব খেয়েছে। খেয়ে সনঝে থেকে 'নামুনে' হয়েছে। আমাদের দুগ্‌গা বিবি তাই শুনে দেখতে ছুটেছেন। আহা-হা, দরদ কত! কি বলব বাবা বল ?

'নামুনে' ; অর্থাৎ কলেরা! সর্বনাশ! সম্মুখে এই বৈশাখ মাস— কোথাও এক ফোঁটা পানীয় জল নাই! এই সময় কলেরা।

সে দ্রুতপদে আসিয়া উঠিল উপেনের বাড়ী। এক মুহূর্তে তাহার সব ভুল হইয়া গেল।

উঠানে মাটির উপর পড়িয়া জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ছটফট করিতেছিল,—জ-ল—জ-ল—জ-ল! স্বর অনুনাসিক হইয়া উঠিয়াছে। অন্য কেহ নাই, কেবল দুর্গা দাঁড়াইয়া আছে, সে যথাসাধ্য সংস্পর্শ বাঁচাইয়া একটা ভাঁড়ে করিয়া তাহাকে জল ঢালিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ কিন্তু আপনার জল খাইবার ভাঁড়ের নিকট হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কম্পিত বাহু বিস্তার করিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তীব্র ব্যগ্রতায় সে চীৎকার করিতেছে, জল— এঁকটু জল!

দেবু অগ্রসর হইল, ভাঁড়টি লইয়া উপেনের মুখের কাছে বসিয়া একটু একটু করিয়া জল ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিল। দুর্গাকে বলিল—দুর্গা, শীগগির গিয়ে একবার জগনকে খবর দে। বলবি আমি বসে রয়েছি।

যতীনের কথাও একবার মনে হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—বিদেশী ভদ্রলোক! তাহাকে এসব বিপজ্জনক ব্যাপারে টানিয়া আনা উচিত হইবে না। এ তাহাদের গ্রাম, এখানকার সকল দুঃখকষ্ট একান্ত করিয়া তাহাদের। অতিথি আগন্তুককে দিতে হয় সুখের ভাগ। দুঃখের ভাগ কি বলিয়া কোন্ মুখে সে তাহাকে লইতে আহ্বান করিবে!

সাতাশ

শুভ নববর্ষ। বৃদ্ধেরা শিহরিয়া উঠিল। নিতান্ত অশুভ প্রারম্ভ। রুদ্ররূপে মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে—সঙ্গিনী মহামারীকে লইয়া। চণ্ডীমণ্ডপে বর্ষ-গণনা পাঠ ও পঞ্জিকা বিচার চলিতেছে। করিতেছে খোঁড়া পুরোহিত, শুনিতেছে শ্রীহরি ঘোষ এবং প্রবীণ মণ্ডলেরা।

গত রাত্রির শেষভাগ হইতে বায়েনপাড়ায় তিনজন আক্রান্ত হইয়াছে ; বাউড়ীপাড়ায় দুইজন। উপেন মরিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীর ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল। এ যে প্রকাণ্ড বিপদ সম্মুখে। গ্রামকে রক্ষা করিতে হইবে। হতভাগ্যের দল, তাহার সহিত বিরোধিতা করিয়াছে বলিয়া সে এসময় বিমুখ হইলে, সে যে ধর্মে পতিত হইবে। অবশ্য কাজ সে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ভূপাল চৌকিদারকে ইউনিয়ন বোর্ডে পাঠাইয়াছে। স্যানিটারী ইন্সপেক্টারের কাছে সংবাদ দিতে ইউ-বির সেক্রেটারিকে পত্র দিয়াছে। লোকটি কাল

সকালেই আসিয়াছিল। বাউড়ীপাড়ায়, বায়েনপাড়ায় কিছু চাল সাহায্য দিবার কথাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ইঁদারাটিকে কলেরার সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছে। কালু শেখ পাহারায় মোতায়েন আছে।

বুড়ী রাঙাদিদি আজ সকালে ভগবানকে গাল দেয় নাই; সে জোড়হাতে তারস্বরে বার বার বলিতেছে—ভগবান, রক্ষে কর, হে ভগবান। দোহাই তোমার বাবা! তুমি ছাড়া গরীবের আর কে আছে দয়াময়? গেরাম রক্ষা কর বাবা বুড়োশিব! হে বাবা! হে ভোলানাথ! হে মা কালী!

পদ্ম আকুল হইয়া উঠিয়াছে—উচ্চিংড়ে ও গোবরার জন্য। 'আসাপা' ছেলে—সাপ দেখিলে ধরিবার মত দুঃসাহস উহাদের;—কি করিয়া উহাদের সে বাঁচাইবে? তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

যতীনও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছে; বাংলাদেশে কত লোক কলেরায় মরে, কত লোক ম্যালেরিয়ায় মরে, কত লোক অনাহারে মরে, কত লোক অর্ধাশনে থাকে—এসব তথ্য সে জানে। নিয়তিকে সে স্বীকার করে না। সে জানে এ মনুষ্যকৃত ত্রুটি, আপনাদের অজ্ঞানতার অক্ষমতার অপরাধের প্রতিফল। অপরাধ একমাত্র এই দেশটিতেই আবদ্ধ নয়—মানুষের ভ্রম হইতে, ভেদবুদ্ধি হইতে, অক্ষমতা হইতে উদ্ভূত এ অপরাধ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত। ব্যাধি এক দেশ হইতে অন্য দেশে সংক্রামিত হয় নাই, সেই দেশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে—অর্থগৃধ্নুর ধন উপার্জন-শক্তির প্রতিক্রিয়ায় চৌর্যের মত, দানধর্মের প্রতিক্রিয়ায় ভিক্ষা-ব্যবসায়ের মত। পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-রিপোর্ট সে পড়িয়াছে—ভিক্ষুকের দল এক-একটা শিশুকে হাঁড়ির ভিতর দিবারাত্র বসাইয়া রাখে—বৎসরের পর বৎসর বসাইয়া রাখে যাহাতে তাহাদের অর্ধাঙ্গ বৃদ্ধি না পায়, পুষ্ট না হয়। পরে ইহাদের বিকলাঙ্গের দোহাই দিয়া দিব্য ভিক্ষার ব্যবসায় পুতুল করিয়া তুলে। হয়তো এদেশের ত্রুটি বেশী, এদেশে লোক বেশী মরে, কুকুর-বিড়ালের মত মরে। তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও চলিতেছে। হয়তো একদিন—তাহার চোখ জলজল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—আরতির যুগল কর্পূর-প্রদীপের শিখার মত, মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কালের দ্বারে বলি ভাবিয়া দৃঢ়চিত্তে আজ কিন্তু এ সমস্ত সে দেখিতে পারিতেছে না। পদ্মের মত সমস্ত গ্রামখানাই কবে কখন তাহার সমস্ত অন্তরকে মমতায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—সে বুঝিতে পারে নাই। গ্রামের এই বিপর্যয়ে—বিয়োগে—শোকে সে নিতান্ত আপন জনের মতই একান্ত বিষণ্ন ও ব্যথিত হইয়া উঠিল।

* * * *

বৈশাখের প্রথম দিন। সেই মধ্যরাত্রে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে—তারপর আর হয় নাই। হু হু করিয়া গরম ধূলিকণাপূর্ণ বাতাস বহিতেছে ঝড়ের মত। সেই বাতাসে শরীরের রক্ত যেন শুকাইয়া যাইতেছে। মাটি তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে যেন একটা তৃষাতুর হা-হা ধ্বনি উঠিয়াছে। কোথাও মানুষ দেখা যায় না। একদিনেই একবেলাতেই

একটা মানুষের মৃত্যুতেই মানুষ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়াছে, একটা মানুষও আর পথের উপরে নাই!

শুধু বাহির হইয়াছে দেবু ও জগন। তাহারা এখনও ফেরে নাই। যতীনও একবার বাহির হইয়াছিল, অল্পক্ষণ পূর্বে ফিরিয়াছে। সে ফিরিতেই পদ্ম অঝোরঝরে কাঁদিয়া বলিল—আমাকে খুন করো না তুমি—তোমার পায়ে পড়ি। দোহাই একটু সাবধানে থাক তুমি।

যতীন ভাবিয়া পায় না—এই অবোধ মা-মণিকে সে কি বলিবে!

দেবু গিয়াছে উপেনের সৎকারে। সকাল হইতে দেবু যেন একাই একশ হইয়া উঠিয়াছে। এই অর্ধশিক্ষিত পল্লী-যুবকটির কর্মদক্ষতা ও পরার্থপরতা দেখিয়া যতীন বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। আরও একটা নূতন জিনিস সে দেখিয়াছে। ডাক্তারের অভিনব রূপ। চিকিৎসকের কর্তব্যে তাহার এতটুকু ত্রুটি নাই। শৈথিল্য নাই। এই মহামারী ক্ষেত্রে নির্ভীক জগন—পরম যত্নের সহিত প্রতিটি জনকে আপনার বিদ্যাবুদ্ধি মত অকাতরে চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছে। গ্রামে সে কখনও ফি লয় না; কিন্তু এমন ক্ষেত্রে, কলেরার মত ভয়াবহ মহামারীর সময় ডাক্তারদের উপার্জনের বিশেষ একটা সুযোগ পাইয়াও জগন আপনার প্রথারীতি ভাঙে নাই,—এটা জগনের লুকাইয়া রাখা একটা আশ্চর্য মহত্ত্বের পরিচয়। মুখে আজ তাহার কর্কশ কথা পর্যন্ত নাই, মিষ্ট ভাষায় সকলকে অভয় দিয়া চলিয়াছে।

দেবু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে। টেলিগ্রাম লইয়া জংশনে গিয়াছে দুর্গা। ইউনিয়ন বোর্ডেও দেবু সংবাদ পাঠাইয়াছে, পাতু সেখানে গিয়াছে। নিজে সে রোগাক্রান্তদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছে। যাহারা গ্রাম হইতে সরিয়া যাইতে চাহিয়াছে—তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। তারপর উপেন বায়েনের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে বসিয়াছে। বায়েনদের মধ্যে এখানে সক্ষম পুরুষ মাত্র তিনজন। তাহাদের একজন পলাইয়াছে। বাকী দুইজন রাজী থাকিলেও দুইজনে একটা শব লইয়া যাওয়া অসম্ভব কথা। পাশেই বাউড়ীপাড়ায় অনেক লোক আছে বটে, কিন্তু বাউড়ীরা মুচীর শব স্পর্শ করিবে না। তবে বাউড়ীদের মাতব্বর সতীশ তাহার সঙ্গে আছে।

শ্মশানের পথও কম নয়, ময়ূরাক্ষীর-গর্ভের উপর শ্মশান—দূরত্ব দেড় মাইলের উপর। অনেক চিন্তা করিয়া শেষে বেলা এগারোটার সময় আপনার গাড়ী গরু আনিয়া, দেবু গাড়ীতে করিয়া উপেনের সৎকারের ব্যবস্থা করিল।

সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াই তাহার কর্তব্য শেষ হইল না; বাউড়ী-বায়েনদের দায়িত্বজ্ঞান কম —হয়তো গ্রামের কাছেই কোথাও ফেলিয়া দিবে আশঙ্কা করিয়া সে শবের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হইল। তা ছাড়া পাতুও তাহার সঙ্গী—মাত্র দুইজনে এই কলেরারোগীর মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাইতে তাহারা যেন ভয় পাইতেছিল। দেবু তাহা অনুভব করিল। এবং বলিল —ভয় করছে পাতু?

শুষ্কমুখে পাতু বলিল—আজ্ঞে!

—ভয় করছে নিয়ে যেতে?

—করছে একটুকু। ভয়ার্ত শিশুর মতই অকপটে সে স্বীকার করিল।

—তবে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই।

—আপুনি?

—হ্যাঁ। আমি। চল যাই!

পাতু ও তাহার সঙ্গীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পাতু বলিল—আপুনি বাঁধের ওপরটিতে শুধু দাঁড়াবেন তা হলেই হবে।

—চল, আমি শ্মশান পর্যন্তই যাব।

প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত বৈশাখী দ্বিপ্রহরে তাহারা গাড়ীর উপর শবদেহ চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মাঠ আজ জনশূন্য। রাখালেরা সকলেই প্রায় এই বাউড়ী-বায়েনের ছেলে—তাহারা এমন আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, মাঠে গরু লইয়া আসে নাই। গ্রামের আশে-পাশেই গরু লইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। বৈশাখী দ্বিপ্রহরে এই ধু-ধু করা প্রান্তরে আসিয়া যদি অকস্মাৎ তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি হইবে? মাঠে আগুনের মত ধুলায় পড়িয়া তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া মরিবে যে! এই আতঙ্কে তাহারা আতঙ্কিত। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠখানা খাঁ-খাঁ করিতেছে। মধ্যে যে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহার আর এক বিন্দুও কোথাও জমিয়া নাই। মাটির রস পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের বড় বড় সিচের পুকুরগুলি এমনভাবে মজিয়া গিয়াছে, মোহনার বাঁধ এমনভাবে ভাঙিয়া গিয়াছে যে, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে জল ভিতরে জমে, তাহাও নিঃশেষে বাহির হইয়া আসে। গ্রামের প্রান্ত হইতে ময়ূরাক্ষী পর্যন্ত কোথাও এক ফোঁটা জল নাই। ঝড়ের মত প্রবল বৈশাখী দ্বিপ্রহরের বাতাসে মাঠের ধুলা উড়িতেছে; তাহাতে যেন আগুনের স্পর্শ! ইহারই মধ্যে গাড়ীটা ধীর গতিতে চলিয়াছিল। ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ—চাকার দীর্ঘ একটানা একঘেয়ে শব্দ উঠিতেছে। ক্যাঁ—ক্যাঁ—!

পাতু বলিল—এবার আর আমাদের রক্ষে নাই; কেউ বাঁচবে না পণ্ডিত মশায়।

দেবু স্নেহসিক্ত স্বরে অভয় দিয়া বলিল—তুই পাগল পাতু! ভয় কি?

—ভয়? পাতু হাসিল, বলিল—একেবারে পয়লা বোশেখ নামুনে ঢুকল গাঁয়ে। তা ছাড়া লোকে বলছে—এবার আমরা চণ্ডীমণ্ডপ ছাইয়ে দিলাম না—বাবা বুড়োশিবের রাগেই হয়তো—

দেবুও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে দেবধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু বাবা কি এমনই অবিচার করিবেন! নিরপরাধের অপরাধটাই বড় হইবে তাঁহার কাছে? দেবোত্তর সম্পত্তি যাহারা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে, তাহাদের তো কিছু হয় নাই! সে দৃঢ়স্বরে বলিল—না পাতু। বাবার কাছে কোন অপরাধ তোমাদের হয় নাই। আমি বলছি।

পাতু বলিল—তবে ই-রকমটা ক্যানে হল পণ্ডিত মশাই?

দেবু কলেরার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিল।

উঃ! এই ঠিক দুপুরে স্ত্রীলোক কে এদিকে আসিতেছে? বোধ হয় জংশন হইতে

ফিরিতেছে। হ্যাঁ—তাই তো। এ যে দুর্গা! দুর্গা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া ফিরিতেছে।

উপেনের শবের সঙ্গে দেবুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—নিকটে আসিয়া তিরস্কার-ভরা কণ্ঠ করিয়া বলিল—এ কি করেছ জামাই! তুমি কেন এলে? তুমি যাচ্ছ কেন? ফেরো!

দেবু কথাটা একেবারে ঘুরাইয়া দিল—এতক্ষণে ফিরলে দুর্গা? টেলিগ্রাম হল?

—হল। কিন্তু তুমি কিসের লেগে যাচ্ছ জামাই? ফিরে চল।

—ফিরছি, তুই যেতে লাগ।

—না, তুমি ফেরো আগে।

—পাগলামি করিস না দুর্গা। তুই যা, আমি শীগগির ফিরব।

তাহারা চলিয়া গেল; দুর্গার চোখ দিয়া অকারণে জল পড়িতে আরম্ভ করিল।

শীঘ্র ফিরিব বলিলেও—শীঘ্র ফেরা হইল না। ফিরিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। ময়ূরাক্ষীর কাদা বালি-গোলা, হাঁটুডোবা জলে কোনমতে স্নান সারিয়া বাড়ী আসিয়া দেবু ডাকিল—বিলু!

ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল খোকা, তাহার খোকনমণি। দুটি হাত বাড়াইয়া সে ডাকিল—বা-বা!

দেবু দুই পা পিছনে সরিয়া আসিয়া বলিল—না, না, ছুঁয়ো না আমাকে। না।

খোকন আমোদ পাইয়া গেল। মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল লুকোচুরি খেলার আমোদ, সে খিল-খিল করিয়া হাত বাড়াইয়া আরও ছুটিয়া আসিল। খোকনের আমোদের ছোঁয়াচ দেবুকেও লাগিল—সে আরও খানিকটা সরিয়া আসিয়া বলিল না খোকন, দাঁড়াও ওখানে। তারপর সে ডাকিল বিলুকে।—বিলু—বিলু!

বিলু বাহির হইয়া আসিল—অভিমানস্ফুরিতাধরা! সে কোন কথা বলিল না। চুপ করিয়া স্বামীর আদেশের প্রতীক্ষায় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। দেবু কি তাহার সর্বনাশ করিতে চায়? এই প্রখর গ্রীষ্ম, তাহার উপর এই ভয়ঙ্করী মহামারী, দেবু সেই মহামারী লইয়া মাতিয়া উঠিল—তাহার সর্বনাশ করিবার জন্য! সে সমস্ত দুপুর কাঁদিয়াছে।

দুর্গা আসিয়াছিল; সে বিলুকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে একটুকুন শক্ত হও বিলু-দিদি, জামাই-এর একটু রাশ টেনে ধর। নইলে এই রোগের পিছুতে ও আহারনিদ্রে ভুলবে, হয়তো তোমাদের সর্বনাশ—নিজের সর্বনাশ করে ফেলবে।

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অভিমান অনুভব করিল। হাসিয়া বলিল—আমার বিলুমণির রাগ হয়েছে? শীগগির একটু খোকাকে ধর বিলু!

বিলুর চোখের জল আর বাঁধ মানিল না। ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবু বলিল—কেঁদো না, ছি! কথা শোন, শীগগির ধর খোকাকে। আর আমাকে একটু খড় জেলে আগুন করে দাও, তারপর তাড়াতাড়ি এক কড়া জল গরম চাপাও। গরম জলে হাত-পা ধুয়ে ফেলব; কাপড়-জামাও গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে।

বিলু কোন কথা বলিল না, ছেলেটিকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইল। ছেলেটি দেবুকে সকাল হইতে দেখিতে পায় নাই, সে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল—বাবা দাব! বাবা দাব।

বিলু তাহার পিঠে একটা চাপড় বসাইয়া দিয়া বলিল—চুপ কর বলছি, চু-উ-প। তবুও তাহার জিদ দেখিয়া তাহাকে ভুম করিয়া নামাইয়া দিল।

দেবু আর সহ্য করিতে পারিল না। বিলুকে তিরস্কার করিয়া বলিল—আঃ! বিলু! ও কি হচ্ছে? শীগগির ওকে কোলে নাও বলছি।

বিলু আজ ক্ষেপিয়া গিয়াছে, সে বলিল—কেন, তুমি মারবে নাকি? ছেলের আদর কত করছ—তা জানি!

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বিলু হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল—এমন দগ্ধে মারার চেয়ে আমাকে তুমি খুন করে ফেল! আমাকে তুমি বিষ এনে দাও!

দেবু উত্তর দিতে গেল—সান্ত্বনা মধুর উত্তরই সে দিতেছিল। কিন্তু দেওয়া হইল না। সর্পস্পৃষ্টের মত সে চমকাইয়া উঠিল, শিহরিয়া উঠিল—পিছন হইতে খোকা তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। ধরিয়াছে, সে ধরিয়াছে—পলাতককে সে ধরিয়াছে! দেবু পিছন ফিরিয়া খোকার দুই হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া, আর্তস্বরে বিলুকে বলিল—শীগগির জল গরম কর বিলু, শীগগির। খোকার হাত ধুয়ে দিতে হবে। এখুনি হয়তো ওই হাত মুখে দেবে।

খোকা দুরন্ত অভিমানে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার ধারণা হইল—তাহার বাবা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। শুধু সে কাঁদিলই না—ঝুঁকিয়া পড়িয়া রোষে ক্ষোভে দেবুর হাতের এক জায়গায় কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। শেষে তাহার ভিজা কাপড়ের খানিকটাও দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া দিল।

দেবু ইহাতে রীতিমত আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। বিলুকে একপ্রকার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—বিলু, লক্ষ্মীটি, সব বুঝিয়ে বলছি তোমায়। চট করে এখনি তুমি গরম জল চাপাও। খোকার মুখখানা তাড়াতাড়ি ধুইয়ে দাও।—

বিলুর রাগ কিন্তু একটু পরেই নিভিয়া গিয়াছে। দেবুর কোলে খোকনকে দেখিয়া সে মহাখুশী হইয়া উঠিয়াছে। বলিল—তুমি কি নিষ্ঠুর বল দেখি! ছেলেটা আমার চেয়েও তোমাকে ভালবাসে—আর তুমি কিনা ওকে ফেলে বাইরে বাইরে থাক! তোমার বোধহয় বাড়ীর বাইরে পা দিলে সংসার বলে কিছুই মনে থাকে না। ছিঃ, খোকাকে ভুলে যাও তুমি!

দেবু বলিল—না। আর যাব না বিলু, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর যাব না।

গরমজলে মুখ হাত পা ধোওয়াইয়া নিজে ধুইয়া দেবু খোকাকে এতক্ষণে ভাল করিয়া কোলে লইল। বাপের কোলে থাকিয়াই সে মাকে কাছে আসিতে দেখিয়া বাপের বুকে

মুখ লুকাইল। বিলু দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ওই দেখ দেখি!

খোকন বলিয়া উঠিল—না, দাব না। না, দাব না।

বিলু খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—ওরে দুষ্ট ছেলে! না দাবে না তুমি? বাপ পেয়ে আমায় ভুললে বুঝি? আচ্ছা, আমিও তোমাকে মেনু দেব না।

খোকন এবার মায়ের মন রাখিতে দেবুকে বলিল—বাবা, মা দাই!

বিলু বলিল—উঁহু। বাবাকে ধরে রাখ, বাবা পালাবে।

দেবুর বুকখানা রুদ্ধ আবেগে তোলপাড় করিয়া উঠিল।

সেটা বিলুর চোখে পড়িল। সে শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাঁগা, তোমার শরীরটা ভাল আছে তো?

হাসিবার চেষ্টা করিয়া দেবু বলিল—শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়েছে।

—একটু চা করব, খাবে?

—কর।

চা খাইয়াও সে তেমনি নীরব বিষণ্ণতার মধ্যে উদ্বেগ উদ্বেলিত অন্তরে একটা ভীষণ কিছু অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় বাউড়ী-বায়েনপাড়ায় একটা কান্নার রোল উঠিল। কেহ নিশ্চয় মরিয়াছে। দেবু খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে অধীর হইয়া উঠিল।

বিলু বলিল—কেউ ম'ল বোধহয়।

তিক্তস্বরে দেবু বলিল—মরুক গে, আমি আর খোঁজ নিচ্ছি না।

অবাক হইয়া বিলু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর বলিল—আমি কি তোমাকে বলেছি যে, কেউ মলে তুমি খোঁজ করবে না, না তাদের বিপদে তুমি দেখবে না! উপেন বায়েন—মুচী, তার সৎকারের জন্য গাড়ী দিলে, আমি কিছু বলেছি? কিন্তু তুমি শ্মশান পর্যন্ত সঙ্গে গেলে কেন বল দেখি? খাওয়া নাই—এই বোশেখ মাসের রোদ! তাই বলেছি আমি।

খোকা দেবুর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিলু খোকাকে দেবুর কোল হইতে লইয়া বলিল—যাও, একবার দেখে এখুনি ফিরে এস। তোমার উপর কত ভরসা করে ওরা—তা তো জানি।

দেবু যন্ত্রচালিত পুতুলের মতই বিলুর কথায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। চণ্ডীমণ্ডপে খোল-করতাল লইয়া হরিনাম-সংকীর্তনের দল বাহির করিবার উদ্যোগ হইতেছে। মৃদঙ্গের ধ্বনিতে নাকি অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

ও-পাড়ার ধর্মদেবের পূজার আয়োজন চলিতেছে। সে সতীশকে ডাকিল। সতীশ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—অবস্থা যে ভয়ানক হয়ে উঠল পণ্ডিত মশায়। বিকেলে আবার দু-জনার হয়েছে। গণার পরিবার একটুকু আগে মারা গেলেন।

—তাড়াতাড়ি সৎকারের ব্যবস্থা কর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে-সব করছি। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপরাধীর মত সে বলিল—উ বেলায় রূপেনের মড়া নিয়ে আপনাকে—কি করব বলেন ? আমাদের জাত তো লয়। আমাদের লেগে আপনাকে এত ভাবতে হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিল—ডাক্তার বিকেলে এসেছিল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিকেলে আবার ঘোষ মশায় নোক পাঠিয়েছিলেন—চাল দেবেন বলে। তা ডাক্তোরবাবু বললেন—কিছুতেই লিবি না।—আমরা যাই মশায়।

দেবু অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা গভীর উদাসীনতা যেন নিবিড় কুয়াশার মত জাগিয়া উঠিতেছে—তাহার সুখ-দুঃখ সব যেন সংবেদন-শূন্যতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। যে গভীর উদ্বেগ সে সহ্য করিতে পারিতেছে না—সেই উদ্বেগ যেন পুরাণের নীলকণ্ঠের হলাহলের মতই তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সতীশ আবার ডাকিল—পণ্ডিত মশায় !

—আমাকে কিছু বলছ ?

সতীশ অবাক হইয়া গেল, বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পণ্ডিত মশায় আর কে আছে এখানে, ও-নামে আর কাহাকে ডাকিবে সে ?

—কি বল ?

—বলছি। রাগ করবেন না তো ?

—না, না, রাগ করব কেন ?

—বলছিলাম কি, ঘোষ মশায় চাল দিতে চাইছেন, তা লিতে দোষ কি ? অভাবী নোক সব—এই মহা বেপদের সময়—

দেবু প্রসন্ন সহানুভূতির সঙ্গেই বলিল—না, না, কোন দোষ নাই সতীশ। ঘোষ মশায় তো শত্রু নন তোমাদের, আমাদেরও নন। তিনি যখন নিজে যেচে দিতে চাচ্ছেন—তখন নেবে বৈকি।

সতীশ দেবুর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—আপনকার মত যদি সবাই হত পণ্ডিত মশায় ! আপনি একটুকুন বলে দেবেন ডাক্তার বাবুকে। উনি আবার রাগ করবেন।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আমি বলে দোব ডাক্তারকে।

—ডাক্তারবাবু বসে আছেন নজরবন্দীবাবুর কাছে।

দেবু ফিরিল। কিন্তু আজ আর যতীনের ওখানে যাইতে ইচ্ছা হইল না। সে বাড়ীর পথ ধরিল। বাড়ীতে দুর্গা আসিয়া বসিয়া আছে। দুর্গা বলিল—আমাদের পাড়া গিয়েছিলে জামাই-পণ্ডিত ? গণার বউটা মারা গেল, নয় ?

—হাঁ—সে বিলুকে বলিল—খোকন কই ?

—সে সেই ঘুমিয়েছে, এখনো ওঠেনি।

—ঘুমিয়েছে ! দেবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। প্রায় ঘণ্টা-চারেক কাটিয়া গেল

খোকা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম সুস্থতার একটা লক্ষণ। তারপর সে দুর্গাকে প্রশ্ন করিল—তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায় ?

—জংশন গেছলাম।

বিলু বলিল —একটু জল খাও। দুর্গা খাতা ফিরিয়ে মিষ্টি এনেছে।

—তাই তো। হ্যাঁরে দুর্গা, জংশনে দোকানদারদের কাছে ভারী কথার খেলাপ হয়ে গেল রে!

—সে-সব ঠিক হয়েছে গো, তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

দুর্গা হাসিল—বিলু-দিদির মত লক্ষ্মী তোমার ঘরে, ভাবনা কি ? বিলু-দিদি আমাকে দু-টাকা দিয়েছিল, আমি দিয়ে এসেছি। আবার সেই আষাঢ়ে কিছু দিয়ো রথের দিনে, আর কিছু আশ্বিনে,—দোকানী তাতেই রাজী হয়েছে।

পরম আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া এতক্ষণে সত্যকার হাসি হাসিয়া দেবু বলিল—বিলু, আমি যতীনবাবুর কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি। বুঝলে ?

—এই রাত্তিরে আবার বেরুচ্ছ ? তা একটুকুন জল খেয়ে যাও।

—আমি যাব আর আসব। জল এখন আর খাব না।

—আচ্ছা উপোস করতে পার তুমি ! বিলু হাসিল। দেবু বাহির হইয়া গেল।

যতীনের আসরে আজ কেবল যতীন, জগন, আর চা-প্রত্যাশী গাঁজাখোর গদাই। চিত্রকর নলিনও আসিয়া একটি কোণে অভ্যাসমত চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে আজ একটি টাকা চাহিতে আসিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া কয়েকদিনের জন্য সে অন্যত্র যাইবে।

জগন অনর্গল বকিতেছে। দেবুকে দেখিয়া ডাক্তার বলিল—কি ব্যাপার হে? এ বেলা পাত্তাই নাই! আমি ভাবিলাম, তুমি বুঝি ভয় পেয়েছ।

দেবু হাসিল।

যতীন বলিল—শরীর কেমন দেবুবাবু? শুনলাম, শ্মশানে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন চারটের পর।

—শরীর খুব ক্লান্ত। নইলে ভালই আছি।

—তুমি মুচী মড়ার সঙ্গে গিয়েছ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখে এস একবার ব্যাপারটা। আর তোমার রক্ষে নাই।

দেবু ও-কথা আমলেই আনিল না, বলিল—আচ্ছা ডাক্তার, কলেরার বিষ যদি শরীরে ঢোকে, তবে কতক্ষণ পরে রোগ প্রকাশ পায় ?

জগন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছ দেবুভাই !

গদাই ওপাশ হইতে সসঙ্কোচে বলিল—কিসের ভয় ? ওর ওষুধ হল এক ছিলিম গাঁজা।

দেবু আর কোন প্রশ্ন করিল না, প্রশ্ন করিতেও তাহার ভয় হইতেছে। বিজ্ঞানের সত্য যদি তাহার উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া দেয় ! সে বার বার মনে করিল—বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য নয়, এ সংসারে একটা পরম তত্ত্ব আছে—সে পুণ্য, সে ধর্ম। তাহার ধর্ম, তাহার পুণ্য তাহাকে

রক্ষা করিবে। সেই অমৃতের আবরণ খোকাকে মহামারীর বিষ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবে।

যতীন বলিল—কি ব্যাপার বলুন তো দেবুবাবু? হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন কেন আপনি?

দেবু বলিল—আজ যখন বাড়ী ফিরলাম—শ্মশানে উপেনের শব আমাকে ধরতে হয়েছিল; তারপর অবশ্যি ময়ুরাক্ষীতে স্নান করেছি। তারপর বাড়ী ফিরে—।—কে? দুর্গা নাকি?

হ্যাঁ, দুর্গাই। অন্ধকার পথের উপর আলো হাতে আসিয়া দুর্গাই দাঁড়াইল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দুর্গা বলিল—হ্যাঁ, বাড়ী এস শীগ্‌গির! খোকার অসুখ করেছে,—একবারে জলের মতন—

দেবু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া, এক লাফে পথে নামিয়া ডাকিল—ডাক্তার!

বৈজ্ঞানিক সত্য ধর্মবিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করিয়া শেষে কি তাহার গৃহেই রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল?

* * *

সর্বনাশী মহামারী মানবদেহের সকল রস দ্রুত শোষণ করিয়া জীবনীশক্তিকে নিঃশেষিত করিয়া দেয়। সেই মহামারী দেবুর সকল রস, সকল কোমলতা নিষ্ঠুর পেষণে পিষ্ট করিয়া পাথর করিয়া দিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একা খোকা নয়, খোকা ও বিলু—দু-জনেই কলেরায় মারা গেল। প্রথম দিন খোকা, দ্বিতীয় দিন বিলু। শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নাই। জংশন-শহর হইতে রেলের ডাক্তার, কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তার—দুইজন বড় ডাক্তার আনা হইয়াছিল। কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তারটি সংবাদ পাইয়া আপনা হইতেই আসিয়াছিল। লোকটি গুণগ্রাহী, দেবুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আসিয়াছিল। জগন নিজে জংশনে গিয়া রেলের ডাক্তারকে আনিয়াছিল। অনাহারে-অনিদ্রায় দেবু অকাতরে তাহাদের সেবা করিয়াছে আর ঈশ্বরের নিকট মাথা খুঁড়িয়াছে—দেবতার নিকট মানত করিয়াছে। দুর্গাও কয়দিন প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিয়াছে। জগন ডাক্তারের তো কথাই নাই; যতীন, সতীশ, গদাই, পাতু দুইবেলা আসিয়া তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। দেবু পাথরের মত অশ্রুহীন নেত্রে নীরব নির্বাক হইয়া সব দেখিল—বুক পাতিয়া নিদারুণ আঘাত গ্রহণ করিল।

বিলুর সৎকার যখন শেষ হইল, তখন সূর্যোদয় হইতেছে। দেবু ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃস্ব, রিক্ত, তিক্ত জীবন লইয়া। সুখ-দুঃখের অনুভূতি মরিয়া গিয়াছে, হাসি ফুরাইয়াছে, অশ্রু শুকাইয়াছে, কথা হারাইয়াছে; মন অসাড়, দৃষ্টি শূন্য; ঠোঁট হইতে বুক পর্যন্ত নীরস শুষ্ক——সাহারার মত সব খাঁ খাঁ করিতেছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়া সে উদাস শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সব আছে—সেই পথ, সেই ঘাট, সেই বাড়ী-ঘর, সেই গাছপালা, কিন্তু দেবুর দৃষ্টির সম্মুখে সব অর্থহীন, সব অস্তিত্বশূন্য ঝাপসা; এক রিক্ত অসীম তৃষাতুর ধূসর প্রান্তর—আর বেদনাবিধুর পাণ্ডুর আকাশ। ওই বিবর্ণ ধূসরতার মধ্যে ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন।

সমস্ত গ্রামের লোকই ভিড় করিয়া আসিয়াছিল তাহাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি জানাইতে। কিন্তু দেবুর এই মূর্তির সম্মুখে তাহারা কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যতীনও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। আত্মগ্লানিতে সে কষ্ট পাইতেছে—তাহার মনে হইতেছে দেবুকে সে-ই বোধ হয় এই পরিণামের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। জগনও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীহরি, হরিশ, ভবেশও আসিয়াছিল। তাহারাও নীরব। দেবুর সম্মুখে কথা বলিতে শ্রীহরিরও যেন কেমন সঙ্কোচ হইল।

ভবেশ শুধু বলিল—হরি-হরি-হরি।

নির্বাক জনমণ্ডলীর প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল—ডাক্তারবাবু!

বিরক্ত হইয়া জগন বলিল—কে? কি?

—আজ্ঞে, আমি গোপেশ। একবার আসেন দয়া করে।

—কেন, হল কি?

দেবু একদিকের ঠোঁট বাঁকাইয়া বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল—আর কি? বুঝতে পার্চ্ছ না? যাও দেখে এস।

জগন দ্বিরুক্তি করিল না—উঠিয়া গেল। যতীন বলিল—দাঁড়ান, আমিও যাচ্ছি।

একে একে জনমণ্ডলী নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল, দেবু একা ঘরে বসিয়া রহিল। এইবার তাহার ইচ্ছা হইল সে একবার বুক ফাটাইয়া কাঁদিবে। চেষ্টাও করিল, কিন্তু কান্না তাহার আসিল না। তারপর সে শুইবার চেষ্টা করিল। এতক্ষণে চারিদিক চাহিয়া চোখে পড়িল—চারিদিকে শত সহস্র স্মৃতি। দেওয়ালে খোকার হাতের কালির দাগ, বিলুর হাতের সিঁদুরের চিহ্ন, পানের পিচ, খোকার রং-চটা কাঠের ঘোড়া, ভাঙা বাঁশী, ছেঁড়া ছবি। পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া—শয্যাতলে যেন কিসের চাপে সে একটু বেদনা বোধ করিল। হাত দিয়া সেটা বাহির করিল—খোকার বালা!' সেই বালা দুইগাছি, বিলুর নাকচাবি, কানের ফুল, হাতের নোয়া। একটা পাঁজর-কাটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে অকস্মাৎ ডাকিয়া উঠিল—খোকা! বিলু!

ঠিক এই সময়ে বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজার মুখে কে মুখ বাড়াইয়া বলিল—দেবু!

—কে?– দেবু উঠিয়া আসিল—রাঙাদিদি?

বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে আরও কেউ।

একা রাঙাদিদি নয়, দুর্গাও একপাশে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল।

দেবুর ইচ্ছা ছিল, গভীর রাত্রে—সকলে ঘুমাইলে—বিশ্বপ্রকৃতি নিস্তব্ধ হইলে সে একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবে।

একা নয়। সন্ধ্যা হইতে বহুজনেই আসিয়াছিল, সকলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট শুইতে আসিয়াছে কেবল—জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল ও গাঁজাখোর গদাই, উচ্চিংড়ের বাবা তারিণী। শ্রীহরি ভূপাল চৌকিদারকেও পাঠাইয়াছে। সে রাত্রিতে দেবুর দাওয়ায়

শুইয়া থাকিবে।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে দেবু উঠিল। উঠানে আসিয়া ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। খোকা নাই—বিলু নাই—বিশ্বসংসারে কোথাও নাই! স্বর্গ মিথ্যা, নরক মিথ্যা, পাপ মিথ্যা, পুণ্য মিথ্যা। কোন্ পাপ সে করিয়াছিল? পূর্বজন্মের? কে জানে? একবার যতীনের কাছে গেলে হয় না! একা বসিয়া সে খোকা ও বিলুকে চিন্তা করিবার অবসর খুঁজিয়াছিল, কিন্তু তাহাও যেন ভাল লাগিতেছে না। আত্মগ্লানিতেই তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই তো মৃত্যুর বিষ বহন করিয়া আনিয়াছিল। সেই তো তাহাদের হত্যা করিয়াছে। কোন্ লজ্জায় সে কাঁদিবে? সে বাহির হইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে রাস্তায় একটা আলো আসিতেছে।

এত রাত্রে আলো হাতে কে আসিতেছে? একজন নয়, জনকয়েক লোকই আসিতেছে।

* * *

কাহার কণ্ঠধ্বনি বাজিয়া উঠিল।—পণ্ডিত!

দেবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ন্যায়রত্ন; তাঁহার সঙ্গে যতীন, পিছনে লণ্ঠন হাতে আর একটি লোক।

—আপনি? কিন্তু আমাকে তো—

—চল, বাড়ীর ভেতর চল।

—আমাকে তো প্রণাম করতে নাই—আমার অশৌচ।

সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—অশৌচ! তিনি মৃদু হাসিলেন।—একটা কিছু আন পণ্ডিত, এইখানে এই উঠোনেই বসা যাক। ঘরের ভেতর থেকে ঘুমন্ত লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন। থাক, যারা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। তোমার সঙ্গে নিরালায় একটু আলাপ করব বলে এত রাত্রে আমার আসা। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আসতে ইচ্ছা হল না। পথে যতীন-ভায়া সঙ্গ নিলে। ওঁদের দৃষ্টি জাগ্রত তপস্বীর মত। ফাঁকি দিতে পারলাম না। দেখলাম—আকাশের দিকে চেয়ে উনিও বসে আছেন তোমার মত। আমাকে বললেন—তোমার এই নিষ্ঠুর বিপর্যয়ের জন্য উনিই দায়ী। ওঁর চোখে জল ছল-ছল করে উঠল। তাই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমাদের সুখ-দুঃখের কথায় উনিও অংশীদার হবেন।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন। এ-হাসি সুখের নয়—দুঃখের নয়—এক বিচিত্র দিব্য হাসি।

দেবুও হাসিল। ন্যায়রত্নের হাসির প্রতিবিম্বটিই যেন ফুটিয়া উঠিল। ঘর হইতে একটি মোড়া আনিয়া পাতিয়া দিয়া সে বলিল—বসুন।

ন্যায়রত্ন বসিয়া বলিলেন—বস, আমার কাছে বস। বস, যতীন-ভায়া, বস।

তাহারা মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল। দেবু বলিল—এই সেদিন পরমশ্রদ্ধায় বিলু আপনার পা ধুইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ—আজ সে কোথায়!

ন্যায়রত্ন তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—দেবু-ভাই, আমি সেই দিনই বুঝে-

গিয়েছিলাম—এই পরিণামের দিকেই তুমি এগিয়ে চলেছ। তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম, তোমার স্ত্রীকে দেখেও বুঝেছিলাম।

দেবু ও যতীন উভয়ে বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—সেদিনের গল্পটা মনে আছে বাবা! সবটা সেদিন বলিনি। বলি শোন! গল্প এখন ভাল লাগবে তো?

দেবু সাগ্রহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বলুন।

ন্যায়রত্ন আরম্ভ করিলেন—"সেই ব্রাহ্মণ ধনবলে আবার আপন সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পুত্র-কন্যা-জামাতায়, পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে সংসার হয়ে উঠল—দেববৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়। ফলে অমৃতের স্বাদ ফুলে অগুরু-চন্দনকে লজ্জা দেয় এমন গন্ধ। কোন ফল অকালে চ্যুত হয় না, কোন ফুল অকালে শুষ্ক হয় না।

পরিপূর্ণ সংসার তাঁর, আনন্দে শান্তিতে সুখে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল। ছেলেরাও প্রত্যেকে বড় বড় পণ্ডিত, জামাতারাও তাই। প্রত্যেকেই দেশান্তরে স্বকর্মে প্রতিষ্ঠিত। কেউ কোন রাজার কুলপণ্ডিত, কেউ সভাপণ্ডিত, কেউ বড় টোলের অধ্যাপক। ব্রাহ্মণ আপন গ্রামেই থাকেন—আপন কর্ম করেন।

একদিন তিনি হাটে গিয়ে এক মেছুনীর ডালার দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন! মেছুনীর ডালায় একটি কালো রঙের সুডৌল পাথর, গায়ে কতকগুলি চিহ্ন। তিনি চিনলেন, নারায়ণ-শিলা—শালগ্রাম। মেছুনীর এই অপবিত্র ডালায় আমিষ-গন্ধের মধ্যে পূত নারায়ণ-শিলা! তিনি চমকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই মেছুনীকে বললেন—মা, ওটি তুমি কোথায় পেলে?

মেছুনী একগাল হেসে প্রণাম করে বলল—বাবা, ওটি নদীর ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছি, ঠিক একপো ওজন; বাটখারা করেছি ওটিকে। ভারি পয় আমার বাটখারাটির। যেদিন থেকে ওটি পেয়েছি—সেদিন থেকে আমার বাড়বাড়ন্তর আর সীমা নেই।

সত্য কথা। মেছুনীর এক-গা সোনার গহনা।

ব্রাহ্মণ বললেন—দেখ মা, এটি হল শালগ্রাম-শিলা—ঐ আমিষের মধ্যে এঁকে রেখে দিয়েছ—ওতে তোমার মহা-অপরাধ হবে।

মেছুনী হেসেই সারা।

ব্রাহ্মণ বললেন—ওটি তুমি আমাকে দাও। আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি। পাঁচ টাকা দিচ্ছি তোমাকে।

মেছুনী বললে—না বাবা। এটি আমি বেচব না।

—বেশ, দশ টাকা নাও!

—না বাবা-ঠাকুর। ও আমাকে অনেক দশ-টাকা পাইয়ে দেবে।

—বেশ, কুড়ি টাকা!

—না বাবা। তোমাকে জোড়-হাত করছি!

—আচ্ছা, পঞ্চাশ টাকা !

—হবে না।

—একশো !

—না গো, না।

—এক হাজার !

মেছুনী এবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না; দিতে পারল না।

—পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি তোমায় !

এবার মেছুনী আর লোভ সম্বরণ করতে পারল না। ব্রাহ্মণ তাকে পাঁচটি হাজার টাকা গুনে দিয়ে নারায়ণকে এনে গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, প্রথম দিনেই ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখলেন—একটি জ্যোতির্ময় দুরন্ত কিশোর তাঁর মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলছে—আমাকে কেন তুমি মেছুনীর ডালা থেকে নিয়ে এলে ? আমি সেখানে বেশ ছিলাম। যাও এখুনি ফিরিয়ে দিয়ে এস আমাকে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হলেন।

দ্বিতীয় দিনেও আবার সেই স্বপ্ন। তৃতীয় দিনের দিনেও স্বপ্নে দেখলেন—কিশোরের ভীষণ উগ্রমূর্তি। বললেন—ফিরিয়ে দিয়ে এস, নইলে কিন্তু তোমার সর্বনাশ হবে।

সকালে উঠে সেদিন তিনি গৃহিণীকে সব বললেন। এতদিন স্বপ্নের কথাটা প্রকাশ করেন নি, বলেন নি। আজ আর না বলে পারলেন না।

গৃহিণী উত্তর দিলেন—তাই বলে নারায়ণকে পরিত্যাগ করবে নাকি ? যা হয় হবে। ও চিন্তা তুমি করো না।

রাত্রে আবার সেই স্বপ্ন, আবার—আবার। তখন তিনি পুত্র-জামাতাদের এই স্বপ্ন-বিবরণ লিখে জানতে চাইলেন তাঁদের মতামত। মতামত এল, সকলেরই এক জবাব—গৃহিণী যা বলেছিলেন তাই।

সেদিন রাত্রে স্বপ্নে তিনি নিজে উত্তর দিলেন—ঠাকুর, কেন তুমি রোজ এসে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত কর, বল তো ? কাজে-কর্মে-বাক্যে-চিন্তায় আমার জবাব কি তুমি আজও পাও নি ? আমিষের ডালায় তোমাকে আমি রেখে দিতে পারব না।

পরের দিন ব্রাহ্মণ পূজা শেষ করে উঠে নাতি-নাতনীদের ডাকলেন—প্রসাদ নেবার জন্যে। সকলের যেটি ছোট, সেটি ছুটে আসছিল সকলের পিছনে। সে অকস্মাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাকে তুললেন—কিন্তু তখন শিশুর দেহে আর প্রাণ নাই। মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন—সেই কিশোর নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলছে—এখনও বুঝে দেখ! জান তো, 'সর্বনাশের হেতু যার, আগে মরে নাতি তার'।

ব্রাহ্মণ নীরবে হাসলেন।

তারপর অকস্মাৎ সংসারে আরম্ভ হয়ে গেল মহামারী। একটির পর একটি—'একে একে নিভিল দেউটি'। আর রোজ রাত্রে একই স্বপ্ন। রোজই ব্রাহ্মণ নীরবে হাসেন।

একে একে সংসারে সব শেষ হয়ে গেল। অবশিষ্ট রইলেন—ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী।

আবার স্বপ্ন দেখলেন—এখনও বুঝে দেখ ব্রাহ্মণী থাকতে!

ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি বড়ই প্রগল্‌ভ হে ছোকরা, তুমি বড়ই বিরক্ত করছ আমাকে।

পরদিন ব্রাহ্মণীও গেলেন।

আশ্চর্য—সেদিন আর রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখলেন না!

অতঃপর ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি শেষ করে, একটি ঝোলায় সেই শালগ্রাম-শিলাটিকে রেখে ঝোলাটি গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, নদ-নদী জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে চললেন। পূজার সময় হলে একটি স্থান পরিষ্কার করে বসেন—ফুল তুলে পূজা করেন, ফল আহরণ করে ভোগ দেন—প্রসাদ পান।

অবশেষে একদা তিনি মানস সরোবরে এসে উপস্থিত হলেন। স্নান করলেন—তারপর পূজায় বসলেন। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন—এমন সময় অপূর্ব দিব্যগন্ধে স্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করে বাজতে লাগল দেব-দুন্দুভি। কে যেন তাঁর প্রাণের ভিতর ডেকে বলল—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি!

চোখ বন্ধ করেই ব্রাহ্মণ বললেন—কে তুমি?

—আমি নারায়ণ।

—তোমার রূপটা কেমন বল তো?

—কেন, চতুর্ভুজ। শঙ্খ চক্র—

—উঁহু, যাও যাও, তুমি যাও।

—কেন?

—আমি তোমায় ডাকি নি।

—তবে কাকে ডাকছ?

—সে এক প্রগল্‌ভ কিশোর। প্রায়ই সে স্বপ্নে এসে আমাকে শাসাত, আমি তাকে চাই।

এবার সেই স্বপ্নের কিশোরের কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন,—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি!

চোখ খুলে ব্রাহ্মণ এবার দেখলেন—হ্যাঁ, সেই তো বটে!

হেসে কিশোর বললেন—এস আমার সঙ্গে।

ব্রাহ্মণ আপত্তি করলেন না, বললেন—চল। তোমার দৌড়টাই দেখি।

কিশোর দিব্যরথে চড়িয়ে তাঁকে এক অপূর্ব পুরীতে এনে বললেন—এই তোমার পুরী। তোমার জন্যে আমি নির্মাণ করে রেখেছি। পুরীর দ্বার খুলে গেল; সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল—সেই সকলের ছোট নাতিটি—যে সর্বাগ্রে মারা গিয়েছিল। তার পিছনে পিছনে আর সব।"

গল্প শেষ করিয়া ন্যায়রত্ন চুপ করিলেন।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া একটু হাসিল।

যতীন ভাবিতেছিল এই অদ্ভুত ব্রাহ্মণটির কথা।

ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—সেদিন তোমাকে দেখে—বিলুকে দেখে এই কথাই আমার মনে হয়েছিল। তারপর যখন শুনলাম—উপেন রুইদাসের মৃতদেহের সৎকার করতে গেছ তুমি—তাদের সেবা করছ তখন আর সন্দেহ রইল না। আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম—মেছুনীর ডালার শালগ্রাম উদ্ধার করতে হাত বাড়িয়েছ তুমি। আত্মা নারায়ণ, কিন্তু ওই বায়েন-বাউড়ীদের পতিত অবস্থাকে মেছুনীর ডালার সঙ্গে তুলনা করি, তবে—আধুনিক তোমরা রাগ করো না যেন।

এতক্ষণে দেবুর চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ন্যায়রত্ন চাদরের খুঁট দিয়া সস্নেহে সে জল মুছাইয়া দিলেন। দেবুর মাথায় হাত দিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—এখন উঠি ভাই। তোমার সান্ত্বনা তোমার নিজের কাছে, প্রাণের ভেতরই তার উৎস রয়েছে। ভাগবত আমার ভাল লাগে। আমার শশী যেদিন মারা যায় সেদিন ভাগবত থেকেই সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। তাই তোমাকে আজ বলতে এসেছিলাম ভাগবতী লীলার একটি গল্প।

যতীনও ন্যায়রত্নের সঙ্গে উঠিল।

পথে যতীন বলিল—এই গল্পগুলি যদি এযুগের উপযোগী করে দিয়ে যেতেন আপনি!

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—অনুপযোগী কোন্ জায়গা মনে হল ভাই?

—রাগ করবেন না তো?

—না, না, না। সত্যের যুক্তির কাছে নতশির হতে বাধ্য আমি। রাগ করব! ন্যায়রত্ন শিশুর মত অকুণ্ঠায় হাসিয়া উঠিলেন।

—ওই আপনার মাছের চুবড়ি, চতুর্ভুজ—শঙ্খ, চক্র ইত্যাদি।

—ভগবানের অনন্ত রূপ। যে রূপ খুশি তুমি বসিয়ে নিয়ো। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ তো চতুর্ভুজ মূর্তি চোখেই দেখেন নি। তিনি দেখলেন—তাঁর স্বপ্নের মূর্তিকে—সেই উগ্র কিশোরকে।

যতীন বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া পড়িয়াছিল, রাত্রিও অনেক হইয়াছে। কথা বাড়াইবার আর অবকাশ রহিল না। ন্যায়রত্ন চলিয়া গেলেন।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে যতীনের মনে অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে' বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।—

বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজ দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।...

নাঃ, ন্যায়রত্নের কথা সে মানিতে পারিল না।

আটাশ

মাস দুয়েক পর। গ্রামের কলেরা থামিয়া গিয়াছে।

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। সাত তারিখে অম্বুবাচী পড়িল। ধরিত্রী নাকি এই দিনটিতে ঋতুমতী হইয়া থাকেন। আকাশ ঘন-ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। বর্ষা প্রত্যাসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। 'মিগের বাতে' এবার যেরূপ প্রচণ্ড গুমোট গিয়াছে, তাহাতে এবার বর্ষা সত্বর নামিবে বলিয় চাষা অনুমান করিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে মৃগশিরা নক্ষত্রে যেবার এমন গুমোট হয়, সেবার বর্ষা প্রথম আষাঢ়েই নামিয়া থাকে। অম্বুবাচীতে বর্ষণ হইয়া যদি কাড়ান লাগে, তবে সে অতি সুলক্ষণ—ঋতুমতী ধরিত্রীর মৃত্তিকা জলে ভিজিয়া অপরূপ উর্বরা হইয়া উঠে। অম্বুবাচীর তিনদিন হল কর্ষণ নিষিদ্ধ।

গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল।

অম্বুবাচীতে চাষীদের মধ্যে কুস্তি-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। চলতি ভাষায় ইহাকে বলে 'আমুতির লড়াই'; এখানকার মধ্যে কুসুমপুর ও আলেপুরেই সমারোহ সর্বাপেক্ষা বেশী। এই দুইখানি মুসলমানের গ্রাম। আমুতির লড়াই হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সমারোহের বস্তু। চাষের পূর্বে চাষীরা বোধ হয় শক্তি পরীক্ষা করে। এ অঞ্চলের মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া। বিভিন্ন স্থান হইতে নামকরা শক্তিমান চাষারা যাহারা এখানে কুস্তিগীর বলিয়া খ্যাত, তাহারা যোগ দেয়। ভরতপুরে যে বিজয়ী হয়; সেই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। তবে শক্তি-চর্চায় শক্তি-প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশী।

যতীনের বাড়ীর সম্মুখে একটা জায়গা খুঁড়িয়া উচ্চিংড়ে ও গোবরা আখড়া খুলিয়াছে। দুইটাতে সারাদিন যুধ্যমান হইয়া পড়িয়াই আছে।

আজ নিষ্ঠাবান চাষীর বাড়ীতে অরন্ধন। ঋতুমতী ধরিত্রীর বুকে আগুন জ্বালিতে নাই। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং বিধবারা এই তিন দিনই অগ্নিসিদ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ কোন জিনিসই খাইবে না। দেবু আজ অরন্ধন ব্রত প্রতিপালন করিতেছে। একা বসিয়া শান্ত উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে। বর্ষার সজল ঘন মেঘ; পুঞ্জিত হইতেছে, আবর্তিত হইতেছে, ভাসিয়া চলিতেছে ওই দূর-দিগন্তের অন্তরালে। আবার এ দিগন্ত হইতে উদয় হইয়াছে নূতন মেঘের পুঞ্জ। অচিরে বর্ষা নামিবে। অজস্র বর্ষণে পৃথিবী সুজলা হইয়া উঠিবে, শস্যসম্ভারে শ্যামলা হইয়া উঠিবে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘুচিবে।

সবুজ হইয়া উঠিবে মাঠ, জলে ভরিয়া উঠিবে ঘাট। ময়ূরাক্ষী বহিয়া গৈরিক জলস্রোত.

বহিয়া যাইবে। শূন্য মাঠ ফসলে ভরিয়া উঠিবে।' নীল আকাশ মেঘে ভরিয়া গিয়াছে। মেঘ কাটিয়া গেলে সূর্য, রাত্রে চন্দ্র তারায় ভরিয়া থাকিবে। তাহারই জীবন শুধু শূন্য হইয়া গিয়াছে। এ আর ভরিয়া উঠিবে না।

একা বসিয়া এমনি করিয়া কত কথাই ভাবে। অকস্মাৎ জীবনে যে প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটিয়া গেল—তাহার ফলে তাহার প্রকৃতি—চরিত্রেও একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত, উদাসীন, একান্ত একাকী একটি মানুষ; গ্রামের সকলে তাহাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তবু তাহারা তাহার পাশে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। দেবুর নিশ্চেষ্ট নির্বাক উদাসীনতার মধ্যে তাহারা যেন হাঁপাইয়া উঠে।

রাত্রে—গভীর রাত্রে দেবু গিয়া বসে যতীনের কাছে। ওই সময় তাহার সাথী মেলে। যতীন তাহাকে অনেকগুলি বই দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দেবুর ছিল। যতীন তাহাকে দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা বই, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, কয়েকজন আধুনিক লেখকের লেখা কয়েকখানা বইও তাহার মধ্যে আছে। নিঃসঙ্গ অবসরে উহারই মধ্যে তাহার সময় অনেকটা নিরুদ্বেগ প্রশান্তির মধ্যে কাটে। কখনও কখনও সে দাওয়ার উপর একা বসিয়া চাহিয়া থাকে। ঠিক দাওয়ার সম্মুখে রাস্তার উপরের শিউলী গাছটির দিকে। ওই শিউলী গাছটির সঙ্গে বিলুর সহস্র স্মৃতি বিজড়িত। বিলু শিউলী ফুল বড় ভালবাসিত। কতদিন দেবুও বিলুর সঙ্গে শরৎকালের ভোরে উঠিয়া শিউলী ফুল কুড়াইয়াছে।

আজ আবার বৈকালে তাহাকে আলেপুর যাইতে হইবে। আলেপুরের শেখ চাষীরা তাহার নিকট আসিয়াছিল; তাহাকে তাহাদের কুস্তির প্রতিযোগিতায় পাঁচজন বিচারকের মধ্যে একজন হইতে হইবে।

সে হাসিয়া বলিয়াছিল—আমাকে কেন ইছু-ভাই, আর কাউকে—

ইছু বলিয়াছিল—উরে বাস রে! তাই কি হয়! আপনি যে বাত বুলবেন—পাঁচখানা গাঁয়ের নোক সিটি মানবে।

দেবু সেই কথাই ভাবিতেছে।

পাঁচখানা গ্রামের লোক তাহাকে মানিবে—একদিন এমনি আকাঙ্ক্ষাই তাহার অন্তরে ছিল। কিন্তু কোন্ মূল্যে সে ইহা পাইল।

যতীন যদি তাহার সঙ্গে আলেপুর যাইত, বড় ভাল হইত; এই রাজবন্দী তরুণটিকে তাহার বড় ভাল লাগে, সে তাহাকে অসীম শ্রদ্ধাও করে। যতীন মধ্যে মধ্যে বলে—আমাদের দেশের লোক শক্তির চর্চাটা একেবারে করে না। তাহাকে সে 'আমুতির লড়াই' দেখাইত। সকলেই শক্তির চর্চা একদিন করিত, প্রথাটা এখনও বাঁচিয়া আছে—ওই চণ্ডীমণ্ডপটার মত। চণ্ডীমণ্ডপটা এবার ছাওয়ানো হয় নাই, বর্ষায় এবার ওটা পড়িয়া যাইবে। গ্রামের লোক ছাওয়ায় নাই, শ্রীহরিও হাত দেয় নাই। শ্রীহরি ওটা ভাঙিতে চায়। এবার দুর্গাপূজার পর সর্বশুক্লা ত্রয়োদশীর দিন সে ওখানে দেউল তুলিবে, পাকা নাটমন্দির গড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপ এখন সত্যসত্যই শ্রীহরির।

শ্রীহরিই এখন এ গ্রামের জমিদার। শিবকালীপুরের জমিদারী সে-ই কিনিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ তাহার নিজস্ব। ইহার মধ্যে অনাচ্ছাদিত চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালগুলি বৈশাখের ঝড়ে, কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। কত পুরাতন দিনের বসুধারার চিহ্নগুলির একটিও আর দেখা যায় না।

শ্রীহরিও এখন তাহাকে প্রায়ই ডাকে—এস খুড়ো, আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিয়ো।—ব্যঙ্গ করিয়া বলে না, সত্যই সে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করিয়া বলে।

কিন্তু বলিলে কি হইবে? ওদিকে আবার যে শ্রীহরির সঙ্গে গ্রামের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বীজ হইতে অঙ্কুরের মত উদ্গত হইতেছে। সেটেলমেণ্টের পাঁচধারার ক্যাম্প আসিতেছে। শস্তের মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে শ্রীহরি খাজনা বৃদ্ধি দাবি করিবে। শ্রীহরি সেদিন তাহার কাছে কথাটা তুলিয়াছিল। দেবু বলিয়াছে—আশেপাশের গ্রামে কি হয় দেখ। সব গ্রামে কি হয় দেখ। সব গ্রামের লোক যদি জমিদারকে বৃদ্ধি দেয়—তুমিও পাবে।

গভর্নমেণ্ট সার্ভে হওয়ার ফলে এ দেশে জমিদারদের একটা সর্বজনীন পর্বের মত খাজনা বৃদ্ধির একটা সাধারণ উপলক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। প্রজারা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের মাতব্বরেরা তাহার কাছে ইহারই মধ্যে গোপনে গোপনে আসিতেছে। সে বরাবর বলিয়াছে, মনেও করিয়াছে—এসব ব্যাপারে সে থাকিবে না। তবু লোক শুনিতেছে না। কিন্তু খাজনাবৃদ্ধি! ইহার উপর খাজনাবৃদ্ধি? সে শিহরিয়া উঠে। গ্রামের দিকে চাহিয়া দেখে—জীর্ণ গ্রাম, মাত্র দুইখানা কাপড়, দুই মুঠা ভাত মানুষের জুটিতেছে না, ইহার উপর খাজনা বৃদ্ধি হইলে প্রজারা মরিয়া যাইবে। চাষীর ছেলে জমিদার হইয়া শ্রীহরি এসব কথা প্রায় ভুলিয়াছে; কিন্তু খোকাকে বিলুকে হারাইয়া সে আজ প্রায় সন্ন্যাসী হইয়াও একথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। গত কয়েকদিন ধরিয়া যতীনের সঙ্গে তাহার এই আলোচনাই চলিতেছে।

কি করিবে? যদি প্রয়োজন হয়—তবে আবার সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়—না, কাজ কি এসব পরের ঝঞ্চাটে গিয়া? তাহার মনে পড়ে ন্যায়রত্নের গল্প। ধর্ম-জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কিছুতেই তাহা হইয়া উঠে না। যতীন তাহাকে এ গল্পের অন্যরূপ অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতেও তাহার ভাল লাগে নাই। কিন্তু একান্তভাবে ধর্মকর্ম লইয়াও সে থাকিতে পারিল না—এটাই তাহার নিজের কাছে সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার ভিতরে একজন কে যেন আছে যে তাহাকে এই পথে এই ভাবে লইয়া চলিতেছে। সেই হয়তো আসল দেবু ঘোষ।

জগন ও হরেন তো ইহারই মধ্যে ভাবী খাজনাবৃদ্ধিকে উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণার পাঁয়-তাড়া করিতেছে। হরেন পথে-ঘাটে পাড়ায়-পাড়ায় বেড়ায়, অকারণে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠে—লাগাও ধর্মঘট। আমরা আছি।

বাংলার প্রজা-সমাজে ধর্মঘট একটি অতি পরিচিত কথা ও একটি অতি পুরাতন প্রথা। ধর্মঘট নামেই ইহার প্রাচীনত্বের পরিচয় বিদ্যমান। ধর্ম সাক্ষ্য করিয়া—ঘট পাতিয়া যে-কোন সর্বসাধারণের কর্মসাধনের জন্য পূর্ব হইতে শপথ গ্রহণ করা হইত। পরে উহা জমিদার ও প্রজার—পুঁজিপতি ও শ্রমজীবীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

ইহার মধ্যে তাহারা বিপুল উত্তেজনা অনুভব করে, সঙ্ঘশক্তির প্রেরণায় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে চায়,—আত্মস্বার্থ অদ্ভুতভাবে হাস্যমুখে বলি দেয়। প্রতি গ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—দরিদ্র চাষীদের মধ্যে এক-আধজনের পূর্বপুরুষ সেকালের প্রজা-ধর্মঘটের মুখ্য ব্যক্তি হইয়া সর্বস্ব খোয়াইয়া ভাবী পুরুষকে দরিদ্র করিয়া গিয়াছে। কোন কোন গ্রামে পোড়ো ভিটা পড়িয়া আছে; যেখানে পূর্বে ছিল কোন সমৃদ্ধিশালী চাষীর ঘর—সে-ঘর ওই ধর্মঘটের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ঘরের মানুষেরা উদরান্নের তাড়নায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অথবা রোগ অনশন আসিয়া বংশটাকে শেষ করিয়াছে।

কিন্তু ধর্মঘট সচরাচর হয় না। ধর্মঘট করিবার মত সর্বজনীন উপলক্ষ সাধারণত বড় আসে না। আসিলেও অভাব হয় প্রেরণা দিবার লোকের। এবার এমনই একটি উপলক্ষ আসিয়াছে। এ অঞ্চলেও প্রতি গ্রামেই গভর্নমেণ্ট সার্ভের পর শস্যের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে খাজনাবৃদ্ধির আয়োজন করিতেছে জমিদারেরা। প্রজারা খাজনাবৃদ্ধি দিতে চায় না। এটাকে তাহারা অন্যায় বলিয়া মনে করে। কোন যুক্তিই তাহাদের মন মানিতে চায় না। তাহারা পুরুষানুক্রমে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জমিকে উর্বরা করিতেছে—সে জমির শস্য তাহাদের। অবুঝ মন কিছুতেই বুঝিতে চায় না। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। আশ্চর্য—তাহার প্রতিটি তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে দেবুকে।

আলেপুরের মুসলমান অধিবাসীরা তাহাকে আজ যে আমুতির লড়াই দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে-ও এই তরঙ্গ। লড়াইয়ের পর ওই কথাই আলোচিত হইবে।

মহাগ্রামের তরঙ্গও তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গ্রামের লোকেরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়াছিল। ঠাকুর মহাশয় তাহাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন দেবুর কাছে। একটা চিঠিতে লিখিয়া দিয়াছেন পণ্ডিত, আমার শাস্ত্রে ইহার বিধান নাই। ভাবিয়া দেখিলাম —তুমি পার; বিবেচনা করিয়া বিধান দিয়ো।

ন্যায়রত্নকে সে মনে মনে প্রণাম করিয়াছে।—তুমি আমার ঘাড়ে এই বোঝা চাপাইতেছ ঠাকুর? বেশ, বোঝা ঘাড়ে লইব। –মুখে তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে তাই ভাবিতেছে—অন্যায় সঙ্ঘর্ষ সে বাধাইবে না। আগামী রথের দিন—ন্যায়রত্নের বাড়ীতে গৃহদেবতার রথযাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া যে মেলা বসিবে, সেই মেলায় সমবেত হইবে—পাঁচ সাতখানা গ্রামের লোক। প্রতি গ্রামের মাতব্বরেরা ন্যায়রত্নের আশীর্বাদ লইতে আসে। ন্যায়রত্ন দেবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দেবু ঠিক করিয়াছে, সেইখানেই সকল গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় স্থির করিবে।

—পোঁ—ভস-ভস-ভস!

রেলগাড়ী ছুটাইয়া আসিয়া হাজির হইল উচ্চিংড়ে। মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া সে বলিল—নজরবন্দীবাবু ডাকছে। তারপর মুখে বাঁশী বাজাইয়া দিয়া ছুটিল—পোঁ—ভস-ভস-ভস—

দেবু উচ্চিংড়ের ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

দেবু আসিতেই যতীন বলিল অনিরুদ্ধের কথা।

—দু'মাস তো পেরিয়ে গেল দেবুবাবু। তাঁর তো এতদিনে ফেরা উচিত ছিল। আমি হিসেব করে দেখেছি—দশদিন আগে বেরিয়েছেন তিনি। হিসেবে তাই হয়, থানাতেও তাই বলে।

—তাই তো! অনি-ভাইয়ের তো এতদিনে ফেরা উচিত ছিল।

—আমি ভাবছি—জেলে আবার কোন হাঙ্গামা করে নতুন করে মেয়াদ হ'ল না তো?

বিচিত্র নয়। অনি-ভাইকে বিশ্বাস নাই। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, দুর্দান্ত ক্রোধী। অনিরুদ্ধ সব পারে। দেবু বলিল—কামার-বউ বোধ হয় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?

যতীন হাসিল—মা-মণি? দেবুবাবু, ও এক বিচিত্র মানুষ। দেখছেন না—বাউণ্ডুলে ছেলে দুটো আর কোথাও যায় না। বাড়ীর আশেপাশেই ঘুরছে দিন-রাত। মা-মণি ওই ওদের নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত। একদিন মাত্র অনিরুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বাস। আবার যেদিন মনে পড়বে জিজ্ঞাসা করবে।

দেবুর চোখে এই তুচ্ছ কারণে জল আসিল। খোকাকে কোলে করিয়া বিলুর হাসিভরা মুখ, ব্যস্তসমস্ত দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। যতীন বলিল—বরং দুর্গা আমাকে দু-তিনদিন জিজ্ঞাসা করেছে।

চোখ মুছিয়া দেবু হাসিল, বলিল—দুর্গা আমার ওদিক দিয়ে আজকাল বড় যায় না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—তো বললে—গাঁয়ের লোককে তো জান জামাই! এখন আমি বেশী গেলে এলেই—তোমাকে জড়িয়ে নানান কুকথা রটাবে।

সত্য কথা। দুর্গা দেবুর বাড়ী বড় একটা যায় না। কিন্তু তাহার মাকে পাঠায় দুধ দিতে, পাতুকে পাঠায় দু-বেলা। রাত্রে পাতুই দেবুর বাড়ীতে শুইয়া থাকে,—সে-ও দুর্গার বন্দোবস্ত। তাছাড়া সে-ও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সে আর লীলাচঞ্চলা তরঙ্গময়ী নাই। আশ্চর্য রকমের শান্ত হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় দেবুর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে তাহাকে। যতীনের কিশোর তরুণ রূপ তাহাকে আর বিচলিত করে না। সে মাঝে মাঝে দূর হইতে দেবুকে দেখে—তাহারই মত উদাস-দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে নিরর্থক চাহিয়া থাকে।

যতীন কিছুক্ষণ পরে বলিল—শুনেছি শ্রীহরি ঘোষ সদরে দরখাস্ত করেছে—গ্রামে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজন হচ্ছে; তার মূলে আমি আছি। আমাকে সরাবার চেষ্টা করছেন। সরতেও আমাকে হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই স্নেহ-পাগলিনী মেয়েটির জন্য যে ভেবে আকুল হচ্ছি। এক ভরসা আপনি আছেন। কিন্তু সেও তো এক ঝঞ্ঝাট। তা ছাড়া এ এক অদ্ভুত মেয়ে, দেবুবাবু; ওই দুটো ছেলেকে আবার জুটিয়েছে। খাবে কি, দিন চলবে কি করে? আমি গেলেই—ঘর ভাড়া দশ টাকা তো বন্ধ হয়ে যাবে! আজকাল মা-মণি ধান ভানে, কঙ্কণায় ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গিয়ে মুড়ি ভাজে। কিন্তু ওতে কি ওই ছেলে দুটো সমেত সংসার চলবে?

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেবু বলিল—জেল-অফিস ভিন্ন তো অনিরুদ্ধের সঠিক খবর পাওয়া যাবে না। আমি বরং একবার সদরে গিয়ে খোঁজ করে আসি।

সদরে গিয়া দেবু দুই দিন ফিরিল না।

যতীন আরও চিন্তিত হইয়া উঠিল। অপর কেহ এ সংবাদ জানে না। পদ্মও জানে না। তৃতীয় দিনের দিন দেবু ফিরিল। অনিরুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জেল হইতে সে বাহির হইয়াছে দশ দিন আগে। দেবু অনেক সন্ধান করিয়াছে, সেই জন্য দুই দিন দেরি হইয়াছে। জেল হইতে বাহির হইয়া একটা দিন সে শহরেই ছিল –দ্বিতীয় দিন জংশন পর্যন্ত আসিয়াছিল। সেখান হইতে নাকি একটি স্ত্রীলোককে লইয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এই পর্যন্ত সংবাদ মিলিয়াছে যে কলে কাজ করিবার জন্য সে কলিকাতা বা বোম্বাই বা দিল্লী বা লাহোরে গিয়াছে। অন্তত সেই কথাই সে বলিয়া গিয়াছে—কলে কাজ করব তো এখানে কেনে করব? বড় কলে কাজ করব। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর যেখানে বেশী মাইনে পাব, যাব।

বাড়ীর ভিতর শিকল নড়িয়া উঠিল।

যতীন-ও দেবু উভয়েই চমকিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। আবার শিকল নড়িল। যতীন এবার উঠিয়া গিয়া নতশিরে অপরাধীর মত পদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইল।

পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল—সে জেল থেকে বেরিয়ে কি কোথাও চলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কলকাতা, বোম্বাই?

—হ্যাঁ।

পদ্ম আর কোন প্রশ্ন করিল না। ফিরিয়া চুপ করিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল।—সে চলিয়া গিয়াছে। যাক। তার ধর্ম তার কাছে!

তাহার এ মূর্তি দেখিয়া যতীন আজ আর বিস্মিত হইল না। পদ্ম বিষণ্ণ মূর্তিতে বসিতেই গোবরা ও উচ্চিংড়ে আসিয়া চুপ করিয়া পাশে বসিল। যতীন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া দেবুর নিকট ফিরিয়া আসিল।

* * *

দিন চারেক পর। সে-দিন রথের দিন।

গত রাত্রি হইতে নব-বর্ষার বর্ষণ শুরু হইয়াছে। আকাশ-ভাঙা বর্ষণে চারিদিক জলে থৈ থৈ করিতেছে। 'কাড়ান্' লাগিয়াছে। প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে মাথালী মাথায় দিয়া চাষীরা মাঠে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জমির আইলের ফাটা মুখ বন্ধ করিতেছে, ইঁদুরের গর্ত বন্ধ করিতেছে,—জল আটক করিতে হইবে। পায়ের নিচে মাটি মাখনের মত নরম, সেই মাটি হইতে সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে। সাদা জল পরিপূর্ণ মাঠ চক চক করিতেছে মেঘলা দিনের আলোর প্রতিফলনে। মধ্যে মধ্যে বীজধানের জমিতে সবুজ সতেজ ধানের চারা চাপ বাঁধিয়া এক-একখানি সবুজ গালিচার আসনের মত জাগিয়া আছে। বাতাসে ধানের চারাগুলি দুলিতেছে—যেন অদৃশ্য লক্ষ্মীদেবী মেঘলোক হইতে নামিয়া কোমল চরণপাতে পৃথিবীর বুকে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবেন বলিয়া চাষীরা আসনখানি পাতিয়া রাখিয়াছে।

সেই বর্ষণের মধ্যে যতীন বাসা ছাড়িয়া পথে নামিল। তাহার সঙ্গে দারোগাবাবু। দুইজন চৌকিদারের মাথায় তাহার জিনিসপত্র। দেবু, জগন, হরেন,—গ্রামের প্রায় যাবতীয় লোক সেই বর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

যতীনের অনুমান সত্য হইয়াছে। তাহার এখান হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ আসিয়াছে। সদর শহরে—একবারে কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে এবার। দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ম্লানমুখী পদ্ম; আজ তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন নাই। দুই চোখ দিয়া তাহার জলের ধারা গড়াইতেছে। তাহার পাশে উচ্চিংড়ে ও গোবরা—স্তব্ধ, বিষণ্ণ।

প্রথমটা যতীন শঙ্কিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিল—পদ্ম হয়তো একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। মূর্ছা-ব্যাধিগ্রস্ত পদ্ম হয়তো মূর্ছিত হইয়া পড়িবে—এইটাই তাহার বড় আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু পদ্ম তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া কেবল কাঁদিল। তাহার পাশে উচ্চিংড়ে গোবরা বেশ শান্ত হইয়া বসিয়াছিল। পদ্ম তাহাকে কোন কথা বলিল না।

উচ্চিংড়ে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি চলে যাবা বাবু?

—হ্যাঁ। মা-মণির কাছে খুব ভাল হয়ে থাকবি, উচ্চিংড়ে। কেমন? আমি চিঠি দিয়ে খোঁজ নেব তোদের।

ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া উচ্চিংড়ে বলিল—আর তুমি ফিরে আসবা না বাবু?

যতীন ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে গিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—তারপর পদ্মকে বলিল—মা-মণি, যেদিন ছাড়া পাব, একদিন তো ছেড়ে দেবেই, তোমার কাছে আসব।

পদ্ম চুপ করিয়াই রহিল।

এতক্ষণে পদ্ম নীরব রোদনের মধ্যেও মৃদু হাসিয়া হাতটি উপরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

যতীনের চোখে জল আসিল। আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—যখন যা হবে, পণ্ডিতকে বলবে—তার পরামর্শ নেবে।

পদ্মের মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—হ্যাঁ, পণ্ডিত আছে। চোখ মুছিয়া এবার সে বলিল—সাবধানে থেকো তুমি।

নলিন, সেই চিত্রকর ছেলেটিও ভিড়ের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া চুপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া, অভ্যাসমত নীরবেই চলিয়া গেল।

যতীন তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল।

হরেন হাত ধরিয়া বলিল—গুডবাই ব্রাদার।

জগন বলিল—রিলিজ্‌ড্‌ হলে যেন খবর পাই।

সতীশ বাউড়ী আসিয়া প্রণাম করিয়া একখানি ভাঁজকরা ময়লা কাগজ তাহার দিকে বাড়াইয়া একমুখ বোকার হাসি হাসিয়া বলিল—আমাদের গান। নিকে নিতে চেয়েছিলেন আপুনি। অনেকদিন নিকিয়ে রেখেছি, দেয়া হয় নাই।

যতীন কাগজখানি লইয়া সযত্নে পকেটে রাখিল।

আশ্চর্য ! দুর্গা আসে নাই !

দারোগাবাবু বলিল—এইবার চলুন যতীনবাবু।

যতীন অগ্রসর হইল—চলুন।

দেবু তাহার পাশে পাশে চলিল। পিছনে জগন, হরেন, আরও অনেকে চলিল। পথে চণ্ডীমণ্ডপের ধারে শ্রীহরি ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। মজুরেরা চণ্ডীমণ্ডপের খড়ের চাল খুলিয়া দিতেছে ; বর্ষার জলে ওটা ভাঙিয়া পড়িবে। তারপর সে আরম্ভ করিবে—ঠাকুরবাড়ী। শ্রীহরি ঘোষও মৃদু হাসিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল।

গ্রাম পার হইয়া তাহারা মাঠে আসিয়া পড়িল। যতীন বলিল—ফিরুন এবার আপনারা।

সকলেই ফিরিল। কেবল দেবু বলিল—চলুন, আমি বাঁধ পর্যন্ত যাব। ওখান থেকে মহাগ্রামে যাব ঠাকুরমশায়ের বাড়ী। তাঁর ওখানে রথযাত্রা।

পথে নির্জন একটি মাঠের পুকুরপাড়ে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল দুর্গা। তাহাকে কেহ দেখিল না। কিন্তু সে তাহাদের দিকে চাহিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল—তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

সকলেই চলিতেছিল নীরবে। একটি বিষণ্ণতায় সকলেই যেন কথা হারাইয়া ফেলিয়াছে। দারোগাবাবুটিও নীরব। এতগুলি মানুষের মিলিত বিষণ্ণতা তাঁহার মনকে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই স্পর্শ করিয়াছে।

যতীনের মনে পড়িতেছিল—অনেক কিছু কথা, ছোটখাটো স্মৃতি। সহসা মাঠের দিকে চাহিয়া তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই বিস্তীর্ণ মাঠ একদিন সবুজ ধানে ভরিয়া উঠিবে, ধীরে ধীরে হেমন্তে স্বর্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। চাষীর ঘর ভরিবে রাশি রাশি সোনার ফসলে।

পরমুহূর্তেই মনে হইল—তারপর ? সে ধান কোথায় যাইবে ?

তাহার মনে পড়িল অনিরুদ্ধের সংসারের ছবি। আরও অনেকের ঘরের কথা। জীর্ণ ঘর, রিক্ত অঙ্গন, অভাবক্লিষ্ট মানুষের মুখ, মহামারী, ম্যালেরিয়া, ঋণভার ; শীর্ণকায় অর্ধ উলঙ্গ অজ্ঞ শিশুর দল। উচ্চিংড়ে ও গোবরা—বাংলার ভাবীপুরুষের নমুনা।—

পরক্ষণেই মনে পড়িল—পদ্ম তাহাদের কপালে অশোক-ষষ্ঠীর ফোঁটা দিতেছে।

হঠাৎ তাহার পড়া স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা তুচ্ছ মনে হইল। অর্ধসত্য—সে শুধু কঠিন বস্তুগত হিসাব। কিন্তু সংসারটা শুধু হিসাব নয়। কথাটা তাহাকে একদিন ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে মনে পড়িয়া গেল। সে অবনত মস্তকে বার বার তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া স্বীকার করিল—সংসার ও সংসারের কোন কোন মানুষ হিসাবের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। ন্যায়রত্ন হিসাবের ঊর্ধ্বে—পরিমাপের অতিরিক্ত। আরও তাহার পাশের এই মানুষটি—পণ্ডিত দেবু ঘোষ, অর্ধশিক্ষিত চাষীর ছেলে, হৃদয়ের প্রসারতায় তাহার নির্ধারিত মূল্যাঙ্ককে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কতখানি—কতদূর যতীন তাহা নির্ধারিত করিতে পারে নাই, কেমন করিয়া গেল—সেও অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত এক রহস্য।

এই হিসাব-ভুলের ফেরেই তো সৃষ্টি বাঁচিয়া আছে। এক ধূমকেতুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে পৃথিবীর

একবার চুরমার হইয়া যাইবার কথা ছিল। বিরাট বিরাট হিসাব করিয়া ও অঙ্ক কষিয়াই— সেটা অঙ্কফল হিসাবেই ঘোষিত হইয়াছিল। অঙ্ক ভুল হয় নাই, কিন্তু পৃথিবী কোন্ রহস্যময়ের ইঙ্গিতে ভুল করিয়া ধূমকেতুটার পাশ কাটাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

নহিলে, সেই সমাজ-শৃঙ্খলার সবই তো ভাঙিয়া গিয়াছে। গ্রামের সনাতন ব্যবস্থা— নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি—আজ স্বকর্মত্যাগী, স্বকর্মহীন। এক গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রামের বন্ধন, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, দশগ্রাম, বিংশতিগ্রাম, শতগ্রাম, সহস্রগ্রামের বন্ধন-রজ্জু গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এলাইয়া গিয়াছে।

মহাগ্রামের 'মহা' বিশেষণ বিকৃত হইয়া মহুতে পরিণত হইয়াছে, শুধু শব্দার্থেই নয়-- বাস্তব পরিণতিতেও তাহার মহা-মহিমত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আঠারো পাড়া গ্রাম আজ মাত্র অল্প কয়েক ঘর লোকের বসতিতে পরিণত। ন্যায়রত্ন জীর্ণ বৃদ্ধ একান্তে মহাপ্রয়াণের দিন গণনা করিয়া চলিয়াছেন।

নদীর ওপারে নূতন মহাগ্রাম রচনা করিতেছে—নূতন কাল। নূতন কালের সে রচনার মধ্যে যে রূপ ফুটিয়া উঠিবে—সে যতীন বইয়ের মধ্যে পড়িয়াছে—তার জন্মস্থান কলিকাতায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। সে মনে হইলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, মনে হয় গোটা পৃথিবীর আলো নিভিয়া যাইবে, বায়ুপ্রবাহ স্তব্ধ হইবে, গোটা সৃষ্টিটা দুর্বৃত্ত-ধর্ষিতা নারীর মত অন্তঃসারশূন্য কাঙালিনীতে পরিণত হইবে। জীর্ণ অন্তর বুকে হাহাকার, বাহিরে চাকচিক্য মুখে কৃত্রিম হাসি। দুর্ভাগিনী সৃষ্টি! আঙ্কিক নিয়মে তার পরিণতি—ক্ষয়রোগীর মত তিলে তিলে মৃত্যু। তবু কিন্তু সে হতাশ নয় আজ। মানুষ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত রহস্য। পৃথিবীর সমুদ্র-তটের বালুরাশির মধ্যে একটি বালুকণার মতই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্তির অভ্যন্তরে এই পৃথিবী, তাহার মধ্যে যে জীবন রহস্য, সে রহস্য ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ-উপগ্রহের রহস্যের ব্যতিক্রম—এককণা পরিমাণ জীবন, প্রকৃতির প্রতিকূলতা মৃত্যুর অমোঘ শক্তি—সমস্তকে অতিক্রম করিয়া শত ধারায়, সহস্র ধারায়, লক্ষ ধারায়, কোটি কোটি ধারায় কালে কালে তালে তালে উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাপ্রবাহে পরিণত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। সে সকল বাধাকেই অতিক্রম করিবে। আনন্দময়ী প্রাণবতী সৃষ্টি, অফুরন্ত তাহার শক্তি—সে তাহার জীবন-বিকাশের সকল প্রতিকূল শক্তিকে ধ্বংস করিবে, তাহাতে তাহার সংশয় নাই আজ। ভারতের জীবন-প্রবাহ বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া আবার ছুটিবে।

ন্যায়রত্ন জীর্ণ। তাঁহার কাল অতীত হইতে চলিয়াছে। তিনি থাকিবেন না। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি, আদর্শ নূতন জন্মলাভ করিবে।

যতীন হাসিল। মনে পড়িল—ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথকে। সে আসিবে। দেবু ঘোষ নবরূপে পল্লীর এই শৃঙ্খলাহীন যুগে, ভাঙাগড়ার আসরের মধ্যে—শ্রীহরি পাল, কঙ্কণার বাবু, থানার জমাদার, দারোগার রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহামারীর আক্রমণকে সে রোধ করিয়াছে। দেবুর বুকে বুক রাখিয়া আলিঙ্গনের সময় সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে, অভয়ের বাণী তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইতে। সকল বাধা দূর করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভের অদম্য আগ্রহের বাণী!

উত্তেজনায় বিপ্লববাদী শরীরে থর থর করিয়া কম্পন বহিয়া গেল। এ চিন্তা তাহার বিপ্লব-বাদের চিন্তা। আনন্দে তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল অদ্ভুত এক দীপ্তি। তাহার আনন্দ, তাহার সান্ত্বনা এই যে, সে তাহার কর্তব্য করিয়াছে। বন্দী-জীবনে এই পল্লীর মধ্যে দেবুর জাগরণে সে সাহায্য করিয়াছে। বন্দীত্ব তাহার নিজের জীবনের জাগরণের ভাবপ্লাবনের গতিরোধ করিতে পারে নাই। এমনি করিয়াই নূতন কালের ধর্ষণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে—মানুষ বাঁচিবে। ভয় নাই, ভয় নাই।

বাঁধের উপর দেবু দাঁড়াইয়া বলিল—যতীনবাবু, আসি তা হলে। নমস্কার।

যতীন বলিল—নমস্কার দেবুবাবু, বিদায়। দেবুর হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ থামিয়া আবৃত্তি করিল—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই॥'

তারপর সে নিতান্ত অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। দেবু যতীনের গতিপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চোখ দিয়া তাহার দরদরধারে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। এই একান্ত একক জীবন—বিলু, খোকা চলিয়া গিয়াছে,—জগন, হরেন আসিয়া আর তেমন কলরব করে না। সমস্ত গ্রাম হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ যতীনবাবুও চলিয়া গেল। কেমন করিয়া দিন কাটিবে তাহার? কাহাকে লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?—সহসা মনে পড়িল ন্যায়রত্নের গল্প। কই, তাহার সে শালগ্রাম কই? সে ঊর্ধ্ব-লোকে আকাশের দিকে চাহিয়া আত্মহারার মত হাত বাড়াইল, সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া অকপট-কাতর স্বরে ডাকিল—ভগবান!

ময়ূরাক্ষীর গর্ভে নামিয়া যতীন আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, সুউচ্চ বাঁধের উপর দণ্ডায়মান ঊর্ধ্ববাহু দেবুকে দেখিয়া সে আনন্দে তৃপ্তিতে মোহগ্রস্তের মত নিশ্চল হইয়া দেবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

দারোগা ডাকিল—যতীনবাবু, আসুন!

যতীন মাটিতে হাত ঠেকাইয়া, সেই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর বলিল—চলুন।

অকস্মাৎ দূরে কোথাও ঢাক বাজিয়া উঠিল।

সেই দূরাগত ঢাকের শব্দে সচেতন হইয়া দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ঢাক বাজিতেছে। মহাগ্রামে ঢাকের শব্দ। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রা। রথ কোথায় গিয়া থামিবে—কে জানে?

বাঁধের পথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

রাইকমল

এক

পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশ।

এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। এমন কি যেদিন 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু' হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিনেরও অনেক কাল পূর্ব হইতেই এ অঞ্চলটিতে মানুষেরা 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' যে বাঁশি বাজে, তাহার ধ্বনি শুনিয়াছে। এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম-শুকপাখি ধরিয়া হৃদয়পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে তখন হইতেই জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষেও জানিত, 'সুখ দুখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই'।

লোকে কপালে তিলক কাটিত, গলায় তুলসীকাঠের মালা ধারণ করিত; আজও সে তিলক-মালা তাহাদের আছে। পুরুষেরা শিখা রাখিত, আজও রাখে; মেয়েরা চূড়া করিয়া চুল বাঁধিত। এখন নানা ধরনের খোঁপা বাঁধার রেওয়াজ হইয়াছে, কিন্তু স্নানের পর এখনও মেয়েরা দিনান্তে একবারও অন্তত চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। আজও রাত্রে বাঁশের বাঁশির সুর শুনিলে এ অঞ্চলের একসন্তানের জননী যাহারা, তাহারা জলগ্রহণ করে না। পুত্র-বিরহবিধুরা যশোদার কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যায়। হলুদমণি পাখি—বাংলা দেশের অন্যত্র তাহারা 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে, এখানে আসিয়া তাহারা সে ডাক ভুলিয়া যায়—'কৃষ্ণ কোথা গো' বলিয়া ডাকে।

অধিকাংশই চাষার গ্রাম। দশ-বিশখানা গ্রামের পরে দুই-একখানা ব্রাহ্মণ এবং ভদ্র সম্প্রদায়ের গ্রাম পাওয়া যায়। চাষীর গ্রামে সদ্গোপেরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা-তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারীরা 'রাধে-কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়; বৈষ্ণবেরা খোল, করতাল লইয়া আসে; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একতারা-খঞ্জনী লইয়া গান গায়; বাউলেরা একা আসে একতারা বাজাইয়া। মুসলমান ফকিরেরা পর্যন্ত বেহালা লইয়া গান গায়—পুত্র-শোকাতুরা যশোদার খেদের গান। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব-আখড়ায় পদাবলী গান হয়, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সংকীর্তন হয়, ঘরের খ'ড়ো বারান্দায় ঝুলানো এদেশী শালিখ পাখি 'রা-ধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রা-ধা, গো-পী-ভজ' বলিয়া ডাকে। লোকে শখ করিয়া মালতী মাধবী ফুলের চারা লাগায়। প্রতি পুকুরের পাড়েই কদমগাছ আছে। কদমগাছ নাকি লাগাইতে হয়। বর্ষায় কদমগাছগুলি ফুলে ভরিয়া উঠে, সেই দিকে চাহিয়া প্রবীণেরা অকারণে কাঁদে।

সে কাল আর নাই। কালের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাঠের বুক চিরিয়া রেল-লাইন পড়িয়াছে। তাহার পাশে পাশে টেলিগ্রাফের তারের খুঁটির সারি। বিদ্যুৎ-শক্তিবহ

'তারের লাইন। মেঠো পথ পাকা হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে মোটর বাস ছুটিতেছে। নদী বাঁধিয়া খাল কাটা হইয়াছে। লোকে হুঁকা ছাড়িয়া বিড়ি-সিগারেট ধরিয়াছে। কাঁধে গামছা, পরনে খাটো কাপড়ের বদলে বড় বড় গ্রামের ছোকরারা জামা, লম্বা কাপড় পরিয়া সভ্য হইয়াছে। ছ-আনা দশ-আনা ফ্যাশনে চুল ছাঁটিয়াছে। নতুন কালের পাঠশালা হইয়াছে। ভদ্রগৃহস্থঘরের হালচাল বদলাইয়াছে, গোলাব ধান ফুরাইয়াছে, গোয়ালের গাই কমিয়াছে, তবুও একশ্রেণীর মানুষ এই ধারাটি ভুলিয়া যায় নাই; 'হরি বলতে যাদের নয়ন ঝরে'—তাদের দুই ভাইকে স্মরণ করিয়া তাহারা আজও কাঁদে। 'সুখ দুখ দুটি ভাই'—এই তত্ত্বটি তাহাদের কাছে আজও অতি সহজ কথা। 'ধীরে সমীরে যমুনাতীরে'—আজও সেখানে বাঁশি বাজে।

এই অঞ্চলে চাষীদের ছোট একখানি গ্রাম। মাটির ঘর, মেটে পথ, পথের দুই ধারে পতিত জায়গায় ভাঁটিফুল ফোটে, কস্তুরীফুল ফোটে, নয়নতারা অর্থাৎ লাল সাদা ফুল চাপ বাঁধিয়া ফুটিয়া থাকে, অজস্র 'বাবুরি' অর্থাৎ বনতুলসী গাছের জঙ্গল হইতে তুলসীর গন্ধ ওঠে। ছোট ছোট ডোবায় মেয়েরা বাসন মাজে, কাপড় কাচে; পাড়ের উপরে বাঁশবনে সকরুণ শব্দ উঠে; কদম, শিরীষ, বকুল, অর্জুন, আম, জাম, কাঁঠাল-বনের ঘনপল্লবের মধ্যে বসিয়া পাখি ডাকে। কোকিল, পাপিয়া, বেনেবউ, বউ কথা কও, ঘুঘু, ফিঙে আরও কত পাখি, কাকেরা বাড়ির উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সড়ক শালিকে পথের ধুলায় ঘরের চালে কিচিমিচি কলরবে ঝগড়া করে। ঘরে চালের কিনারায় ঝুলাইয়া দেওয়া ঝুড়িতে হাঁড়িতে পায়রারা বকবকম গুঞ্জন তোলে; সুখের ঘরেই নাকি পায়রার বাস—তাই সুখের আশায় মানুষেরা নিজেরাই বাসা বাঁধিয়া দেয়। চাষীরা মাঠে যায়। মেয়েরা ঘরের পাশে শাকের ক্ষেতে জল দেয়, লাউ-কুমড়া-লতার পরিচর্যা করে। ধান শুকায়, ধান তোলে, সিদ্ধ করে, ঢেঁকিতে ভানে। ছেলেরা সকালে কেউ পাঠশালায় যায়, কেউ যায় না, গোরুর সেবা করে। গ্রামখানির উত্তর প্রান্তের ছোট্ট একটি বৈষ্ণবের আখড়া কাহিনীটির কেন্দ্রস্থল। সুনিবিড় ছায়াঘন কুঞ্জবনের মত আখড়াটির নাম ছিল—হরিদাসের কুঞ্জ। হরিদাস মহান্ত ছিল আখড়াটির প্রতিষ্ঠাতা। আখড়াটির চারিদিক রাঙ-চিতার বেড়া দিয়া ঘেরা। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে আম, জাম, পেয়ারা, নিম, সজিনা গাছের ঘন পল্লবের প্রসন্ন ছায়া আখড়াটির সর্বাঙ্গ জড়াইয়া আছে নিবিড় মমতায় মত। পিছনের দিকে কয় ঝাড় বাঁশ, যেন দুলিয়া দুলিয়া আকাশের সঙ্গে কথা কয়। এই আবেষ্টনীর মধ্যে দুই পাশে দুইখানি মেটে ঘর আর তাহারই কোলে রাঙা মাটি দিয়া নিকানো ছোট্ট একটি আঙিনা—সর্বদা সুপরিচ্ছন্ন মার্জনায় তকতক করে। লোকে বলে সিঁদুর পড়িলেও তোলা যায়। ঠিক মাঝ-আঙিনায় একটি চারাগাছে জড়াজড়ি করিয়া উঠিয়াছে দুইটি ফুলের লতা—একটি মালতী, অপরটি মাধবী। শক্ত বাঁশের মাচার উপরে লতা দুইটি লতাইয়া বেড়ায় আর পালাপালি করিয়া ফুল ফোটায় প্রায় গোটা বছর। লতাবিতানটির নিবিড় পল্লবদলের মধ্যে অসংখ্য মধুকুলকুলির বাসা। ছোট ছোট পাখিগুলি ফুলে ফুলে মধু খায় আর কলরব করে উদয়কাল হইতে অস্তকাল পর্যন্ত।

আখড়ায় থাকে মা ও মেয়ে—কামিনী ও কমলিনী। পল্লীবাসীরা দেশের ভাষা অনুযায়ী বলে 'মা-বিঠীরা'। বৈষ্ণবের সংসার, চলে ভিক্ষায়। কামিনী খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া আনে। কিশোরী মেয়ে কমলিনী ঘরে থাকে, গৃহকর্ম করে, পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা করে, গুনগুন করিয়া গান গায়। গান শেখা এখনও তাহার শেষ হয় নাই। তবে গানের দিকে মেয়েটির একটি সহজ দখল ছিল। তাহার বাপ হরিদাস মহান্ত ছিল এ অঞ্চলে একজন প্রতিষ্ঠা-বান গায়ক। কমলিনীর মা কামিনীর শিক্ষাও তাহারই কাছে।

কামিনীর গলা ছিল বড় মিঠা। হরিদাস ওই মিঠা গলার জন্যই শখ করিয়া তাহাকে গান শিখাইয়াছিল। কামিনী সলজ্জভাবে আপত্তি করিলে সে বলিয়াছিল, জান, এসব হল গোবিন্দের দান, এই রূপ এই কণ্ঠ—এর অপব্যবহার করতে নাই। এতে তাঁরই পুজো করতে হয়। এই গলা তিনি তোমাকে দিয়েছেন এতে তাঁর নাম-গান হবে বলে।

তারপর আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিল, আরও শিখে রাখ কামিনী, আমার সম্পত্তির মধ্যে তো এইটুকু, ভালমন্দ কিছু হলে এ ভাঙিয়ে তুমি খেতে পারবে।

কথাটা যে অতি বড় নিষ্ঠুর সত্য, সেদিন তাহা কেহ ভাবে নাই। কিন্তু ভবিতব্যের চক্রান্তে পরিহাস সত্য হইল। ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া কামিনী অনাথ হইল। আখড়াধারী বৈষ্ণবদের পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা আছে,—কিন্তু কামিনী তাহা করিল না। হরি বলিয়া দিন যাপনের সংকল্প করিল। হরিদাস অকালে অল্পবয়সে দেহ রাখে। মরণকে উহারা মরণ বলে না, বলে দেহ রাখা। সত্যই আজ কামিনীর ওই গানই সম্বল।

মা-বাপের উভয়ের এই গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে কমলিনীর ছিল। সঙ্গীতে সে যেন একটি স্বচ্ছন্দ অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সে প্রতিষ্ঠা জন্মগত। একবার শুনিলেই গানের সুরখানি সে আপন কণ্ঠে বসাইয়া লইত। মায়ের নিকট পাইয়াছিল সে সুস্বর—তরুণ কণ্ঠটি ছিল তাহার সরল বাঁশের বাঁশির মত সুডৌল, মধুক্ষরা এবং বাপের কাছ হইতে পাইয়াছিল সুর-জ্ঞান ও ছন্দে তালে অধিকার।

গৃহকর্মের মধ্যে সে শাকসব্জি ও মালতী-মাধবীর জোড়া-লতার চারাটিতে জল দেয়। রাঙা মাটি দিয়া ঘর-দুয়ার ও আঙিনাটি পরিপাটি মার্জনা করে আর হাসিয়া সারা হয়। চঞ্চলা মেয়েটির মুখে হাসি লাগিয়াই আছে।

ভাগ্যগুণে হরির কৃপায় একটি সহায়ও তাহাদের মিলিয়া গিয়াছে। কোথা হইতে বুড়া বাউল রসিকদাস একতারা হাতে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে এই গ্রামে আসিয়া কামিনীদের আখড়ার পাশেই আখড়া বাঁধিল। কমলিনীর বয়স তখন ছয় কি সাত। কমলিনীই তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিজেদের আখড়ায় লইয়া আসিয়াছিল। বুড়ার সঙ্গে তাহাদের দেখা হইয়াছিল পথে। বুড়া বাউল গ্রামে ঢুকিয়া গান করিয়াছিল—

মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে
কোন মহাজন পারে বলিতে ?
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে।

ওগো ললিতে।

হায় পোড়ামন—

ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধুলা থেকে

রাই যে আমার রাঙা পায়ের ছাপ গিয়েছে এঁকে।

আলোর ছটা চোখ ধাঁধালো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিতে।

গ্রামের মাতব্বর মণ্ডল চাষী মহেশ্বর নিজের দাওয়ায় হুঁকা টানিতেছিল আর ঢেঁড়ায় শনের দড়ি পাকাইতেছিল। বুড়া বাউলের মিঠা কণ্ঠস্বরের গান শুনিয়া সেই ডাকিয়া বলিল, বলিহারি বলিহারি! ও বাবাজী! এ যে খাসা গান। বস বস। তামাক ইচ্ছে কর।

বাউল দাওয়ায় চাপিয়া বসিয়া বলিল, ও ক্ষ্যাপা ভাত খাবি? না—পাত পাড়লাম, পাতা সঙ্গেই আছে। বলিয়া সে হুঁকা বাহির করিল। হাসিয়া বলিল, দেন তা হলে। পরানটা তামাক-তামাক করচে।

কল্কে লইয়া বেশ কয়েক টান টানিয়া বলিল, চমৎকার দেশ আপনাদের বাবা। অজয়ের তীর।

মহেশ বলিল, হ্যাঁ, মাটি ভাল। অজয়ের পলিতে সোনা ফলে। বুয়েচ না বাবাজী, আলু যা হয়, সে তোমার ওল বললে ভুল হবে না। ইয়া বড়।

বাউল বলিল, তা হ্যাঁ বাবা, অজয়ের জলের শব্দে রাত বিরেতে এখনও শোনা যায়, বাঁশি, বাঁশির সুর?

মহেশ বলিল, বাঁশি? ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, মহতের কথা মহতে বোঝে। মেঘের ডাকে ময়ূর নাচে, গেরস্ত তাকায় ফুটো চালের পানে। বাবুরা সর্ষেফুল দেখে মূর্ছা যায়, আমাদের ক্ষেতে সর্ষেফুল দেখে সাত মণ তেলের কথা ভাবি—চোখের সামনে রাধা নাচে। ও বোবার গায়েন কালায় বোঝে, ঢেঁকির নাচন ঘোড়ায় বোঝে; বাঁশি শুনে রাই উদাসী, জটিলে কুটিলের হৃদ্‌কম্প। বুয়েচ বাবা—লোকে বলে বাজত—কেউ বলে আজও বাজে, তা আমি শুনি নি। বাবা, আমি শুনি বর্ষায় অজয়ের জল ডাকে—খাবং খাবং খাবং, জমি খাব, ঘর খাব, গেরাম খাব। আমি তখন বলি—থামং থামং থামং। শীতের সময় দরজা-জানালা বন্ধ করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে এক ঘুমে রাত কাবার; দিনে ধান কাটি, ধান পিটি—ধুপধাপ শব্দে; অজয়ের কথা মনেই থাকে না।

শুনিয়া বাউল হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিহারি বলিহারি! মোড়ল মশায়, আপনার রসের ভাণ্ডার অক্ষয় হোক। আপনি আনন্দময় পুরুষ গো!

মহেশ মণ্ডল খুশী হইয়া আর একবার তামাক সাজিয়া খাইয়াছিল, খাওয়াইয়াছিল। এবং এবার সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বাবাজীর নাম কি?

বাউলও ওই সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছিল, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন—রসময় অনেক দূর, পঙ্করসে ডুবে রইলাম, বাপ-মা নাম দিয়েছেন রসিকদাস।

ঘর কোথা গো? যাবে কোথা?

ঘরের ঠিকানা বাউলের নাই বাবা, পথেই ঘুরছি; যাব ব্রজে তা পথের মাঝে পথ হারিয়েছি।

ঠিক এই সময়েই ওই কমলিনীর সঙ্গে দেখা। মহেশ মোড়লের ছেলে রঞ্জনদের সঙ্গে খেলা সারিয়া সে তখন ঘরে ফিরিতেছিল। কচি মুখে রসকলি ও খাটো চুলে বাঁধা চূড়া ঝুঁটি দেখিয়া বাউল বলিয়াছিল, এ যে দেখি খাসা বষ্টুমী! কি নাম গো তোমার?

কমলিনী বলিয়াছিল, আমি কমল।

বাউল বলিয়াছিল, শুধু কমল ন্যাড়া শোনায়, তুমি রাইকমল।

মহেশ মোড়ল একটু কৃপণ মানুষ, বেলা দুপহর হইয়া আসিয়াছে, বাউলকে সে নিজে ডাকিয়া বসাইয়াছে; এখন খাইতে দেওয়ার হাঙ্গামাটা অনায়াসে ওই ছোট মেয়েটার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে কোন প্রতিবাদ হইবে না বুঝিয়া বলিয়া দিল, নিয়ে যা। কমলি, বাবাজীকে তোদের আখড়ায় নিয়ে যা। বেলা হয়েছে। আমাদের আমিষের হেন্‌সেল। তোদের ঘরে নিয়ে যা।

কমল হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, এস বাবাজী।

*   *   *

সেই অবধি বুড়া এইখানেই থাকিয়া গিয়াছে। মা-বিটীদের আখড়ার পাশে আর-একটা আখড়া বাঁধিয়াছে। গ্রামের ছেলেছোকরাদের তামাক খাইবার আড্ডা। বুড়াদের বড় তামাকের মজলিস। ভাবুকদের কীর্তনের আসর। কামিনী-কমলিনীর ভরসাস্থল।

আধবুড়া বাউল রসিকদাস কমলিনাকে গান শিখাইতে আসে। সে ডাকে—রাইকমল!

কমলিনী অমনই হাসিয়া সারা, বলে, কি গো বগ-বাবাজী?

বাউল রসিকদাসের শরীরের গঠনভঙ্গী কেমন অতিরিক্ত লম্বা রকমের। বকের মত লম্বা গলা, অমনই লম্বা হাত-পা। ছোট কমল বড় হইয়া মুখরা হইয়াছে। ওই বাউলই তাহাকে মুখরা করিয়া তুলিয়াছে। সে এখন বাউলেরই নামকরণ করিয়াছে বগ-বাবাজী!

কমলিনীর তাহাকে দেখিলেই হাসি পায়। সে তাহার নাম দিয়াছে—বগ-বাবাজী। রসিকদাস রাগ করে না, সে হাসে।

কমলিনী বলে, মরে যাই বগ-বাবাজীর শখ দেখে। দাড়িতে আবার বিনুনি পাকানো হয়েছে! পাকা চুলে মাথায় আবার রাখাল-চূড়ো! ওখানে একটি কাকের পাখা গোঁজ, ওগো ও বগ-বাবাজী!

বলিয়া আবার সে হাসে।

মা কামিনী রুষ্ট হইয়া উঠে—সে রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করে, মর মর মুখপুড়ী, চোদ্দ বছরের ধাড়ী—

রসিক হাসিয়া বাধা দিয়া বলে, না না, বোকো না। ও আনন্দময়ী—রাইকমল

সায় পাইয়া কমলিনী জোর দিয়া বলে, বল তো বগ-বাবাজী!

বলিয়াই মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে এলাইয়া পড়ে।

ঝাঁট দিতে দিতে ঝাঁটাগাছটা উঁচাইয়া মা বলে, ফের ! দেখবি ?

বাহিরে বেড়ার ওপাশে পথের উপর হইতে মহেশ মোড়লের ছেলে রঞ্জন ডাকে, কমলি ! অমনই কমলি পলায়নের ভান করিয়া ছুটিতে শুরু করে। বলে, মার, তোর নিজের মুখে মার। থাকল তোর গান শেখা, চললাম আমি কুল খেতে।

রাগে গরগর করিতে করিতে মা বলে, বেরো—একেবারে বেরো।

মেয়ে মায়ের তিরস্কার আমলেই আনে না, চলিয়া যায়। মা পিছন পিছন বাহির-দরজা পর্যন্ত আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলে, কমলি, ফিরে আয় বলছি—ফিরে আয়। এত বড় মেয়ে, লোকে বলবে কি—সে জ্ঞান করিস ? বলি, ওগো ও কুলখাগী কমলি !

রসিকদাস হাসে। তাহার হাসি দেখিয়া কামিনীর অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। সে ঝঙ্কার দিয়া বলে, কি যে হাস মহান্ত ? তোমার হাসি আসছে তো !

রসিকদাস কোন উত্তর করে না। সে আপন মনে লম্বা দাড়িতে বিনুনি পাকায়। কামিনীও গৃহমার্জনা করিতে করিতে কন্যাকেই তিরস্কার করে। গান শিখাইবার লোকের অভাবে রসিকদাস আপনার আখড়ার পথ ধরে। পথে নিজেই গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দেয়—

ফুটল রাইকমলিনী বসল কৃষ্ণভ্রমর এসে।
লোকে বলে নানা কথা তাতে তার কি যায় আসে ?
কুল তো কমল চায় না বৃন্দে মাঝজলেই হাসে ভাসে।

বাউল পথ চলে আর মাথা নাড়ে। এই কিশোর-কিশোরীর লীলার মধ্যে সে দেখে ব্রজের খেলা।

রঞ্জন—মহেশ্বর মোড়লের ছেলে। কমলিনীর চেয়ে সে বৎসর তিন-চারেকের বড়। কমলিনীর সে খেলাঘরের বর—সে তাহার কিল মারিবার গোসাঁই। ধর্মতলার প্রকাণ্ড বট-গাছটার তলদেশে এই গ্রামের ছেলেদের পুরুষানুক্রমিক খেলাঘর। গাছটিকে বেষ্টন করিয়া ছোট ছোট খেলাঘরে শিশুকল্পনার গ্রাম এই বসতিসৃষ্টির দিন হইতে নিত্যনিয়মিত গড়িয়া উঠিয়াছে। বটগাছের উঁচু উঁচু শিকড়গুলি হইত তাহাদের তক্তাপোশ। পথের ধুলা গায়ে স্বেচ্ছামত মাখিয়া বালক রঞ্জন আসিয়া সেই তক্তাপোশের উপর বসিয়া বিজ্ঞ চাষীর মত বলিত, বউ, ও বউ, একবার তামাক সাজ তো। আর খানিক বাতাস। আঃ, যে রোদ—আর চাষের যে খাটুনি !

কমলি তখন সাত-আট বছরের। সে প্রগল্‌ভা বধূর মত ঝঙ্কার দিয়া উঠিত, আ মরে যাই ! গরজ দেখে অঙ্গ আমার জুড়িয়ে গেল ! আমার বলে কত কাজ বাকি, সেসব ফেলে আমি এখন তামাক সাজি, বাতাস করি ! নবাব নাকি তুমি ? তামাক নিজে সেজে নিয়ে খাও।

রঞ্জন হুঙ্কার দিয়া উঠিত, এই দ্যাখ—রোদে-পোড়া চাষা আর আগুনে তপ্ত ফাল এ দুইই সমান। বুঝে কথা বলিস কিন্তু নইলে দেবো তোর ধুমসো গতর ভেঙে।

অমনিই কমলি খেলা ছাড়িয়া রঞ্জনের কাছে রোষভরে আগাইয়া আসিত। তাহার

নাকের কাছে পিঠ উঁচাইয়া দিয়া বলিত, কই, দে—দে দেখি একবার ' ওঃ—গতর ভেঙে দেবেন, ও রে আমার কে রে !

খেলাঘরের প্রতিবেশীর দল কৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিত। দারুণ অপমানে রুখিয়া, রঞ্জন কমলির মোটা বিঁড়েখোঁপা ধরিয়া গদাগদ কিল বসাইয়া দিত। টান মারিয়া কমলি চুলের গোছা মুক্ত করিয়া লইত। কয়েকগাছা চুল রঞ্জনের হাতেই থাকিয়া যাইত। তারপর ক্ষিপ্তার মত সে রঞ্জনের চোখে মুখে ধুলা ছিটাইয়া দিয়া রোষ-রোদনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিত, কেন, কেন, মারবি কেন তুই ? আমাকে মারবার তুই কে ?

ননদিনী কাদু প্রবীণার মত আসিয়া বলিত, এটি কিন্তু দাদা, তোমার ভারি অন্যায় !

ও পাড়ার ভোলা কমলির প্রতি দরদ দেখাইয়া বলিত, খেলতে এসে মারবি কেন রে রঞ্জন ?

রঞ্জনের আর সহ্য হইত না। সে বলিত, নাঃ, মারবে না ! পরিবারের মুখ-ঝামটা খেতে হবে সোয়ামী হয়ে ?

কমলি ফুলিতে-ফুলিতে গর্জিয়া উঠিত, ওরে আমার সোয়ামী রে ! বলে যে সেই, ভাত দেওয়ার ভাতার না, কিল মারবার গোসাঁই। যা যা, আমি তোর বউ হব না। তোর সঙ্গে আড়ি—আড়ি—আড়ি।

এমনই করিয়া খেলা ভাঙিত। পরদিন প্রভাতে আবার সেখানে ছেলেদের কলরব জাগিয়া উঠিত। সেদিন প্রথমেই কমলির হাত ধরিত ভোলা। সে বলিত, আজ ভাই তোমাতে আমাতে, বেশ—

কমলি আড়চোখে তাকাইয়া দেখিত, ওপাশে রঞ্জন দাঁড়াইয়া আছে। মাঝের পাড়ার বৈষ্ণবদের মেয়ে পরী আগাইয়া আসিত। রঞ্জনের হাত ধরিয়া বলিত, তোতে আমাতে, বেশ ভাই রঞ্জন।

পরীও কমলির সমবয়সী ; কিন্তু কমলির সহিত তাহার যেন একটা শত্রুতা আছে। পরীদের বাড়ি রঞ্জনদের বাড়ির পাশেই। রঞ্জনকে লইয়া কমলির সঙ্গে তাহার খুনসুটি লাগিয়াই আছে। রঞ্জন বলিত, বেশ।

কমলি ভোলাকে বলিত, আমি ভাই বিধবা। একা খেলব।

দুই-তিন দিন পর একদিন পরীকে খেদাইয়া দিয়া রঞ্জন মাথা নাড়িয়া বলিত, বিয়েই আমি করব না।

ব্যঙ্গভরে ভোলা হাসিয়া বলিত, গোসাঁইঠাকুর গো !

ভোলার হাত ছাড়াইয়া কমলি অগ্রসর হইত। ভোলা বলিত, আবার মার খাবি কমলি ?

কমলি বলিত, তা ভাই মারে তো আর কি করব বল ? বর যখন ওকে একবার বলেছি, তখন ঘর ওর করতেই হবে। তা বলে তো দুবার বিয়ে হয় না মেয়েদের ? অ্যাঁ, নাকি বল ভাই ?—বলিয়া সে রঞ্জনের খেলাঘরে আসিয়া উঠিত। আসর জাঁকাইয়া বসিয়া সে

ফরমাশ করিত পাকা গিন্নীটির মতই, আ আমার কপাল! নুন নাই, বলি তেল নাই, সেসব কি আমি রোজগার করে আনব?

রঞ্জন কথা কহিত না, উদাসভাবে বসিয়া থাকিত। কমলি হাসিয়া বলিত ভোলাকে, সত্যি ভোলা, মোড়ল আমাদের গোসাঁই হয়েছেন। তারপর ফিসফিস করিয়া রঞ্জনের কাছে বলিত, কোন্ গোসাঁই গো? আমাকে কিল মারবার গোসাঁই নাকি?—বলিয়াই খিলখিল করিয়া হাসি।

রঞ্জন অমনই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিত। খেলার মধ্যে সকলের অগোচরে রঞ্জন ফিসফিস করিয়া বলিত, আর মারব না বউ, কালীর দিব্যি। কমলি আবার হাসিত।

এসব পুরানো কথা। কিন্তু সে কথা মনে করিয়া এখনও কমলি হাসে। রঞ্জন একটু যেন লজ্জা পায়, পাইবারই কথা। রঞ্জন আজ তরুণ কিশোর। তাহার চোখের কোণে আজ শীতান্তের নবকিশলয়ের মত ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা দিয়াছে। সরল কোমল দেহে পেশীগুলি পরিপুষ্টরূপে প্রকট হইয়া দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। আর সেই চপলা মুখরা কমলি আজ চৌদ্দ বছরের কমলিনী। আজও দেহে তার ফুল ফোটে নাই কিন্তু তাহার চঞ্চল চরণের ঈষৎ সঙ্কুচিত গতিতে, রঙের চিক্কণতায়, নয়নের চটুল ভঙ্গিমায়, গালের ফিকা লালিমাভায় মুকুলের বার্তা ঘোষণা করিয়াছে। তবুও তাহার চাপল্যের অন্ত নাই। বয়সের ধর্ম তাহার স্বভাব-ধর্মের কাছে পরাজয় মানিয়াছে। এখন ঈষৎ চাপা চপল সে।

তাই কুলের ভয় দেখানো সত্ত্বেও সে রঞ্জনের সঙ্গে কুল খাইতে যায়, মায়ের ঝাঁটার ভয় উপেক্ষা করিয়াও রসিকদাসকে বলে 'বগ-বাবাজী'। সে চলিয়া যায়—চাপল্যে দেহে উঠে একটা হিল্লোল—নদীর নৃত্যপরা স্রোতের মত। কথা বলিতে কথার আগে উপচিয়া পড়ে হাসি ঝরনাধারার ছলছল-ধ্বনির মত।

সেদিন রঞ্জন গাছে চড়িয়া কুল ঝরাইতেছিল,—তলায় ছুটিয়া ছুটিয়া কমলিনী সেগুলি কুড়াইয়া আঁচলে তুলিতেছিল। একটা কুলে কামড় মারিয়া কমলিনী বলিয়া উঠিল, আহা কি মিষ্টি রে!

গাছের উপর হইতে ঝপ করিয়া রঞ্জন ঝাঁপ দিয়া মাটিতে পড়িয়া বলিল, দে, দে ভাই, আমাকে আধখানা দে।

আধ-খাওয়া কুলটা কমলি তাড়াতাড়ি রঞ্জনের মুখে পুরিয়া দিল। কুলটায় পোকা ধরিয়াছিল। বিস্বাদে রঞ্জন টাকরায় টোকা মারিয়া বলিল, বাবাঃ।

কমলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, কেমন রে?

রঞ্জন তখনও টোকা মারিতেছিল, তবু সে তা স্বীকার করিল না, বলিল, খুব মিষ্টি—তোর এঁটো যে।

হাততালি দিয়া কমলি হাসিতে হাসিতে বলিল, বোল হরিবোল! আমার এঁটো টকো কুল মিষ্টি হয়ে গেল! আমার মুখে চিনি আছে নাকি?

রঞ্জন বলিল, হুঁ, তুইই আমার চিনি।

কমলি কৌতুকে হাসিয়া এলাইয়া পড়িল। রঞ্জনের এই ধারার তোষামোদ তাহার ভারী ভাল লাগে। তারপর বলিল, তোর এঁটো আমার কেমন লাগে জানিস?

কেমন?

ঝাল—ঠিক লঙ্কার মত। তুই আমার লঙ্কা।

বিষণ্ণভাবে রঞ্জন বলিল, যার যেমন ভালবাসা।

কমলি তাহার বিষণ্ণতা আমলেই আনিল না। কৌতুকভরে সে বাণের পর বাণ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছিল। বলিল, তা তো হল, কিন্তু তুই আমার এঁটো খেলি যে? তোর যে জাত গেল।

চকিতভাবে এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া রঞ্জন বলিল, কেউ তো দেখে নাই! তারপর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, গেল তো গেলই। ভেক নিয়ে আমি বোষ্টম হব। তোকে বিয়ে করব।

কমলি বলিয়া উঠিল, যাঃ, তোকে কে বিয়ে করবে? আকাট চাষা!

রঞ্জন খপ করিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, আমাকে বিয়ে করিস তো আমি জাত দিই কমলি।

কমলি বলিল, দূর, ছাড়।

রঞ্জন বলিল, বল—নইলে ছাড়ব না। কমলির হাতখানা সে আরও জোরে চাপিয়া ধরিল।

কাতরস্বরে কমলি বলিয়া উঠিল, উঃ—উঃ, ঘা—ঘা আছে। অপ্রস্তুত হইয়া রঞ্জন হাত ছাড়িয়া দিল। কমলির কলহাস্যে নির্জনতার স্বপ্নভঙ্গ হইল। সে ছুটিয়া পলায়ন করিতে করিতে বলিয়া গেল, চাষার বুদ্ধির ধার কেমন? না, ভোঁতা লাঙ্গলের ধার যেমন।

রঞ্জন অনুসরণ করিল না। সে পলায়নপরা কমলির গমনপথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল—তাহাদের সাদা বলদটা কেমন করিয়া এখানে আসিল?

পিছন হইতে ডাক আসিল—হ-হ-হ। তাহার বাপ মহেশ্বর মোড়লের গলা। রঞ্জন মুহূর্তে দৌড় দিল।

দুই

রঞ্জনের মা কমলিকে বড় ভালবাসিত। তাহার নাম দিয়াছিল—হাস্যময়ী। রঞ্জনকে দিতে গিয়া আধখানা মণ্ডা ভাঙিয়া সে কমলির হাতে দিত। কিন্তু সেদিন রঞ্জন যখন কমলির এঁটো কুল খাইয়া বাড়ি ফিরিল, তখন সে বলিল, রাক্ষুসী রাক্ষুসী, মাঁয়াবিনী গো, ওরা ছত্রিশ জেতে বোষ্টম—ওদের কাজই এই। মুড়োঝাঁটা মারি আমি হারামজাদীর মুখে।

কুল-খাওয়ার ঘটনাটা দৈবক্রমে খোদ মহেশ্বর মোড়লের—রঞ্জনের বাপের নজরে পড়িয়াছিল। মহেশ্বরের বলদটা অকারণে ছুটিয়া আসে নাই। গরু চরাইতে গিয়াছিল সে এই কুলগাছটার

পাশেই একটা জঙ্গলের আড়ালে। হঠাৎ ব্যাপারটা দেখিয়া অকারণে সে বলদটার পিঠে সজোরে পাচন লাঠির এক ঘা বসাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। তার স্ত্রীর নিকটে সমস্ত প্রকাশ না করিয়া পারিল না। রঞ্জনের মা গালে হাত দিয়া বিষম বিস্ময়ে লম্বা টানা সুরে বলিয়া উঠিল, ওগো মা, কোথায় যাব গো, জাত মান তুই গেল যে! রাক্ষুসী হারামজাদী কি নচ্ছার গো, মুড়োঝাঁটা মার মুখে। আর সে হারামজাদা গেল কোথা? ধরে গোবর খাওয়াও তুমি।

মহেশ্বর বাধা দিয়া বলিল, চুপ চুপ, চেঁচিয়ে গাঁগোল করিস না। জ্ঞাতিতে শুনলে টেনে ছাড়ানো দায় হবে, পতিত করবে। ধমক খাইয়া রঞ্জনের মা তখনকার মত চুপ করিল। কিন্তু রঞ্জন বাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র নথ নাড়িয়া, ঘন ঘন ভুরু তুলিয়া সে বলিল, বলি, ওরে ও মুখ-পোড়া, তোর রকম কী বল দেখি?

রঞ্জনও সমানে তাল দিয়া বলিল, খেতে দাও বলছি। গাল খেয়ে পেট ভরবে না আমার। গাল খেতে আসি নাই আমি।

ঝঙ্কার দিয়া মা বলিয়া উঠিল, দোব—ছাই দোব মুখে তোমার। কমলির এঁটো কুল খেয়ে পেট ভরে নাই তোমার, শরম-নাশা জাত-খেগো!

সাপের মাথায় যেন ঈশের মূল পড়িল। উদ্ধত রঞ্জনের রক্তচক্ষু নত হইয়া মাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল। মহেশ্বর মোড়ল আড়ালেই কোথায় ছিল। সে এবার সম্মুখে আসিয়া চাপা গলায় গর্জন করিয়া বলিল, হয়ে মরলি না কেন তুই? মুখ হাসালি আমার তুই! জাত নাশ করলি!

রঞ্জন নীরব হইয়া রহিল। তাহার নীরবতায় বাপের রাগ অকারণে বাড়িয়া গেল, সে বলিল, চুপ করে আছিস যে? কথার জবাব দে।

কিছুক্ষণ পর আবার সে গর্জিয়া উঠিল, তবু কথার জবাব দেয় না। আচ্ছা, আমিও তেমন লোক নই, তা জানো তুমি। ত্যাজ্যপুত্তুর করব আমি তোমাকে—বাড়ি থেকে দূর করে দোব। কিন্তু জাত আমি দোব না।

তারপর আদেশের সুরে বলিল, খবরদার, আর যাবে না ওদের বাড়ি। মা-বিটীদের ত্রিসীমেনা মাড়াবে না আর। এই বলে দিলাম তোকে—হ্যাঁ।

আস্ফালন করিয়া মহেশ্বর চলিয়া গেল। রঞ্জন নীরবে নত দৃষ্টিতে সেইখানেই বসিয়া রহিল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া মা আসিয়া এবার সান্ত্বনা দিয়া বলিল, মাঘ মাসেই বিয়ে দেব তোর। এমন বউ আনব, দেখবি কমলি কোথায় লাগে!

রঞ্জন নীরবেই বসিয়া রহিল। মুড়ি বাহির করিতে করিতে মা ঘর হইতে বলিল, বলে যে সেই—

বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশি
রাই হেন কত মিলবে দাসী।

সুন্দর মেয়ের আবার ভাবনা!

রঞ্জন বলিয়া উঠিল, না।

মায়ের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। সবিস্ময়ে বলিল, কি 'না'?

বিয়ে আমি করব না।

প্রবলতর বিস্ময়ে আশঙ্কায় মা প্রশ্ন করিয়া বলিল, কি করবি তবে?

রঞ্জন উঠিয়া পড়িল। আঙিনাটা অতিক্রম করিতে করিতে সে বলিয়া গেল, বোষ্টম হব আমি।

বিস্ময়ে হতবাক রঞ্জনের মা কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ পাইয়া ডাকিল স্বামীকে, ওগো মোড়ল, ও মোড়ল!

রঞ্জন আসিয়া উঠিল রসকুঞ্জে। রসিকদাসের আখড়ার ওই নাম। রসকুঞ্জ এ গ্রামের সকলেরই সুপরিচিত স্থান। ছেলেদের সেখানে মিলিত তামাক, বুড়োদের মিলিত গাঁজা। কাহারও মিলিত বিচিত্র আকারের বাঁশের হুঁকা, কাহারও বা সাপের মত আঁকাবাঁকা নল; কাহারও লতাবেষ্টনীর জোড়া ডালের ছড়ি—ঠিক যেন দুইটি সাপে পরস্পরকে জড়াইয়া আছে। এই রকম বহু উদ্ভট সুন্দর সামগ্রী আবিষ্কার করিয়া রসিকদাস সকলের মনোরঞ্জন করিত।

সেদিন রসিকদাস স্নানের পর দাড়ির বিন্যাস করিতেছিল, কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইয়া ফাঁস ভাঙিতেছিল। রঞ্জন আসিয়া ডাকিল, মহান্ত!

রসিক বলিল, রাইকমল-রঞ্জন যে হে! এস এস।

রঞ্জনকে সে ওই নামে ডাকে। রঞ্জন অনেক কথা মনে মনে ফাঁদিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সব কেমন গোলমাল হইয়া গেল। যেটুকু মনে ছিল, সেটুকুও লজ্জায় বলিতে পারিল না।

রসিকদাসই প্রশ্ন করিল, কি, তামাক খেতে হবে নাকি? ভাত খেয়েছ?

রঞ্জন একটা সুযোগ পাইল, সে বলিল, না। তোমার এখানেই খাব।

মহান্ত রসিকতা করিয়া বলিল, জাত যাবে যে হে!

ফস করিয়া রঞ্জন বলিয়া ফেলিল, বোষ্টম হব আমি মহান্ত।

মহান্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। তারপর উপভোগের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দিল—

জাতি কুল মান সব ঘুচাইয়া চরণে হইনু দাসী

রঞ্জন লজ্জায় রাঙা হইয়া ঈষৎ বিরক্তিভরে কহিল, ধেৎ! ধান ভানতে শিবের গীত! তোমার হল কি মহান্ত?

মৃদু হাসিতে হাসিতে মহান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, রসিকের রস এসেছে।

আরও বিরক্ত হইয়া রঞ্জন বলিল, তা তুমি কি বলছ বল? আমাকে ভেক দেবে তুমি?

নির্বিকারভাবে রসিকদাস বলিল, রাইকমল বলে তো দোব।

রুষ্ট হইয়া রঞ্জন বলিল, কেন ? কমলি কি তোমার হাকিম নাকি ?

হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া রসিক বলিল, হুঁ ।

তবু যদি বগ-বাবাজী না বলত সে ! রঞ্জন ক্রোধভরে উঠিয়া পড়িল।

রসিকদাস তখনও তেমনই হাসিতেছিল, সে কথা কহিল না। রঞ্জন বলিল, বেশ, চললাম আমি তারই কাছে।

রসিকদাস গুনগুন করিতে করিতে দাড়িতে বিনুনি পাকাইতে আরম্ভ করিল।

কমলি তখন আখড়ায় জোড়া-লতার ছায়াতলে বসিয়া সেই কুলগুলি বাছিতেছিল, মাঝে মাঝে রঞ্জনকে প্রতারণা করার কৌতুক স্মরণ করিয়া আপনার মনেই সে হাসিয়া উঠিতেছিল। ও-পাড়ার ভোলা আসিয়া কমলির নিকটে বসিয়া বলিল, কমলি !

স্বরখানি তরঙ্গায়িত করিয়া অনাবশ্যক দীর্ঘ উচ্চারণে কমলি উত্তর দিল, কি !

ভোলা বলিল; এই এলাম একবার।

নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে ভোলার স্বরভঙ্গী অনুকরণ করিয়া কমলি বলিল, বেশ, যাও একবার। সে ব্যঙ্গে ভোলা এতটুকু হইয়া গেল। হাঁটু দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। কমলিও কুল বাছা রাখিয়া ভোলার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া বসিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, বাঁদরের মত বসলি যে উপু হয়ে ? ভোলার লজ্জার আর পরিসীমা ছিল না। সে পলায়নের অজুহাত খুঁজিতেছিল। কমলি বলিল, আমার কুলগুলো বেছে দে না ভাই। আমি একটু বসি।

ভোলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে তাড়াতাড়ি কুল বাছিতে বসিল।

বিচিত্র খেয়ালী চপলা মেয়েটি অকস্মাৎ দুলিয়া দুলিয়া আরম্ভ করিল—

এক যে ছিল রাজা তিনি খান খাজা
তাঁর যে রাণী তিনি খান ফেনী
তাঁর যে পুত হাবাগোবা ভূত
মুখে খায় সর গালে খায়—

সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁ হাতে চড় উঠাইয়াছিল। কিন্তু ভোলা চট করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। কমলির কলকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল জলতরঙ্গের মত হাসি।

ভোলা বলিল, কমলি ! স্বর তাহার কাঁপিতেছিল।

হাতখানি আকর্ষণ করিয়া কমলি বলিল, ছাড় ভোলা, ছাড় বলছি।

ভোলা বলিল, না।

কমলি মুক্ত ডান হাতে এক মুঠা কুল লইয়া ভোলার মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া বসিল। পাকা কুলগুলি ছিতরাইয়া চটচটে শাঁসে ভোলার মুখখানা ভরিয়া গেল। কমলির হাত ছাড়িয়া ভোলা মুখ মুছিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কমলি সেই হাসি হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

ঠিক এই সময়টিতেই বাহির হইতে ডাক আসিল, চিনি !

ভোলা দুর্বল মানুষ, সে রঞ্জনকে বড় ভয় করিত। ডাক শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে বাহিরের দিকে ছুটিল। প্রবল কৌতুকে উচ্ছলা কমলি তাহাকে ডাকিল, যাস না ভোলা, যাস না। ভয় কিসের রে ?—বলিতে বলিতে সে বাহিরের দরজায় আসিয়া দেখিল, এ মুখে পলাইতেছে ভোলা, বিপরীত মুখে দ্রুতগমনে চলিয়াছে রঞ্জন !

কমলি ডাকিল, লক্ষা, লক্ষা হে !

রঞ্জন উত্তর দিল না, একবার ফিরিয়া চাহিল না পর্যন্ত।

কমলি বুঝিল, রঞ্জন রাগ করিয়াছে, ভোলার সঙ্গে কথা বলিলেই রঞ্জনের মুখ ভার হয়, আজ তো ভোলার সঙ্গে বসিয়া সে হাসিতেছিল। কিন্তু এতটাও তাহার সহ্য হইল না। ভোলাকে ধরিয়া দু-ঘা দিলেই তো হইত ! তা না, উল্টা রাগ করিয়া যাওয়া হইতেছে ! সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা—আচ্ছা এই হল। মনে থাকে যেন।

বলিয়াই সে ফিরিল ; দুই পা ফিরিয়াই আবার সে দরজার মুখে আগাইয়া আসিয়া বলিল, আমি কারও কেনা বাঁদী নই।

বলিয়াই সে এদিকে মুখ ফিরাইয়া ভোলাকে ডাকিল, ভোলা, ভোলা ! কিন্তু পথের বাঁকের অন্তরালে ভোলা তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আখড়ার মধ্যে ফিরিয়া কমলি আবার কুল বাছা শুরু করিল। একটা কুল হাতে লইয়া সে আপন মনেই বলিয়া গেল, ও-রে ! চলে গেলি—গেলিই। আমার তাতে বয়েই গেল। একেই বলে, আলুনো রাগ। তা রাগ করলি—করলি, নিজের ঘরে ভাত বেশি করে খাবি।

সে হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসির বদলে চোখে আসিল জল। অভিমানভরে সে পটপট করিয়া কুলের বোঁটা ছাড়াইয়া চলিল।

কতক্ষণ পর কে জানে, কমলির হুঁশ ছিল না।

কামিনী ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া তিক্তস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কমলিকে বলিল, ও—মাগো ! এখনও উনোনের মুখে কাঠ পড়ে নাই, জলের কলসী ঢনঢন করছে ! একি ? বলি, হ্যাঁ গো কমলি, তোর রীতকরণের রকম কি বল দেখি ?

কমলি অকারণে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল, পারব না, আমি পারব না ; খেতে না হয় নাই দেবে।—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, শুধুই বকুনি, শুধুই বকুনি। যার তার রাগ আমার ওপর। কেন, আমি কার কি করেছি !

কামিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। সে তো এমন কিছু বলে নাই। তবু আদরিণী মেয়েটির কান্না তাহার সহ্য হইল না। মেয়ের পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া সে বলিল, কিছু তো বলি নাই আমি তোকে মা। বলেছি, বুড়ো মানুষ তেতে-পুড়ে এলাম, এখন জল আনা, কাঠ যোগাড় করা—

চোখের জল চোখে তখনও ছলছল করিতেছিল, কমলির মুখে অমনই হাসি দেখা দিল। বোধ হয় খানিকটা লজ্জাও পাইল। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া শূন্য কলসীটা কাঁখে

তুলিয়া বলিল, জল নিয়ে আসি আমি—এলাম বলে।

মা হাসিল। ফুলের ঘা সয় না তাহার কমলের!

কমলি চলিয়া যাইতেই আসিয়া প্রবেশ করিল মহেশ্বর মোড়ল—রঞ্জনের বাপ, সে যেন এই অবসরটুকুর প্রতীক্ষাতেই কোথাও দাঁড়াইয়া ছিল। একেবারেই সে কামিনীর হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া একান্ত কাকুতিভরে বলিল, কামিনী, তোরও সন্তান আছে। আমার ওই একমাত্র সন্তান। আমার সন্তান আমাকে ফিরে দে কামিনী। তোর ভাল হবে।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া সবিস্ময়ে কামিনী প্রশ্ন করিল, কি, হল কি মোড়ল?

সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া সজল চক্ষে মহেশ্বর বলিল, বাড়ি থেকে সে পালিয়ে এসেছে। তার মাকে বলে এসেছে, বোষ্টম হবে।

কামিনী সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, এতদূর তো ভাবি নাই আমি মোড়ল। কিন্তু এখন ছাড়াছাড়ি করলে কি মেয়েরই আমার সুখ হবে? আমাকে কি মা হয়ে সন্তানের বুকে শেল হানতে বল তুমি?

মহেশ্বর বলিল, টাকা দোব আমি, তোমার মেয়েকে কিছু জমি লিখে দোব আমি কামিনী।

বাধা দিয়া কামিনী বলিল, ছি, আমার মেয়ের কি ইজ্জত নাই মোড়ল?

মোড়ল বলিয়া উঠিল, রাম রাম রাম! সে বললে জিভ খসে পড়বে আমার। কিন্তু ভেবে দেখ কামিনী, সন্তান তো আমারও। ওই একটি সন্তান।

একটু চিন্তা করিয়া কামিনী বলিল, যাও মোড়ল, আমি কমলিকে নিয়ে গাঁ থেকে চলে যাব। তুমি তোমার ছেলেকে বাগিয়ে নিও।

বিষণ্ণভাবে মহেশ্বর বলিল, গাঁ থেকে চলে যেতে তো বলি নাই, কামিনী!

কামিনী বলিল, না। মেয়ের চোখের উপর রঞ্জনকে আমি রাখব না মোড়ল। আমি ভিখারী, কিন্তু মেয়ে তো আমার কম আদরের নয়। আর বোষ্টম জাত, পথই তো আমাদের ঘর গো।

সহসা বাহিরে বেড়ার ধারে কি একটা শব্দ হইল। কি যেন সশব্দে পড়িয়া গেল। কামিনী ছুটিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে বলিতেছিল, কে? কমলি?

সত্যই কমলি বেড়ার পাশে সিক্তবস্ত্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। তাহার কাঁখের জলভরা মাটির কলসীটা পড়িয়া ভাঙিয়া গিয়াছে।

মহেশ্বর ত্রস্তপদে অপরাধীর মতই যেন পলাইয়া গেল। স্নেহকোমল স্বরে কামিনী বলিল, কলসীটা ভেঙে গেল! যাক। আয়, ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল।

কমলি হাসিয়া বলিল, না, জল আনি।

মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মেয়েটি তাহার সেই মেয়ে কমলিই বটে, কিন্তু হাসিটি তো তাহার নয়! কমলির মুখে এ হাসি তো সাজে না! কামিনীর বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল।

কমলি ঘাটের দিকে ফিরিয়াছিল, কামিনী বলিল, না।

এলাম বলে।

দাঁড়া। আমিও যাব। একটা ঘড়া লইয়া কামিনী বাহির হইয়া আসিল। পুকুরে অগাধ জল। কমলির অভিমান তার চেয়েও বেশি।

পথে যাইতে যাইতে কমলি বলিল, মা!

কি রে?

সেই ভাল মা, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কামিনী চমকিয়া উঠিল। কমলি কথাটা শুনিয়াছে। কিন্তু কথার উত্তর দিতে পারিল না। তখন তাহার চোখের কোণে রুদ্ধ অশ্রুর বান ডাকিয়াছে।

কমলি বলিল, রাসে নবদ্বীপে মেলা হয়। চল মা, তার আগেই আমরা চলে যাই। সন্তান হারানোর অনেক দুঃখ মা। নন্দরানীর দুঃখের কথা ভেবে দেখ।

কামিনী অবাক হইয়া গেল। কমলির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, কমলি যেন অকস্মাৎ কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! মনে হইল, সে যেন তাহার সখীর সঙ্গে কথা বলিতেছে। সেও সব ভুলিয়া এই মুহূর্তটিতে অন্তরঙ্গ সখীর মতই প্রশ্ন করিয়া বসিল, তোর কি খুব কষ্ট হবে কমলি?

হাসিয়া কমলি বলিল, দূর!

মা বলিল, লজ্জা করিস না মা।

ধীরভাবে কমলি বলিল, না।

জল লইয়া ফিরিবার পথে কামিনী বলিল, নবদ্বীপে চাঁদের মত চাঁদ খুঁজে তোর বিয়ে দোব আমি। সে যেন এতক্ষণে মনের মত শোধ তুলিবার উপায় পাইয়াছে।

ঘরে কলসী নামাইয়াই চটুল চঞ্চল গতিতে কমলি বাহিরের পথ ধরিল। মা বলিল, কোথায় যাবি আবার?

নবদ্বীপ যেতে হবে, বলে আসি বগ-বাবাজীকে।—বলিয়া সহজভাবেই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কামিনী কিন্তু ওই হাসিতে সান্ত্বনা পাইল না। মেয়ে চলিয়া যাইতেই সে কাঁদিল বার বার চোখের জল মুছিল।

অন্যায় তাহারই। তাহারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মেয়েকে এমন ভাবে রঞ্জনের সঙ্গে মাথামাথি করিতে দেওয়া উচিত হয় নাই। এতটা সে ভাবে নাই; কিন্তু ভাবা উচিত ছিল। দুইটি কিশোর আর কিশোরী। বিচিত্র এর রীতি। কেমন করিয়া যে কোথায় বাঁধন পড়ে! পরান ছাড়িলেও এ বাঁধন ছেঁড়ে না!

কমলি বাহির হইতে ডাকিল, মা, এই নাও, বললে বিশ্বাস করে না। তুমি বল, তবে হবে। কমলি বগ-বাবাজীকে লইয়া হাজির করিয়াছে।

কামিনী বলিল, বোসো মহান্ত, বোসো। কথা আছে, শোন। কমলি, যা তো মা,

তোর ননদিনীর বাড়ি থেকে খানিকটা নুন নিয়ে আয় তো।

কমলিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, ওই তো ঘরে সের দরুনে নুন রয়েছে।

তুই যা না, ওতে হবে না।

ওতে না হলে মণ দরুনে নুনেও তোমার মরণ হবে না। আমি পারব না।

যাও না মা, একটুখানি বেড়িয়েই এস না হয়। মায়ের কথা শুনলে বুঝি পাপ হয়?

এবার কমল হাসিয়া বলিল, আমার সামনেই বলতে পারতে মা। কমল তোমার শুকোত না। বেশ, আমি যাচ্ছি।

সে চলিল ননদিনীর বাড়ি। ননদিনী কাদু পাড়ার মোড়লদের মেয়ে, কমলির খেলাঘরের পাতানো সই ননদিনী। কাদু বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, আদরে বর্ষার দাদুরীর মত সে মুখরা। হয়তো ভুল হইল, শুধু মুখরা বলিলে কাদুর প্রশংসা করা হয়। মেয়েটি মুখরার উপরে অপ্রিয়-সত্য-ভাষিণী। লোকে বলে, নবজাতা কাদুর মুখে তাহার মা নাকি মধুর প্রলেপ দিতে ভুলিয়াছিল। পাড়ার লোকে কাদুকে 'সাত কুঁদুলী'র মধ্যে আসন দিয়াছে। ঘরে বসিয়া অনেকে তাহার মাথা খায়। ননদিনী পাতানো কমলিনীর সার্থক হইয়াছে। কাদুর ইহারই মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গরিবের ছেলে দেখিয়া বিবাহ দিয়া তাহার বাপ জামাইকে ঘরেই রাখিয়াছে।

পথ হইতেই কাদুর গলা শোনা যাইতেছিল, ও মাগো! একেই বলে—যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। আমি পান খাই, আমার বাপের পয়সায় খাই। তাতে তোমার চোখ টাটায় কেন বল তো?

কমলিনী বুঝিল, এ কোন্দল হইতেছে কাদুর স্বামীর সঙ্গে। মা-বাপের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইলেই পনেরো বছরের কাদু প্রবীণা গিন্নীর মত কোমর বাঁধিয়া স্বামীর সঙ্গে কোন্দল জুড়িয়া দেয়। সে দুয়ারে ঢুকিয়াই গান ধরিয়া সাড়া দিল—

ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মালা
কালসাপিনীর জিহ্বা যেন বিষে আঁকাবাঁকা।
ও আমার দারুণ ননদিনী—

কাদু কোন্দল ছাড়িয়া খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। কমল বলিল, কুঞ্জে প্রবেশ করতে পারি কুঞ্জেশ্বরি?

কাদু বলিল, মর মর মর, ঢঙ দেখে আর বাঁচি না। আয় আয়।

তারপর তীব্রস্বরে স্বামীকে বলিল, ভারি বেহায়া তুমি। যাও না বাইরে। বউ এসেছে।

কমল প্রবেশ করিয়া বলিল, আহা, থাকুকই না বেচারী, যুগল দেখে চোখ সার্থক করি।

কাদু হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, এক হাতে কোদাল আর হাতে কাস্তে নিয়ে শ্যামকে মানাবে ভাল। বোস বোস ভাই। দিনরাত ব্যাজব্যাজ করছে, মলাম আমি। দাঁড়া, আমি পান নিয়ে আসি। দোক্তা নিবি, দোক্তা?

পান-দোক্তা মুখে পুরিয়া কমল বলিল, বিদায় নিতে এলাম ননদিনী।

সে কি? রাসে কোথাও যাবি বুঝি?

নবদ্বীপ।

কবে ফিরবি?

কমলিনীর চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে ম্লানকণ্ঠে বলিল, আর ফিরব না ভাই কাহু।

কাহু বলিয়া উঠিল, সে কি? কি বলছিস তুই বউ, আমি যে বুঝতে পারছি না।

অবরুদ্ধ ক্রন্দনে কমলিনীর ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া শুধু কাঁপিয়া উঠিল। কোন কথা তাহার ফুটিল না।

তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া কাহু বলিল, কি হয়েছে ভাই বউ? আমাকে বলবি না?

ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিয়া কমলিনী বলিল, এত সব কথা তো কোনদিন ভাবি নাই ভাই কাহু। কিন্তু আজ—

কথা সে শেষ করিতে পারিল না আবার তাহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কাহু যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে কমলিনী মৃদু হাসিয়া বলিল, সে বলেছে, সে বিয়ে করবে না, জাত দেবে। তা ভাই, মা-বাপের ছেলে মা-বাপের থাক। আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কাহু বলিয়া উঠিল, তা মোড়লও কেন বোষ্টম হোক না। বোষ্টম কি ছোট জাতি নাকি? না, তারা মানুষ নয়? আমি বলব রঞ্জনদার বাবাকে, আমি ছাড়ব না। ভারি তো, ওঃ।

কমলিনী বলিল, না। বার বার সে ঘাড় নাড়িল—না।

কাহু একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এক কাজ কর বউ। হোক না রঞ্জনদাদা বোষ্টম। তখন ছেলের টানে—

বাধা দিয়া কমলিনী বলিল, ছি!

কাহু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। চোখ তাহার ছলছল করিতেছিল। কমল অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল, কাহুকে ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল, ও মা, এ যে নতুন কাণ্ড! বউয়ের শোকে ননদ কাঁদে, মাছের মায়ের কান্না! শোন শোন ভাই, একখানা গান শোন।

মৃদুস্বরে সে গান ধরিল—

> ও আমার দারুণ ননদিনী ও তুই পরম সন্ধানী
> যেথায় যাব সেথায় যাবি লাগাইবি লেঠা
> ছাড়ালে না ছাড়ে যেন শেয়াকুলের কাঁটা।

গানের অর্ধপথে কাহু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আর দেখা হবে না ভাই বউ?

হাসিয়া কমল বলিল, কেন হবে না? এই তো নবদ্বীপ। নন্দাইকে নিয়ে চলে যাবি—কেমন?

কাহু বলিল, তিন বার করে যাব আমি বছরে—রাসে, দোলে, ঝুলনে। আজ কিন্তু তোর

কাছে শোব ভাই রাত্রে।

কমলিনী হাসিয়া বলিল, নন্দাই ?

কান্থ বলিল, মর।

কমল তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিল, মরব। কিন্তু "সখি, না পুড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে—"

কান্থ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, হাত দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিল, না না। ও গান তুই গাস না। না।

আখড়াতে যখন সে ফিরিল, রসিকদাস তখনও বসিয়া ছিল। কমলকে দেখিয়া সে গান বাঁধিয়াছিল—

গোরার সেরা গোরাচান্দ চল দেখে আসি সখি!

কমল মৃদু হাসিয়া বলিল, গান ভাল লাগছে না বগ-বাবাজী।

রসিকও মৃদু হাসিল। বলিল, তাই তা হলে হবে রাইয়ের মা। চলে চল যত শিগগির হয়। আমরা বোষ্টম, আমাদের প্রভুর চরণতলই ভাল।

রাস্তায় বাহির হইয়া সে চলিতে চলিতে আবার গান ধরিল—

মথুরাতে থাকলে সুখে আসতে তারে বলিস নে গো।
তাতে মরণ হয় যদি মোর সুখের মরণ জানিস সে গো॥

তিন

নবদ্বীপে কামিনী বেশ জাঁকিয়া বসিল। স্বামীর আমল হইতে গোপন সঞ্চয় ছিল, তাহা হইতেই সে বাড়িঘর কিনিয়া আখড়া বাঁধিয়া বসিল। আখড়ার জাঁকজমকেরও অভাব ছিল না। বৈষ্ণব মহান্তদের নিমন্ত্রণ হয়, পরম যত্নে সাধু-সেবা হয়; সকাল-সন্ধ্যায় আখড়ায় নাম-গানের আসর জমিয়া উঠে।

বলাইদাস, সুবলচাঁদ ইহারা বয়সে তরুণ। সুবল তাহার উপর সুপুরুষ। সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটি পরম কমনীয় শ্রীতে শান্ত কোমল, মানায় বড় চমৎকার। কথাগুলিও স্নেহশান্ত, নম্র। রসিকদাসের তাহাকে দেখিয়া আশ মেটে না। বাউল বৈরাগী তাহার সহিত সম্পর্কও পাতাইয়া বসিয়াছে। সুবল তাহার সখা—সুবল-সখা বলিয়া ডাকে।

কমলি সেই তেমনই আছে। সেই যেদিন তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া নবদ্বীপে আসে, সেদিন হঠাৎ সে যতটুকু বড় হইয়া গিয়াছিল, ততটুকু বাড়িয়াই সে আর বাড়ে নাই।

অবসর সময়ে রসিকদাস কমলকে বলে, এ যে চাঁদের হাট বসিয়ে দিলে গো রাইকমল! আহা-হা—কী সুন্দর রূপ গো! গোরাচাঁদের দেশের রূপই আলাদা।

কমলিনী বলিল, তা হলে গঙ্গাতীরের রূপে তুমি মজেছ বল। এইবার ভাল দেখে একটি বোষ্টমী করে ফেল বগ-বাবাজী।

বলিয়াই সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। কমলের পরিহাসে রস-পাগল রসিকের একটু লজ্জা হইল। সে সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, রাধে রাধে! রাধারানীর জাত কৃষ্ণ-পূজার ফুল—কী যে বল তুমি রাইকমল!

হাসিতে হাসিতে উচ্ছলভাবে কমলিনী বলিল, প্রসাদী মালা গলায় পরা চলে গো। পায়ে না মাড়ালেই হল।

রসিক বলিল, আমি বাউল দরবেশ রাইকমল। বৃন্দে হল আমাদের গুরু। মালা আমাদের মাথায় থাকে গো। এখন তোমার কথা বল।

কি জিজ্ঞাসা করছ, বল?

নবদ্বীপ কেমন? রসিক একটু হাসিল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, কমলের মুখে রক্তাভা দেখিবে।

কিন্তু কমলিনী মাথা নাড়িয়া সর্বদেহে অস্বীকারের ভঙ্গী ফুটাইয়া বলিল, এমন ভাল কি আর মহান্ত? মহান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমলিনী আবার বলিল, তবে মা-গঙ্গা ভাল।

প্রবল বিস্ময়ে রসিকদাস বলিল, এমন সোনার গোরায় তোমার মন উঠল না রাইকমল?

হাসিয়া কমলিনী বলিল, না, বগ-বাবাজী। তবে হঁ্যা, ওই রূপের মানুষটি যদি পেতাম তা হলে পায়ে বিকতাম, তবে মন উঠত।

রসিক এবার ছাড়িল না, রহস্য করিয়া সে বলিল, বল কি? রাইকমল-রঞ্জনকে ভুলে, অঁ্যা?

হাসিয়াই কমল উত্তর দিল, তা সোনার মোহর পেলে রূপোর আধুলি ভোলে না কে, বল?

তবে রাইকমল, আধুলি-টাকার তফাতের লোকও তো রয়েছে। টাকাটা নিয়ে আধুলিটা ভোল না কেন?

সাধে কি তোমাকে বগ-বাবাজী বলি! চুনোপুঁটির ওপরেও তোমার লোভ! দুটো আধুলিতে একটা টাকা। বত্রিশটা আধুলিতে একটা মোহরের দাম হয়, কিন্তু বত্রিশটা গালালেও রূপোতে সোনার রঙ ধরে না। ওটুকু তফাতে আমার মন ওঠে না। এত লোভ আমার নাই।

কামিনী বোধ হয় নিকটেই কোথাও গোপনে বসিয়া কন্যার মনের কথা শুনিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না, সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিল, তা বলে টাকা-আধুলির উলটো কদরও কেউ করে না মা। তোমার সবই আদিখ্যেতা, হঁ্যা।

কমলিনী বাসর-ঘরের কনের মত ধরা পড়িয়া হাসিয়া সারা হইল। সে-হাসিতে মায়ের রাগ আরও বাড়িয়া গেল। কামিনী রাগ করিয়াই বলিয়া উঠিল, মরণ! এতে হাসির কি পেলি শুনি? হাসছিস যে শুধু?

কমলিনীর হাসি বাড়িয়াই চলিল। মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল, মরণ তোমার। আড়ি পেতে আবার মেয়ের মনের কথা শোনা হচ্ছিল! তারপর উচ্ছল হাস্যধারা

সংবরণ করিয়া মৃদু শান্ত হাসি হাসিয়া সে বলিল, তা শুনেছিস যখন, তখন শোন। ঢেঁপো-হাঁদা টাকার মালা না পরে যদি কেউ প্রমাণী আধুলির মালাই গলায় দেয়, তাতে নিন্দের কি আছে? ওখানে দরের কথা চলে না বাহাত্তুরে বুড়ি—ও হল রুচির কথা।

অবাক হইয়া কামিনী মুখরা মেয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর তাহার যেন চমক ভাঙিল, বলিল, তবে তোর মনের কথাটাই শুনি?

কমলিনী বলিল, বললাম তো, আবার কি বলব?

মা বলিল, কতকাল আর আমার গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবি তুই? বিয়ে তুই কেন করবি না?

তা আবার কখন বললাম আমি?

কেন তবে সুবলকে মালাচন্দন করবি না?

দূর! কেমনধারা মেয়ের মতন কথা, মেয়েলী ঢঙ। দূর দূর! মুখে কাপড় দিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মা বলিল, বেশ, তবে বলাইদাস—

ঠোঁট উল্‌টাইয়া কমল বলিয়া উঠিল, মর—মর! রুচিতে তোর ধন্যি যাই। ওই আমড়ার অঁাটির মত রাঙা-রাঙা চোখ! ওকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

রাগ করিয়া কামিনী উঠিয়া গেল। সমস্ত দিন সে আর মেয়ের সঙ্গে কথা কহিল না। কমলিনী সেটুকু বুঝিল। সন্ধ্যার সময়ে সে আসিয়া মায়ের গা ঘেঁষিয়া বসিতেই মা হাত-দুই ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। বলিল, কচি খুকীর মত গা ঘেঁষে বসা কেন আবার?

কমল কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিল। তারপর অনুপেক্ষণীয় গম্ভীর স্বরে মাকে বলিল, দেহ দিয়ে গোবিন্দের পুজো করা হয় না মা?

মা চকিতভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিল। কমল অসঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, মালা কি মানুষের গলাতেই দিতে হবে?

ওদিকের দাওয়ার উপর ছিল রসিকদাস বসিয়া, সে বলিয়া উঠিল, তাই হয় গো রাইকমল, তাই হয়। মানুষের মধ্যে দিয়েই তাঁর পুজো করতে হয়। জান, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

কমল কঠিন স্বরে বলিল, মিছে কথা। ও হচ্ছে মানুষের নিজের ফন্দির কথা। ভগবানের পুজো চায় সে নিজে।

কামিনী বলিল, ও কথা থাক না কমল। কিন্তু মা, মা তো তোর অমর নয়—আর ভিখারীর সম্বলও আর কিছু নাই যে তোকে দিয়ে যাব। যা ছিল, তাও ফুরল। কি করে তোর দিন চলবে?

হাসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, হরি বলে। নেহাত বোকার মত কথাটা বললি মা। তোর যেমন করে দিন চলছে তেমনিই করে আমারও চলবে। হরি বলে পাঁচটা দোর ঘুরলেই একটা পেট চলে যাবে আমার।

মা বলিল, তুই তো জানিস না কমল পথের কথা। সাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় মা, কিন্তু পাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় না।

কমল উত্তর দিল, লখিন্দরকে বাসর-ঘরে—লোহার বাসর-ঘরে সাপে খেয়েছিল মা। পথে নয়। ও পথই বল আর ঘরই বল, পাপ এড়িয়ে কোথাও চলা যায় না। আমায় আর ওসব কথা বলিস না মা। সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

কামিনী রসিকদাসকে বলিল, কি করি আমি মহান্ত ?

রসিক আপন-মনে গান ভাঁজিতেছিল, কোন উত্তর দিল না।

মানুষের নাকি আশার শেষ নাই। সংসারে চুনিয়া চুনিয়া সে শুধু সংগ্রহ করে আশাপ্রদ ঘটনাগুলি। বাকিগুলি ইচ্ছা করিয়া সে ভুলিতে চায়, ভুলিয়াও যায়। এমনই ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া সে গড়িয়া তোলে কল্পনার আশা-দেউল। কামিনীর আশা নিঃশেষে শেষ হয় নাই।

সুবলকে লইয়া খানিকটা জটিলতা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তাহা দেখিয়াই কমলের মায়ের একটা আশ্বাসপূর্ণ প্রত্যাশা জাগিয়াছিল। যতই নিন্দা সুবলের সে করুক, তাহাকে দেখিলে কমল প্রফুল্ল হইয়া উঠে। আগ বাড়াইয়া হাসিমুখে তাহাকে সম্ভাষণ করে, সুবলসাঙাতী, শোন।

রসিক মুগ্ধভাবে বলিয়া উঠে, সুবল সখা, গোরারূপে তোমায় মানায় না ভাই। রঙটি তোমার কালো হলেই যেন ভাল হত।

সুবল লজ্জা পায়। সে মাথাটা নত করিয়া রাঙা হইয়া উঠে। উত্তর দেয় কমল, সপ্রতিভ মেয়েটির মুখে কিছুই বাধে না। অবলীলাক্রমে ধারালো বাঁকা ছুরির মত উত্তর দেয়, সমাজে খেতে বসে নিজের যে জিনিসটার ওপর লোভ হয়, লোকে সেই জিনিসটা পাশের পাতে দিতে সুপারিশ করে। কালো রূপটা তোমার হলেই ভাল হত বগ-বাবাজী। রাইকমলকে পাশে মানাত ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্দাম হাসির তরঙ্গে সে নিজেই যেন মুখরিত হইয়া উঠে। তরুণ অবয়বের প্রতি অঙ্গটি তাহার সুপ্রত্যক্ষ কম্পনে কাঁপে, মনে হয় প্রতিটি অঙ্গ যেন নাচিতেছে।

রসিকদাস লজ্জিত হইয়া বলে, রাধে রাধে! আমরা হলাম বাউল রাইকমল। ব্রজের শুক আমরা। লীলার গান গাওয়াই আমাদের কাজ গো।

কমল হাসিতে হাসিতে বলে, আমি না হয় সারীই হতাম শুকের।

রসিকদাস পলাইয়া যায়। বলে, রণে ভঙ্গ দিলাম আমি। পিঠে বাণ মারা ধর্মকাজ হবে না রাইকমল।

মাও কাজের অজুহাতে সরিয়া যায়। হাসি গল্প গান করিয়া সুবল চলিয়া যায়। পথে পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকে, শোন শোন, ওহে সুবল-সখা!

সুবল পিছন ফিরিয়া দেখে, রসিকদাস। রসিক নিকটে আসিয়া বলে, কি বললে রাইকমল ?

সুবল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কি আবার বলবে ? কিসের কি ?

রসিক বলিয়া উঠে, কমল ঠিক বলে, মেয়ে গড়তে গড়তে বিধাতা তোমাকে ভুলে পুরুষ গড়ে ফেলেছে। মালা—মালা—বলি, কমল-মালা গলায় উঠবে তোমার ? কিছু বুঝতে পারছ ?

সুবল লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে, মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

রসিক যেন রুষ্ট হয়। বলে, কি তুমি হে ?

লজ্জিত সুবলকে দেখিয়া আবার মায়াও হয়। কিছুক্ষণ পর সান্ত্বনা দিয়া বলে, খেয়ে তো ফেলবে না রাইকমল তোমাকে। সে তো আর বাঘ-ভালুক নয়। তার মতটা জান না একদিন।

মৃদুস্বরে সুবল বলে, কাল জানব।

রসিক খুশি হইয়া বলে, মালা-চন্দনের দিন তোমার মালা আমি গাঁথব কিন্তু।

হাসিয়া সুবল বলে, বেশ!

পরদিন ঠিক সেই স্থানটিতে রসিক অপেক্ষা করিয়া থাকে। সুবল আসিতেই হাসিতে হাসিতে বলে, মালা গাঁথি সুবল-সখা ?

সুবল নীরব। রসিকদাস বলে, কথা কও না যে হে ? কি হল ?

সুবল বলে, কমলের মা ছিল ওদিকের ঘরে—

রসিক বলে, কি বিপদ ! তোমার জন্যে সে কি বনে যাবে ? তোমার কোনও ভয় নাই, কামিনী নিজে আমায় তোমাকে বলতে বলে দিয়েছে। সে নিজে দিনে দশ বার করে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছে যে, কেন তুই সুবলকে বিয়ে করবি না ? কাল কিন্তু এর শেষ করতে হবে। বুঝলে ?

সুবল ঘাড় নাড়িয়া জানায়, সে বুঝিয়াছে।

পরদিন কামিনীও কোথায় গিয়াছিল। কমলিনী একা বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। সুবল আসিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া রসিকতা করিয়া বলিয়া ফেলিল, রাইকমলিনী বিমলিনী কেন গো ?

কমল ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসির সহিত বলিল, গোষ্ঠের বেলা যায় যে সখা ! তাই ভাবছি, সুন্দর সুবল-সখা আমার বাছনি বুকে এল না কেন ? শ্যামের কাছে আমি যাব কেমন করে ?

তরুণ সুবলের মনে মোহ ছিল। তাহার উপর রসিকদাসের গতকালের উৎসাহ সে-মোহের মূলে ভরসার জলসিঞ্চন করিয়াছে। কমলের কথাগুলির অর্থের মধ্যেও সে তাই অনুকূল ইঙ্গিত অনুভব করিল। যে মোহ এতদিন তাহার মনের কুঁড়ির ভিতরের গন্ধের মত সুপ্ত ছিল, আজ সে-মোহ বিকশিত পুষ্পের গন্ধের মত তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িল। স্বপ্নভরা চোখে কমলের দিকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে আবিষ্টের মত কমলিনীর হাতখানি ধরিতে হাত বাড়াইল। সে-হাত তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

মৃণালের মত লীলায়িত ভঙ্গীতে দেহখানি বাঁকাইয়া সরিয়া আসিয়া কমলিনী বলিল, ছি! এই কি সুবল-সখার কাণ্ড! তোমার মনে পাপ!

অকল্পিত আকস্মিক আঘাত সুবলের কাছে। রসিকদাসের কথা সে ধ্রুব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। মুহূর্তে দারুণ লজ্জায় শান্ত লাজুক বৈষ্ণবটির সর্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেল। মুখ হইয়া গেল বিবর্ণ পাংশু।

বিচিত্র চরিত্র এই চঞ্চলা কিশোরীটির। এইবার সে নিজেই সুবলের হাত ধরিয়া বলিল, এস সখা, বোসো। দাঁড়াও, একটা কিছু নিয়ে আসি পাতবার জন্য।

কমলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই সুবল পলাইয়া আসিয়া বাঁচিল। লজ্জার ধিক্কারের আর তাহার সীমা ছিল না। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। পিছন হইতে কমলিনী ডাকিল, যে চলে যায়, সে আমার মাথা খায়—মাথা খায়।

সুবলকে ফিরিতে হইল। চটুলা চঞ্চলা মেয়েটি তখনই হাসিয়া অনুযোগ করিল, চলে যাচ্ছ যে?

সুবল মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত দুইটি ধরিয়া কমলিনী বলিল, তুমি আমার সত্যি সুবল-সখা—বেশ!

এবার কণ্ঠস্বরে ছিল সকরুণ একটি আন্তরিকতা, আত্মীয়তা।

সুবল এতক্ষণে মুখ তুলিয়া অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, বেশ। কিন্তু তোমার চোখ ছলছল করছে কেন রাইকমল?

সাদা হাসিটি হাসিয়া কমলিনী বলিল, এই হাসছি আমি ভাই।

সেদিন ফিরিবার পথে সুবল রসিকদাসকে বলিল, ও কথা আমাকে বলবেন না।

রসিক বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবল বলিল, মানুষে ওর মন ওঠে না মহান্ত।

কামিনী সমস্ত শুনিয়া আজ আবার বলিয়া বসিল, আমি কি করব মহান্ত?

রসিক অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, বরং মনে তাহার গান গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

কাঞ্চন-বরনী, কে বটে সে ধনী, ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে নীল শাড়ি শোভে গায়।।
... ...
চণ্ডীদাস কহে, ভেব না ভেব না, ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস ধন তোমারি সে আছে ধনী।।

কামিনী কিন্তু অনেক ভাবিয়া সান্ত্বনা আবিষ্কার করে। তাহার কমল এখনও ফোটে নাই।

চার

দিনে দিনে মাস কাটিয়া গেল। মাসে মাসে বৎসর পূর্ণ হইল। কামিনী একাগ্র চোখে মেয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল, এইবার তাহার মনে হইল, কমলকোরক দিনে দিনে ক্রমশ পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। কমল আজ পূর্ণ যুবতী। পূর্ণতার গাম্ভীর্যে সেই চাপা চাপল্যটুকু যেন ঈষৎ ভারাক্রান্ত। আপনার দিকে চাহিয়া কমলিনী আপনি আপনাকে একটু মন্থর করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বভাবের চটুলতাও ভোলা যায় না। মৃণালের বৃন্তে কমলদলের মত মধ্যে মধ্যে সে হেলিয়া দুলিয়া উঠে। সে চটুল-লজ্জার রূপ অপূর্ব! রসিকদাস সে রূপ দেখিয়া বিভোর হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে সে গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দেয়—

চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায় রে—অবনী বহিয়া যায়।

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলে, বলি—বয়স হল কত ?

রসিক একগাল হাসিয়া উত্তর দিল, ভোমরা বয়েস মানে না রাইকমল! আমরণ ফুলের রূপের বন্দনা গেয়েই বেড়ায়।

কমল ঝঙ্কার দিয়া উঠে, বেশ, তুমি থাম মহান্ত।

আজ পরম কৌতুকে হাসিয়া উঠে রসিকদাস। তাহার সে হাসি আর থামিতে চায় না। রোষভরে কমল আবার বলে, থাম বলছি মহান্ত।

রসিকের হাসি মিলায় না। সে বলে, আমি না হয় থামছি। কিন্তু তুমি 'মহান্ত' নামটি ছাড় দেখি।

কমলিনীর লাজরক্ত রোষদৃপ্ত অধরে হাসির রেখা দেখা দিল। চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়া সকৌতুকে সে বলিল, কেন, তুমি মহান্ত নও নাকি ?

খুব জোরে মাথা নাড়িয়া মহান্ত বলিল, না।

তবে তুমি কি ?

রসিক বলিল, আমি রাইকমলের বগ-বাবাজী।

এবার কমল মুখে কাপড় চাপা দেয়। মুখের চাপা কাপড় ঠেলিয়া তরুণীকণ্ঠের অবাধ্য হাসি জলকলধ্বনির মত বাহির হইয়া আসে।

সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য বাউল গানটির পাদপূরণ করে—

ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মূরছা যায় রে—মদন মূরছা যায়।

কামিনীর দুইটি ইচ্ছা ছিল—কমলের বিবাহ এবং নবদ্বীপের পুণ্যভূমি গৌরচন্দ্রের চরণচ্ছায়ায়, গঙ্গার কোলে চিরদিনের মত চোখ বুজিয়া শেষশয্যা পাতা।

ইদানীং সে মেয়ের বিবাহের আশা ছাড়িয়া দিয়া কামনা করিত শুধু নবদ্বীপচন্দ্রের

চরণাশ্রয়। তাহার সে ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না, হঠাৎ সে মারা গেল। নবদ্বীপেই দেহ রাখিল। হয় নাই বেশি কিছু। সামান্ত জ্বর, তাও বেশি দিন নয়—চার দিন।

কামিনী সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল। শেষের দিন সে বলিল, মরণে আমার দুঃখ নাই মহান্ত। গোরাচাঁদের চরণে মা-গঙ্গার কোলে এ আমার সুখের মরণ। তবে—

রসিক বাধা দিয়া বলিল, মিছে ভাবছ কেন রাইয়ের মা, কি এমন হয়েছে তোমার?

ঈষৎ হাসিয়া কামিনী বলিল, হয়েছে সবই মহান্ত, তোমরা বুঝতে পারছ না, আমি কিন্তু মরণের সাড়া পাচ্ছি। আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমি যেন তোমাদের হতে দূরে—অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। কথা বলছ তোমরা, আমি যেন শুনছি অনেক দূর হতে। শোন, মরণে আক্ষেপ নাই, শুধু মেয়ের ভাবনা আমার মহান্ত। কমলির আমার কি হবে মহান্ত?

চোখের জলে রসিকের বুক ভাসিয়া গেল। সে বলিল, ভেবো না তুমি রাইয়ের মা। তাই যদি হয়, তবে তোমার কমলের ভার আমি নিলাম।

কামিনীর মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল, সে আমি জানি মহান্ত। কই, কই কমলি আমার কই?

পাশেই কমলিনী বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া সে অবরুদ্ধ স্বরে ডাকিল, মা!

অবশ হস্ত মেয়ের মাথায় রাখিয়া কামিনী হাসিতে হাসিতেই বলিল, কাঁদিস কেন রে বুড়ো মেয়ে? মা কি চিরদিন কারও থাকে?

কমলিনী তবুও কাঁদিল। বহুকষ্টে অবশ হস্তখানির একটি স্পর্শ মেয়ের এলানো চুলের উপর টানিয়া দিয়া মা বলিল, শোন, কাঁদিস না। যাবার সময় নিশ্চিন্ত কর।

কমলি বলিল, বল!

শোন, যে লতা গাছে জড়ায় না, সে চিরদিন ধুলোয় গড়াগড়ি যায়। জানোয়ারে মুড়ে খায় তার—

কমল বাধা দিয়া বলিল, কষ্ট হচ্ছে মা তোমার?

না। তা ছাড়া, মানুষের মুখে বড় বিষ, ওরে কলঙ্কের বিষে রাধার সোনার অঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল। না, রে তুই সইতে পারবি না। আমায় কথা দে তুই।

সে হাঁপাইতেছিল।

কমল বলিল, কেন মা? দেবতার হাতে দিয়ে যেতে কি তোর মন সরছে না?

দরদরধারে কামিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বার বার ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, না। কমলি, আমায় নিশ্চিন্ত কর। বল, কথা দে।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া এবার কমল বলিল, বিয়ে করব মা।

কামিনী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ!

তারপর সে দুইটি কথা কহিয়াছিল। একসময় বলিল, বাপ-মায়ের ছেলে কেড়ে নিল না যেন।

হাসিয়া কমল বলিল, না মা।

মহান্ত তখন নাম আরম্ভ করিয়াছে, জয় রাধে রাধে—

কামিনী বলিল, গোবিন্দ গোবিন্দ!

ওই শেষ কথা।

পাঁচ

ফুল ঝরিয়া যায়, আবার ফোটে। কালের তালে তালে ঘুম-পাড়ানিয়া গানের মত বিস্মরণীয় গান গাহিয়া মানুষের দুঃখের স্মৃতি ভুলাইয়া দিতেছেন মা-বসুমতী। কমলিনীও দিনে দিনে মায়ের শোক কতকটা ভুলিল। দিনের সঙ্গে সঙ্গে সে চোখের জল মুছিল, তারপর আবার হাসিল, আবার কীর্তন গাহিল। বাউল রসিক যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে হাসিল। ব্যথাতুর শিশু বেদনার উপশমে কান্না ভুলিয়া হাসিলে মায়ের বুকে যে হাসি দেখা দেয়, রসিকের মুখেও তেমনই হাসি দেখা দিল।

রসিক ভিক্ষা করিয়া আনে, কমল রাঁধে-বাড়ে। দিন এমনই করিয়া চলিতেছিল, মাস তিনেক পর একদিন রসিক বলিল, রাইকমল, একটা কথা বলছিলাম।

তার কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গীতে যেন একটা কুণ্ঠা ছিল। এটুকু কমলের বড় ভাল লাগিল। চটুল রসিকতায় বাউলকে আরও সে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল।

বলিল, বল?

রসিক বলিল, বলছিলাম কি—

কমল বলিয়া উঠিল, কি বলছিলে?

রসিক আরও কুণ্ঠিতভাবে বলিল, তা হলে—

কমলিনীর হাসি স্ফুট হইয়া উঠিল, বলিল, তা হলে? কি তা হলে বল না গো? বগ-বাবাজীর গলায় কি কাঁটা আটকাল নাকি?

বিব্রত রসিক অকারণে গলাটা খাঁকি দিয়া ঝাড়িয়া লইল। বলিল, না—তা—

স্বভাবগত কলহাস্যে সমস্ত মুখরিত করিয়া কমল বলিল, তবে গলা ঝাড়লে যে?

রসিক এবার বলিয়া ফেলিল, তোমার মালাচন্দনের কথা। আমি—ধর, আমার—

কথাটা শুনিবামাত্র চঞ্চল কমলিনী এক মুহূর্তে স্থির হইয়া গিয়াছিল। একদৃষ্টে সে রসিকের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। কথাটার শেষের দিকে রসিকদাসের কুণ্ঠা দেখিয়া তবুও তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—ম্লান হাসি, বলিল, তোমার?

রসিক বলিল, আমি বাউল। তা ছাড়া আমার কাছে থাকলে লোকেও মন্দ—

সে আর বলিতে পারিল না। কমল আবার ঈষৎ ম্লান হাসিয়া বলিল, গলার কাঁটাটা ঝেড়ে ফেলতে পারলে না? আচ্ছা, এ বেলাটা সবুর কর মহান্ত, ও বেলায়—

কথাটা সে শেষ করিল না, তাহার পূর্বেই ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সারাটা দিন

বাহির হইল না।

রসিকদাসও সারাটা দিন বাহিরে মাথায় হাত দিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার কিছু আগে কমল ঘর হইতে বাহির হইল।

রসিক বসিয়া ছিল পূর্বমুখে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সন্ধ্যার অস্তমান সূর্যের স্বর্ণাভা কমলের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আজ তবু পদাবলীর কোন কলি মনে পড়িল না। অপরাধীর মতই রসিক বলিল, রাইকমল!

বিচিত্র হাসি হাসিয়া কমল বলিল, মালার জন্যে যে ফুল চাই মহান্ত।

সবিস্ময়ে রসিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমল বলিল, আজই আমার মালাচন্দন হবে মহান্ত। ফুল চাই। আয়োজন চাই।

পরম আনন্দে উঠিয়া রসিক বলিল, সুবল-সখাকে ডেকে আনি আমি।

বাধা দিয়া কমল বলিল, পরে। এখন থাক। আগে ফুল নিয়ে এস তুমি।

রসিক বালকের মত আনন্দবিহ্বল হইয়া চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে সিক্তবস্ত্রে কতকগুলি পদ্মফুল লইয়া সে ফিরিল। বলিল, রাইকমল, কমলফুলই এনেছি আমি।

আরও বোধ হয় কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু কমলিনীর রূপ দেখিয়া সে-কথা আর রসিকদাস উচ্চারণ করিতে পারিল না। কমলের চুলের রাশি ছিল এলানো। পরনে টকটকে রাঙাপাড় তসরের শাড়ি একখানি। নাকে ক্ষীণ রেখায় আঁকা শুক্ল-প্রতিপদের চন্দ্রকলার মত রসকলিটি যেন উঁকি মারিয়া হাসিতেছিল। কপালে সন্ধ্যার গোধূলি-তারার মত শুভ্র টিপ একটি। গলায় তুলসীকাঠের মালা, হাতে দুইগাছি রাঙা রুলি। অঙ্গে আর কোন আভরণ নাই; কিন্তু তাই যেন ভাল।

কমলিনী হাসিল।

রসিক বলিল, একটু খুঁত হয়েছে রাইকমল। নীলাম্বরী পরলেই ভাল হত।

কমল বলিল, সে বাসরে পরব। নীল কালো বিয়ের সময় পরতে নেই যে। এখন তুমি কাপড়টা ছাড় দেখি। ওই দেখ, কাপড় রেখেছি।

রসিক দেখিল, কমলিনীর শখ করিয়া সেদিনের কেনা সেই নূতন শান্তিপুরে ধুতিখানি রহিয়াছে। পরমানন্দে কাপড়খানা সে পরিধান করিয়া বলিল, শিরোপা যে মজুরীর চেয়েও দামী গো! তারপর, এইবার হুকুম কর, সুবল-সখাকে ডাকি।

চন্দন ঘষা শেষ করিয়া কমল বলিল, পরে। আগে মালা দুগাছা গেঁথে ফেলি, এস। তুমি একগাছা গাঁথ, আমি একগাছা গাঁথি।

রসিকের আজ আর আনন্দ যেন ধরিতেছিল না। সে তাড়াতাড়ি মালা গাঁথিতে বসিয়া গেল। বলিল, খুব ভাল হবে রাইকমল। সুবল-সখা আসবামাত্র মালা পরিয়ে দেবে। সে অবাক হয়ে যাবে।

কমলের হাতের মালা শেষ হইয়া আসিল। সে তাগিদ দিল মহান্তকে, বলি, আর দেরি কত? আমার শেষ হল যে!

রসিক রসিকতা করিয়া উত্তর দিল, রাই ধৈর্যং—

তারপর সুতার গিঁঠ বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, আমার মালাও তৈরি গো।

কমলিনী আপন হাতের মালাগাছি রসিকের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, গোবিন্দ সাক্ষী।

রসিকের মুখ হইয়া গিয়াছিল বিবর্ণ পাংশু। কমল তাহাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া বলিল, এইবার তোমার মালা আমায় দাও।

এতক্ষণে রসিকের কথা সরিল। সে আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কি করলে রাইকমল?

কমল সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিল, মালার প্রসাদ দেবে না আমায়?

বলিয়া চন্দন লইয়া রসিকের জরাজীর্ণ পাণ্ডুর ললাট চর্চিত করিয়া দিল।

রসিকের চোখের দৃষ্টি ক্রমশ পরিবর্তিত হইতেছিল। এক রহস্যময় দৃষ্টিতে কমলের মুখপানে চাহিয়া সে হাসিল। তারপর আপন হাতের খসিয়া-পড়া মালাগাছি তুলিয়া লইয়া কমলের গলায় পরাইয়া দিল। তাহার সুন্দর মসৃণ তরুণ ললাটে সুন্দর ছাঁদে আঁকিয়া দিল সুবঙ্কিম রেখায় চন্দনবিন্দুর অলকা-তিলকার সারি। আঁকিতে আঁকিতে সে গাহিতেছিল—

কৃষ্ণপূজার কমল আমি রেখে দিব মাথায় করে।

কমল লীলাকৌতুকে বলিয়া উঠিল, কত দেরি তোমার? বাসর সাজাতে হবে যে!

রসিক বলিল, না গো সখি, না। বাসর সাজাব আমি। আমাদের লীলা হবে উল্‌টো—এ লীলায় তুমি কাঁদবে, আমি কাঁদব।

কমল বলিল, চল, এখন গৌরাঙ্গ-মন্দিরে চল। মহান্তের কাছে যাই। যেগুলো করতে হবে, সেগুলো করা চাই তো!

* * *

রসিকদাসই বাসর সাজাইল। কমল দেখিল, বাসর সাজানো হইয়াছে—একদিকে টাটকা ফুলে, অন্য দিকে শুকনো ফুলে। কমল মুখ তুলিয়া মহান্তের দিকে চাহিল। রসিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি আর আমি।

কমল বলিল, তার চেয়ে আগুরে সাজালে না কেন? তাহার কণ্ঠস্বর যেন কাঁপিতেছিল।

রসিক অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া বলিল, না না, শুকনো ফুল ফেলে দিই।

কমল বাধা দিল। সে শুষ্ক ফুলশয্যার উপর বসিয়া বলিল, এ শয্যে আমার। তোমার শুকনো শয্যে হবে না, তোমার হবে টাটকা শয্যে।

কথা শেষ করিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ একটা অনমুভূত তীব্রতায় জীর্ণদেহ প্রৌঢ়ের বক্ষপঞ্জরের অভ্যন্তরটা গুরগুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণ কম্পনের রেশে সর্বদেহ কাঁপিতেছিল।

প্রৌঢ় বাউল কয় পা পিছাইয়া গেল, কম্পিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, থাক রাইকমল, থাক।

কমল সমান হাসি হাসিয়া কহিল, তা কি হয় গো? এ যে নিয়ম। আর আমার বিয়ের সাধ-আহ্লাদ তো একটা আছে।

ধীরে ধীরে আপনাকে দৃঢ় করিয়া লইয়া মহান্ত বিকশিত কোমল কুসুম-শয্যার উপর গিয়া বসিল। তারপর কমলের হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, রাইকমল, আধুলির বদলে শেষে আধলার মালা গলায় গাঁথলে?

বাউল বিচিত্র হাসি হাসিল।

কমল হাসিল। বলিল, সোনায় তামায় বড় ধাঁধা লাগে গো। সোনা বলেই তো গলায় গাঁথলাম। তামা যদি হয়, তবুও জানব, ওই আমার সোনা। সোনা-তামায় তফাত তো মনের ভুল। এ তো শুধু আমার রইল। কদর করব আমি। পরের সঙ্গে দর করতে হাটে তো যাচ্ছি না।

ঘরের কোণে কমল ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়াছিল। প্রদীপটা জ্বলিতেছিলও বেশ উজ্জ্বলভাবে। রসিক কমলের মুখখানি পরিপূর্ণ আলোর ধারার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কমল হাসিল।

রসিকের দেখিয়া যেন আর তৃপ্তি হয় না—আশা মেটে না। কমল বলিল, ছাড়।

সে কেমন ভয় পাইয়া গেল। জীর্ণ বাউলের বার্ধক্যমলিন চোখের কি তীব্র জ্বলজ্বলে একাগ্র দৃষ্টি!

সে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রসিক সহসা উন্মত্তের মত প্রবল আকর্ষণে কমলের পুষ্পিত দেহখানিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। কমল ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ওই শীর্ণ বাহুতে যেন মত্ত হস্তীর শক্তি! কঙ্কাল যেন ফাঁসির দড়ির মত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

কমলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আর্তস্বরে প্রার্থনা করিল, মহান্ত! মহান্ত!

উন্মত্ত বাউল যেন অন্ধ বধির হইয়া গিয়াছে।

ছয়

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কমল দেখিল, মহান্ত দাওয়ার উপর বসিয়া আছে।

কখন যে সে শয্যাত্যাগ করিয়াছে, কমল তাহা জানিতে পারে নাই; কিন্তু মহান্তের মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। রক্ত-মাংসের মানুষটা যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চল মূক—নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টি তাহার। চোখের কোলে কোলে দুইটি গভীর কালো রেখা দেখা দিয়াছে। শুষ্ক নদীর ভাঙন-ধরা তটরেখার মত বিগত-বন্যার বার্তা যেন তাহাতে পরিস্ফুট।

সবই কমল বুঝিল। আপনাকেই একান্তভাবে অপরাধী করিয়া কমল লজ্জায় দুঃখে এতটুকু হইয়া গেল। কতবার সান্ত্বনার কথা কহিতে গিয়াও সে পারিল না। সমস্ত প্রভাতটা সে আড়ালে আড়ালে ফিরিল।

রসিকদাসই আগে কথা কহিল। সে ডাকিল, কমল!

ডাকটা কমলের কানে যেন ঠেকিল—যেন খাটো-খাটো, কণ্ঠস্বরও যেন হিম-কঠিন। কমল তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল নতমুখে।

রসিক তাহার মুখপানে চাহিয়া কাতরভাবে বলিল, কমল, আমি মানুষ।

কমল উত্তর দিল, কেউই পাথর নয়। তবে তুমি আজ পাথর হয়েছ দেখছি।

মহান্তের কণ্ঠস্বরে বাদল যেন ঝরিয়া পড়িল। সে বলিল, অহল্যার মত পাষাণই বুঝি হলাম কমল।

কতকালের গৃহিণীর মত কমল আপনার অাঁচল দিয়া মহান্তের সজল চোখ মুছাইয়া দিল। তারপর বলিল, মালা তো ফুলেরই মালা মহান্ত, তাতেও তোমার যদি গলায় ফাঁসি লাগে তবে তুমি ছিঁড়ে ফেলো।

মহান্ত ধীর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। সে পারব না। আবার সে ঘাড় নাড়িল—না।

হাসিয়া কমল বলিল, আমার জন্যে ভাবছ? আমার জন্যে তুমি ভেবো না। গোবিন্দ তোমার একার নয়। তার হাতে ছেড়ে দিতেও কি তুমি পারবে না?

রসিক বলিল, না কমল, সে আর আমি পারব না—দেবতার পায়ে নয়, মানুষের হাতেও নয়। আমার ভিতর বাহির তুমিময় হয়ে গিয়েছে। তুমি ছাড়া আমি বাঁচব না। জান কমল, কাল রাত্রে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নাই। পা উঠেছে, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারি নাই।

কমল ম্লানমুখে কহিল, কিন্তু আমি যে দুঃখে লজ্জায় মরে যাচ্ছি মহান্ত। তোমার এতদিনের ভজন-পূজন সব আমার জন্যে পণ্ড হল।

উন্মত্তের মত কমলের হাত দুইটি আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়া মহান্ত বলিল, যাক—যাক—যাক। সংসারে আমি কিছু চাই না। শুধু তুমি যেন আমায় ছেড়ো না কমল।

প্রবল আকর্ষণে সে কমলকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

কমল বলিল, ছাড়। ওঠ, উঠে স্নান কর। গোরাচাঁদের পুজো করে এস।

মহান্ত অকস্মাৎ হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

৫

আজন্ম-কুমার বৈরাগীর বুকের ক্ষুধা এতদিন ঘুমন্ত জনের ক্ষুধার মত অবিচলিত ছিল। আজ আহার্য সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলার সে-ক্ষুধা অজগরের গ্রাস বিস্তার করিয়া মাথা তুলিল। সে-অজগর বাউলের আজন্ম সাধনায় অর্জিত বৈরাগ্যকে অসহায় বনকুরঙ্গের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাকে পিষিয়া মারিয়া সে তাহাকে নিঃশেষে গ্রাস করিবে।

রসিকদাস শিহরিয়া উঠিল। সে যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার রসের উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শুক-সারীর দ্বন্দ্বের গান আর জমে না। গোষ্ঠ বিহারের সুদাম-সুবলের সখা-সংবাদ আর সে গায় না। হাসে না, কাঁদেও না, সে এক অদ্ভুত অবস্থা!

মধ্যে মধ্যে একা, অথবা নিশীথ-রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া হাতজোড় করিয়া ডাকে, হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ!

ধীরে ধীরে দুইটি নরনারীর জীবন কেমন একটা স্পন্দনহীন গুমটে অসহনীয় হইয়া উঠিল। কমলেরও যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। একদিন সে বলিয়া ফেলিল, এ তো আর ভাল লাগে না মহান্ত।

মহান্ত চমকিয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে স্পন্দনহীন দৃষ্টিতে সে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমল বলিল, ঘর যে বিষ হয়ে উঠল! চল, কোথাও যাই।

গৃহত্যাগের নামে রসিক যেন একটু জীবন্ত হইয়া উঠিল। সেও বলিয়া উঠিল, তাই চল, তাই চল কমল! কোথায় যাবে বল দেখি?

বৃন্দাবন।

রসিকদাস শিহরিয়া উঠিল। বলিল, না না না। অন্য কোথাও চল, ব্রজের চাঁদকে এ মুখ আমি দেখাতে পারব না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার সে কহিল, জান কমল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত গোরাচাঁদের মন্দিরে যাই নাই।

কমলের মরিতে ইচ্ছা করিল। আপনার পানে চাহিতেও যেন তাহার ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে মহান্তকেই প্রশ্ন করিল, আমার মাঝে কি এতই পাপ আছে মহান্ত?

রসিক সে-কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। একান্ত অপরাধীর মত নতমস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। কমল চোখ মুছিতে মুছিতে আবার বলিল, বেশ, কোথাও গিয়ে কাজ নাই। চল, পথে পথেই ঘুরব আমরা।

আঃ, রসিক যেন বাঁচিয়া গেল। পথে—পথে—পথে—পথে! সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তাই চল রাইকমল, তাই চল। আজই চল। তাহার মনে হইল, পথের ধুলার মধ্যেই কোথায় আছে যেন মুক্তি। ঘর নয় কুঞ্জ নয় বিশ্রাম নয় অভিসার নয়, শুধু চলা। —চল, আজই চল।

কমল হাসিয়া বলিল, 'ওঠ' বলতেই কাঁধে ঝুলি! ঘর-দোরের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?

বাধা দিয়া রসিক বলিল, থাক থাক, পড়ে থাক ঘর-দোর! ঘর যখন আর বাঁধব না, তখন ঘর বিক্রি করে, ঘর সঙ্গে নিয়ে কি হবে? সখি, বৈরাগী বাউল—হতে হয় হারায়ে দু কূল।

কমল আর আপত্তি করিল না। সে বলিল, যা খুশি তোমার তাই কর মহান্ত।

পরাজিত বন্দী বৈরাগী মুক্তির আশায় কাঁধে ঝোলা লইয়া মাথায় বাঁধিল নামাবলী। দাড়িতে আজ আবার বিনুনি পাকাইতে পাকাইতে অভিসারের গান ধরিল।

দীর্ঘদিন পর ঘর ছাড়িয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ রসিক-হইয়া উঠিল যেন পিঞ্জরমুক্ত

পাখি—প্রগাঢ় নীলিমার মধ্যে সঞ্চরমাণ, মুখর। রসিক পায়ে পরিয়াছে নূপুর; হাতের একতারাটিতে উঠিয়াছিল অবিরাম ঝঙ্কার, সে নিজে গাহিয়া চলিয়াছিল গানের পর গান। দ্বিপ্রহরের সময় একখানা বর্ধিষ্ণু গ্রামের বাজারের মুখে পথের পাশে পুকুরের বাঁধা ঘাট দেখিয়া পথবিহারী নরনারী দুইটি ঘর পাতিল।

রসিক গাছতলা পরিষ্কার করিয়া উনান পাতিল, কাঠকুটা ভাঙিয়া সংগ্রহ করিল। তারপর ডাকিল, এস গো ঘরের লক্ষ্মী।

কমল স্নানান্তে আসিয়া একটু হাসিল। রান্নার ব্যবস্থায় বসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ঝুলির ভাঁড়ারে যে নুন নাই গো ঘরের কর্তা!

মহান্ত নুন আনিতে গেল। নুনের ঠোঙা হাতে ফিরিয়া দেখিল, কমলকে ঘিরিয়া দর্শকদের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে।

পরম কৌতুকে রসিকদাস দর্শকদের পিছনে দাঁড়াইল। দৃষ্টি পড়িল তাহার কমলের পানে। হাঁ, দেখিবার মত রূপ বটে। ভিজা এলোচুলের প্রান্তদেশ একটি গিঁট দিয়া ভাঁজ করিয়া মাথার উপর তোলা। আগুনের আঁচে সুন্দর মুখখানি সিন্দুরের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। নাকে রসকলি, কপালে তিলক জলজল করিতেছে। দর্শকদের সে দোষ দিতে পারিল না। দর্শকদের দল কিন্তু দেখিয়াই নিরস্ত ছিল না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ হইতেছিল।

প্রশ্নের কিন্তু জবাব ছিল না। কমল নীরবে মর্যাদাভরে গরবিনীর মত বসিয়া ছিল। কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

একজন বার বার প্রশ্ন করিতেছিল, কি নাম গো বোষ্টুমী? কোথা বাড়ি?

পিছন হইতে রসিক উত্তর দিল, নাম রাইকমল। বাস রসকুঞ্জে।

কথার শব্দে পিছন ফিরিয়া সকলে একবার রসিকের দিকে চাহিল। কে একজন প্রশ্ন করিল, ও আবার কে হে?

রসিক কমলের পাশে আসিয়া সেই লতার লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমার নাম খেঁটে-হাতে আয়ান ঘোষ গো প্রভু। বোষ্টুমীর বোষ্টম গো আমি।

দর্শকের দল খসিতে শুরু করিল।

কৌতুকে মহান্ত হাসিয়াই সারা হইল। নির্জীব বৈরাগী আজ মুক্ত বায়ুর স্পর্শে যেন বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

আপনার মনে গুনগুন করিতে করিতে সে ডাকিয়া উঠিল, রাইকমল!

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, তবু ভাল। কতদিন পরে আজ 'রাইকমল' বলে ডাকলে!

ঘর-ছাড়ার কোন্ আনন্দে বৈরাগী আজ মাতোয়ারা, কে জানে! রসিকের শুষ্ক রসসাগর যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। স্মিতহাস্যে কৌতুকোজ্জ্বল চোখে সে বলিয়া উঠিল, তাই ভাল, তাই ভাল রাইকমল, আজ মানই তুমি কর। গেরস্থের দোরে দোরে আজ আমি মানের পালা গাইব।

কমল হাসিল। হাসিয়া বলিল, গান তুমি গাইতে পার মহান্ত, কিন্তু মান তো ভাঙাতে পারবে না। নারীর সঙ্গ বাউল-বৈরাগীর পাপ, লজ্জা—সে তো তুমি ভুলতে পারবে না।

খুব জোরের সহিত বাউল বলিয়া উঠিল, খুব পারবো গো রাইমানিনী, খুব পারব। পাপ-লজ্জা ঘরের বস্তু, ঘরেই ফেলে এসেছি। তাই তো আজ আবার তুমি আমার রাইকমল—কৃষ্ণ পূজার কমল-মালা।

পথে পথে চলে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। গৃহস্থের দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়। পথের পর পথ, গ্রামের পর গ্রাম পিছনে পড়িয়া থাকে। গঙ্গা অনেক পিছনে পড়িয়াছে। অজয়ের তীরে তীরে পথ।

চলিতে চলিতে মাস-দুই পরে একদিন কমল পথের উপর চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কহিল, এ কোথায় এলাম মহান্ত?

রসিক চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া শুধু বলিল, রাইকমল!

মায়ার টানে, না, পথের ফেরে কে জানে, পথের মানুষ দুইটি এ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে?

ওই দূরে অজয়ের তীর। ঘন শরবন চলিয়া গিয়াছে কূলে কূলে। এই তো বনওয়ারী-লালের রাসমঞ্চ।

বনওয়ারীলাল এখানকার প্রাচীন জমিদারের গোবিন্দ-বিগ্রহ। এই অঞ্চলে অজয়ের কূলে কূলে বনওয়ারীলালের লীলাক্ষেত্র তৈয়ারি করিয়া গিয়াছেন বনওয়ারীদেবের সেবাইত—রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, ঝুলনকুঞ্জ। এখান হইতে ওই অনতিদূরে তাহাদের গ্রাম। ওই তো!

উভয়েই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কমল বলিল, ফেরো মহান্ত।

রসিক ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, না রাইকমল। মা যখন টেনেছেন, গোবিন্দ যখন এনেছেন, তখন মায়ের কোলে ত্রিরাত্রি বাস না করে ফিরব না।

তাহারা আসিয়া দাঁড়াইল রসকুঞ্জের দুয়ারে। দুয়ার বলিলে ভুল হইবে, রসকুঞ্জের ধ্বসিয়া-পড়া ভিটার প্রান্তে।

মনের কোণে মমতা কোথায় লুকাইয়া ছিল, নয়ন-পথে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিল। চোখে জল আসিল।

কমলদের আখড়ার অবস্থাও তাই। তবে অটুট আছে শুধু জোড়ালতার কুঞ্জটি, আর চারিপাশে ঘন বেষ্টনীটি। কুঞ্জতলের রাঙা মাটিতে নিকানো সেকালের সেই সুপরিচ্ছন্ন অঙ্গনটির উপর জাগিয়াছে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। পথবাসী মানুষ দুইটি সেই ছায়াতলে বসিয়া পড়িল। অনির্বচনীয় নিবিড় একটি মমতার মোহ তাহাদের মন ও চৈতন্যকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নির্বাক হইয়া বসিয়া উভয়ে চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকের সহিত আজ আবার যেন নূতন করিয়া পরিচয় করিয়া লইতেছে।

কতক্ষণ পর কমল বলিয়া উঠিল, বড় মায়া হচ্ছে মহান্ত। ফেলে যাবার কথা মনে করতেও

কষ্ট হচ্ছে, মন যে থাকতে চাইছে।

রসিক তখন গান ধরিয়া দিয়াছে—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল
দেখা না হইত পরান গেল।

কমল তাহার সঙ্গে যোগ দিল। চোখ তাহার সজল হইয়া উঠিল। গানের শেষে মহান্ত বলিল, আর যাব না রাইকমল। বাতাসে মাটিতে আমাকেও যেন জড়িয়ে ধরেছে।

কমল নীরবে আমগাছটির দিকে চাহিয়া ছিল।

রসিক আবার বলিল, আমাকে কিন্তু রসকুঞ্জে থাকতে দিতে হবে।

তিক্ত হাসিয়া কমল বলিল, তাই হবে গো, তাই হবে, তোমার কুঞ্জেই তুমি থাকবে। ভয় নাই, ধ্যান তোমার ভাঙবে না।

মহান্ত বলিল, না গো না, আসব আমি। শাওনের বাদল রাতে ঝুলনায় তোমার দোল দিতে আসব। রাসের রাতে ফুলের গয়না নিয়ে তোমার দরবারে আসব আমি। ফাল্গুনের পূর্ণিমায় আসব ফাগ-কুমকুম নিয়ে।

তীব্র ব্যঙ্গভরে হাসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, একটি লীলা যে বাকি থাকল ঠাকুর—গিরি-গোবর্ধনধারণ।

রসিক অপ্রতিভ হইল না। কহিল, ভুল করলে যে রাইকমল। আমি তো সে হয়ে আসব না তোমার দরবারে রাইমানিনী। আমি হব তোমার বৃন্দে, তোমার ললিতা, তোমার মালাকর, তোমার কুঞ্জদ্বারের দ্বারী। কটা দিনের কথা ভুলে যাও—হারিয়ে ফেল, মুছে দাও জলের আল্পনার মত।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, মালা কি সত্যিই ফাঁসি হয়ে গলায় লেগেছে মহান্ত যে ছিঁড়তেই হবে?

দূর, দূর, বাজে বকে সময় মাটি। বলি ওগো বোষ্টুমী, পেটের কথা ভাব। চল, দোরে দোরে দুটো মেগে আসি।

মহান্ত একতারায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

ম্লান হাসি হাসিয়া কমল বলিল, চল। কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায় মহান্ত?

পথ চলিতে চলিতে কমল সহসা বলিয়া উঠিল, মহান্ত, আর একদিন এই কথাটাই তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজ আবার জিজ্ঞেস করি—আমার মাঝে কি এতই পাপ আছে?

মহান্ত পথ চলিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে হাতে বাজিতেছিল একতারা, পায়ে তালে তালে বাজিতেছিল নূপুর।

একতারা নীরব হইয়া গেল, পায়ের নূপুর বাজিয়া উঠিল বেতালা। মহান্ত কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

হঠাৎ কমল দাঁড়াইল।

রসিকদাস বলিল, দাঁড়ালে যে?

কমল আপনার অঙ্গের পানে চাহিল। চিকণ উজ্জ্বল ত্বক রৌদ্রের ছটায় ঝলমল করিতেছে নিখাদ সোনার মত। বুকের নিঃশ্বাসে তো কই কালি নাই—কোন গন্ধ নাই? তবে? মন তাহার বলিয়া উঠিল, কোথায় পাপ? কিসের পাপ? সে আর মহান্তকে প্রশ্ন করিল না।

মহান্ত বলিল, কানুর বাড়ি আগে যাই চল।

কমল বলিল, না। তা হলে সে আর ছাড়বে না। সমস্ত গাঁ ফিরে শেষে তার বাড়ি যাব।

প্রথম গৃহস্থের দুয়ারে আসিয়া কমলই কহিল, বাজাও মহান্ত, একতারায় সুর দাও।

দুয়ারে দুয়ারে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া ফেরে। গ্রামের জন তাহাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে। মহান্ত গানেই উত্তর দেয়—

বল বল তোমার কুশল শুনি,
তোমার কুশলে কুশল মানি।

মেয়েরা কিন্তু ছাড়ে না। তাহারা তাহাদের কুশল শুনিয়া তবে ছাড়ে। কমলকে দেখিয়া স্মিতমুখে তাহারা বলিয়া উঠে, এ যে লক্ষ্মী-ঠাকুরুনটি হয়েছিস কমলি—অ্যাঁ!

নিজেরা দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহাদের গৃহের মধ্যে কেহ থাকিলে তাহাকেও তাহারা ডাকে, দেখে যাও গো মাসী। আমাদের সেই কমলি এসেছে, দেখে যাও।

মাসী আসিয়া কমলকে দেখিয়া বলে, নবদ্বীপের জলের গুণ আছে।

কমলের মুখ লজ্জিত স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠে। উত্তর দেয় রসিকদাস। সে বলিয়া উঠে, সে যে গোরাচাঁদেরদেশ, রূপের সায়র গো। কৌতুকচপল পল্লীর মেয়েরা পরিহাস করিতে ছাড়ে না। তাহারাবলিয়া উঠে, তা বটে। তোমারও চেহারার জলুস হয়েছে দেখছি।

কথার শেষে তাহারা মুখে কাপড় দিয়ে হাসে।

রসিকদাস কিন্তু অপ্রস্তুত হয় না। স্মিতমুখে সে জবাব দেয়, কাল যে কলি গো, নইলে শুকনো গাছেও ফুল ফুটত।

মুখের চাপা কাপড় ভেদ করিয়া এবার তরুণী-কণ্ঠের অবাধ্য হাসি উচ্ছলিত হইয়া উঠে।

রসিকের কাছে পরাজয় মানিয়া এবার আবার তাহারা কমলকে লইয়া পড়ে। জিজ্ঞাসা করে, কমলি, এখনও সোঁদা আছিস নাকি? তোর বোষ্টম কই লো?

রসিকদাসকে এবার লজ্জায় নীরব হইতে হয়। কমলই জবাব দেয় স্মিতমুখে, এই যে আমার মহান্ত।

মেয়েদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেই তাহারা কলস্বরে হাসিয়া উঠে। কেহ কেহ বলিয়া উঠে, কাল কলি হলে কি হবে মহান্ত, নামের গুণ যায় নাই। শুকনো গাছেও ফুল ফুটেছে।

মহান্ত অকারণে ব্যস্ত হইয়া উঠে। বলে, ভিক্ষে দাও গো। পাঁচ-দোর ঘুরতে হবে আমাদের।

রঞ্জনদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া মহান্ত বলিল, রাইকমল, আজ আর থাক। দুটো পেট এতেই চলে যাবে।

কমল বলিল, বাঃ, তাই কি হয়? আমার লঙ্কার বাড়ি না গেলে বলবে কি?

এতটুকু দ্বিধার লেশ সে কণ্ঠস্বরে ছিল না। মহান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। আনন্দোজ্জল মুখ, সম্মুখপথে নিবদ্ধ দৃষ্টি কমলের। দুয়ারের পর দুয়ারে ভিক্ষা সারিয়া রঞ্জনদের দুয়ারে আসিয়া কমল বলিয়া উঠিল, মহান্ত, একি?

রঞ্জনদের বাড়িঘর সমস্ত একটা ধ্বংসস্তূপের মত পড়িয়া আছে।

মহান্ত ডাকিল, রাইকমল!

কমল মুখ ফিরাইল, হাসিয়া বলিল, বল?

মহান্ত বলিল, ফিরি চল।

কমল হাসিয়া বলিল, চল।

পথে দাঁড়াইয়া ছিল একটি মেয়ে। সঙ্গে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। সে অকস্মাৎ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, মাথা খাব তোমার, নাকে ঝামা ঘষে দোব। এত দেমাক তোর কিসের লা? আমাকে হেনস্তা—কেন, কেন শুনি?

কমল বলিল, কাদু!

কাদু আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কাদু কিসের লা? বল ননদিনী!

তারপর সহসা স্নেহকোমল স্বরে অনুযোগ করিয়া বলিল, এই দুপুর-রোদে কষ্টভোগ দেখা দেখি। বলি, আমি কি আজ খেতে দিতে পারতাম না? আয় আয়, জল খাবি আয়। এস গো মহান্ত। না, তুমি বুঝি আবার দাদা হয়েছ। বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সাত

কাদু সমারোহের সহিত জলখাবারের আয়োজন করিয়াছিল। দাওয়ায় বসাইয়া সে নিজে পাখার বাতাস দিতে বসিল।

তারপর মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, শেষকালে এঁদোপুকুরে ডুবে মলি ভাই বউ! ওই বগ-বাবাজী—বুড়ো বগের গলায় মালা দিলি?

কমল মুখ তুলিল, ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

সবিস্ময়ে কাদু বলিল, বউ!

লঙ্কা—আমার লঙ্কার বাড়ি! কান্নার আবেগে কমলের কথা শেষ হইল না। চোখের কোল দুটি তখন পরিপূর্ণ অশ্রুভারে উথলিয়া উঠিয়াছে।

দারুণ ঘৃণার সহিত কাদু বলিয়া উঠিল, তার নাম আমার কাছে করিস না। ছি-ছি-ছি!

কমল কিছু বুঝিতে পারিল না। কাদু আবার বলিল, পরীকে মনে আছে তোর? পরী

বিধবা হল তোরা এখান থেকে যাবার কিছুদিন পরেই। সেই পরীকে নিয়ে রঞ্জন দেশান্তরী হল। রঞ্জনের বাবা, রঞ্জনের মা লজ্জায় ঘেন্নায় কাশী চলে গেল। সেইখানেই তারা মরেছে।

কমল মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। চোখের সম্মুখে তাহার মাটি যেন পাক খাইয়া ঘুরিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে তুফান বহিতেছিল। হায়, এত বড় বঞ্চনায় সে বাঁচিবে কি করিয়া ?

কাদু বলিল, তার জন্যে দুঃখ করিস না বউ। সে যে তোর মোহ এড়িয়েছে, সেই তোর ভাগ্যি। তার বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর সে এখানে একবার এসেছিল বিষয় বিক্রি করতে। কি বললে আমাকে জানিস ?

কমল মাটির দিকে চাহিয়া ছিল—মাটির দিকেই চাহিয়া রহিল। কাদু বলিল, দেখলাম রঞ্জন বোষ্টম হয়েছে। আমি একদিন ডেকে বললাম, আচ্ছা রঞ্জনদা, বোষ্টমই যদি হলে তবে কমলকে দেশান্তরী করলে কেন ? তাকে তুমি ভুললে কি করে ? আমায় উত্তর দিলে, কাদু, পরী খুব ভাল মেয়ে, তুমি জান না। আর সে ছেলেবেলার খেলাধুলার কথা ছেড়ে দাও। বয়সের সঙ্গে তফাত হলেই সব ভুলে যেতে হয়।—ও কি, ও কি ভাই, কিছুই যে খেলে না ! না না, একটা মণ্ডা অন্তত খা।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া কমল বলিল, রুচছে না ভাই ননদিনী, ননদিনীর দেওয়া মিষ্টি মুখে রুচছে না। তেতো নয়, বিষ নয়, ননদিনীর হাতের মিষ্টি কি মুখে ভাল লাগে ! যে খবর দিয়েছিস, তাতেই পেট ভরেছে। তারপর গম্ভীরভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আজ থাক ভাই ! পালাচ্ছি না তো। কত খাওয়াবি খাওয়াস পরে।

কাদু তাহার বুকের তুফানের সন্ধান পাইয়াছিল। সে আর জেদ করিল না। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিক্ষার ঝুলিটি মেলিয়া ধরিল। রহস্যের ভানে সে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

ভিক্ষার ঝুলিটি প্রসারিত করিয়া সে বলিল, ভিক্ষে পাই ননদিনী-ঠাকরুন।

কাদুর কিন্তু চোখে জল আসিল। সে বেদনাভরেই কহিল, শেষ-ভিক্ষে তো দিয়েছি বউ, ননদিনীর কাজ তো করেছি।

কমল হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি এত ব্যর্থ, এত মেকি যে তাহার নিজের চোখেই জল আসিল।

কাদু বলিল, আমার কাছে লুকোচ্ছিস বউ ? তা লুকোতে পারিস। আমাকে তা হলে তুই পর ভাবিস !

কমল তাহার হাত দুইটি ধরিয়া শুধু বলিল, কাদু !

মুখরা কাদুর মুখে ম্লান সকরুণ হাসিটি বিচিত্র শোভায় ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, তা হলে তুই আর আমার কাছে তোর দুঃখ লুকোতে চেষ্টা করতিস না। মা হ'স নাই তুই বউ, নইলে বুঝতে পারতিস খাঁটি ভালবাসায় মানুষের কাছে মানুষের কিছু গোপন থাকে না। কথা-না-ফোটা ছেলে কাঁদে। মা বুঝতে পারে, কোনটা তার ক্ষিদের কান্না, কোনটা রোগের

কান্না, কোনটা রাগের কান্না। চোখের জল তোর গাল বেয়ে ঝরল না, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, সে-জলে বুকের ভেতর তোর সায়র হয়ে গেল।

কমল নতমস্তকে এ তিরস্কার মাথা পাতিয়া হইল। এতক্ষণে চোখের জল মুক্তধারায় পায়ের তলার মাটি সুসিক্ত করিয়া তুলিল।

রসিকদাস বাহিরে বসিয়া পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল। সে আবার বাহির হইতে সাড়া দিয়া উঠিল, ননদ-ভাজে এত গলাগলি কিসের গো?

কমল তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, যাই আমি ননদিনী।

কাহু বলিল, আজ এইখানে রান্নাবান্না কর।

না, আজ নয়। বহুদিন পর ভিটের কোলে ফিরে এলাম ভাই। আজ ভিটের মাটিতেই পাতা পেড়ে খাব।

কাহু আর আপত্তি করিল না।

লতামণ্ডপের তলদেশটিতে কমল সেদিনের মত গৃহস্থলী পাতিল। মহান্ত মুদীর দোকানে কয়টা জিনিস আনিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া দেখিল, ইটের উনান তৈয়ারী করিয়া ঝরা পাতার ইন্ধনে কমল ফুঁ পাড়িতেছে। মুখখানি রক্তরাঙা, চোখের জলে নিটোল গাল দুইটি চকচক করিতেছে।

মহান্ত যেন কেমন হইয়া গেল। কমলের বুকের উচ্ছ্বাসের সংবাদ তাহারও অজ্ঞাত ছিল না। একটা প্রবচন আছে, 'ছেলে কোলে মরে জলে ফেলব; তবু না পোষ্যপুত্র দিব'। বৈরাগীর অন্তরের স্বামিত্বটুকু এমনই একটি ঈর্ষার আগুনে জ্বলিয়া মরিতেছিল। তাহার জিহ্বাগ্রে কয়টা কঠিন কথা আসিয়া পড়িল। সে বলিয়া ফেলিল, বলি ও চোখের জল ধোঁয়ার, না মায়ার গো রাইকমল?

মুহূর্তে আহত ফণিনীর মত উগ্র ভঙ্গীতে কমল মুখ তুলিয়া মহান্তের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল। কিন্তু বিচিত্র রাইকমল, দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিতে তীব্রতা তাহার কোথায় মিলাইয়া গেল। ছলছল চোখে সকরুণ হাসি হাসিয়া কমল ধীরে ধীরে কহিল, মায়াই বটে মহান্ত।

মহান্ত বিষণ্ণ হাসি হাসিল, কোন উত্তর দিল না। কতক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমাকে বিদায় দাও তুমি।

কমল স্থিরদৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, তারপর আবার মুখ নামাইয়া কাজে মন দিল।

মহান্ত কমলের হাত ধরিয়া অতি কোমল কণ্ঠে কহিল, রাইকমল!

কমল হাতখানা টানিয়া লইল। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত প্রখর হাসি কমলের অধরে জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সে বলিল, আমার মধ্যে পাপ আছে মহান্ত।

অতি সুন্দর হাসি হাসিয়া মহান্ত বলিল, না না কমল। পাপ তোমার নয়, পাপ আমার। আমাকে বিদায় দাও তুমি।

কমল বলিল, না। আবার সে নীরবে উনানের ধূমায়মান আগুনে ফুঁ পাড়িতে লাগিল। সেই দিকে চোখ ফিরাইয়া মহান্ত একসময় আপন মনেই গাহিতে লাগিল—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

গান থামাইয়া মহান্ত ডাকিল, রাইকমল!

কমল সে আহ্বান গ্রাহ্য করিল না। মহান্ত হাসিমুখেই বলিল, বৈষ্ণবী, একটা প্রাণের কথা শোন—

সখি, সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

আট

এই ঘর ভাঙিয়া বাউল ও বৈষ্ণবী একদিন পথে বাহির হইয়াছিল, সঙ্কল্প ছিল, আর কখনও ফিরিবে না। আবার পথের ফেরে সেইখানে ফিরিয়া দুইটা দিন থাকিবার জন্য গাছতলায় সংসার পাতিয়াছিল। সে সংসার আর তাহারা ভাঙিতে পারিল না। কমল যেন বাসা বাঁধিতে বসিল। রসিকদাসও বলিল না, চল, বেরিয়ে পড়ি। কয়েক মাস না যাইতে ভাঙা ঘর পরম যত্নে তাহারা আবার গড়িয়া তুলিল। মায়ের কোলের মমতার জন্য, না পথের বুকেও সুখ পাইল না বলিয়া, সে-কথা তাহারাও হয়তো বেশ বুঝিল না।

পাশাপাশি দুইখানি আখড়া আবার গড়িয়া উঠিল। নীড় রচনার সমারোহের মধ্যে দিন-কয়েক বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। মহান্ত কাটিল মাটি, কমল বহিল জল, মহান্ত দিল দেওয়াল, কমল আগাইয়া দিল কাদার তাল। মহান্ত ছাইল চাল, কমল লেপিল রাঙা মাটি। মহান্ত বসাইল দুয়ার জানালা, কমল দুয়ার-জানালার পাশে পাশে রচনা করিল খড়ি ও গিরিমাটির আলপনা। নীড় সম্পূর্ণ হইল, সে নীড়ের দুয়ারে আবার অতিথি দেখা দিল। সেই পুরানো বন্ধু—ভোলা, বিনোদ, পঞ্চানন। সন্ধ্যায় কীর্তনের আসর বসে। তাহারা আনন্দ করিয়া চলিয়া যায়। কমল রাঁধিয়া বাড়িয়া ডাকে, মহান্ত!

মহান্ত তখন চলিয়া গিয়াছে। রসকুঞ্জে আসিয়া কমল বলিল, না খেয়ে যে চলে এলে?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ ও অভিমান।

রসিক হাসিয়া বলিল, শরীর ভাল নাই কমল।

কমলের কণ্ঠস্বরের ভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে আশঙ্কাভরে জিজ্ঞাসা করিল, কি হল গো? জ্বর-টর হবে না তো? কই, দেখি, গা দেখি?

কিন্তু নিত্যনিয়মিত ব্যাধি হইলে, সে ব্যাধির স্বরূপের সহিত মানুষের পরিচয় হইয়া যায়।

কয়দিন পর কমল সেদিন বলিল, দেহেই হোক আর মনেই হোক মহান্ত, ব্যাধি পুষে রাখা ভাল নয়। ব্যাধি তুমি দূর কর।

রসিকদাস শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বলিল, সেদিন তুমি বলেছিলে, বিদায় দাও। সেদিন পারি নাই। আমার যা হবে হোক মহান্ত, তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি।

রসিক চমকিয়া উঠিল, বলিল, এ কথা কেন বলছ কমল ?

ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া কমল বলিল, ব্যাধি তো তোমার আমি মহান্ত। ব্যাধিকে বিদায় করাই ভাল।

রসিক মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পর সে ডাকিল, কমল, রাইকমল!

জনহীন প্রাঙ্গণ নিথর পড়িয়া, কমল বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। কথাটি বলিয়া সে আর অপেক্ষা করে নাই।

পরদিন হইতে রসিকদাস যেন উৎসব জুড়িয়া দিল। মুখে তাহার হাসির মহোৎসব—আখড়ায় মানের মহোৎসব! ভোলা আসিলে মহান্ত আহ্বান করে, এস ভোলানাথ, গাঁজা তৈরি। ভোলা পরমানন্দে বলে, লাগাও মহান্ত, দম লাগাও।

কলরবের স্পর্শ পাইয়া কমল মুখর হইয়া উঠে। ভোলার তৎপরতা দেখিয়া তাহার হাসি উচ্ছল হইয়া ভাঙিয়া পড়ে। পঞ্চানন আসিলে সে বলিয়া উঠে, তুমি নাম-গান কর পঞ্চানন। —বলিয়া সে নিজেই গান ধরিয়া দেয় বাউলের সুরে—

> গাঁজা খেয়ে বিভোর ভোলা—
> পঞ্চাননে গায় হরিনাম—পঞ্চানন—ভোলা—

ভোলা ধরে খোল, মহান্ত করতাল লইয়া দোহারকি করে। দেখিতে দেখিতে কীর্তন জমিয়া উঠে। এমনই করিয়া আবার দিনকয়েক বেশ কাটিয়া গেল। সেদিন কমল ভোলাকে বলিল, ভোলা, দুখানা কাঠ কেটে দে না ভাই।

ভোলা কুড়ুল লইয়া মাতিয়া উঠিল। কাঠ কাটিয়া ভোলা বলিল, মজুরি দাও কমল।

এখন কুলের সময় নয় রে ভোলা, নইলে কুলের ঢেলা ছুঁড়ে মজুরি দিতাম। কথাটা শেষ করিয়া কমল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, মনে পড়ে তোর ?

ভোলাও হাসিল। বলিল, খুব।

রাত্রিতে নামকীর্তনের আসর ভাঙিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে ভোলা তামাক সাজিতে বসিল। মহান্ত খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল। ভোলা তখনও তামাক টানিতেছিল।

মহান্ত বলিল, ভোলানাথ, এস।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভোলা পরম ঔদাস্যভরে বলিল, বসি আর একটু!

কিছুক্ষণ পর মহান্ত আবার ফিরিয়া আসিল, আমার কল্কেটা। কল্কে লইয়া মহান্ত কমলকে বলিল, রাত অনেক হল রাইকমল।

উত্তর হইল, জানি মহান্ত।

মহান্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই।

কমল এবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, ফুল মাথায় তোলবার আগে তাতে পোকা আছে কিনা বেছে নিতে হয় মহান্ত। নইলে শিরে দংশন যদি হয়, তাতে আর ফুলেরই বা কি দোষ, পোকারই বা কি দোষ!

ফুল তো—কথাটা বলিতে গিয়া মহান্ত থামিয়া গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই একমুখ হাসিয়া সে বলিল, গোবিন্দের নির্মাল্য রাইকমল, তাতে কীটই থাক আর কাঁটাই থাক, মাথা ভিন্ন রাখবার আর ঠাঁই নাই আমার।

কমল বলিল, কালি মাখিয়ে সাদা ঢাকা যায় মহান্ত, কিন্তু কালি মাখিয়ে আলো ঢাকা যায় না। ফুল তুমি নিজে মাথায় তোল নাই, সে কথা একশো বার সত্যি। আজ তোমায় জোড়হাত করে বলছি, আমায় রেহাই দাও।

মহান্ত কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভোলা গাঁজা খাইয়া বম হইয়া বসিয়াছিল। কমল ভোলাকে কহিল, বাড়ি যা ভাই ভোলা।

ওদিকে রুদ্ধ ঘরের মধ্যে মহান্ত প্রৌঢ় বাউল অন্তরবাসী গোবিন্দের পায়ে মাথা কুটিতেছিল, গলার মালা আমার মাথায় তুলে দাও প্রভু, মাথায় তুলে দাও।

কিছুক্ষণ পরে উন্মত্তের মত নির্জন ঘরখানি মুখরিত করিয়া বলিয়া উঠিল, না না, আমায় রূপ দাও। শ্যামসুন্দর, আমায় সুন্দর করে দাও। আমার সাধনা-পুণ্য সব নাও।

উন্মত্ততার মধ্যে এই একান্ত কামনা জানাইয়া সে শয়ন করিল।

প্রভাতে তখন তাহার সে উন্মত্ততা শান্ত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু দুরাশার মোহ যেন কাটে নাই, প্রভাতের আলোকে আপনার অঙ্গপানে সে চাহিয়া দেখিল। তাহার সেই কুরূপ তাহার একান্ত প্রত্যাশিত দৃষ্টিকে উপহাস করিল।

পরদিন সমস্ত দিনটা সে কমলের আখড়া দিয়া গেল না। কি তাহার মনে হইল, কে জানে, বাহির করিয়া বসিল বাউলের পথ-সম্বল বড় ঝুলিটা। কয়টা স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে রঙিন কাপড়ের তালি দিতে বসিল।

ভোলা আসিয়া ডাকিল, কমল ডাকছে মহান্ত, এখনই চল।

মহান্ত গাঁজার পুরিয়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল, তোয়ের কর।

কমলের আজ্ঞাপালনের তাগিদ ভোলানাথ ভুলিয়া গেল। গাঁজা খাইয়া সে কথা তাহার মনে পড়িল। সে ডাকিল, এস।

কাঁধে ঝোলাটা ফেলিয়া মহান্ত উঠিল। কিন্তু পথে বাহির হইয়া বিপরীত মুখ ধরিয়া সে বলিল, কমলকে বলো, আমি ভিক্ষায় বেরুলাম।

ভোলা অবাক হইয়া বলিল, যাঃ গেল, গাঁজাখোরের রকমই এই।

সন্ধ্যায় আখড়াটা সেদিন কেমন ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল। প্রদীপের আলোকে আড্ডার

লোক কয়টি বসিয়া গল্প করিতেছিল। কমল ঘরের মধ্যে শুইয়া আছে। কীর্তনের আসর আজ বসে নাই। রসিকদাস আসিয়া বলিল, একি ভোলানাথ, কীর্তনের আসর খালি যে?

ভোলা বলিল, বোষ্টুমীর অসুখ। মাথা ধরেছে।

বোষ্টম তো আছে, এস এস।

রসিকদাস মৃদঙ্গটা পাড়িয়া বসিল। কিন্তু তবুও আসর জমিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই আসর শেষ হইয়া গেলে মহান্ত আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, রাইকমল!

কমল নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল—কোন উত্তর করিল না। বিছানার পাশে বসিয়া মহান্ত আবার ডাকিল, কমল! রাইকমল!

আমার মাথা ধরেছে মহান্ত।

কমলের ললাটখানি স্পর্শ করিয়া মহান্ত বলিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দোব রাইকমল?

রুদ্ধস্বরে কমল বলিয়া উঠিল, না না না। তোমার পায়ে পড়ি মহান্ত, আমায় রেহাই দাও।

বহুক্ষণ নীরবতার পর মহান্ত ধীরে ধীরে বলিল, পারছি না রাইকমল। আজ গোবিন্দের মুখ মনে করে পথে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদূর না যেতেই গোবিন্দের মুখ ভুলে গেলাম। মনে পড়ল তোমার কমল-মুখ। হাজার চেষ্টা করেও শ্রীমুখ মনে আর এল না।

কমল বলিল, এত বড় পাপ আমার মধ্যে আছে যে, আমার মুখ মনে করলে গোবিন্দের মুখ মনে পড়ে না মহান্ত?

মহান্ত নতমুখে বসিয়া রহিল। কমল বলিয়া গেল, তোমার আগুনে তুমি কতটা পুড়লে তা জানি না মহান্ত, কিন্তু পুড়ে মলাম আমি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মহান্ত উঠিয়া চলিয়া গেল।

কমল উঠিল পরদিন সকালে। সঙ্কল্প লইয়া শয্যাত্যাগ করিল, মহান্তের হাতেই আজ নিঃশেষে নিজেকে তুলিয়া দিবে। আর সে পারে না; এ আর তাহার সহ্য হইতেছে না। দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিতেই তাহার নজর পড়িল, রঙিন কাপড়ে বাঁধা ছোট্ট একটি পোটলা দরজার পাশেই কেহ যেন রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। একটু ইতস্তত করিয়া সেটি তুলিয়া লইয়া সে খুলিয়া ফেলিল। লাল পদ্মের পাপড়ির শুকনো একগাছি মালা। মালাগাছি হাতে করিয়া সে নীরবে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা অগ্রসর হইয়া চলিল। ভোলা আসিয়া তামাকের সরঞ্জাম পাড়িয়া বসিল। তামাক সাজিতে সাজিতে সে প্রশ্ন করিল, কই, মহান্ত গেল কোথা? আখড়ায় তো নাই!

কমল বলিল, জানি না।

তামাক খাইয়া ভোলা উঠিয়া গেল, আসর জমিল না। স্নানের সময় কাদু আসিয়া ডাকিল, বউ!

সচকিতের মত উঠিয়া কমল বলিল, চল যাই।

ঘড়া-গামছা লইয়া সে কাদুর সঙ্গে চলিল। কাদু প্রশ্ন করিল, ওটা আবার কি বউ, রঙিন

কাপড়ে জড়ানো ?

কমল বলিল, মালা। জলে বিসর্জন দিয়ে আসব ভাই।

কাহু বিস্মিতের মত কমলের মুখের উপর চাহিয়া রহিল। কথাটা সে বুঝিতে পারিল না। কমল বলিল, মহান্ত কাল রাত্রে চলে গেছে ননদিনী। এ মালা আমি তার গলায় দিয়েছিলাম।

কাহু বলিল, ছিঃ, মহান্তকে আমি ভাল মানুষ মনে করতাম। তার—

কমল বাধা দিল, কহিল, না না। তুই জানিস না ননদিনী, তুই জানিস না। চোখে তাহার জল আসিল। চোখ মুছিয়া আবার বলিল, তা ছাড়া সে আমার গুরু, তার নিন্দে আমায় শুনতে নাই।

নীরবে পথ চলিতে চলিতে কমল আবার বলিল, তোর সংসারের লক্ষ্মীর কৌটো যদি কেউ সিঁদ কেটে চুরি করে কাহু, তবে সে ঘরে সংসার পাততে কি সাহস হয়, না মন চায় ?

কাহু বলিয়া উঠিল, ওসব কি অলুক্ষণে কথা বলিস তুই বউ—ছিঃ !

কমল হাসিয়া বলিল, বাউলের সংসারের গৃহদেবতা চুরি গিয়েছে ননদিনী।

আবার কিছুক্ষণ পর সে বলিল, সে পাক, তার শ্যামকে সে ফিরে পাক।

নয়

ইহার পর কমল যেন আর এক কমল হইয়া উঠিল। মহান্ত চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান সে করিল না। কাহাকেও করিতেও বলিল না। কেহ তাহাকে বারেকের জন্য বিষণ্ণ হইয়া থাকিতে দেখিল না।

রাত্রে ঘুমাইয়া কাঁদে কিনা, সে কথা ভগবান জানেন। সকালে উঠে কিন্তু সে হাসি মুখে লইয়া, সে হাসি অহরহই তাহার মুখে লাগিয়া থাকে। সামান্য কারণে হাসিতে গানে উল্লাসে সে যেন উথলিয়া উঠিল। দেহলাবণ্যের মার্জনবিন্যাস আরও বাড়িয়া উঠিল। কোঁকড়া কোঁকড়া ফুলো ফুলো একপিঠ চুল তাহার। সে-চুল সে পরিপাটি বিন্যাস করিয়া রাখালচূড়া বাঁধে। ঈষৎ বাঁকা নাকটির সুবঙ্কিম মধ্যস্থলেই শুভ্র তিলক-মাটি দিয়া একটি সূক্ষ্ম রসকলি আঁকে। তাহারই ঠিক উপরে কালো রেখা দুইটির মধ্যস্থলে সযত্নে তিলক-মাটিরই একটি টিপ পরে। গলায় থাকে দুকণ্ঠি মিহি তুলসী কাঠের মালা।

দেখিয়া দেখিয়া ভোলা বলে, শোভা কি মালায় গুণে, শোভা হয় গলার গুণে।

ঘাড়টি দুলাইয়া কমল মৃদু মৃদু হাসে।

আখড়ার সেই উৎসব-সমারোহ যেন বাড়িয়া গিয়াছে।

ভোলা আসে, বিনোদ আসে, পঞ্চানন আসে, আরও অনেকে আসে। দিনে দিনে তাহাদের দলবৃদ্ধি হয়। কিশোর যাহারা তাহাদের কেহ আখড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলে কমল তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়। প্রৌঢ়রা কেহ দুই-চারিদিন আখড়ার সুমুখ দিয়া আনাগোনা করিলে পঞ্চম দিনে কমল তাহাকে ডাকে, এস মোড়ল, পায়ের ধুলো দিয়ে যাও।

সন্ধ্যায় কমল গান ধরে, অপর সকলে দোহারকি করে। প্রহরখানেক রাত্রে আখড়া ভাঙে। কমল বলে, এইবার বাড়ি যাও সব ভাই। সবাই উঠি উঠি করে, কিন্তু কেহই যাইতে চায় না। কমল একে একে হাত ধরিয়া আখড়ার বাহিরে পথের উপর আনিয়া বলে, কাল সকালেই ঠিক এসো যেন। বাড়ি ফিরিয়া কমল ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়।

কিছুক্ষণ পরে ভোলা ডাকে, কমলি! কমলি!

কাহারও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কোন কোন দিন সাড়া মিলে ঘরের মধ্য হইতে। কমল বলে, তুই আবার ফিরে এসেছিস?

ভোলা বলে, একবার তামাক খাব ভাই, দেশলাইটা দে।

উত্তর আসে, বাড়িতে—বাড়িতে তামাক খেগে যা। বউ সেজে দেবে।

ভোলা ডাকে, কমল!

কমল বলিয়া উঠে, দেখছিস বঁটি, আমায় বিরক্ত করবি তো নাক কেটে দোব। যা বলছি, বাড়ি যা। তোর বউয়ের, তোর মায়ের গাল খেতে পারব না আমি।

সত্যই ভোলার মা, শুধু ভোলার মা কেন, গ্রামের গৃহস্থজন সকলেই কমলকে গালাগালি দেয়। বলে, ছি! এই কি রীতিকরণ? রঞ্জনকে দেশছাড়া করলে, মহান্তকে তাড়ালে, আবার কার মাথা খায় দেখ। যাকে দশে বলে ছি, তার জীবনে কাজ কি?

সমস্তই কমলের কানে পৌঁছায়, লোক স্বল্প দূরত্ব রাখিয়া সমস্তই তাহাকে শুনাইয়া বলে। এ ঘাটে কমল স্নান করে, কথা হয় পাশের ঘাটে। কমল পথ চলে, পিছনে থাকিয়া লোকে কথা বলে। কমল পিছনে থাকিলে তাহার আগে থাকিয়া লোকে ওই কথা বলিয়া পথ চলে।

কমলের হাসিমুখ আরও খানিকটা হাসিতে ভরিয়া উঠে। সেদিন ভোলার মা তাহাকে ডাকিয়াই বলিল, মর মর, তুই মর।

কমল হাসিল, বলিল, মনুষ্যজন্ম বহু-ভাগ্যে হয়েছে, সাধ করে কি মরতে পারি, না মরতে আছে?

ভোলার মা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কমল কথা না বাড়াইয়া হাসিমুখেই চলিয়া গেল।

ভোলার মা পিছন হইতে আবার ডাকিল, শোন, শোন।

কমল বলিল, মাখন মোড়লের নতুন জামাই এসেছে খুড়ীমা, জামাই দেখতে যাচ্ছি, পরে শুনব।

মাখন মোড়লের বাড়িতে নূতন জামাইয়ের আসর হাসিতে গানে রসিকতায় গুলজার করিয়া দিয়া হঠাৎ সন্ধ্যার মুখে সে উঠিয়া পড়ে।

জামাই বলে, সে কি, এর মধ্যে যাবে কি ঠাকুরঝি? এই সন্ধ্যে লাগল।

কমল হাসিয়া বলে, আমার যে আয়ান ঘোষের একটি দল আছে ভাই শ্যামচাঁদ। ফিরতে দেরি হলে ঘর-দোর ভেঙে তছনছ করে দেবে হয়তো।

ব্যাপার চরমে উঠিল একদিন। গ্রামের নন্দী আসিয়া বলিল, পান আছে বোষ্টুমী? গোটা পান চাইলে গোমস্তা। জমিদার এসেছেন, পান আনতে ভুল হয়েছে।···গোটা পান দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াও, তাহার কি মনে হইল, সে পানের বাটা লইয়া পান

সাজিতে বসিল। একখানা ঝকঝকে রেকাবিতে পানের খিলিগুলি সাজাইয়া পাশে একটু চুন, কিছু কাটা সুপারি রাখিয়া হাসিমুখে সে কাছারিতে গিয়া হাজির হইল। রেকাবিটি সামনে নামাইয়া রাখিয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল। জমিদার সবিস্ময়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কমল হাসিয়া বলিল, আমি আপনার প্রজা—কমলিনী বোষ্টুমী। নন্দী গেল গোটা পানের জন্যে। পান কি পুরুষমানুষে সাজতে পারে! তাই সেজে আনলাম।

জমিদার একটি পান তুলিয়া মুখে দিয়া বলিলেন, বাঃ! কেয়ার গন্ধ উঠছে দেখছি!

কমল হাসিয়া বলিল, আপনার পান এলে পাঠিয়ে দেবেন, আমি সেজে দোব।

সে জমিদারকে আবার একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। জমিদার বলিলেন, পান সেজে তুমি দিয়ে যাবে কিন্তু।

কমল হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমি?

হ্যাঁ। তোমার পান যেমন মিষ্টি, হাসি তার চেয়েও মিষ্টি। গানও নাকি তুমি খুব ভাল গাও শুনেছি।

বৈষ্ণবী তাহার ঘোমটা ঈষৎ একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিল, ভিখিরীর ওই তো সম্বল প্রভু। জমিদারকে সে গান শুনাইল।

আশ্চর্যের কথা, সেইদিন সন্ধ্যায় তাহার আখড়ায় কেহ আসিল না। ভোলাও না।

কমল ঠাকুরঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিল।

দিন কয়েক পর।

জমিদার চলিয়া গিয়াছেন ভোররাত্রে। সকালবেলাতেই গ্রামখানা উচ্চ চিৎকারে মুখরিত হইয়া উঠিল। কোথাও কলহ বাধিয়াছে।

কলহ বাধিয়াছে কামুর সঙ্গে ভোলার মায়ের। কামু অনেক দিন হইতেই কমলের সম্পর্কে লোকে কটু কথা বলে শুনিয়া আসিতেছিল, শুনিয়া সে জলিয়া যাইত। কমল তাহাকে বলিত, ছি! লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে নাই। আজ জমিদার চলিয়া যাইতেই লোকে ওই পান দেওয়া এবং গান গাওয়া লইয়া নানা কথা কহিতে শুরু করিয়াছে ভোরবেলাতেই। ঘাটে কামু সেই কথা লইয়া ঝগড়া বাধাইয়াছে। সে আর সহ্য করিতে পারে নাই।

একা ভোলার মা নয়, বিনোদ-পঞ্চাননের মাও ছিল। আরও ছিল দুই-চারিজন স্পষ্ট-ভাষিণী প্রতিবেশিনী। কিন্তু কামুর জিহ্বা ও কণ্ঠের তীব্রতার কাছে তাহাদিগকে হার মানিতে হইল। সত্য সত্যই এ যেন লঙ্কাকাণ্ড, কি কুরুক্ষেত্র! কিন্তু কামুর এক নিক্ষেপে 'লক্ষ বাণ ধায় চারিভিতে'।

কমল আসিয়া কামুকে টানিয়া লইয়া গেল আপনার বাড়ি। কহিল, ছি!

কামু উগ্রভাবেই বলিল, ছিঃ? 'ছি' কেন শুনি? যে চোখ সংসারে খারাপ বই দেখে না, তার মাথা খাব না? তাদের জিভ খসে যাবে না?

কমল হাসিল। বলিল, বলুক না।

না, বলবে কেন? কেন বলবে শুনি? কোন চোখ-খাগীর—? সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কমল বলিল, আমার মাথা খাবি।

কাহু বলিল, তোর মাথা খাব না ভেবেছিস? তোর মাথাও খাব। জাঁতি দিয়ে তোর চুলের রাশ কাটব, ঝামা দিয়ে নাকের রসকলি তুলব, তবে আমার নাম ননদিনী।

কমল হাসিয়া বলিল, তাই আন। পরের সঙ্গে কেন বাপু?

কাহু ও-কথায় কান দিল না। কাহু কমলের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল, দেখ দেখি, এই রূপে চোখখাগীরা কু দেখে! পোড়ামুখীদের কালো হাঁড়িমুখ, না পোড়াকাঠ?

কমল ননদিনীর গালে একটি টোকা মারিয়া বলিল, আবার? তারপর সে মৃদুকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাথা,
কালসাপিনী-জিহ্বা যেন বিষে আঁকাবাঁকা।
আমার দারুণ ননদিনী—

কাহু একটু হাসিল। কমল বলিল, ছিঃ কাহু, মানুষকে কি ওই সব বলে?

কাহু বলিল, তবে কি বলব, শুনি? শ্রীমতী কি বলিতে বলেন, শুনি?

কমল আবার মধুরস্বরে গাহিল—

ননদিনী ব'লো নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।

কাহু বলিল, তবে আর গালাগালি দিই কি সাধ করে বউ? ওরা যে তা বিশ্বাস করবে না। বলে, তাই নাকি হয়?

কথাটা হইতেছে এই—কমল এবার সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, আর মানুষ নয়, এ রূপে সে এবার শ্যামসুন্দরের পূজা করিবে। বহু ইতিকথা তো সে শুনিয়াছে। তাই সে রাত্রে আখড়া ভাঙিয়া গেলে মালতী বা মাধবীর মালা গাঁথে, সুশোভিত কাঠের সিংহাসনে স্থাপিত কৃষ্ণমূর্তির পটখানির গলায় পরাইয়া দেয়। অনিমেষে পটের দিকে চাহিয়া থাকে—যদি সে মূর্তি হাসে! মাথার উপর ঘৃতদীপ ধরিয়া সে পটের আরতি করে। তাই রাত্রে আখড়া ভাঙিবার পর ভোলা যখন ডাকিত 'কমল', পূজারত কমলের সে কথা কানে যাইত না বা উত্তর দিবার অবসর থাকিত না। পূজায় বসিবার পূর্বে হইলে বলিত, তোর নাক কেটে দোব ভোলা।

এটুকু জানিত শুধু ননদিনী কাহু।

আজ কাহুর কথার উত্তরে কমল বলিল, আমার একটি কথা রাখতে হবে কাহু।

কাহু বুঝিয়াছিল, কথাটা কি। সে হাসিয়া বলিল, রাখব। কিন্তু আমারও একটা কথা রাখতে হবে তোকে।

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ছেলেবয়সের সাথী-সখার দল—কি করে বলব কাছু যে এসো না তোমরা ?

কাছু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, তোর কলঙ্ক আমার সহ্য হয় না বউ। তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল।

বহুক্ষণ পর কমল বলিল, তাই হবে ননদিনী। সেই ভাল। পটের পায়ে ডুবতে হলে ভাল করে ডোবাই ভাল। সঙ্গী-সাথী ডেকে হাত বাড়িয়ে তুলতে বলা হয় কেন ? তাই হবে।

কাছু বলিল, ননদিনীর জিভও কাটা গেল বউ আজ থেকে।

এর পর কমলের জীবনের এক নূতন অধ্যায়।

পটের পূজায় সে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করিল। কমলের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ননদিনী পর্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সে একদিন বলিল, একটা কথা বলব বউ ?

কি ?

রাগ করবি না তো ?

কমল কোন উত্তর দিল না, শুধু হাসিল। কাছু উত্তর পাইয়াছিল, সে ভরসা করিয়া বলিল, এ পথ ছাড় ভাই বউ ; তুই পাগল হয়ে যাবি।

কমলের মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল, আমার আশার ঘর তুই ভেঙে দিস না ভাই।

কাছু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর কহিল, ভগবান বড় নিষ্ঠুর ভাই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কমল বলিল, অতি নিষ্ঠুর ননদিনী, অতি নিষ্ঠুর।

ছবি পূজার দীর্ঘ দুইটি বৎসর তাহার কাটিয়া গেল, কিন্তু মূক ছবি মূকই রহিয়া গেল। কোনদিন তো সে হাসিল না, স্বপ্নেও কোনদিন সে দেখা দিল না। কল্পনায় একটি কিশোর মূর্তি মনে করিতে গেলে ফুটিয়া উঠে চঞ্চল কিশোর সখার রূপ। কমল শিহরিয়া উঠে। সহসা আজ তাহার মনে হইল, পট না হাসুক, কিন্তু যুগান্তরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা-করা বিগ্রহ তো আছে।

কাছু বলিল, তুই মালা-চন্দন কর ভাই বউ। তোদের তো আছে।

কমল বলিল, না, আমার আশা আজও যায় নাই ননদিনী। আমি মন্দিরে মন্দিরে তাকে খুঁজে দেখব।

কাছু আর কিছু বলিতে পারিল না।

ইহার পর হইতে কমল গ্রামে-গ্রামান্তরে তীর্থে তীর্থে বিগ্রহ-মূর্তির দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রাণ-ঢালা গানের নৈবেদ্যে সে দেবতার পূজা করিত, প্রাণের আবেদন শুনাইত, অপলক নেত্রে বিগ্রহ মূর্তির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, যদি ঈষৎবিকশিত চোরা-হাসিটি পলকের অন্ধকারে চোখ এড়াইয়া মিলাইয়া যায়।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চোখ জলে ভরিয়া আসে। তখন আর সে পলক না ফেলিয়া পারে না। চোখের জল তাহার গণ্ডদেশ বহিয়া গড়াইয়া পড়ে।

দশ

এমনই করিয়া কাটিয়া গেল কতদিন—পরিপূর্ণ দুইটি বৎসর।

পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বদিন স্নানের সময় ননদিনী কমলের দুয়ার খোলা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। এ-দিনে তো পোড়ারমুখী বউ কখনও ঘরে থাকে না। সংক্রান্তির দিন গঙ্গাস্নান করিয়া বনওয়ারীবাদে বনওয়ারীলালের দরবারে তাহার যাওয়া চাইই। কাদুর আশঙ্কা হইল। কমলের অসুখ করিল নাকি? সে আগড় ঠেলিয়া আগড়ায় প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বউ!

কমল তখন স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে উত্তর দিল, যাই।

কাদু প্রশ্ন করিল, তোর শরীর ভাল তো?

কলসী কাঁখে লইয়া কমল বাহিরে আসিল। খোলা হাতখানি কাদুর মুখের কাছে নাড়া দিয়া বলিল, বলি, ও ওলো ননদী, আজকে হঠাৎ হলি যে তুই এমন দরদী? হঠাৎ শরীরের খবর যে?

তবে যে বড় বনওয়ারীলালের দরবারে যাস নাই? নাগরের ডাক হেলা করে বেলা খোয়াচ্ছিস যে?

যাব না।

কেন?

মান করেছি।

মান! কাদু একান্ত দুঃখের সহিতই হাসিল। তারপর বলিল, মান ভাঙাবে কে কমল?

কমল স্বপ্নপ্রবণ চোখে আকাশপানে চাহিয়া রহিল।

কাদু বলিল, বউ, মিছে দেহপাত করিস না। ও হবার নয়।

কমল, বোধ হয় কোন স্বপ্ন-কল্পনা করিতে করিতেই পথ চলিতেছিল, কোন উত্তর না দিয়া এতক্ষণে স্থির দৃষ্টি কাদুর মুখের উপর রাখিয়া চাহিয়া রহিল। কাদু বলিল, এমন করে চেয়ে থাকিস না ভাই। তোর ওই চাউনিকে আমার বড় ভয় করে।

কমল তবু হাসিল না। স্নান করিতে করিতে কাদু হাসিয়া বলিল, তার চেয়ে বউ, আমায় তোর শ্যাম মনে কর। আমি তোকে বুকে করে রাখব।

কমলের নগ্ন সুন্দর বুকে সে আঙুলের একটি টোকা মারিল। সে তখন দুই হাতের আঘাতে আঘাতে জলের হিল্লোল তুলিতে তুলিতে গাহিতেছিল, 'সাগরে যাইব কামনা করিব সাধিব মনেরই সাধা'। ফিরিবার পথে কমল অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তাই ভাল ননদিনী।

কি?

তোকেই আমার শ্যাম করব।

মর।

সন্ধ্যেতে আসিস ভাই। একলা আজ থাকতে পারব না।

তুই যাস ভাই। ছেলেপিলের খাওয়া-দাওয়া, চ্যা-ভ্যাঁ, সন্ধ্যেতে আমার আসা হবে না।

আচ্ছা, যাব। নন্দাই কিছু বলবে না তো?

খিলখিল করিয়া হাসিয়া কাহু বলিল, তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব, নয়তো রাম মোড়লের মজলিসে তামাক খেতে পাঠিয়ে দোব।

কমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু দ্বিপ্রহর না যাইতেই কমল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল জয়দেবের কথা। জয়দেবের শ্যামচাঁদের দরবারে সে কখনও তো যায় নাই! জয়দেবের শ্যাম প্রেমের ঠাকুর। জয়দেবের কাহিনী মনে করিয়া সে আশান্বিত হইয়া উঠিল। ননদিনীকে চাবি দিয়া তুলসীমন্দিরে প্রদীপ দিবার কথা বলিবার তাহার অবসর হইল না।

বহুদূর পথ, ক্রোশ-পঁচিশেকের কম নয়। কমল স্থির করিল, দিনরাত্রি চলিয়াও সে আগামী কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনরূপে পৌঁছিবেই।

কমল একাই পথ ধরিল। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছিল। পথে যাত্রীর দল পাইবে, সে আশা করিয়াছিল। কিন্তু যাত্রীরা সব পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার মুখে একখানা গ্রাম পার হইবার সময় সে শুনিল, সম্মুখে একখানা মাঠ পার হইয়াই আর একখানি গ্রাম, তারপরই জয়দেবের আশ্রম।

মাঠখানা একটু বিস্তীর্ণ। ক্রোশ-দুই হইবে। কমল মাঠের বুকে নামিয়া পড়িল। সন্ত ফসল-কাটা শুভ্র ক্ষেতগুলিকে বেড়িয়া বেড়িয়া পায়ে-চলা পথের নিশানা ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। শুক্লপক্ষের রাত্রি। দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত স্তর-মেঘের মেলা আকাশ ছাইয়া থাকিলেও মেঘের আড়ালের দশমীর চাঁদের জ্যোৎস্নার আভায় ধরিত্রীর বক্ষ অস্পষ্ট উজ্জ্বল। সে অস্পষ্টতায় দেখা বেশ যায়, কিন্তু ভাল চেনা যায় না। কমল সন্তর্পণে পথ চলিয়াছিল। শীর্ণ পথ লতার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া কত দিকে শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে।

অল্প অল্প বাতাস বহিতেছিল। শীত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কমল কাপড়খানাকেই বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইল। হাসিও আসিল তাহার। কাহু শুনিলে তাহাকে নিশ্চয় রাই-উন্মাদিনী বলিয়া ঠাট্টা করিবে। আর পাগল হইতে বাকিই বা রহিয়াছে কোথায়? কিন্তু পাগল হইয়াও তো আকাশে ফুল ফোটানো গেল না! কমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এই শেষ। ইহার পর আর সে আকাশে ফুল ফুটাইবার কল্পনা করিবে না। কমল একবার দাঁড়াইল। চারিদিক বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া মনে মনে কথা কহিতে কহিতে আবার চলিল। চারিদিকের গ্রামের বনশোভা ঘষা কালো ছবির মত দেখা যাইতেছিল। মাথার উপরে কাটা মেঘের মধ্য দিয়া আলো-আঁধারির খেলা খেলিতে খেলিতে চাঁদও চলিয়াছিল

এই একাকিনী যাত্রিণীর সঙ্গে।

কিন্তু পথ যে ফুরায় না! পথ ভুল হইল না তো? চারিদিকেই তো পথ!

কমল থমকিয়া দাঁড়াইল। আকাশে চাহিয়া দেখিল, চাঁদ প্রায় মাথার উপরে আসিয়াছে। রাত্রি তবে তো অনেক হইয়াছে। চারিপাশে চাহিয়া দেখিল, গ্রাম সেই দূরে, ছবির মত মনে হইতেছে—যত দূরে ছিল তত দূরেই আছে, এতটুকু নিকটবর্তী হয় নাই। মধ্য-প্রান্তরের মধ্যে সে শুধু একা দাঁড়াইয়া। কমলের কান্না পাইল।

এই সীমাহারা প্রান্তরে একা সে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। কেন এমন ভুল সে করিল, কেন সে সন্ধ্যার মুখে একা এই বিস্তীর্ণ মাঠে নামিল? কে তাহাকে পথ দেখাইবে?

দেহ-মন যেন তাহার ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া কমল কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া ছিল কে জানে? হঠাৎ তাহার কানে কোন পথচারীর কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছিল। পথিক যেন গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিয়াছে। কমল উঠিয়া পড়িল। স্বর লক্ষ্য করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া চলিল। অদূরে ছায়ার মত মানুষের কায়া যেন দেখা যাইতেছে।

সে আর্তস্বরে ডাকিল, কে গো?

আবার ডাকিল, ওগো, কে গো তুমি? একটু দাঁড়াও। পথিক দাঁড়াইল।

কমল ডাকিয়া বলিল, একটু দাঁড়াও গো। পথ হারিয়েছি আমি।

পথিক এবার শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? সে সেই দিকেই হাঁটিতে শুরু করিল। আলপথের একটি বাঁকের উপরে দুইজনের মুখোমুখি দেখা হইল। কমল দেখিল, পথিক যুবা। শুধু যুবা নয়, রূপও আছে তাহার।

মেঘের একটা স্তর ছাড়াইয়া আকাশের চাঁদ তখন পরিপূর্ণ ভাবে উঠিয়াছে। অকস্মাৎ পুরুষটি বিস্ময়-ভরা কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল, কমল? চিনি?

কমলও বুঝি চিনিয়াছিল, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঞ্জন—তাহার লক্ষা।

কমলের মনে একটি গোপন আশঙ্কা জাগিয়াছিল। একবার মনে হইল, এ সেই। তাহার শ্যামচাঁদ, রঞ্জনের রূপ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন অনেক গল্প সে শুনিয়াছে। যেখানে যে শ্যাম-বিগ্রহের দরবারে সে চলিয়াছে, সেই শ্যামই তো জয়দেব গোস্বামীর রূপ ধরিয়া পদ্মা-বতীকে ছলনা করিয়া কবির অসমাপ্ত গান সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। স্থিরদৃষ্টিতে সে রঞ্জনের দিকে চাহিয়া রহিল।

রঞ্জন আবার ডাকিল, কমল! রাইকমল!

সে তাহার হাত ধরিয়া ডাকিল এবার। রাইকমলের চেতনা ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পর আপনাকে সংযত করিয়া বুঝিল, সত্যসত্যই এ রঞ্জন। অস্পষ্ট ছায়ালোকের মধ্যে ক্ষেতের বুকে তাহার দেহের দীর্ঘ ছায়াখানি বাঁকাভাবে পড়িয়া আছে। দেবতার ছায়া পড়ে না।

রঞ্জন—এ সেই রঞ্জন! দেবতা নয়, মানুষ!

আশ্চর্য! তবুও তাহার বুক বিপুল আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

রঞ্জনই আবার কথা বলিল, তুমি এখানে এত রাত্রে কেমন করে এলে কমল?

কমল তখনও তাহাকে দেখিতেছিল। রঞ্জনের বৈষ্ণবের বেশ। তাহার মনে পড়িল, রঞ্জন পরীকে লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। রঞ্জনের প্রশ্নে সে সজাগ হইয়া উঠিল। বলিল, জয়দেব যাব। কিন্তু তুমি—কি বলব তোমাকে, কি নাম নিয়েছ? তুমি কোথা যাবে?

রঞ্জন বৈষ্ণবের মতই মৃদু হাসিয়া বলিল, নাম এখন আমার রাইদাস মহান্ত।

কমল অকারণে লজ্জা পাইল। রঞ্জন বলিল, আমিও জয়দেব যাব। আমার সঙ্গেই এস, কি বল?

কমল কহিল, চল।

কমলের মনের মধ্যে কত প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া মরিতেছিল, কিন্তু কথা যেন জিভে জড়াইয়া যাইতেছে। পথ চলিতে চলিতে রঞ্জন আবার বলিল, রসিকদাস চলে গেল?

কমল উত্তর দিল না। রঞ্জন বলিল, আমি তোমাদের খবর সবই জানি। বাউলের যে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হয়েছে, এও ভাল। তারপর দুজনেই নীরব। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিম আকাশে অস্ত যাইতেছিল। মেঘের ছায়া ঘন হইয়া কায়া গ্রহণ করিতেছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে চারিদিক। কমল মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, পরী ভাল আছে?

রঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শেষ-জীবনে বড় কষ্টই সে দিলে আমায়—নিজেও পেলে; রোগের যন্ত্রণায় দিনরাত্রি চীৎকার! আর সে কী ভয়ঙ্কর মূর্তি—অস্থিকঙ্কালসার! উঃ! মনে করতেও শরীর আমার শিউরে ওঠে!

সমবেদনায় কমলও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, আহা! পরী মরিয়া গিয়াছে!

আক্ষেপ করিয়া রঞ্জন বলিল, গুরু পেয়েছিলাম ভাল। ভাল আখড়া, দেবসেবা, কিছু দেবোত্তর—সবই তিনি আমায় দিয়ে গেছেন। দিনও কিছুদিন মন্দ কাটে নাই। কিন্তু তারপর এই অশান্তি। একদিকে দেবতার সেবা, একদিকে মানুষের সেবা…এ কি চিনি, শীতে যে কাঁপছ তুমি! গায়ে কাপড় দাও।

কমল বলিল, থাক।

না না, এ ঠাণ্ডায় কঠিন ব্যারাম হতে পারে। গায়ে কাপড় দাও।

এবার বাধ্য হইয়া কমলকে জানাইতে হইল, সে গায়ের কাপড় আনিতে ভুলিয়াছে।

রঞ্জন বলিল, তাই তো! তা হলে এক কাজ কর, আমার গায়ের কাপড়খানা—

কমল প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না।

পথ চলিতে চলিতে রঞ্জন বলিল, ভাল মনে পড়েছে। দাঁড়াও, আমার কাছে যে আরও দুখানা নতুন গরম কাপড় রয়েছে।

সে আপনার পোঁটলা খুলিয়া দুইখানি গায়ের কাপড় বাহির করিল—একখানি গাঢ় নীল,

অপরখানি হলুদ রঙের। নীল রঙের কাপড়খানি সে কমলের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, না নিলে আমার বড় দুঃখ হবে চিনি।

কমল 'না' বলিতে পারিল না। নীল গায়ের কাপড়খানি তাহাকে মানাইলও বড় ভাল। রঞ্জন ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, আমার দেওয়া মিছে হয় নাই রাইকমল। প্রতিবার আমি জয়দেবে আসি, আর রাধাগোবিন্দকে পীতবস্ত্র ভেট দিই।

তাঁর গায়ের কাপড়ের রঙ হলুদ, রাধার গৌর অঙ্গে নীল রঙই মানায় ভাল।

কমল দারুণ লজ্জায় মৃদুস্বরে বলিল, ছিঃ, তুমি করলে কি!

রঞ্জন বলিল, ঠিক করেছি। রাধারানীই নিয়েছেন রাইকমল।

পরদিন প্রভাতে কমল অজয়ে স্নান করিয়া মন্দিরে গেল। মনে হইল, বিগ্রহ যেন হাসিতেছে। চারিদিকে বাউল বৈষ্ণবে গান ধরিয়াছে। সেও মন্দিরা বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে
দেখা না হইত পরান গেলে।

তাহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে, সঙ্গীতের শিল্পচাতুর্যে মুগ্ধ শ্রোতার দল ভিড় জমাইয়া ফেলিয়াছিল। গান শেষ হইলে পূজারী আসিয়া একগাছি প্রসাদী মালা দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, ভক্তি তোমার অচলা হোক।

প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সে জল খাইবার জন্য যাইতেছিল অজয়ের ঘাটে। মন্দিরসীমার বহির্দ্বারে রঞ্জন দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, কি প্রসাদ পেলে, আমায় ভাগ দাও কমল।

কমল পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, প্রসাদ পেয়েছি—শ্যামচাঁদের আশীর্বাদী মালা।

রঞ্জন বলিয়া উঠিল, তাই দাও আমায়।

কমল এ কথার উত্তর দিল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল। রঞ্জন বলিল, রাধারানীর কি দয়া আমার ওপর হবে না কমল?

কমল বলিল, তাই নাও। তারপর স্বর নামাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া বলিল, অনেক ভেবে দেখলাম—বাউল বল, দেবতা বল, সবার ভেতর দিয়ে তোমাকেই চেয়ে এসেছি এতদিন।

এগারো

জয়দেবধামের মন্দিরপ্রাঙ্গণে রঞ্জনকে বরণ করিয়া সেখান হইতেই কমল তাহার অনুগামিনী হইল। ঘরের কথা মনে হইল না। কানুর কথা মনে হইলেও কানু যেন অনেক ছোট হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, ইহার পর ননদিনীকে একটা সংবাদ পাঠাইয়া দিলেই হইবে, কিংবা তাহারা দুইজনে গিয়া একেবারে তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিবে। পোড়ারমুখী ননদিনী ছুটিয়া আসিয়া অবাক হইয়া যাইবে।

কল্পনার জাল বুনিতে বুনিতে রঞ্জনের সঙ্গে তাহার আখড়ায় যখন গিয়া পৌঁছিল, বেলা তখন যায়, গোধূলির আলো ঝিকমিকি করিতেছে।

মনের-মধ্যে উল্লাসের তৃপ্তির আর পরিসীমা ছিল না তাহার। কিন্তু সে উল্লাস বাহিরে প্রকাশ করিবার যেন উপায় ছিল না। রঞ্জনকে সম্ভাষণ করিবার যোগ্য সম্বোধন সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার লক্ষা—কিন্তু ছিঃ, মহান্ত বলিতেও যে লজ্জা হয়, মনও উঠে না। মনে মনে বিচার করিয়া 'লক্ষা'র চেয়ে 'মহান্ত' সম্বোধন কিছুতে সে প্রিয়তর বা মধুরতর মনে করিতে পারিল না।

রঞ্জন উল্লসিত হইয়াছিল। কপোতীকে বেড়িয়া কপোত যেমন অনর্গল গুঞ্জন করিয়া ফেরে, তেমনই ভাবে সে কখনও কমলের আগে, কখনও পিছনে পথ চলিতে চলিতে অনর্গল কথা কহিয়া চলিয়াছিল।

গ্রামে ঢুকিবার মুখে রঞ্জন বলিল, আজ সন্ধ্যেতে কিন্তু আমার ঠাকুরকে গান শোনাতে হবে কমল।

কমল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। মনে মনে স্থিরও করিয়া রাখিল, কোন্ গান সে গাহিবে। গানের কলিগুলি মনের মধ্যে তাহার এখনই গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখচন্দা।

আখড়ার নিকটে আসিয়া আগড় খুলিয়া রঞ্জন বলিল, এস, এই আমার আখড়া।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কমল চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। আখড়াটি সুন্দর। শুধু সুন্দর নয়, ভিক্ষুকের ভবনের মধ্যেও সচ্ছল সমৃদ্ধির পরিচয় চারিদিকেই সুপরিস্ফুট। একদিকে জাফরি-বোনা বাঁশের বেড়ার মধ্যে গাঁদাফুলের গাছ। গাছগুলির সর্বাঙ্গ ভরিয়া ভারে ভারে ফুল ফুটিয়া আছে। মাঝে মাঝে কয়টা রাধাপদ্মের গাছে বড় বড় হলদে ফুলের সমারোহ। কয়টা সন্ধ্যামণি গাছে তখন সদ্য সদ্য রাঙাবরণ ফুল ফুটিতেছিল। ওপাশে পাঁচ-ছয়টা আমগাছ মুকুলে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মাঝ আঙিনায় একটা সজিনাগাছের পুষ্পিত শীর্ষগুলি মাটির দিকে নুইয়া পড়িয়া বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে।

সম্মুখেই দাওয়া—উঁচু বাঁধানো-মেঝে মেটে ঘর একখানি। তাহার ঠিক পাশেই ঘরখানির সহিত সমকোণ করিয়া আর একখানি ছোট্ট ঘর। তাহারও বাঁধানো মেঝে। আকারে প্রকারে মনে হয়, এইটিই বিগ্রহ-মন্দির। দুয়ারের চৌকাঠে, সিঁড়িতে আলপনার দাগ অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল।

কমলের অনুমানে ভুল হয় নাই। রঞ্জন গিয়া ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিয়া কহিল, এস, প্রণাম করি।

কমল দেখিল, মন্দিরের মধ্যে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ। রঞ্জন ও কমল পাশাপাশি বসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

মহান্ত!

পিছনে অস্বাভাবিক দুর্বল কণ্ঠস্বরে কে যেন বুক ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কমল চমকিয়া উঠিল। প্রণাম তাহার সম্পূর্ণ হইল না, সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, ও-ঘরের দাওয়ার উপরে অদ্ভুত এক নারীমূর্তি প্রাণপণে দুই হাত মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতেছে। কমল শিহরিয়া উঠিল। মানুষের এমন ভয়ঙ্কর কুৎসিত পরিণতি সে আর দেখে নাই। কঙ্কালাবশেষ জীর্ণ দেহ হইতে বুকের কাপড় শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কমল দেখিল, সে-বুকে অবশিষ্টের মধ্যে শিথিল চর্মের আবরণের মধ্যে শুধু কঙ্কালের স্তূপ। সেই স্তূপ ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার জন্য প্রাণ হৃৎপিণ্ডের দ্বারে যেন উন্মত্তভাবে মাথা কুটিতেছে।

রঞ্জন কর্কশকণ্ঠে কহিল, এ কি! আবার তুই বাইরে এসেছিস পরী? পরী!

অজ্ঞাতসারে কমল অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, পরী!

এই পরী! সেই পরীর এই দশা! সেই হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ মেয়ে এমন হইয়া গিয়াছে! সেই পরিপুষ্ট সুডৌল মুখ এমন শীর্ণ দীর্ঘ দেখাইতেছে! মুখে ও চামড়ার নীচে প্রত্যেকটি হাড় দেখা যায়। গালের কোনও অস্তিত্বই নাই যেন, আছে শুধু দুইটা গহ্বর। পরীর চুলের শোভা ছিল কত! কিন্তু এখন সেখানে সাদা মসৃণ চামড়া বীভৎসভাবে চকচক করিতেছে। যে কয়গাছ চুল আছে, তাহার বর্ণ পিঙ্গল, রুগ্ন কর্কশতায় বীভৎস। চর্মসার কঙ্কালের মধ্যে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল শুধু দুইটি চোখ, চোখ দুইটা যেন দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। শীর্ণ দেহের মধ্যে কোথাও স্থান না পাইয়া মানব হৃদয় যেন ওইখানে বাসা গাড়িয়াছে। ক্রোধ, হিংসা, অভিমান, লোভ, মমতা, স্নেহ সব আত্মপ্রকাশ করে ওই দৃষ্টির মধ্য দিয়া।

রঞ্জনের কর্কশ তিরস্কারে পরী কর্ণপাত করিল না। সে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কে মহান্ত?

দৃষ্টি দিয়া পরী যেন কমলের রূপসম্ভারভরা সর্ব অবয়ব গ্রাস করিতেছিল।

রঞ্জন বলিল, চিনতে পারলে না? ও যে কমল। তুমি যে আমায় বলেছিলে পরী—

পরী পাগলের মত দুই হাতে আপনার বুক চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, বলি নাই; বলি নাই আমি। সে আমি মিথ্যে বলেছি। তোমার মন রাখতে, মন বুঝতে বলেছি আমি।

হা-হা করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

কমল থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। রঞ্জন তাহার হাত ধরিয়া ডাকিল, কমল, কমল!

দেবতার ঘরের খুঁটিটা ধরিয়া কমল বলিল, পরী বেঁচে থাকতে তুমি এ কি করলে? আমায় তো তুমি বল নাই! ছি!

রঞ্জন বলিল, পরী মরেছে, সে কথা তো আমি বলি নাই কমল।

সে কথা সত্য কি না যাচাই করিয়া দেখিবার সময় সে নয়। কমল বলিল, ধর ধর, তুমি পরীকে গিয়ে ধর। পড়ে যাবে, পড়ে যাবে হয়তো।

রঞ্জন পরীকে ধরিয়া ডাকিল, পরী, পরী!

তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পরী বলিল, কি করলে গো, এ তুমি কি করলে? দুটো দিন সবুর করতে পারলে না? আমি তো বাঁচব না। দুদিনও হয়তো বাঁচব না। দু দিনের জন্যে আমার বুকে এ তুমি কি শেল হানলে গো?

আবার সে হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রক্তমাংসের মানুষ লইয়া এ কি কুশ্রী কাড়াকাড়ি! কমলের করুণা হইল। ওই মেয়েটির বুকে যে আজ কি বেদনা, কত তাহার পরিমাণ, সে তো নিজে নারী, সে তাহা বোঝে। শুধু তাই নয়, আজ যে তাহাকে কঠোরভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল, তোমায় মরিতে হইবে—একান্ত নিঃস্ব রিক্ত হইয়া কাঙালিনীর মরণ মরিতে হইবে।

কমলের চক্ষে জল দেখা দিল। সে আসিয়া পরীর পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, পরী, আমার ওপর রাগ করলি ভাই?

বেরো—বেরো—দূর হ—দূর হ। চীৎকার করিয়া পরী তাহার কঙ্কালসার দেহে যতখানি শক্তি ছিল প্রয়োগ করিয়া কমলকে লাথি মারিয়া বসিল। অতর্কিত কমল নীচে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। রঞ্জন কিছু করিবার পূর্বেই কমল নিজেই উঠিয়া বসিল।

ও কি, তোমার ভুরু থেকে রক্ত পড়ছে যে! রঞ্জন পরীকে ছাড়িয়া দিয়া কমলের পরিচর্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

পরীর চোখ বাঘিনীর চোখের মত হিংস্র দীপ্তিতে দপদপ করিয়া জ্বলিতেছিল।

সে দৃষ্টি কমল দেখিয়া ছিল। ভ্রূতে বুলানো রক্তমাখা হাতখানি দেখিতে দেখিতে সে বলিল, না না, লাগে নাই আমার। যাও, তুমি পরীকে ধর—ও রোগা মানুষ। আমি নিজেই ধুয়ে ফেলছি।

কমল এপাশ-ওপাশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, একটি চারা আমগাছের তলায় জল ফেলিবার জন্য একটুখানি স্থান বাঁধানো রহিয়াছে। বালতির জল লইয়া সে ভ্রূর রক্ত ধুইতে বসিল। ধুইতে ধুইতে শুনিল, পরী বলিতেছে, না না, এমন করে তুমি চেও না। রাগ করো না। দুটো দিন, দুটো দিন ওকে পর করে রাখ। আদর করো না, কথা করো না। দুটো দিন গো, দু দিন বই আর আমি বাঁচব না। সত্যি বলছি।

সন্ধ্যায় দেবতার সম্মুখে নিত্য কীর্তন হয়। রঞ্জন কমলকে বলিল, এস, আমার প্রভুকে

গান শোনাবে এস!

কমল বলিল, না।

রঞ্জন আশ্চর্য হইয়া গেল। বলিল, সে কি? এ এখানকার নিয়ম। আর এরই মধ্যে লোকজন এসেছে সব, তাদের বলেছি আমি।

কমল দৃঢ়স্বরে বলিল, না। পরীর অবস্থাটা ভাব দেখি। আমার গান শুনলে সে হয়তো পাগল হয়ে উঠবে।

রঞ্জন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁ।

কমল আবার বলিল, যাও, তুমি নাম-গান আরম্ভ কর গে, সন্ধ্যে বয়ে যাচ্ছে। আমি বরং যাই, দেখেশুনে পরীর জন্যে একটু সাবু কি বার্লি চড়িয়ে দিই।

রঞ্জন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে কমলের হাত ধরিয়া বলিল, কমল, আগে দেবসেবা পরে মানুষ। এস বলছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কমল বলিল, আমারও এতদিন তাই ছিল। কিন্তু আজ আমি ধর্ম পাল্টেছি। ছাড় আমাকে তুমি।

রঞ্জন হাত ছাড়িয়া দিল। কমল ধীরপদক্ষেপে ওদিকে চলিয়া যাইতেছিল, রঞ্জন অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, মরবেও না, আমারও অশান্তি ঘুচবে না।

কমল ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, দেবতার পায়ে প্রাণ ঢেলেও দেবতার সাড়া পাই নি। দেবতা পাথরের বলে মানুষকে ধরেছি জড়িয়ে। মানুষের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিও না আর। ছি!

রঞ্জন এতটুকু হইয়া গেল। ঘরের ভিতরে দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে পরী গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল।

রঞ্জন নিজেই খোল লইয়া দেবতার দুয়ারে বসিল।

কীর্তন ভাঙিয়া গেলে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, কমল!

কমল তখন পরীর কাছে বসিয়া ছিল। পরীর সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহার তন্দ্রাতুর বক্ষের ক্রন্দনকম্পিত দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া আসিতেছিল।

কমল সন্তর্পণে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন বলিল, নাও।

সে একডালা ফুল আগাইয়া দিল। কমল হাত বাড়াইয়া লইল। কিন্তু জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, ফুলশয্যা—

না।

রঞ্জন আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ভুল করে করেই জীবন চলেছে আমার। যত বড় মানুষ আমি, ভুলের পর ভুল জমা করলে সেও বোধ হয় তত বড়ই হবে। আবারও বোধ হয় ভুল

করলাম আমি।

রঞ্জন কমলের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কমল বলিল, যে মানুষের প্রয়োজন নাই, তার কি কোন দাম নাই তোমার কাছে? একবার পরীর কথা ভাব দেখি।

রঞ্জন বলিয়া উঠিল, তুমি কি পাথর?

আমি? কমল হাসিল। তারপর আবার বলিল, পাথর হলে পাথরেই মন উঠত লক্ষ্মী, এ কথা আর একবার বলেছি। মানুষ বলেই মানুষের জন্যে পাগল হয়েছি, মানুষের জন্যে মমতা না করে যে পারি না।

আচ্ছা, থাক। রঞ্জন ঈষৎ উষ্মাভরেই সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল।

মহান্ত! ঘরের ভিতর হইতে পরী ডাকিতেছিল।

কমল তাড়াতাড়ি পরীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনায় পরী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, না না, সরে যা তুই বলছি।

সভয়ে কমল বাহিরে আসিয়া রঞ্জনকে বলিল, যাও, ডাকছে তোমায়। একান্ত অনিচ্ছার সহিত রঞ্জন পরীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। পরী বলিল, আজ তোমার ফুলের বাসর হবে, নয়? তোলা বিছানার মধ্যে তোশক বালিশ—

বাধা দিয়া রঞ্জন বলিল, থাক থাক, ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না পরী।

না। বিছানা নামিয়ে নাও গে। কিন্তু আমি শখ করে যা যা করিয়েছি, সেগুলো নিও না। সে আমার, সে আমি সইতে পারব না। প্রাণ থাকতে সে দেখতে আমি পারব না।

উত্তরে রঞ্জন অতি কটু একটা জবাব দিতে গেল। কিন্তু পিছনে লঘু পদশব্দে কমলের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সে তাহা পারিল না। শুধু পরীর মাথায় হাত বুলাইতে চেষ্টা করিল। পরী হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, থাক।

রঞ্জনও যেন বাঁচিল, সে চলিয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে রঞ্জন তামাক খাইতেছিল। কমল আসিয়া কহিল, তোমার বিছানা পরীর ঘরে।

রঞ্জন চমকিয়া উঠিল। কমল বলিল, 'না' বলতে পাবে না। আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।

রঞ্জন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না—বার বার অস্বীকার করিয়া বলিল, না না। রোগীর গায়ের গন্ধে আমার ঘুম হবে না।

শান্তভাবে কমল প্রত্যুত্তরে বলিল, তা হলে আমারও যদি কোন দিন ওই পরীর মত দশা হয়, তবে তো তুমি এমনই করেই আমাকে জঞ্জালের মত ঘেন্না করবে, আস্তাকুড়ে ফেলে দিতে চাইবে!

রঞ্জন চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে হাসিমুখেই কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার জয় হোক কমল।

কমল হেঁট হইয়া রঞ্জনের পায়ের ধুলা লইল। রঞ্জন মুহূর্তে অবনত কমলকে বুকে টানিয়া তুলিয়া লইল, চুম্বনে চুম্বনে অধর ভরিয়া দিল, সবল পেষণে যেন পিষ্ট করিয়া দিতে চাহিল। কমলের চোখ দুটিও আবেশে মুদিয়া আসিতেছিল। এ আনন্দ তাহার অনাস্বাদিতপূর্ব। রসিকদাসও তাহাকে এমনই আদরে বুকে লইয়াছে, কিন্তু সে যেন তাহাতে পাথর হইয়া যাইত। ঠিক এই সময়ে ভিতরে পরীর সাড়া পাওয়া গেল, সে বোধ হয় আবার কাঁদিতেছে। মুহূর্তে আত্মস্থ হইয়া সে বলিল, ছাড়।

না।

কমল বলিল, ছাড়। যে মরতে বসেছে তাকে আর ঠকিও না।

রঞ্জনের বাহুবেষ্টনী শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, কমল আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, যাও, শোও গে যাও। বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, এপাশের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে পরীর ঘরখানি পরিষ্কার করিবার জন্য সে সেই ঘরে ঢুকিল। ঝাঁট দিতে দিতে পরীর দিকে চাহিতেই সে দেখিল, পরী তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। কমলের ভয় হইল, পরী হয়তো আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিবে।

কমলি! পরী তাহাকে ডাকিল।

পরী আবার ডাকিল, শোন, আমার কাছে আয় ভাই কমলি। ভয় নাই।

কমল কাছে আসিয়া বসিল। পরীর জীর্ণদেহে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, ভয় কি ভাই!

পরী সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, রূপ একদিন আমারও ছিল।

কমল চমকাইয়া উঠিল। করুণ হাসি হাসিয়া পরী বলিল, তোকে আশীর্বাদ করব বলেই ডাকলাম ভাই। আজ ছ মাস বিছানা পেতেছি, ছ মাস এখা পড়ে পড়ে কাঁদছি। বড় সাধ ছিল ভাই, সে সাধ তুই মেটালি। আশীর্বাদ করি—

আর সে কথা বলিতে পারিল না, অকস্মাৎ অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, পরী পরী!

বালিশে মুখ গুঁজিয়া পরী শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, না না, তুই যা, তুই যা। আমার সামনে থেকে তুই যা।

ওই দিন সন্ধ্যাতেই পরী দেহ রাখিল। যেন ওই আকাঙ্ক্ষাটুকুই তাহার জীবনকে জীর্ণ পঞ্জরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। বহুদিনের রোগী প্রায় সজ্ঞানেই দেহত্যাগ করে। পরীরও তাহাই হইয়াছিল। বৈকালের দিকে শ্বাস উপস্থিত হইতেই রঞ্জন বলিল, পরী, চল, তোমাকে প্রভুর সামনে নিয়ে যাই, প্রভুকে একবার দেখ।

পরী হাত নাড়িয়া বলিল, না।

জীবনের জ্বালা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের বোধ হয় যায় না। কষ্টের পরিসীমা ছিল না।

তবুও পরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেবতার সেবা অনেক করেছি, কিন্তু দেবতা আমায় কি দিলে ? দেবতা নয় ; মহান্ত, তুমিও না। তোমার মুখ আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না। সরে যাও তুমি। আমি একা থাকব।

তারপর একটি সকরুণ হাসি হাসিয়া বলিল, আমি তো আজ একাই।

আপন জীবনের সমস্ত তিক্ত রসটুকু হতভাগী নিঃশেষে পান করিয়া তবে গেল।

বারো

তারপর ?

তারপর একটি অবিচ্ছিন্ন মিলনের গাঢ় আনন্দ। এই আনন্দের মধ্য দিয়া দিবারাত্রিগুলি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাসের মত বহিয়া যায়। মিলনের আবেশে চোখের নিমিখ নামিয়া আসে, সে নিমিখ খুলিতে খুলিতে রাত্রি আসে। আবার রাত্রি কাটিয়া প্রভাত হয়। পাখির কলরব জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে যাহার ঘুম ভাঙে, সে অপরের কানের কাছে মৃদুস্বরে গায়—

রাই জাগো—রাই জাগো
ওই শুক-সারী বোলে।

ঘুম ভাঙে। প্রভাত হইতে আবার আরম্ভ হয়—হাসি, গান, আনন্দ, অভিমান, অনুনয়, অভিনয়, অশ্রু। আবার মিলন হয়। আবার হাসি, আবার আনন্দ। মোট কথা, দুইটি তরুণ নর-নারীর জীবনের যা লীলা—তাই। পুরাতন ধারা জীবনে ঘুরিয়া-ফিরিয়া অল্প একটু বেশ পরিবর্তন করিয়া দেখা দেয়। নর-নারী দুইটি কিন্তু ছদ্মবেশ ধরিতে পারে না। তাহারা পায় তাহার মধ্যে নূতনের সন্ধান।

কিন্তু তবু কমল মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠে। মনে হয়, পরী যেন ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া কোন্ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

সেদিন দোল। বসন্ত-পূর্ণিমা শেষ-ফাল্গুনে আসিয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণা বাতাসের গতি ঈষৎ প্রবল। ঘরে দোলনা খাটানো হইয়াছে। দেবতার পায়ে আবীর-কুমকুম নিবেদন করিয়া দিয়া থালাখানি হাতে রঞ্জন দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। কমল বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। কৌতুকভরে রঞ্জন একটা কুমকুম ছুঁড়িয়া কমলকে মারিল। রাঙা মুখে কমলও উঠিয়া একটা কুমকুম তুলিয়া লইল।

কিন্তু সে কুমকুম তাহার হাতেই থাকিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া বিবর্ণ মুখে সে বলিয়া উঠিল, কে কাঁদছে গো ?

সবিস্ময়ে রঞ্জন প্রশ্ন করিল, কই, কোথা ?

ওই ঘরে !

ওই ঘরটায় পরী মরিয়াছিল। সত্যই একটা অস্ফুট কান্নার মত শব্দ যেন দীর্ঘায়িত বিলাপের ছন্দে বাজিতেছিল।

সাহস করিয়া রঞ্জন ঘরে ঢুকিল। বাতাসের তাড়নায় একটা খোলা জানালা ধীরে ধীরে দুলিতেছিল—তাহারই মুরিচা-ধরা কব্জার শব্দ সেটা।

রঞ্জন হাসিয়া উঠিল।—এত ভয় তোমার!

কমল হাসিতে চেষ্টা করিল।

এমনই করিয়া দিন কাটে। দিনে দিনে মাস—মাসে মাসে বৎসর চলিয়া যায়। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছিল। পাঁচ বৎসর পর বোধ হয়। কমল হঠাৎ একদা অনুভব করিল, দিনগুলি যেন বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। দিনগুলির ধারারও কেমন যেন পরিবর্তন হইয়াছে, তেমন স্বচ্ছন্দ গতিতে আর যায় না—কেমন যেন মন্দগতি। মধ্যে মধ্যে কাটিতে চায় না দিন। রঞ্জন আখড়ার জমি-জমা লইয়া বড় বেশি জড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজের আর অন্ত নাই।

দোলের দিন রঙ-খেলায় সে আর তেমন করিয়া মাতে না। ঝুলনের দিন বকুলশাখায় ঝুলনা আর ঝুলানো হয় না। রঞ্জন গাছে উঠিতে পারে না, বলে, এ বয়সে হাত-পা ভাঙলে বুড়ো হাড় জোড়া লাগবে না। রাসের দিন দেবতার রাস সারিয়া রঞ্জন ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম আসে না কমলের। মধ্যে মধ্যে সেই পুরানো ভয় হঠাৎ তাহাকে চাপিয়া ধরে। মনে হয়, ও-ঘরের মধ্যে পরী যেন পদচারণা করিয়া ফিরিতেছে।

কমল ক্রমে হাঁপাইয়া উঠিল।

সেদিন রঞ্জন খাইতে বসিলে সে বলিল, দেখ, চল, কিছুদিন তীর্থ ঘুরে আসি।

রঞ্জন বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। কমল বলিল, আমার ভাল লাগছে না বাপু, চল, একবার ব্রজধাম ঘুরে আসি।

শ্লেষের হাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল, কত খরচ জান? বোষ্টম-ভিখারীর ঝুলিতে তা নাই।

কমল ম্লান হইয়া গেল, বলিল, তোমার তো টাকা না থাকার নয়!

রঞ্জন পরিষ্কার বলিল, আমার একটি পয়সাও নাই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কমল আবার বলিল, বেশ তো, কাজ কি টাকাকড়িতে! চল, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে বেরিয়ে পড়ি।

রূঢ়কণ্ঠে রঞ্জন বলিল, আমার বাবা এলেও তা পারবে না।

কমল আঘাত পাইল, অভিমানও হইল। কিন্তু কেন কে জানে সে অভিমান প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

ইহার পর কমল যেন সজাগ হইয়া উঠিল। মহান্তের সেবাযত্নের পরিপাট্যে গভীরভাবে সে আত্মনিয়োগ করিল। রঞ্জনও একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু কমলের মনে অতৃপ্তি ঘুরিয়া মরে। তাহার মনে হয়, সেদিন আর নাই। সে ব্যাকুল অন্তরে সেই হারানো দিন ফিরিয়া পাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল।

দোলের দিন আবার সে রঙের খেলা খেলিতে চায়, রাসের রাত্রে সারা রাত্রি জাগিয়া যে গান করিতে চায়, জীবনে সে লীলা চায়।

শ্রাবণ মাস, সম্মুখেই ঝুলন-পূর্ণিমা। শুক্লপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর একটি রাত্রি। রঞ্জন বাড়িতে ছিল না, কমল দাওয়ার উপর বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। ওপাশে শুইয়াছিল বাউড়ী-বুড়ী। মহান্ত না থাকিলে ওই বুড়ী বাড়িতে শোয়।

মেঘাবরিত চাঁদের জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ প্রভার মধ্যে অবিরাম ধারা-পাতের ঝরঝর ধারা কুহেলীর মত দেখা যাইতেছিল। রাত্রিটি কমলের বড় মধুর লাগিল। আকাশ নীচে নামিয়া শ্যামা ধরণীকে আলিঙ্গন করিতে চায়, কিন্তু বাতাস নিয়তির মত পথ রোধ করিয়া হা-হা করিয়া হাসে, তাই আকাশ যেন কাঁদিয়া সারা।

কমল মনে মনে আগামী দিনের জন্য এমনই একটি রাত্রি বার বার কামনা করিল। একটি সুন্দর সঙ্কল্প করিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। দেব মন্দিরে ঝুলনা ঝুলানো হইয়াছে, যুগল বিগ্রহ ঝুলনে চাপিয়াছেন। কমল সঙ্কল্প করিল, সেকালের মতন শয়ন-মন্দিরে তাহারাও ঝুলনা বাঁধিয়া ঝুলনে দোল খাইবে।

কমল কল্পনা করিতে করিতে বিভোর হইয়া উঠিল।

সবুজ রঙের ছাপানো সেই কাপড়খানি সে পরিবে। চুল এলানো থাকাই ভাল। নাকে রসকলি, কপালে চন্দন। মহান্তের গলায় দিবে গন্ধরাজের মালা। নিজের জন্য বেলফুলের মালাই তাহার পছন্দ হইল।

কিন্তু এমন জ্যোৎস্নাস্বচ্ছ বর্ষণমুখর রাত্রিটি কি কাল হইবে? কমলের আক্ষেপ হইতেছিল। আজ যদি সে থাকিত! শুধু আক্ষেপ নয়, সে তাহার লজ্জার জন্য একটি সলজ্জ বেদনাময় অভাব অনুভব করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই, যেন নিজের কাছে নিজের লজ্জা বোধ হইতেছিল তাহার।

কখন বাউড়ী-বুড়ীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল, ঘরদোরে আলো কই গো? সন্ধ্যেপিদিম জ্বাল নাই নাকি?

কমল চমকিয়া উঠিল। তাই তো, মহাপ্রভুর ঘরে—যুগল বিগ্রহের ঘরেও যে আলো দেওয়া হয় নাই, কীর্তন গাওয়া হয় নাই! তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া সে প্রদীপ জ্বালিতে বসিল।

প্রদীপ দেওয়া শেষ করিয়া সে নিয়মমত খঞ্জনী লইয়া কীর্তন গাহিতে বসিল। গান ধরিল—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—

অকস্মাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে করিয়াছে কি? যুগল বিগ্রহ যখন পূর্ণ মিলনানন্দে ঝুলনে চাপিয়াছেন, তখন সে এ কি গান গাহিল? মনে মনে বার বার মার্জনা চাহিয়া সে ঝুলনের গান ধরিল।

পরদিন প্রভাতেও মেঘ কাটিল না। কমল সজল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া পুলকিত হইয়া

উঠিল। কল্পনা করিল, আজিকার রাত্রিটি গতরাত্রির চেয়েও সুন্দর হইবে। আজ চাঁদ এক কলা বাড়িবে যে। ঝুলনের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাথালি মাথায় দিয়া সে বড় পিঁড়েখানি ঘরে আনিয়া তুলিল। ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে আলপনা আঁকিতে বসিল। আলপনায় পাশাপাশি দুইটি পদ্ম সে আঁকিল। তারপর সে দোকানে বাহির হইয়া গেল। যখন ফিরিল, তখন মহান্ত আসিয়াছে। মহান্তকে দেখিয়া কমল কাপড়ের আঁচলে কি যেন লুকাইল। বেশ দেখাইয়াই লুকাইল। কিন্তু রঞ্জন সেদিকে লক্ষ্যই করিল না, সে আপন মনেই বলিতেছিল, জ্বালাতন রে বাপু, সারা দিনরাত টিপটিপ ঝিপঝিপ! হবে তো তাই ভাল করে হয়ে ছেড়ে দে রে বাপু!

কমল বলিল, হোক না বাপু, তোমারই বা কি, আমারই বা কি? কাল কেমন রাতটি হয়েছিল বল দেখি?

রঞ্জন বলিল, হুঁ, তা হয়েছিল। কিন্তু জলে-কাদায় যে পায়ে হাজা ধরে গেল। তোমার কি বল, তোমার জলই ভাল, তুমি যে কমল।

কমল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এইটুকু আদরেই সে গলিয়া গেল। আঁচলের ভিতর হইতে সে এবার লুকানো জিনিসটি বাহির করিল। বেশ মোটা এক আঁটি দড়ি বাহির করিয়া রঞ্জনের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, দেখ তো!

রঞ্জন একনজর দৃষ্টি বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি, হবে কি?

কমল তরুণীর মত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, বাঃ রে, আমি বললাম, দেখ তো জিনিসটা কেমন; আর উনি জিজ্ঞেস করছেন, হবে কি? আগে আমার কথার উত্তর দাও!

একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া রঞ্জন বলিল, দড়ি শক্ত বটে। এখন হবে কি শুনি?

সকৌতুকে কমল বলিল, বল দেখি, কি হবে! দেখি তুমি কেমন!

রঞ্জন যেন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, আরে, তাই তো পাঁচবার জিজ্ঞাসা করছি।

কমল বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, বলছি। কিন্তু আগে আর একটা কথার জবাব দাও দেখি, দুজন মানুষের ভার সইবে এতে?

কেন, গলায় দিয়ে ঝুলতে হবে নাকি? তা সইবে।

কমলের মুখ এক মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। এ কথাটাকে সে কিছুতেই রহস্য বলিয়া মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইতে পারিল না। তবুও সে চেষ্টা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আজ ঝুলন হবে আমাদের। শোবার ঘরে ঝুলনা টাঙাব।

কমলের মুখের দিকে অল্পক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বলি বয়স বাড়ছে, না কমছে?

রুদ্ধশ্বাসে কমল বলিল, কেন?

রঞ্জনের হাসির ধারায় কমল ভয় পাইয়া গিয়াছিল। রঞ্জন এবার অতি দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল, নইলে এখনও তোমার ঝুলনের সাধ হয়! আয়নাতে কি মুখ দেখা যায় না, না নিজের রূপ খুব ভালই লাগে?

কমলের বুকে যেন ব্যথা ধরিয়া উঠিল। দড়ির গোছাটা হাত হইতে আপনি খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে দ্রুতপদে সেখান হইতে পলাইয়া আসিল। তাহার বুকের মধ্যে তখন কান্নার সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। সে গিয়া ঢুকিল পরী যে ঘরটায় মরিয়াছিল সেই ঘরে। মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কমল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার পরীর কথা মনে পড়িয়া গেল। মৃত্যুর দিন সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, রূপ একদিন আমারও ছিল। সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল, এ পরীর বেদনার বিলাপ। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হইল, পরী তাহাকে অভিশাপই দিয়া গিয়াছে।

শুনছ?

ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রঞ্জন তাহাকে ডাকিল। অশ্রুর লজ্জায় কমল মুখ ফিরাইতে পারিল না, সে নীরবেই পড়িয়া রহিল।

রঞ্জন বলিল, আমাকে আজ এখুনি আবার যেতে হবে। দিনতিনেক হবে, বুঝলে?

তারপর সব নীরব। রঞ্জন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে নাই, তখনই চলিয়া গিয়াছে। কমল উদাস নেত্রে খোলা জানালার দিকে চাহিয়া পড়িয়া ছিল। মনের মধ্যে সে শুধু ভাবিতেছিল, সেই লক্ষা! কেন এত অবহেলা তাহার? হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল, রঞ্জনের কথাগুলা তাহার মনে পড়িয়া গেল, "আয়নায় কি মুখ দেখ না?" সে ব্যস্ত হইয়া কুলুঙ্গি হইতে আয়নাখানা পাড়িয়া আপনার মুখের সামনে ধরিল। প্রতিবিম্বের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

বাস্তব আজ তাহার চোখে পড়িল। কালের সঙ্গে সঙ্গে তিলে তিলে তাহার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা চোখে পড়ে নাই এতদিন, আজ পড়িল—সত্যই তো, কোথায় সেই প্রাণ-মাতানো রূপ তাহার? সেই চাঁপার কলির মত রঙ এখনও আছে, কিন্তু সে চিক্কণতা তো আর নাই। চাঁদের ফালির মত সেই কপালখানি আকারে চাঁদের ফালির মতই আছে, কিন্তু তাহাতে যেন গ্রহণ লাগিয়াছে, সে মসৃণ স্বচ্ছতা আর তাহাতে নাই। গালে সে টোলটি এখনও পড়ে, কিন্তু তাহার আশেপাশে সূক্ষ্ম হইলেও সারি দিয়া রেখা পড়িতে শুরু করিয়াছে—এক দুই তিন। নাকের ডগায় কালো মেচেতার রেশ দেখা দিয়াছে। সেই সে, সেই সব, কিন্তু সে নবীন লাবণ্য তাহার আর নাই। এই দীর্ঘ দিনে পৃথিবীর ধূলামাটি তাহাকে ম্লান করিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে আয়নাটা বন্ধ করিয়া দিল। আবার তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। রঞ্জনের অবহেলার জন্য নয়, তাহার রূপের জন্য কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কয় ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া পড়িয়া মাটির বুকে মিশিয়া গেল।

থাকিতে থাকিতে বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়িয়া গেল আর একজনের কথা। বৃদ্ধ রসিকদাস—বগ-বাবাজীর মুখ বহুদিন পরে তাহার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। সেই কৌতুকোজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখ। কমলের মনে হইল মহান্ত ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত অন্তর তাহার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল না না না। সে তাহাকে বলিত, কৃষ্ণ-

পূজার কমল। সে-ই তাহার নাম দিয়াছে—রাইকমল। কমল শুকায়, কিন্তু রাইকমল, সে তো কখনও শুকায় না! আবার সে শিহরিয়া উঠিল, মনে পড়িল পরীকে। পরী ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে যেন—সেই জীর্ণ শীর্ণ বীভৎস মরণাতুর মুখ।

তেরো

ইহার কয়দিন পর আকাশ তখনও মেঘলা হইয়া আছে। অপরাহ্ণের দিকে কমল বিগ্রহ-মন্দিরের দাওয়ার উপর বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। রঞ্জন সেই গিয়াছে, আজও ফেরে নাই। সে যেন কমলকে লুকাইয়া একটা কিছু করিতেছে। কমলও কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নাই। মনের মধ্যে একটি অভিমানাহত উদাসীনতা তাহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। সে আপনার মনে মৃদুস্বরে গাহিতেছে—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

বাহিরের আগড় ঠেলিয়া কে যেন প্রবেশ করিল। কমল চাহিয়া দেখিল, সে রঞ্জন। রঞ্জনের বেশে আজ পরম পারিপাট্য ছিল। কপালে চন্দনের তিলক, গলায় ফুলের মালা, পরনে রেশমী বহির্বাস, গলায় উত্তরীয়। কমল মুগ্ধ হইয়া গেল। রঞ্জন কিশোর সাজিয়া তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল। সে সব ভুলিয়া গেল এক মুহূর্তে। সব ভুলিয়া গিয়া সে হাতের মালাগাছি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হউক দেবতার নামে গাঁথা মালা! সেও আজ কিশোরী সাজিবে!

হাসিমুখে কাছে আসিয়া সে বলিল, এ কি, এ যে নটবর বেশ! দুই হাত তুলিয়া রঞ্জনের গলায় মালা দিতে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিশ্চল হইয়া গেল সে, আর্তস্বরে প্রশ্ন করিল, ও কে মহান্ত?

মহান্তের পিছনে ঠিক দরজার মুখে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

মেয়েটি শ্যামাঙ্গী, কিন্তু সর্বাঙ্গব্যাপী একটি চটুলতায় সে মনোহারিণী। তাহার সে চটুল রূপ ষোলকলায় পূর্ণ বিকশিত। রঞ্জনকে উত্তর দিতে হইল না। মেয়েটি বাড়ি ঢুকিল। অদ্ভুত চপলা মেয়ে, দেখিলেই তাহার প্রকৃতি বুঝা যায়; সর্বাঙ্গে একটি হিল্লোল তুলিয়া হাসিতে হাসিতে সে-ই বলিল, আমি নতুন সেবাদাসী গো!

তারপর একটু আগাইয়া আসিয়া সে আবার বলিল, তুমিই বুঝি কমল বোষ্টমী রাই-কমল? তবে যে শুনেছিলাম গাইয়ে-বাজিয়ে বলিয়ে-কইয়ে—রূপে মরি-মরি! ও হরি তুমি এই!

ঠোঁটের আগায় সে একটা পিচ কাটিয়া দিল। ধীরে ধীরে কমল মুখ তুলিল, কিছুক্ষণ রঞ্জনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মুখেও তাহার ফুটিয়া উঠিল বিচিত্র এক হাসি। রঞ্জন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। মেয়েটিও কেমন যেন

অভিভূত হইয়া গেল সে-দৃষ্টির সম্মুখে। কমল এইবার কথা বলিল, হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আমিই রাইকমল। এখন এস, মহান্তকে পাশে নিয়ে দাঁড়াও দেখি—বরণ করে ঘরে তুলি। দাঁড়াও, পিঁড়িখানা নিয়ে আসি।

ঝুলনের জন্য আলপনা-আঁকা পিঁড়িখানা আনিয়া সে পাতিয়া দিল। সেদিনের সে আলপনা আজও ঝকঝক করিতেছে, দুইজনের জন্য দুই পাশে দুইটি পদ্ম। দেবমন্দির হইতে শঙ্খঘণ্টা বাহির করিয়া আনিল, জল ভরিয়া ঘট পাতিয়া দিল, তারপর বলিল, পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াও।

রঞ্জন বলিল, থাক।

হাসিয়া কমল বলিল, এ যে করণীয় কাজ গো! ছিঃ, উঠে দাঁড়াও, আমি বরণ করি।

সন্ধ্যায় সে নিজের হাতে ফুলশয্যা সাজাইয়া দিল। আপনি শুইতে গেল, পরী যে ঘরে মরিয়াছিল, সেই ঘরে।

পরদিন সকালে উঠিয়া কমল স্নান করিয়া দেবতার ঘরে ঢুকিয়া বসিল, অনেকক্ষণ পর ঘর হইতে বাহির হইয়া রঞ্জন ও নূতন বৈষ্ণবীর বাসর-দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা খোলা, উঁকি মারিয়া দেখিল, রঞ্জন শুইয়া নাই। এদিক-ওদিক সে খুঁজিয়া দেখিল। না, রঞ্জন বাড়িতে নাই। কমল অগত্যা পরীর ঘরেই বসিয়া রহিল। ও-ঘরে তরুণীটি এখনও ঘুমাইতেছে।

কিছুক্ষণ পর রঞ্জন ফিরিল। কমলকে দেখিয়া সে লজ্জিত হইল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি বিপদ, রাখালটা আসে নাই!

সে তাহাকে আড়াল দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। হাসিয়া কমল ডাকিল, লঙ্কা! দীর্ঘকাল পর সে রঞ্জনকে 'লঙ্কা' বলিয়া ডাকিল। এতদিন হয় 'ওগো' বলিয়াছে, অথবা 'মহান্ত'।

রঞ্জন নতমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল হাসিয়া কহিল, এমন লুকিয়ে ফিরছ কেন বল তো?

নতচক্ষেই রঞ্জন বলিল, আমায় মাপ কর কমল।

প্রশান্তকণ্ঠে কমল উত্তর দিল, আর 'কমল' নয়, 'চিনি' বল। বহুকাল পরে তুমি আমার 'লঙ্কা', আমি তোমার 'চিনি'। কিন্তু রাগ কি তোমার উপর করতে পারি লঙ্কা? রাগ আমি করি নাই।

ব্যগ্রভাবে রঞ্জন বলিল, সত্যি কথা বল কমল।

না না, 'কমল' নয়, 'চিনি' বল।

অগত্যা রঞ্জন বলিল, সত্যি কথা বল চিনি।

কমল হাসিমুখে বলিল, রাগ করি নাই, রাগ করি নাই, রাগ করি নাই—তিন সত্যি করলাম, হল তো?

রঞ্জন এবার আদর করিয়া কমলকে বুকে টানিয়া লইতে গেল। কিন্তু কমল বেশ মর্যাদার সহিত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, ছিঃ! তুমি লঙ্কা, আমি চিনি!

তারপর ঘরের ভিতর হইতে একটা পোটলা বাহির করিয়া কাঁধে তুলিয়া লইল, বলিল, এইবার আমায় বিদেয় দাও।

সে কি!

হ্যাঁ, আমি যাই।

তবে তুমি যে বললে, আমি রাগ করি নাই?

না, রাগ করি নাই। তবে—তবে, পরীর কথা মনে পড়ে তোমার—যেদিন আমি প্রথম আসি? আমার এই ভ্রূর পানে তাকিয়ে দেখ, মনে পড়বে।

রঞ্জন নীরবে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল আবার বলিল, আমিও তো সেই পরীর জাত, আমার বুকে তো মেয়ের পরান আছে লক্ষ!

সে সেই আশ্চর্য হাসি হাসিল।

রঞ্জন কমলের হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, না না কমল, এ রাজত্ব তোমারই। ও তোমার দাসী হয়ে থাকবে। তুমি তো জান, বৈষ্ণবের সাধনা—রাধারাণীর কল্পনা—যৌবনরূপ—

বাধা দিয়া কমল বলিল, ওরে বাপ রে! অনেক এগিয়েছ তুমি। তা বটে, যৌবন-রূপ সামনে না থাকলে ধ্যান-ধারণায় বাধা পড়ে, রূপ-রসের উপলব্ধি হয় না, মনে রাধারানী ধরা পড়েন না। ঠিক কথা। একটু হাসিয়া আবার বলিল, তুমি আমার গুরু গো। তোমার সাধন-পথেই তো যাচ্ছি আমি। আমিও তো বৈষ্ণবী, আমারও তো চাই একটি শ্যাম-কিশোর।

রঞ্জন নির্বাক হইয়া গেল। কমল দুয়ারের কাছে গিয়াছে, তখন সে বলিয়া উঠিল, বলি, তারই সন্ধানে চললে বুঝি?

কমল রঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ গো, তারই সন্ধানে চলেছি আমি। তুমি আশীর্বাদ কর।

সে হাসিতে, সে স্বরে ব্যঙ্গ নাই, শ্লেষ নাই, ব্যথা নাই; বিচিত্র সে হাসি—বিচিত্র সে কলস্বর!

কমল পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথ—অজয়ের কূলে কূলে পথ। ঘাট, মাঠ, মাঠের পর গ্রাম। গ্রামের মধ্যে পথের দুই পাশে গৃহস্থের দুয়ার।

বৈষ্ণবী পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলে। গৃহস্থের দ্বারে গান গাহিয়া ভিক্ষা চায় বিনীত হাসিমুখে। ভিক্ষা লয় সন্তোষের আশীর্বাদে গৃহস্থের ভিক্ষা-দেওয়া শূন্য পাত্রখানি ভরিয়া দিয়া। পরিতুষ্ট পুরনারীরা ভিক্ষা দিয়া নিমন্ত্রণ করে, আবার এস বোষ্টমী। হাসিয়া বৈষ্ণবী বলে, তোমাদের দুয়ারই যে আমাদের ভাণ্ডার, আসব বইকি।

হাটে-বাজারে বৈষ্ণবী গান গায়। রসিক শ্রোতার দল নানা প্রশ্ন করে। বৈষ্ণবী মিষ্ট হাসি হাসিয়া অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দেয়। শ্রোতারা হাসিয়া বলে, বোষ্টমীর গান

যেমন মিষ্টি, হাসিও তেমনই মিষ্টি।

বৈষ্ণবী হাসিয়া উত্তর দেয়, বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল প্রভু।

পথের ধারে অজয়ের ঘাটের পাশে গাছতলায় সেদিনের ঘরকন্না পাতে; রান্নার উদ্যোগ করিতে করিতে মনে পড়ে রসিকদাসের কথা। রাইকমল দুইটি হাত কপালে স্পর্শ করিয়া বার বার বলে, তোমার সাধনা সফল হোক, তোমার সাধনা সফল হোক। অজয়ের ঘাটে নামিয়া সযত্নে অঙ্গমার্জনা করিয়া স্নান করে; মলিন পরিধেয় সাবান দিয়া কাচিয়া লয়। কাচা ধপধপে কাপড়খানি পরে। তারপর স্নানান্তে দর্পণের সম্মুখে নাকে সযত্নে রসকলি আঁকে। আঁকিতে আঁকিতে অকস্মাৎ চোখ তাহার সজল হইয়া আসে, সে গুনগুন করিয়া মৃদুস্বরে গান ধরে—

সখি বলিতে বিদরে হিয়া
আমারই বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।

কিন্তু এ গান কোনদিন সে শেষ করিতে পারে না। অভিশাপের কলি তাহার কণ্ঠে ফোটে না।

মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, তাহার পূর্বের রূপ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে সেই রাইকমল। নিজেকে দেখিয়া সে নিজেই মুগ্ধ হইয়া যায়। সেদিন সে গুনগুন করিয়া গান ধরে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

অজয়ের নির্জন তীর, নিজের গান সে নিজেই শোনে। সব সারিয়া গাছতলার ঘর ভাঙিয়া আবার সে পথ চলে।

বিবিধ

ভোর তিনটার সময় নিয়মিত শয্যাত্যাগ করিয়া বিশ্বম্ভর রায় ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। পুরাতন খানসামা অনন্ত গালিচার আসন ও তাকিয়া পাতিয়া, ফরসি ও তামাক আনিবার জন্য নীচে চলিয়া গেল। বিশ্বম্ভর চাহিয়া একবার দেখিলেন, কিন্তু বসিলেন না। নতশিরে যেমন পদচারণা করিতেছিলেন, তেমনই করিতে থাকিলেন। অদূরে রায়বাড়ির কালী-মন্দিরের তলদেশে শুভ্র স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা ক্ষীণধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা ধবধব করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ওই তারাটির সহিত যেন দীপ্তির প্রতিযোগিতা করিয়াই এ অঞ্চলের হালে বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল। ঢং-ঢং-ঢং করিয়া গাঙ্গুলীবাবুদের ছাদে তিনটার ঘড়ি এতক্ষণে পেটা হইল। পূর্বে দুই শত বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলে ঘড়ি বাজিত রায়বাবুদের বাড়িতে, এখন আর বাজে না। এখন বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভাঙে অভ্যাসের বশে আর পারাবতের গুঞ্জনে। শুকতারা আকাশে দেখা দিলেই উহাদের কলরব শুরু হয়। ভোরের বাতাসের সঙ্গে একটি অতি মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বসন্ত সমারোহ করিয়া রায়বাড়িতে আর আসে না। তাহার পাদ্য-অর্ঘ্য দিবার মত শক্তিও রায়বংশের নাই। মালীর অভাবে ফুলের বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র কয়টা বড় গাছ—মুচকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা। সেগুলিও এই বংশেরই মত শাখাপ্রশাখাহীন, এই প্রকাণ্ড ফাটল-ধরা প্রাসাদখানার মতই জীর্ণ। সত্য সত্যই কয়টা গাছের কাণ্ডের মধ্যে গহ্বরও দেখা দিয়াছে। সেই জীর্ণ শাখার প্রান্তে বসন্ত দেখা দেয়, না গাছগুলিই বসন্তকে ধরিবার চেষ্টা করে, কে জানে!

আস্তাবল হইতে একটা ঘোড়া ডাকিয়া উঠিল।

ফরসির মাথায় কলিকা বসাইয়া নলটি হাতে ধরিয়া অনন্ত খানসামা ডাকিল, হুজুর!

বিশ্বম্ভরবাবুর চমক ভাঙিল, বলিলেন, হুঁ!

ধীরে ধীরে গালিচায় বসিতেই অনন্ত নলটি তাঁহার হাতে আগাইয়া দিল। নীচে ঘোড়াটা আবার ডাকিয়া উঠিল।

নলে দুই-একটা মৃদু টান দিয়া বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, মুচকুন্দ ফুল ফুটতে আরম্ভ হয়েছে, শরবতের সঙ্গে দিবি আজ থেকে।

মাথা চুলকাইয়া অনন্ত বলিল, আজ্ঞে পাকে নি এখনও পাপড়িগুলো।

ওদিকে আস্তাবলে ঘোড়াটা অসহিষ্ণুভাবে ডাকিয়া উঠিতেছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রায় ঈষৎ বিরক্তিভরেই বলিলেন, নিতে বেটার কি বুড়ো বয়সে ঘুম বাড়ছে নাকি? যা দেখি নিতেকে ডেকে দে। তুফান ছটফট করছে। ডাকছে শুনছিস না?

তুফান ওই ঘোড়াটার নাম। রায়বাড়ির নয়টি আস্তাবলের মধ্যে এই একটা ঘোড়া অবশিষ্ট

আছে। বৃদ্ধ তুফান পঁচিশ বৎসর পূর্বের অসমসাহী জোয়ান বিশ্বম্ভর রায়ের দুর্দান্ত বাহন। সেকালে—সেকালে কেন, দুই বৎসর পূর্বেও দেশ-দেশান্তরের পথচারী বাদশাহী-সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ি-বাঁধা গৌরবর্ণ বীরবপু আরোহীকে দেখিয়া এ দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিত, কে হে উনি?

লোকে বলিত, আমাদের রাজা উনি—বিশ্বম্ভর রায়। বড়দরের শিকারী, বাঘ মারা ওঁর খেলা।

অপরিচিত পথিক সসম্ভ্রমে চোখ তুলিয়া দেখিত, সাদা ঘোড়া তাহার আরোহীকে লইয়া দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে। দূরে উড়িতেছে শুধু ধুলার একটা কুণ্ডলী, একটা প্রক্ষিপ্ত ঘূর্ণি যেন পাক দিতে দিতে দিগন্তে মিশিবার জন্য ছুটিয়াছে।

নিত্যনিয়মিত দুর্দান্ত তুফান বিশ্বম্ভর রায়কে লইয়া ভোরে বাহির হইত। দুই বৎসর পূর্বে যেদিন মহাজন গাঙ্গুলীরা সমারোহ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঢোল-শোহরত দ্বারা দখল-ঘোষণা করিল, সেই দিন হইতে দেখা গেল—তুফানের পিঠ সওয়ার-শূন্য, নিতাই সহিস মুখের লাগাম ধরিয়া তুফানকে টহল দিয়া ঘুরাইয়া আনিতেছে।

নায়েব তারাপ্রসন্ন একদিন বলিয়াছিল, আপনার এতদিনের অভ্যেস ছাড়লে শরীর—

বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি দেখিয়া তারাপ্রসন্ন কথা শেষ করিতে পারে নাই।

রায় উত্তর দিয়াছিলেন দুটি কথায়, ছি তারাপ্রসন্ন!

অনন্ত নীচে যাইতেছিল। বিশ্বম্ভর আবার ডাকিলেন, শোন্।

অনন্ত ফিরিল।

রায় বলিলেন, নিতাই কাল বলছিল তুফান দানা নাকি পুরো পাচ্ছে না!

অনন্ত বলিল, ছোলা এবার ভাল হয় নি, তাই নায়েববাবু বললেন—

হুঁ।

আবার ফরসিতে গোটাকয় টান মারিয়া বলিলেন, তুফান কি খুব রোগা হয়ে গেছে?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, না। তেমন কই—

হুঁ।

কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, দানা পুরোই দিবি, বুঝলি? নায়েবকে আমার নাম ক'রে বলবি। যা তুই, নিতাইকে ডেকে দে।

অনন্ত চলিয়া গেল। তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া ঊর্ধ্বমুখে বিশ্বম্ভরবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নলটা পাশে পড়িয়া আছে। আকাশের তারাগুলি একের পর এক নিবিয়া আসিতেছিল। বিশ্বম্ভর অন্যমনস্কভাবে বোধ করি আপনার প্রশস্ত বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন—এক—দুই—। প্রথম দিন তুফানের পিঠে সওয়ার হইতে গেলে এই পাঁজরখানাতেই ধাক্কা লাগিয়াছিল। সেদিনের সে কি রূপ তুফানের! সে কি দুর্দান্তপনা! শান্ত হইত সে শুধু বাজনার শব্দে। বাজনা বাজিলে সে কখনও বেতালা পা ফেলে নাই। ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে কি নৃত্য তাহার!

বিশ্বম্ভরবাবু উঠিয়া পড়িলেন। অতীত স্মৃতি তারকারাজির মত বুকের আকাশে রায়বংশের মর্যাদার ভাস্কর-প্রভায় ঢাকা পড়িয়া থাকে। আজ মমতার ছায়ায় সে ভাস্করে অকস্মাৎ সর্বগ্রাসী গ্রহণ লাগিয়া গেল। স্মৃতির উজ্জ্বলতম তারকা—তুফান, সেই আকাশে সর্বাগ্রে জলজল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আজ দুই বৎসর তিনি নীচে নামেন নাই। দুই বৎসর পরে তুফানকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া রায় দোতলায় নামিলেন। চকমিলানো বাড়ির সুপরিসর সুদীর্ঘ বারান্দা রায়ের বলিষ্ঠ পদের খড়মের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় সারি সারি গোল থামের মাথায় খড়খড়ি হইতে সচকিত কতকগুলা চামচিকা ফরফর করিয়া উড়িয়া গেল। এপাশে অন্ধকার তালাবন্ধ ঘরগুলার ভিতরেও চামচিকার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। ছাদের সিঁড়ির পাশেই বিছানাঘর। তুলার টুকরা বারান্দায় পড়িয়া আছে। তাহার পরই একটা দুর্গন্ধ। এটা ফরাশঘর। জাজিম, শতরঞ্চি, গালিচা থাকে ঘরটায়। বোধ হয় কিছু পচিয়া থাকিবে। পরের ঘরটায় চামচিকার পক্ষতাড়নের শব্দের সঙ্গে ঝুনঝুন শব্দ উঠিতেছে। বাতিঘর এটা। বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমগুলি বোধ হয় দুলিতেছে। ইহার পরই এপাশের কোণের ঘরটা ছিল ফরাশ-বরদারের। এই সমস্ত জিনিসের ভার ছিল তাহার উপর। ঘরখানা শূন্য পড়িয়া আছে।

পূর্বমুখে রায় মোড় ফিরিলেন। পত্তনিদার মহল এটা। রায়দের দপ্তরে বিভিন্ন জেলার বড় বড় ধনী পত্তনিদার ছিল। পাঁচ শত হইতে পাঁচ হাজার টাকা খাজনা রাখিত, এমন পত্তনিদারের অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিলে এইখানে তাঁহাদের বাসস্থান দেওয়া হইত। বারান্দার দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া রায় একবার চাহিলেন। প্রথমখানির ছবি নাই, কাঁচ নাই, শুধু ফ্রেমখানা ঝুলিতেছে। দ্বিতীয়খানার কাঁচ নাই। তৃতীয়খানার স্থান শূন্য। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রায় আবার নতমুখে চলিলেন। উপরে কড়ির মাথায় পায়রাগুলি অবিরাম গুঞ্জন করিতেছে। পূর্বমুখে বারান্দার প্রান্তেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া রায় নীচে আসিয়া নামিলেন। দুই বৎসর পর আজ আবার তিনি নীচে নামিলেন। সেরেস্তাখানার সারি সারি ঘরে রায়বংশের রাশি রাশি কাগজ বোঝাই হইয়া আছে।

সাত রায়ের ইতিহাস। বিশ্বম্ভর রায় জমিদার রায়বংশের সপ্তম পুরুষ। অন্ধকারের মধ্যে রায় ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল রায়বংশের আদিপুরুষের কথা। তিনি নাকি বলিতেন, মা-লক্ষ্মীকে বাঁধতে হ'লে মা-সরস্বতীর দয়া চাই। কাগজের ওপর কালির গুটির শেকল—ও বড় কঠিন শেকল। হিসেবনিকেশের শেকল ঠিক রেখো—চঞ্চলার আর নড়বার ক্ষমতা থাকবে না। তিনি ছিলেন নবাব-দরবারের কানুনগো।

কাগজ, কলম, কালি—সবই ছিল, কিন্তু মা-লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন।

বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা কুকুর কোথায় অন্ধকারে শুইয়া ছিল, সেটা ঘেউ ঘেউ শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। রায় গ্রাহ্য করিলেন না, অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কুকুরটার ঘেউ ঘেউ থামিয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার

সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। কুকুরটা শখ করিয়া কেহ পোষে নাই। রায়বাড়ির উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের সন্ততি কেহ।

কাছারির দেউড়ি পার হইয়া দক্ষিণে গোশালা, বামে আস্তাবল।

তাহার ওদিকে দেবতাদের মন্দির।

রায় ডাকিলেন, নিতাই!

সসম্ভ্রম কণ্ঠের জবাব আসিল, হুজুর!

তুফানের উচ্চ হ্রেষারবে সে জবাব ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিক হইতে একটা হাতীর গর্জন শোনা গেল।

রায় অগ্রসর হইয়া তুফানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থিরভাবে পা ঠুকিয়া ডাক দিয়া বৃদ্ধ তুফান শিশুর মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মুখে হাত বুলাইয়া রায় বলিলেন, বেটা!

তুফান মাথাটা মনিবের হাতে ঘষিতে লাগিল। ওদিকে হাতীটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত ডাকিয়া ডাকিয়া সে পায়ের শিকিল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। মাহুত রহমৎ প্রভুর সাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিয়া আপনার হাতীর নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সে অতি মৃদু অনুযোগের সুরে বলিল, হুজুর, ছোটগিন্নী শিকলি ছিঁড়ে ফেলবে।

হস্তিনীটির নাম ছোটগিন্নী। বিশ্বম্ভরবাবুর মায়ের বিবাহের যৌতুক এই ছোটগিন্নী। তখন নাম ছিল মতি। কিন্তু কর্তা ধনেশ্বর রায় শিকার করিয়া ফিরিয়া মতি বলিতে পাগল হইয়া উঠিলেন। মতি একটা চিতাবাঘকে শুঁড়ে ধরিয়া পদদলিত করিয়াছিল। মতির প্রতি যত্নের আধিক্য দেখিয়া বিশ্বম্ভরের মা তাহার নাম দিয়াছিলেন, সতীন। কর্তা বলিয়াছিলেন, সেই ভাল রায়-গিন্নী, ওর নামও থাকুক—গিন্নী।

বিশ্বম্ভরবাবুর মা বলিয়াছিলেন, শুধু গিন্নী নয়,—ছোটগিন্নী, ও তোমার দ্বিতীয় পক্ষ।

রহমতের কথায় বিশ্বম্ভরবাবু তুফানকে ছাড়িয়া ছোটগিন্নীর সম্মুখে গেলেন। পিছনে তুফানের অসন্তুষ্ট হ্রেষারব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রায় ছোটগিন্নীকে বলিলেন, কি গো মা-লক্ষ্মী? ছোটগিন্নী আপনার শুঁড়খানি বাঁকাইয়া রায়ের সম্মুখে ধরিল। এটুকু তাহাকে সওয়ার হইবার জন্য অনুরোধ; রায় হাতীতে উঠিতেন শুঁড় বাহিয়া।

রায় তাহার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, এখন নয় মা।

ছোটগিন্নী কথা বুঝিল। সে শুঁড়খানি রায়ের কাঁধের উপর রাখিয়া লক্ষ্মী মেয়েটির মতই শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় কহিলেন, নিতাই, তুফানকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।

একান্ত সঙ্কোচভরে নিতাই বলিল, তুফান আর যাবে না আজ হুজুর। আপনাকে দেখেছে, আপনি সওয়ার না হ'লে—

রায় এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। ছোটগিন্নীর শুঁড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে!

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ প্রত্যূষের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিচিত্র সঙ্গীতে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। সচকিত রায় ছোটগিন্নীর শুঁড়খানি নামাইয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যাণ্ড বাজে কোথায় রে?

নিতাই মৃদুস্বরে জবাব দিল, গাঙ্গুলীবাড়িতে বাবুর ছেলের ভাত।

অভ্যাসমত রায় বলিলেন, হুঁ।

তুফান তখন ঘাড় বাঁকাইয়া তালে তালে নাচিতে শুরু করিয়াছে। রায় মৃদু হাসিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে ছোটগিন্নীর পায়ের শিকলও তালে তালে নূপুরের মত বাজিতেছিল, ঝুম—ঝুম—ঝুম।

রায় দেউড়ি পার হইয়া অন্ধকার পুরীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, এককালে ভোরের নহবতের সঙ্গে এমনই করিয়া নিত্য নাচিত—এক দিকে তুফান, অন্য দিকে ছোটগিন্নী।

দোতলায় উঠিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত!

হুজুর।

নায়েবকে ডেকে দে

রায় ছাদে গিয়া বসিলেন। প্রৌঢ় নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, মহিম গাঙ্গুলীর ছেলের অন্নপ্রাশন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিমন্ত্রণপত্র করেছে বোধ হয়?

কুণ্ঠিতভাবে তারাপ্রসন্ন বলিল, হ্যাঁ।

একখানা গিনী আর থালা—একখানা কাঁসার থালাই পাঠিয়ে দেবে।

তারাপ্রসন্ন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থাটাও বেশ মনঃপূত হয় নাই।

রায় বলিলেন, মোহর একখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

নায়েব চলিয়া গেল। রায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনন্ত আসিয়া কলিকা পাল্টাইয়া দিয়া নলটি ধরিয়া বলিল, হুজুর!

রায় অভ্যাসমত হাতটি বাড়াইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ছোটগিন্নীর পিঠের গদি, জাজিম, ঘণ্টা বের ক'রে দিবি। নায়েব যাবেন গাঙ্গুলীবাড়ি লৌকুতো দিতে।

•

তিনপুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্রই নয়। রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশও হইয়া গেল। জেলায় জজকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারের নির্দেশমত রায়বংশের লক্ষ্মী তখন ঝাঁপি হাতে দুয়ারে দাঁড়াইয়াছেন। অপেক্ষা মাত্র প্রিভি কাউন্সিলের আদেশের।

পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসবে রায়বাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল। দানভোজন বিলাসভোজন চলিয়াছিল পূর্ণিমার জোয়ারের মত। তারপরই পড়িল ভাটা। ভাটার টানে

রায়বংশের সমস্ত প্রবাহটুকু নিঃশেষ হইয়া গেল। সাত দিনের দিন বিলাস হইয়া উঠিল বিষ। বাড়িতে কলেরা দেখা দিল। তাহার পর সাত দিনের মধ্যে রায়গিন্নী, দুই পুত্র, এক কন্যা, কয়েকজন আত্মীয়—সব শেষ হইয়া গেল। শুধু বিশ্বম্ভর রায় বিন্ধ্যগিরির অগস্ত্য-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার মত নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভুল বলা হইল। মৃত্যুর প্রতীক্ষা সেই দিন হইতে করিয়াছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু নতশির সেদিনও তিনি হন নাই। নতশির হইলেন আরও দুই বৎসর পরে। প্রিভি কাউন্সিলের রায় যেদিন বাহির হইল, সেই দিন। নতুবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যুর পরও এ বাড়িতে জলসাঘরে বাতি জ্বলিয়াছে, সেতার সারেঙ্গ ঘুঙুর বাজিয়াছে। বিপুল হাস্যধ্বনিতে নিশীথরাত্রি চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছোটগিন্নীর পিঠে শিকারের হাওদা চড়িয়াছে। তুফান সেদিনও রোষে ক্ষোভে দড়াদড়ি ছিঁড়িয়াছে।

যাক, প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূসম্পত্তি সব চলিয়া গেল। রহিল বাড়িঘর ও লাখেরাজের কায়েমী বন্দোবস্তটুকু। রায়বংশের আদিপুরুষ এইটুকু কাগজের উপর কালির শিকলে এমন করিয়া বাঁধিয়াছিলেন যে, সেইটুকুতে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। ওই বন্দোবস্তেই দেবসেবা চলে, ছোটগিন্নীর বরাদ্দ চাল আসে, রহমতের বেতন হয়। মোট কথা, এখনও যেটুকু আছে, সে সেই বন্দোবস্তেরই কল্যাণে। এখন মাসের প্রথমেই চাল আসে—

মাসবরাদ্দ বাদশাভোগ চাল, নিত্য প্রাতে লাখেরাজ বিল বন্দোবস্তের দরুন আসে মাছ, ওই বিল হইতেই জলচর পাখীর বন্দোবস্তের ফলে আসে—পাখী। এ সমস্ত অতীত, কিন্তু স্মরণাতীত নয়। তাই এই জীর্ণ ফাটল-ধরা রায়বাড়ীর নাম এখনও রাজবাড়ি, শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়-হুজুর।'

সেইটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ। তাঁহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা-পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশী।

মহিম গাঙ্গুলী ভাবে, মরা-পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে আমায়।

ছোটগিন্নীর পিঠে ঘণ্টা উঠিতেই, সে গরবিনীর মত গা দোলাইতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, ঢং—ঢং—ঢং—

নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভরবাবু বসিয়াছিলেন অন্দরের হল-ঘরে। এখন এই একখানি ঘরই তিনি ব্যবহার করেন। দেওয়ালে রায়বংশের কর্তা-গিন্নীদের ছবি টাঙানো। সকলেরই প্রৌঢ় বয়সের প্রতিকৃতি। সকলেরই গায়ে কালী-নামাবলী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে জপমালা। বিশ্বম্ভরবাবু সেই ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন। নায়েবকে দেখিয়া ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া ডাকিলেন, অনন্ত, হাত-বাক্সটা দে তো।

হাত-বাক্স হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি লইয়া সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিলেন। সিন্দুকের

উপরের থাকে রায়বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি শোভা পাইতেছিল। নীচের থাকে দুই-তিনটি বাক্স। রায় টানিয়া বাহির করিলেন একটি অতি সুদৃশ্য বাক্স। এটি তাঁহার মৃতা পত্নীর গহনার বাক্স। রায় বাক্সটি খুলিলেন। বাক্সটির গর্ভ প্রায় শূন্য। অলঙ্কারের মধ্যে একটি সিঁথি রহিয়াছে। এই সিঁথিটি সাতপুরুষের বধূবরণের মাঙ্গলিক সামগ্রী। ওইটি ছাড়া সব গিয়াছে। পাশের একটি খোপে কয়খানি মোহর।

এগুলির কয়েকখানি রায়-গিন্নীর আশীর্বাদের মোহর, কয়খানা যুবক বিশ্বম্ভরের পত্নীকে প্রথম উপহার। বিবাহের বৎসরই প্রথম তিনি মহালে যান। নজরানার মোহর হইতে কয়খানা তিনি পত্নীকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহারই একখানা লইয়া নায়েবের হাতে নিঃশব্দে তিনি তুলিয়া দিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরই ছোটগিন্নীর ঘণ্টার শব্দ সুউচ্চ হইয়া উঠিল। রায় আসিয়া জানালায় দাঁড়াইলেন।

ছোটগিন্নীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে—ললাটের তৈলসিক্ত অংশটুকু ঘিরিয়া সিন্দুরের রেখা আঁকা। ছোটগিন্নী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

অপরাহ্ণে গাঙ্গুলীদের ঝকঝকে মোটরখানা আসিয়া লাগিল রায়বাড়ির ভাঙা দেউড়িতে। গাড়ি হইতে নামিলেন মহিম গাঙ্গুলী নিজে। নায়েব তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন, আসুন।

অনন্তও দোতলা হইতে ঘটনাটা দেখিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া রায়বাড়ির খাস বৈঠকখানার দরজাটা খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মহিম কহিল, ঠাকুরদা কোথায়—দেখা করব যে!

গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায়-দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে। মহিমের পিতা জনার্দন পর্যন্ত রায়বাড়ির কর্তাকে বলিয়াছে—হুজুর। তারাপ্রসন্ন মহিমের কথার ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুখে মিষ্টভাবেই বলিল, হুজুর এখনও ওঠেন নি। খেয়ে শুয়েছেন।

মহিম বলিল, ডেকে তুলতে ব'লে দিন।

তারাপ্রসন্ন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, সে সাহস আমাদের কারও নেই। আপনি বরং ব'লে যান আমাকে কি বলতে হবে, আমি বলব।

অসহিষ্ণুভাবে মহিম বলিল, না, আমাকে দেখা করতেই হবে।

অনন্ত আসিয়া রূপার গ্লাসে গাঙ্গুলীর সম্মুখে শরবত ধরিল।

গ্লাসটি লইয়া মহিম অনন্তকে প্রশ্ন করিল; ঠাকুরদা উঠেছেন রে?

উঠেছেন। আপনার খবর দিয়েছি। ডাকছেন আপনাকে তিনি।

শরবত পান করিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার গন্ধটুকু তো! কিসের শরবত রে?

অনন্ত মিথ্যা কথা বলিল, আজ্ঞে, কাশীর মসলা, আমি জানি না ঠিক।

দোতলার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল, কই ঠাকুরদা, আপনি যে খেতে গেলেন না?

বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন, এস এস, ব'স ভাই।

মহিম বলিল, আমার ভারি দুঃখ হয়েছে ঠাকুরদা।

তেমনই হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, বুড়ো ঠাকুরদাদা ব'লে ভুলে যাও ভাই। বুড়ো মানুষ, নিয়মের ব্যতিক্রম দেহে সহ্য হয় না।

মহিম বলিল, সে দুঃখ ভুলব, কিন্তু রাত্রে পায়ের ধুলো নিতেই হবে।

বিশ্বম্ভর ফরসি টানার ভানে নীরব রহিলেন।

মহিম বলিয়া গেল, শখ ক'বে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী আনিয়েছি। তাদেব পানে কদর আপনি ভিন্ন আমরা বুঝব না।

কিছুক্ষণ নীরবে তামাক টানিয়া নলটি বায় রাখিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, শরীর আমার বড় খারাপ ভাই মহিম, বুকে একটা ব্যথা হয়েছে ইদানীং, সেটা মাঝে মাঝে বড কাতর করে আমাকে।

মহিম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তা হ'লে উঠি ঠাকুরদা। আমায় যেতে হবে একবার সদরে। সাহেব-সুবোদের নিয়ে আসতে হবে আবার, তাঁরা সব আসবেন কিনা।

বিশ্বম্ভর শুধু বলিলেন, দুঃখ ক'রো না ভাই।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একবার দাড়াইয়া সহসা বলিয়া উঠিল, বাড়িটা ক'রে রেখেছেন কি ঠাকুরদা, মেরামত কবানো দরকার যে।

সে কথার কেহ জবাব দিল না।

অনন্ত শুধু বলিল, আসুন হুজুর।

গাঙ্গুলীবাড়িতে নাচের আসর আলোর ঐশ্বর্যে ঝকমক করিতেছিল। চাঁদোয়ার চারিপাশে নানা রঙের আলো। গাঙ্গুলীদের নিজেদের 'ডায়নামো'। ইলেকট্রিক তারের লাইন বাড়াইয়া আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খুঁটিগুলি গাছের পাতা ও ফুল দিয়া সাজানো। রঙিনকাগজের মালা চারিপাশ বেড়িয়া ঝুলিতেছে। নীচে শতরঞ্জির উপর চাদর বিছাইয়া আসর পড়িয়াছে। এক দিকে সারি সারি চেয়ার, অন্য দিকে ঢালা বিছানায় সাধারণ শ্রোতাদের বসিবার স্থান। খানিক দূরে মেয়েদের আসর!

রাত্রি আটটার মধ্যেই আসর ভরিয়া গেল। তবলচী, সারঙ্গী আপন আপন যন্ত্রের সুর বাঁধিতেছিল। দুইজন পশ্চিমা নর্তকী পেশোয়াজ-ওড়নায়-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আসরে আসিয়া বসিল। আসরে কোলাহল মুহূর্তে নীরব হইয়া গেল। হাঁ, রূপ বটে!

গান আরম্ভ হইল। ওদিকে চেয়ারে বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে মহিম গাঙ্গুলী বসিয়া।

দুইজন নর্তকীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা উঠিয়া গান ধরিয়াছিল। দীর্ঘ সুরে রাগিণীর আলাপে আসরখানা যেন ঝিমাইয়া আসিল। শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তা শুরু হইয়া গেল। বিশিষ্ট শ্রোতামহলে কি একটা হাস্যপরিহাস চলিতেছিল। গাঙ্গুলীবাড়ীর চাপরাসীর দল সাধারণ

শ্রোতাদের পিছনে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া উঠিল, চুপ—চুপ।

গান শেষ হইবার মুখে মহিম ভদ্রতা করিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ,—বাঃ! নর্তকীর নৃত্যগীতি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। গান শেষ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। তরুণীটির সহিত মৃদু হাসিয়া কি কয়টা কথা বলিয়া তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল।

দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। চপলগতির কণ্ঠসঙ্গীতে ও চটুল নৃত্যভঙ্গীতে যেন একটা পাহাড়ী ঝরনা আসরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারিফে তারিফে আসরের মধ্যে একটা কলরোল উঠিল। বিশিষ্ট শ্রোতামহল হইতে টাকা নোট বখশিশ আসিল।

তারপর আবার—আবার—আবার। আর আসর অলসমন্থর হয় নাই। আসর ভাঙিলে মহিম ডাকিয়া বলিল, সকলে খুব খুশী হয়েছেন।

সেলাম করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, আপনাদের মেহেরবানি।

সত্যই মহিমের মেহেরবানির অন্ত ছিল না। তিন দিন বায়নার স্থলে পাঁচ দিন গাওনা হইয়া তবে শেষ হইল।

বিদায়ের দিন আরও মেহেরবানি সে করিল। বিদায় করিয়া বলিয়া দিল, এখানে আমাদের রাজবাড়ি আছে, একবার ঘুরে যেয়ো। বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমীর লোক। গাওনা হয়তো হতে পারে।

বয়োজ্যেষ্ঠা সম্ভ্রমভরে কহিল, ওঁর কথা আমরা শুনেছি হুজুর। জরুর যাব রাজাবাহাদুরের দরবারে। সে মতলব আবার প্রথম থেকেই আছে।

তারাপ্রসন্ন মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল, এ ওই কুটিল মহিম গাঙ্গুলীর কূট চাল। অবশেষে একটা বেশ্যাকে দিয়া অপমানের চেষ্টা করিয়াছে। সে গম্ভীরভাবে বলিল, বাবুর তবিয়ত আচ্ছা নেই—নাচগান এখন হবে না।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজীটি বলিল, মেহেরবানি করকে—

বাধা দিয়া তারাপ্রসন্ন বলিল, সে হয় না।

বাইজী দুঃখিতভাবে বলিল, মেরে নসিব।

তাহারা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

এমন সময় দোতলা হইতে হাঁক আসিল, তারাপ্রসন্ন!

তারাপ্রসন্ন আসিতেই বিশ্বম্ভর বলিলেন, কে ওরা?

নতমুখে তারাপ্রসন্ন উত্তর দিল, গাঙ্গুলীদের বাড়ি ওরাই এসেছিল মুজরো করতে।

হুঁ।—তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, শুধু ফিরিয়ে দিলে?

সেলাম পৌঁছে হুজুরকো পাশ।—মুসলমানী কায়দায় আভূমিনত অভিবাদন করিয়া বাইজী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কাছারি-ঘর হইতে এদিকের বারান্দা ও ঘরের খানিকটা দেখা যায়। বিশ্বম্ভরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাইজী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

এত্তালা না দিয়া উপরে উঠিয়া আসার জন্য বিশ্বম্ভর রুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে রাগ রহিল না। বাইজীর রূপ তাঁহার চিত্ত কোমল করিয়া দিল।

বাইজী আবার অভিবাদন করিয়া বলিল, কসুর মাপ করতে হুকুম হয় মেহেরবান ; এত্তালা না দিয়ে এসে পড়েছি।

বিশ্বম্ভর দেখিতেছিলেন বাইজীর রূপ। দাড়িমের দানার মত রঙ্, সুর্মা আঁকা টানা দুইটি চোখ—মাদকতা-ভরা চাহনি, গোলাপের পাপড়ির মত দুই ঠোঁট, ঈষৎ দীর্ঘ দেহখানি, ক্ষীণ কটি, নৃত্য যেন আলস্যভরে দেহখানিতে বিরাম লইয়াছে। এ চঞ্চল হইলেই সে মুখর হইয়া উঠিবে।

বিশ্বম্ভর প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, বৈঠিয়ে।

অদূরবর্তী গালিচার উপর বাইজী সসম্ভ্রমে বসিয়া বলিল, হুজুর বাহাদুরের দরবারে বাঁদী গান শোনাবার জন্য হাজির।

বিশ্বম্ভর বলিতে গেলেন, তাঁহার তবিয়ৎ খারাপ। কিন্তু কেমন লজ্জা হইল, একটা তওয়াইফের সম্মুখে মিথ্যা বলিতে বুঝি ঘৃণা হইল।

বাইজী বলিল, সবার মুখে শুনেছি, এখানকার বড় ভারি সমঝদার হুজুর বাহাদুর। গাঙ্গুলী-বাবুও বললেন—আমীর, এখানকার রাজা আপনি।

রায়ের নলের ডাক বন্ধ হইয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হবে মজলিস সন্ধ্যের সময়। তারপর ডাকিলেন, অনন্ত।

অনন্ত বাহিরেই ছিল। সম্মুখে আসিতেই বলিলেন, এঁদের বাসা দিয়ে দে। নীচে তালুক-দারের ঘর একখানা খুলে দে।

অনন্ত বলিল, আসুন।

বাংলা বলিতে না পারিলেও বাংলা বুঝিতে বাইজীর কষ্ট হইল না। উঠিয়া অভিবাদন করিয়া সে কহিল, বহুৎ নসীব মেরে—বহুৎ মেহেরবানি হুজুরকো।

অনন্তকে অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল।

নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া ছিল—নির্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে কহিল, গাঙ্গুলীদের বাড়ি এক শো টাকা ক'রে রাত্রি নিয়েছে ওরা।

হুঁ।

কয়বার নলে টান দিয়া রায় বলিলেন, তোমার তহবিলে কি—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি আবার নলে টান দিতে আরম্ভ করিলেন। তারাপ্রসন্ন বলিল, দেবোত্তরের তহবিলে শুধু শ-দেড়েক টাকা আছে।

কিছুক্ষন চিন্তা করিয়া রায় উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিলেন সেই বাক্সটি। বাক্সের মধ্য হইতে রায়-বংশের মাঙ্গলিক সিঁথিখানি তুলিয়া তারাপ্রসন্নের হাতে দিয়া বলিলেন, দেবোত্তরের খাতায় খরচ লেখ—আনন্দময়ীর জন্য জড়োয়া সিঁথি খরিদ, দাম ওই দেড়-শো টাকা।

আনন্দময়ী রায়-বংশের ইষ্টদেবী—পাষাণময়ী কালী।

বহুদিন পর নিস্তব্ধ রায়বাড়ি তালা খোলার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। জলসাঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া গেল। বাতিঘরের তালা খুলিল। ফরাসঘরে আলোক প্রবেশ করিল।

অনন্ত ঘর-দুয়ার ঝাড়িতেছিল। সাহায্য করিতেছিল। সাহায্য করিতেছিল নিতাই ও রহমৎ। ঠাকুরবাড়ির পুরানো ঝি মাজিতেছিল—আসাসোঁটা গড়গড়া, বড় বড় পরাত, গোলাপ-পাশ, আতরদান। নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া সমস্ত দিকের তদারক করিতেছিল।

অনন্ত বলিল সদরে লোক পাঠাতে হবে নায়েববাবু।

নায়েব বলিল, ফর্দ করেছি আমি। শোন দেখি, কিছু ভুল হল কি না।

ফর্দ শুনিয়া অনন্ত কহিল, সবই হয়েছে, বাদ পড়েছে দুটো জিনিস। ভরি দুই আতর আর বিলিতি বোতল কটা।

নায়েব বলিল, ছিল তো একটা।

তাতে আর খানিকটা আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু এক-এক দিন খান তো। কিন্তু আজ যদি চান, তবে একটা বোতলে হবে না নায়েববাবু।

নায়েব বলিলেন, কিন্তু পাঠাই কাকে? পায়ে হেঁটে সন্ধ্যের আগে কি ফিরবে?

অনন্ত দ্বিধাভরে বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাই-ই নয় যাক।

নিতাই বলিল, হুজুর হুকুম না করলে—

নায়েব বলিল, আচ্ছা, আমি বলে আসছি।

বিশ্বম্ভরবাবু শুইয়া ছিলেন। নায়েব গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। একবার গাঙ্গুলীবাড়িতে যাও, মহিমকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো। আর গ্রামে ভদ্রলোক বেছে বেছে নিমন্ত্রন করতে হবে। গাঙ্গুলীবাড়ি যাও তুমি নিজে।

নায়েব বলিল, তাই যাব।

রায় বলিলেন, ছোটগিন্নীর পিঠে গদি দিতে বল।

নায়েব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাইকে পাঠানো দরকার সদরে।

হুঁ।

কিছুক্ষণ পর রায় বলিলেন, তাই যাক।

আরও কিছুক্ষণ পর তুফানের হ্রেষা শুনিয়া রায় সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া দিলেন। বাড়ির পিছন দিয়া দেবদারুছায়াচ্ছন্ন রায়েদের নিজস্ব পথখানি পরিস্কার দেখা যায়। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ সে পথে বাজিয়া উঠিল। রায় দেখিলেন, ঘাড় বাঁকাইয়া দীপ্ত পদক্ষেপে তুফান দুর্দান্তপনা করিতে করিতে চলিয়াছে। তেমনই বাঁকানো ঘাড়, তেমনই পদক্ষেপ।

আরও কিছুক্ষণ পর ছোটগিন্নীর পিঠের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

রায় উঠিয়া বসিলেন। জানালা দিয়া দেখিলেন, গরবিনী ছোটগিন্নী চলিয়াছে। রায় বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেঝের উপর পদচারণা আরম্ভ করিলেন। দেহ-মন কেমন তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সমারোহ! রায়বাড়িতে বহুদিন পর সমারোহ!

ওদিকের জলসাঘর হইতেই বোধ করি শব্দ আসিতেছিল—ঠুং—ঠাং—ঠুং—ঠাং। বেলোয়ারী ঝাড়ের শব্দ। রায় ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অনন্ত ঝাড়-দেওয়ালগিরি হুকে হুকে টাঙাইতেছিল। পদশব্দে দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর রায়। তিনি চাহিয়া আছেন—দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে। প্রকাণ্ড হলের চারিদিকের প্রাচীরবিলম্বিত রায়বংশের মালিকদের যুবাবয়সের প্রতিকৃতি। আদিপুরুষ ভুবনেশ্বর রায় হইতে তাঁহার নিজের পর্যন্ত—সকলেরই বিলাস ও ব্যসনে মত্ত প্রতিকৃতি। প্রপিতামহ রাবণেশ্বর রায় দাঁড়াইয়া আছেন—শিকার-করা বাঘের উপর পা রাখিয়া, হাতে সড়কি বল্লম, পিঠে ঢাল। পিতা ধনেশ্বর বসিয়া আছেন গদির উপর, পাশে বসিয়া ছোটগিন্নী। যুবক বিশ্বম্ভর তুফানের উপর আরূঢ়।

রায়বংশ এই ঘরে ঝড়ের খেলা খেলিয়া গিয়াছেন। রায়ের মনে পড়িল কত কথা। দুর্দান্ত রাবণেশ্বর এ বংশের প্রথম ভোগী পুরুষ। তিনিই এই জলসাঘর তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। কিন্তু ভোগ করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। প্রথম যেদিন এই জলসাঘরে তিনি মজলিস করিয়াছিলেন, সেই দিনই রাবণেশ্বরের স্ত্রী-পুত্র সব শেষ হইয়াছিল। বাতিদানের বাতি অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেই নিবিয়াছিল। তাহার পর আর তিনি সাহস করিয়া জলসাঘরের দুয়ার খোলেন নাই।

সেই দিন রায়বংশের শেষ হইলেই যেন ভাল হইত। কিন্তু রাবণেশ্বর রায়বংশের মমতায় পুনরায় আপনার শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এ তাঁহার আনন্দময়ীর আদেশ। তাঁহারই পুত্র তারকেশ্বর এই জলসাঘরের দুয়ার খুলিয়া আবার বাতি জ্বালিয়াছিলেন। তিনি এক রাত্রে এই ঘরে এক আমীর বন্ধুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাঁচ শত মোহর এক বাইজীকে বকশিশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথা মনে পড়িল—চন্দ্রা, চন্দ্রাবাই! আসর ভাঙার পর বন্ধুদের লুকাইয়া চন্দ্রার সহিত আলাপ বুকের মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে। ফুলের স্তবকের মত চন্দ্রা!

অনন্তের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত আর সরিতেছিল না। রায়ের মুখখানা থমথমে রাঙা—যেন কোন রুদ্ধমুখ শিরা খুলিয়া আবদ্ধ রক্তধারা সে মুখে উৎসের মত আজ উথলিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে অনন্ত পরাতের উপর রূপার গ্লাসে শরবত বসাইয়া রায়ের সম্মুখে নিঃশব্দে ধরিয়া দিল। রায় চাহিয়া দেখিলেন, অনন্তের অঙ্গে জরিদার চোপদারের উর্দি, কোমরে পেটি, মাথায় পাগড়ি, বুকে রায়বাড়ির তকমা। তিনি নিঃশব্দে গ্লাসটি উঠাইয়া লইলেন। অনন্ত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখে কোঁচানো ধুতি, শুভ্র ফিনফিনে মিহি মুসলমানী ঢঙের পাঞ্জাবি, রেশমের চাদর নামাইয়া রাখিল। রায় চিনিলেন, পাঁচ বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদে জমিদার-বন্ধুর বাড়ি যাইবার সময় এই পোশাক তৈয়ারি হইয়াছিল।

প্রশ্ন করিলেন, সব ঠিক আছে?

মৃদুস্বরে অনন্ত বলিল, বাতি জ্বালা হচ্ছে।

লোকজন ?

অনন্ত বলিল, নাথরাজদার ভাণ্ডারীরা বাপ-বেটায় এসেছে। দেবোত্তরে নাথরাজদার পাইক এসেছে চারজন, তারা দেউড়িতে আছে।

নীচে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল।

অনন্ত ত্রস্তপদে নীচে চলিয়া গেল। মহিম গাঙ্গুলী আসিয়াছে। সিঁড়ির বুকে চলা-ফেরার শব্দ শোনা যায়। নীচের তলায় অতিথি-অভ্যর্থনার সাদর সম্ভাষণ, পরস্পরের সহিত আলাপের গুঞ্জন উঠিতেছে। ক্রমে জলসাঘরে তারের যন্ত্রের মৃদু সুর জাগিয়া উঠিল। তবলার ধ্বনিও শোনা গেল। সুর বাঁধা হইতেছে।

অনন্ত আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, হুজুর!

বিশ্বম্ভর বেশ পরিবর্তন করিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিলেন। উত্তর দিলেন, হুঁ।

আসর বসতে পারছে না।

হুঁ।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি বলিলেন, জুতো দে।

অনন্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিয়া নীরবে কোণের টেবিলের দেরাজ খুলিয়া বোতল ও গ্লাস বাহির করিল। দেরাজের উপরে সেগুলি নামাইয়া দিয়া সে জুতা বাহির করিয়া ঝাড়িতে বসিল। রায় একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আবার পায়চারি শুরু করিলেন। নীচে যন্ত্রসঙ্গীতের সুর ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

অনন্ত ডাকিল, হুজুর।

রায় শুধু বলিলেন, হুঁ।

আবার কয়বার তিনি ঘুরিলেন। সে গতি যেন ঈষৎ দ্রুত। অনন্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে রায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সোডা।

প্রকাণ্ড বড় হলটার তিন দিকে লম্বা ফালির মত গদি পাতিয়া তাহার উপর জাজিম বিছাইয়া শ্রোতাদের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। পিছনে সারি সারি তাকিয়া। হলের ছাদে পাশাপাশি তিনটি বেলোয়ারী ঝাড়ে বাতি জ্বলিতেছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে দেওয়ালগিরিতে বাতির আলো বাতাসে ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ঝাড় ও দেওয়ালগিরির কতকগুলি শেজ না থাকায় বাতাসে বাতিগুলি নিবিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে তাই মধ্যে মধ্যে স্খলমান ছায়ারেখা দীর্ঘাকারে জাগিয়া উঠিতেছে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার মত।

আসর বসিয়াছে—কিন্তু গতি এখনও অতি মৃদু। যন্ত্রবাদ্যের ঝঙ্কার অঙ্কুরের মত সবে দেখা দিয়াছে। চারিপাশের আসরে বসিয়া ত্রিশ-চল্লিশজন ভদ্রলোক মৃদু গুঞ্জনে আলাপ করিতেছেন। চার-পাঁচটা গড়গড়া-ফরসিতে তামাক চলিতেছে। তওয়াইফ দুইজন নীরবে বসিয়া আছে।

মাঝে মাঝে কেবল মহিম গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সিগারেটে টান দিয়া সে নিবন্ত বাতি-গুলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কটাবাতি নিবে গেল যে হে! কেহ এ কথার জবাব দিল না। সে ডাকিল, নায়েববাবু! তারাপ্রসন্ন দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে বলিল, দেখুন, আলো বেশ খোলে নি! আমার ড্রাইভারকে ব'লে দিন, দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল। বয়োজ্যেষ্ঠা নর্তকীটি কেবল উর্দুতে বলিল—যেন স্বগতোক্তি করিল, এ ঘরে সে আলো মানায় কি?

বাহিরে ভারী পায়ের জুতার আওয়াজে নায়েব পিছনে চাহিয়া দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত পরেই অনন্তের পিছনে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিশ্বম্ভর রায়। বাইজী দুইজন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মজলিসের সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মহিমও আপনার অজ্ঞাতসারে অর্ধোত্থিত হইয়া হঠাৎ আবার বসিয়া পড়িল।

রায় স্বল্প হাসিয়া বলিলেন, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তারপর তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া মহিম সেটাকে সরাইয়া দিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাকিয়াটাকে কয়বার ঝাড়িয়া লইয়া বিরক্তভরে সে বলিল, বাপ রে বাপ, কি ধুলো! তারাপ্রসন্ন আতর বিলি করিয়া গেল। সমস্ত গড়গড়া-ফরসির কলিকা বদল করিয়া রায়ের সম্মুখে তাঁহার নিজের ফরসি নামাইয়া অনন্ত হাতে নল তুলিয়া দিল।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজী কুর্নিশ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। সেই দীর্ঘ মন্থর গতিতে রাগিণীর আলাপ। কিন্তু একটু বৈচিত্র্য ছিল। আসর আজ নিস্তব্ধ। রায় চোখ মুদিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। গানের দীর্ঘ মন্থর গতির সমতায় বিশাল দেহ তাঁহার ঈষৎ দুলিতেছে! থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাম হাতখানি উদ্যত হইয়া পাশের তাকিয়াটির উপর একটি মৃদু আঘাত করিল। ঠিক ওই সঙ্গে তবলচীর চর্মবাদ্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। রায় চোখ মেলিলেন, বাইজীর পায়ের ঘুঙুর সাড়া দিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। কলাপীর নৃত্য। আকাশে মেঘ দেখিয়া উতলা ময়ূরীর মত নৃত্যভঙ্গী। গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়াছে, দুই হাতে পেশোয়াজের দুই প্রান্ত আবদ্ধ, পেখমের মত তালে তালে নাচিতেছে। চরণে ঘুঙুর বাজিয়া উঠিল।

রায় বলিয়া উঠিলেন, বাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীর নৃত্যমুখর চরণচাপল্য স্থির হইয়া গেল? ওদিকে তবলায় পড়িল সমাপ্তির আঘাত

মহিম সরিয়া আসিয়া রায়ের কানে কানে বলিল, ঠাকুরদা, আসর যে জমছে না, গলা শুকিয়ে এল! কৃষ্ণাবাই সব ঠাণ্ডা ক'রে দিলে যে!

কৃষ্ণাবাই ঈষৎ হাসিল, বোধ করি সে বুঝিল। অনন্ত শরবৎ আনিয়া মহিমের সম্মুখে ধরিয়াছিল! মহিম কহিল, থাক্, কদিন রাত্রি জেগে সর্দি ক'রে আছে আমার।

রায় ঈষৎ হাসিয়া অনন্তকে ইঙ্গিত করিলেন।

অনন্ত ফিরিয়া গিয়া বড় একটা পরাতের উপর হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস লইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পানীয় প্রস্তুত করিয়া অনন্ত মহিমকে দিয়া দ্বিতীয় গ্লাস তুলিয়া আসরের দিকে চাহিল। সকলে নতশির হইয়া বসিয়া ছিল। সে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে সসম্ভ্রমে পানীয় অগ্রসর করিয়া ধরিল। নীরবে রায় গ্লাসটি ধরিলেন। মহিম অনেকক্ষণ ধরিয়া তরুণী বাইজীকে লক্ষ্য করিতেছিল, একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তুমি একবার আগুন ছড়িয়ে দাও দেখি!

পিয়ারী গান ধরিল। জলদ গতি। রায় চোখ মুদিয়া ছিলেন, একবার কেবল ফাঁকের ঘরে বলিলেন, জেরা ধীরসে।

কিন্তু অভ্যাসের বশে পিয়ারী চটুল নৃত্যে, চপল সঙ্গীতে মজলিসের মধ্যে যেন অজস্র লঘু ফেনার ফানুস উড়াইয়া দিল। মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুৎ আচ্ছা।

রায়-কর্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি-ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

কিন্তু তবু তিনি দুলিতেছিলেন সঙ্গীতমুগ্ধ অজগরের মত। দেহের মধ্যে শোণিতের ধারা—রায়বংশের শোণিতের অভ্যস্ত উগ্রতায় বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী নাচিতেছে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মত। পিয়ারীকে দেখিয়া মনে পড়ে লক্ষ্ণৌয়ের জোহরার কথা। কৃষ্ণার সঙ্গে সাদৃশ্য দিল্লীওয়ালী চন্দ্রাবাইয়ের। চন্দ্রাবাই তাঁহার জীবনের একটা অধ্যায়। পিয়ারীর নৃত্য শেষ হইল। রায় ভাবিতেছিলেন অতীতের কথা। চিন্তা ভাঙিয়া গেল টাকার শব্দে। মহিম পিয়ারীকে বকশিশ দিল। মহিম নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। প্রথম ইনাম দিবার অধিকার গৃহস্বামীর। চকিত হইয়া রায় সম্মুখে পাশে চাহিলেন। নাই—সম্মুখে রূপার পরাত নাই—আধারও নাই, আধেয়ও নাই। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণাবাই তখন গান ধরিয়াছে। আসরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরঙ্গের মত তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া ফিরিতেছিল। তাহার গতিতাড়িত বায়ুতরঙ্গ শ্রোতাদের বুকে আঘাত করিতেছে। সে গাহিতেছিল—কানাইয়ার বাঁশী বাজিয়াছে; উচ্ছ্বসিত যমুনা উজানে ফিরিল; তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙিয়া কানাইয়াকে সে বুকে টানিয়া লইতে চায়। সে সঙ্গীত ও নৃত্যের উচ্ছ্বাস অপূর্ব! রায় সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গত শেষ হইল। রায় বলিয়া উঠিলেন, বহুৎ আচ্ছা চন্দ্রা!

কৃষ্ণা সেলাম করিয়া কহিল, বাঁদীকে নাম কৃষ্ণাবাই।

ওদিক হইতে মহিম ডাকিল, কৃষ্ণাবাই, থোড়া ইনাম ইধার।

রায় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। ধীর পদক্ষেপে মজলিস অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বারান্দার বুকে পাদুকাশূন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

মহিম বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তোমার আর একখানা।

কৃষ্ণা বলিল, হুজুর-বাহাদুরকে আনে দিজিয়ে।

মহিম বলিল, আসছেন তিনি, তার আর কি। ওই—ওই বোধ হয় আসছেন তিনি।

রায় নয়—প্রবেশ করিল নায়েব তারাপ্রসন্ন। একটি রূপার রেকাবি আসরে সে নামাইয়া

দিল। রেকাবের উপর দুইখানি মোহর।

নায়েব বলিল, বাবু ইনাম দিলেন।

মহিম অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, তিনি কই ?

তাঁর বুকে ব্যথা ধরেছে। তিনি আজ আসতে পারবেন না আপনারা গান শুনন। তিনি মাফ চেয়েছেন সকলের কাছে।

মজলিসের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন উঠিল।

মহিম উঠিয়া তাচ্ছিল্যময় আলস্যভরে একটা আড়ামোড়া ভাঙিয়া বলিল, উঠি তারাপ্রসন্ন। কাল আবার সাহেব আসবেন।

তারপ্রসন্ন আপত্তি করিল না। অপর সকলেও উঠিয়া পড়িল। মজলিস ভাঙিয়া গেল।

ঘরের মেঝের উপর রায়-গিন্নীর হাতবাক্সটা খোলা পড়িয়া ছিল। গর্ভ তাহার শূন্য। রায় নিজে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন উন্নত শিরে। রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উত্তেজনায়, সুরার উগ্রতায় দেহের রক্ত যেন ফুটিতেছিল। স্থান কাল আজ সব ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। জলসাঘরের আলোকের দীপ্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। আবার আসিয়া তিনি জলঘরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য আসর। দেওয়ালের বুকে শুধু জাগিয়া আছেন রায়বংশধরগণ। বিশ্বম্ভর খোলা জানালার দিকে চাহিলেন। জ্যোৎস্নায় ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। বসন্তের বাতাসের সর্বাঙ্গে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ মাখা। কোথায় কোন্ গাছে বসিয়া একটা পাপিয়া অশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলিয়া ডাকিতেছে, পিউ-কাঁ-হাঁ—পিউ-কাঁ-হাঁ! রায়ের মনের মধ্যে সঙ্গীত গুঞ্জন করিয়া উঠিল। বহুদিনকার ভুলিয়া যাওয়া চন্দ্রার মুখের বেহাগ—শুনু যা শুনু যা পিয়া—। মাথার উপরে চাহিয়া দেখিলেন, চাঁদ মধ্যগগনে। পদশব্দে পিছন ফিরিলেন। অনন্ত বাতি নিবাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন, থাক্।

অনন্ত চলিয়া যাইতেছিল। রায় ডাকিলেন, এস্রাজটা এনে দে আমার।

অনন্ত এস্রাজ লইয়া আসিল। জানালার সম্মুখে এস্রাজ-কোলে রায় বসিয়া বলিলেন, ঢাল্!

পরাতের উপর খোলা বোতল পড়িয়া ছিল—রায় ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পানীয় দিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

এস্রাজের তারের বুকে ছড়ির টান পড়িল। নিস্তব্ধ পুরীর মধ্যে সুর জাগিয়া উঠিল। বিভোর হইয়া রায় এস্রাজ বাজাইয়া চলিয়াছেন। এস্রাজ কি কথা কহিয়া উঠিল? মৃদু ভাষা যে স্পষ্ট শোনা যায়।

গানের কথাগুলি রায়ের কানে বাজিতেছিল—নিশীথরাত্রে হতভাগিনী বন্দিনী, দুয়ারের পাশে প্রহরায় জাগিয়া বিবাক্ত ননদিনী! নয়নে আমার নিদ্রা আসে না, নিদ্রার ভানে আমি তোমারই রূপ ধ্যান করি; হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে?

রায় এস্রাজ ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন?

মৃদুস্বরে তিনি ডাকিলেন—চন্দ্রা—চন্দ্রা!

* *

তাঁহার চন্দ্রা! এ গানও যে চন্দ্রার! বাহির হইতে মিঠা গলায় কে ডাকিল, জনাব!

রায় ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন,—চন্দ্রা,—চন্দ্রা, আও, ইধর আও। দোস্ত্ লোক চলা গিয়া চন্দ্রা!

কৃষ্ণা স্মিত সলজ্জ মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অতি মধুর করিয়া যে গানটি তিনি এস্রাজে বাজাইতেছিলেন, তাহার শেষ চরণ গাহিল—হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে? হাসিয়া রায় তাঁহার মোটা গলা যথাসম্ভব চাপিয়া গান ধরিলেন—ওগো প্রিয়া, এমন রাত্রি, বুকে আমার বিজয়োল্লাস, একা কি আজ থাকা যায়?

রায় বোতলের ছিপি খুলিতেছিলেন। হাত বাড়াইয়া কৃষ্ণাবাই বলিল, জনাবকে হুকুম হোয়ে তো বাঁদী দে সকতে হেঁ। মৃদু হাসিয়া রায় বোতল ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণা বোতল খুলিয়া দিল। মদ ঢালিয়া গ্লাস রায়-বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

আবার এস্রাজের সুর উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা মৃদুস্বরে গান ধরিল। কৃষ্ণা গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিল। সে গাহিল—হে প্রিয়, ঝরা ফুলের মালা আমি গাঁথি না; উচ্চ শাখায় ওই যে ফুলের স্তবক, ওই আমায় দাও; আমায় তুমি তুলিয়া ধর, আমি নিজে চয়ন করিব তোমার জন্য। ঊর্ধ্ব মুখে হাত দুইটি বাড়াইয়া সে নাচিতেছিল। রায় এস্রাজ ফেলিয়া টপ করিয়া হাতের মুঠাতে কৃষ্ণার পা দুইটি ধরিয়া উচ্চে তুলিয়া তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া দিলেন। গান শেষ হইল। কৃষ্ণা পড়িয়া যাইবার ভানে চিৎকার করিয়া উঠিল। পর-মুহূর্তে সে নামিয়া পড়িল। সুরামত্ত রায় আদর করিয়া ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী!

গানের পর গান চলিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। একটা বোতল শেষ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বোতলটাও শেষ হয়-হয়। একটু পরেই বাইজীর অবশ দেহ এলাইয়া পড়িল—ফরাসের উপর। বিশ্বম্ভর তখনও বসিয়া—মত্ত নীলকণ্ঠের মত। বাইজীর অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। একটা তাকিয়া সযত্নে তাহার মাথায় দিয়া ভাল করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন। তারপর এস্রাজ টানিয়া লইয়া আবার বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় বোতলটা শেষ হইতে চলিল। কিন্তু, রাত্রি শেষ হইল না। এমন সময় গাঙ্গুলীবাড়ির তিনটার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, ঢং—ঢং—ঢং।

রায়বাড়ির খিলানে খিলানে পারাবতের গুঞ্জন উঠিল। রায়ের চমক ভাঙিল। নিত্য এই শব্দে নিদ্রা ভাঙে—তিনি উঠিয়া পড়িলেন। একবার শুধু নিদ্রিতা কৃষ্ণাকে আদর করিলেন চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী! তারপর বারান্দার বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত!

অনন্ত গিয়াছিল ছাদে প্রভুর জন্য তাকিয়া গালিচা পাতিতে। নীচে নামিয়া আসিতেই রায় তাহাকে বলিলেন, পাগড়ির চাদর, সওয়ারের পোশাক দে। নিতাইকে ব'লে দে তুফানের পিঠে জিন দিতে—জলদি।

সবিস্ময়ে অনন্ত প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, রায় গোঁফে চাড়া দিতেছেন।

এ মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়, কিন্তু বহুদিন দেখে নাই। সে মৃদুস্বরে বলিল, মুখে হাতে জল দিন।

কিছুক্ষণ পরই তুফানের হর্ষপূর্ণ হ্রেষায় শেষরাত্রির বুক ভরিয়া উঠিল। তারাপ্রসন্নের ঘুম

ভাঙিয়া গিয়াছিল। জানালা হইতে সে দেখিল—তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর রায়। পরনে চোস্ত্ পায়জামা, গায়ে আচকান, মাথায় সাদা পাগড়ি। অন্ধকারে সম্পূর্ণ না দেখিলেও তারাপ্রসন্ন কল্পনা করিল—পায়ে জরিদারি নাগরা, হাতে চামর দেওয়া চাবুক। তুফান নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল।

মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া ধূলার ঘূর্ণি উড়াইয়া তুফান তুফানের বেগে ছুটিয়াছিল। শেষরাত্রির শীতল বায়ু হু-হু করিয়া রায়ের উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। সুরার উগ্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রান্তর শেষ হইয়া গ্রাম—গ্রামখানার নাম কুসুমডিহি। পাশ দিয়া তরকারি-বোঝাই একখানা গাড়ি চলিয়াছে। আরোহী তাহাতে দুই জন। বোধ হয় তাহারা হাটে চলিয়াছিল। কয়টা কথা তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল, গাঙ্গুলীবাবুরা কিনে থেকে—

রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতিরোধ করিলেন।

তখনও গাড়ির আরোহী বলিতেছিল, খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায়-রাজাদের আমলে—

চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া রায় চমকিয়া উঠিলেন।

তুফানের পিঠের উপর! কোথায়!—এ তিনি কোথায়! ক্রমে চিনিলেন, হারানো লাট কীর্তিহাট সম্মুখে। মুহূর্তে সোজা হইয়া, লাগাম টানিয়া তুফানকে ফিরাইয়া সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিলেন। আবার কশাঘাত। তুফান বিপুল বেগে ছুটিল। আস্তাবলের সম্মুখে আসিয়া রায় চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, পূর্বদিকে আলোর রেশ ফুটিতেছে। রজনী এখনও যায় নাই।

রায় ডাকিলেন, নিতাই!

তিনি হাঁপাইতেছিলন। অনুভব করিলেন, তুফানও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। রায় নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, লাগামের টানে তুফানের মুখ কাটিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত মুখটা রক্তাক্ত। শ্রান্ত তুফান কাঁপিতেছিল। রায় তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, বেটা—বেটা!

তুফান মুখ তুলিতে পারিল না। সুরার মোহ বোধ করি তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ যায় নাই। বলিলেন, ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি বেটা তুফান! ওঠ্—ওঠ্।

নিতাই পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, বড় হাঁপিয়ে পড়েছে, ঠাণ্ডা হ'লেই উঠবে।

চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রায় দেখিলেন, নিতাই! নিতাইয়ের হাতে তুফানকে দিয়া ত্বরিতপদে রায় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, জলসাঘর তখনও খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর শূন্য, অভিসারিকা চলিয়া গিয়াছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গড়াগড়ি যাইতেছে। ঝাড়-দেওয়ালগিরির বাতি তখনও শেষ হয় নাই। এখনও আলো জ্বলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ!

কেবল তাঁহার নহে, সান্ত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।

দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। রেলিঙে ভর দিয়া ভীতার্তের মত তিনি ডাকিলেন, অনন্ত—অনন্ত।

অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনে নাই। সে আসিয়া দাঁড়াতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর্—জলসাঘরের—

আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।

যে বই লিখতে চাই

অনেক দিন হল—বোধ করি ছেলেবেলায় কোন বিদেশী গল্পের অনুবাদ পড়েছিলাম—সেটি আজও আবছা মনে আছে। গল্পটিকে আজকে স্মরণ করতে গিয়ে যা মনে হচ্ছে তা হয়তো আজকের বিষয়বস্তুর প্রভাবে পাল্টে গিয়ে থাকবে। তা যাক—সেটি এই—একজন অবস্থাপন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি একদা ঘোষণা করলেন যে, অতঃপর তিনি একখানি এমন স্মরণীয় এবং মহৎ গ্রন্থ রচনা করবেন যেমনটি আর পৃথিবীতে পূর্বে রচিত হয়নি—সে কি আকারে, কি প্রকারে। কলেবর হবে সুবৃহৎ এবং তার রচনাশৈলী হবে নদীর স্রোতের মত স্বচ্ছন্দবহা ও ভাষার মাধুর্য তার উপর পূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নার মত প্রতিফলিত হয়ে ক'রে তুলবে অপরূপ। ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে সে গ্রন্থ জীবনের অনুদ্ঘাটিত পরম সত্যকে উদ্ঘাটিত করবে—যে সত্যের মধ্যে থাকবে জীবনের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। শান্তি সুখ-সান্ত্বনা এমন কি ঈশ্বরের স্পর্শ প্রত্যক্ষ করবে মানুষ। এক কথায় গ্রন্থখানি হবে একখানি অমৃতময় গ্রন্থ এবং তার ফলে রচয়িতা অবশ্যই হবেন অমর। ঘোষণা ছড়িয়ে পড়তেই বহুজনে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন—তাঁর স্ত্রী একটা আশঙ্কায় এবং এক গৌরব প্রত্যাশায় কেমন যেন হয়ে গেলেন। বাড়ির ভিতর নূতন করে তাঁর লিখবার ঘর হল; বই এল—নানান গ্রন্থ; কাগজ এল, কলম এল, কালি এল; সবই মূল্যবান জিনিস, এবং তিনি একদা সেই ঘরে বসে কাজ শুরু করলেন। দরজা বন্ধ থাকে; মধ্যে মধ্যে স্ত্রী এসে ডাকেন—কফি এনেছি, চা এনেছি, খাবার এনেছি। ক্বচিৎ কখনও নিজেই বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়ান, আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকান বিচিত্র সন্ধানী দৃষ্টিতে, আমার ঘরে গিয়ে ঢুকে বসেন। স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ঘরে এসে ঘর গুছিয়ে যান যখন স্বামী ঘুমিয়ে পড়েন। দেখেন স্তূপীকৃত বই নামানো হয়েছে—কোনটা খোলা, কোনটায় আট-দশটা পৃষ্ঠা-চিহ্ন গোঁজা। তিনি বুঝতে পারেন সমুদ্রগর্ভে রত্নসন্ধানী ডুবুরীর মত জ্ঞানসমুদ্রে স্বামী ডুবে রয়েছেন। তিনি বাইরে যান—অথবা আগন্তুক আসেন—তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

সে যে কী গভীর সাধনা আমি বলতে পারি না। অনুভব করি। মাস যায় বছর যায়, স্ত্রী দেখলেন, আর বই নামানো থাকে না, স্তূপীকৃত কাটা কাগজ টেবিলের উপরে রাখা এবং তেমনি সংখ্যক ছেঁড়া কাগজ মেঝের উপর ছড়ানো। কোনটায় দু'লাইন লেখা। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের লোক আসে—তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করে—কতদূর হল বই? স্ত্রী বলেন—হচ্ছে। দ্রুত কাজ চলছে। অত্যন্ত দ্রুত। কাগজে এই সংবাদ বের হয়, বইখানি সম্পর্কে কিছু কাল্পনিক বিবরণও বের হয়। দেশের লোক পণ্ডিত-সমাজ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন; কোন কোন সমালোচক—এই প্রকাশিত কাল্পনিক বিবরণের উপরেই ছোটখাটো প্রবন্ধ লিখে বসেন। বৎসরের পর বৎসর কাটে। প্রশ্ন করে—আর কত দূর? উত্তর দেন স্ত্রী—এই শীঘ্রই শেষ হবে। তিনি না-জেনেই বলেন। কারণ স্বামীর মুখ দেখে তিনি ও প্রশ্ন করতে সাহস করেন না—তিনি উদ্‌ভ্রান্ত, নিঃশব্দ, গভীরতম চিন্তায় নিমগ্ন। এই অবস্থায় একদিন ঘরের মধ্যে কোন ভারী জিনিস পড়ার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর স্ত্রী ছুটে গিয়ে দেখলেন—স্বামী মারা গেছেন। খবর ছড়িয়ে পড়ল! গোটা শহর ভাঙল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের লেখক মারা গেছেন। মহা সমারোহে শেষ সৎকার হল। ঘরে তালা দেওয়া হল পাছে একটুকরো কাগজ খোয়া যায়। তারপর একদিন শহরের চিন্তানায়করা এসে দরজা খুললেন। কই সে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কই? শুধু স্তূপীকৃত সাদা কাগজ। শুধু একখানি কাগজে মোটা হরফে লেখা—

'কল্পনামৃত'

নিচে তাঁর নাম। এ ছাড়া এক লাইনও লেখা হয়নি। ছেঁড়া কাগজগুলি পরীক্ষা করা হল! তাতেও ওই একই কথা লেখা—কল্পনামৃত—নিচে লেখক হিসেবে তাঁর নাম। এ ছাড়া আর কিছু লিখতে তিনি পারেননি। লেখা তাঁর হয়নি। জীবনের এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনার কল্পনা তাঁর হয়তো আসেনি, অথবা নিত্যই সে কল্পনার পরিবর্তন হয়েছে।

সকলে একটু করে বক্রহাস্য হেসে চলে গেল। শুধু স্ত্রীর চোখ থেকে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল।

'যে বই লিখতে চাই' সে সম্পর্কে বলতে বসে গল্পটি আমার মনে পড়ছে। যে বই লিখতে চাই, অর্থাৎ যার কল্পনা মনে মনে আছে কিন্তু যা লেখা হয়নি, বা হয়ে উঠছে না—সে-বই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই বইয়ের মত। অর্থাৎ 'যে বই লেখক লিখতে চান' যাতে তাঁর মনের শেষ কথা বা শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির কথাটি বলা হয়ে যায়—সেই বই কখনও লেখা হয় না—অথবা যদিই লেখা হয় তবে তাঁর লেখা সেই বইয়েই শেষ হয়ে যায়—লেখার কাজ ফুরিয়ে যায়। হয়তো বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই 'যে বইটি লিখতে চাই' সেই বইটির পরিকল্পনা যে কি তাও সঠিক বা স্পষ্টভাবে আমাদের মনের মধ্যে রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে না; মায়ের মনের ইচ্ছার মতই ইচ্ছা হয়েই থেকে যায়।

এক একজন মহান লেখক হয়তো লিখে গেছেন। যেমন বাল্মীকি। রামায়ণ তিনি লিখতে চেয়েছিলেন অথবা লিখতে বসে যে বই তিনি লিখতে চেয়েছিলেন—রামায়ণেই তা লেখা হয়ে গেছে—তাই রামায়ণ ছাড়া দ্বিতীয় গ্রন্থ তিনি লেখেননি। বেদব্যাস—মহাভারতেও

তাই করে গেছেন। ভাগবত হয়তো পূর্বের রচনা। অথবা ভাগবতেও তিনি মহাভারতেই আছেন; মহাভারত ওতে সম্পূর্ণ হয়েছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের মত। এবং এই কারণেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের চরম ও পরম উপলব্ধি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে নিজেও হলফ করে বলতে পারে না যে 'এই বই আমি লিখতে চাই' এবং এই লিখলেই আমার জীবনের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হবে। অন্যথায় যাঁরা লিখে জীবিকা অর্জন করেন তাঁদের মনে অবশ্যই থাকে যে এই বইখানি শেষ করে এই বইখানি আরম্ভ করব। 'যে বই আমি লিখতে চাই'—যাতে আমার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সেই গ্রন্থকে বর্তমান জগতের পটভূমিতে সকল কালের চরম ও পরম-সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে হবে। বর্তমানের মানব-চরিত্রের মধ্য থেকে সকল কালের জীবন চরিত্র প্রকাশিত হবে সূর্যমধ্যস্থ জ্যোতির্ময়তার মত।

কিছুকাল থেকে আমার মনে মনে আমি অনুভব করি—মানব-জীবনে সকলের মধ্যেই একটি কামনা নিরন্তর একই মুখে তাকে প্রভাবিত করছে। হিম বা জল যেমন নিম্নাভিমুখী গতিতে পাহাড়ের চূড়ায় তুষার রূপ থেকে বিগলিত হয়ে সমুদ্রপথে চলেছে, তেমনি জীবনও অরণ্য ও পর্বক-কন্দর থেকে এই যে সভ্যতার স্তর থেকে স্তরান্তরে নব নব রূপে নিজেকে রূপায়িত করছে—তার ধারা বিশ্লেষণ করলে একটি একমুখী গতিতে স্পষ্ট দেখা যায়। সে গতি দুঃখ থেকে সুখে, অন্ধকার থেকে আলোকে, অসৎ থেকে সতে, চেতনা থেকে চৈতন্যে এবং চৈতন্যের স্তর থেকে ঊর্ধ্বতর স্তরে চলেছে। এখানে একের সঙ্গে অন্যের এক নিরন্তর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সত্য উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমনই স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে যে মনে মনে ইচ্ছা হয় যে এই শতবর্ষের ইতিহাস ও উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের মত নবভারত রচিত হোক। বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে বিভিন্ন পর্ব। এ বিরাট কর্ম একজনের নয়—ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রতিনিধিমণ্ডল নিয়ে বিচার করে এক এক জনের উপর এক এক পর্বের ভার দেওয়া হোক। সকল প্রকার ধর্মনীতি রাজনীতি সমাজনীতির প্রভাব থেকে উর্ধ্বে আসন পেতে শতবর্ষের জীবন-যুদ্ধকে বিচার বিশ্লেষণ করা হোক। নায়ক স্থির হোক। শেষ স্থির হোক। মহাত্মার জীবনাবসানে এ ছেদ বা সমাপ্তিতে মহানাটকীয় সমাপ্তি দেখতে পাই আমি। তারপরও দেখি শতবর্ষের সার্থকতার মধ্যে যে অসার্থকতা—আলোর পশ্চাদনুসারিণী ছায়ার মত—দেশ-বিভাগ ও দেশত্যাগীদের লাঞ্ছনা ও দুর্দশার মধ্যে আবার নূতন জীবন-দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। এই অসমাপ্তির মধ্যেই জীবনের চলমানতার ইঙ্গিত। এতেই এই মহাকাব্যের শেষ। এই মহাকাব্যের একটি অংশ লেখার ইচ্ছা আমার হয়। কিন্তু ঐ আমার সাধ। সাধ্য বিচার করতে গিয়ে মনে পড়ে যায় ওই গোড়াকার গল্পটি। হয়তো বঙ্গপর্ব রচনার ভার নিয়ে দিনরাত্রি চিন্তা করে, গ্রন্থের পর গ্রন্থ উল্টে-পাল্টে যাব, সামনে থাকবে স্তূপীকৃত কাগজ—এই ফাউন্টেনপেনের যুগে—কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর ফাউন্টেন পেন, খুব ভালো কালি; মাসের পর মাস আমি ঘরের মধ্যে বসেই থাকব কলম হাতে নিয়ে; নিত্যই একখানা নূতন কাগজ টেনে নিয়ে যত চমৎকার করে আমার সাধ্য আমি লিখব—নবভারত, বঙ্গপর্ব-রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; দিন শেষে কাগজখানা মুচড়ে পিণ্ড পাকিয়ে ফেলে দেব; পরদিন আবার নূতন কাগজ টেনে নিয়ে

ওই ক'টি কথাই আবার লিখব, সারাদিন ধরে কখনও ওই অক্ষর ক'টিতে কলমের দাগ টেনে মোটা করব সুন্দরতর করব, কখনও বা আকাশের দিকে তাকিয়ে শতবর্ষের জীবনস্রোতের তরঙ্গ গণনা করব। তারপর একদা আমার জীবন শেষ হবে, সেদিন সকলে ছুটে আসবেন বঙ্গপর্বের জন্য খুঁজে দেখবেন; পাবেন শুধু শেষ লেখা কাগজ একখানি—তাতে লেখা আছে নবভারত বঙ্গপর্ব-রচয়িতা তারাশঙ্কর—বাকী কাগজগুলি সব সাদা—সব সাদা—সব সাদা। যে বই আমি লিখতে চাই—দেখা যাবে সে বই আমার লেখা হয়নি।